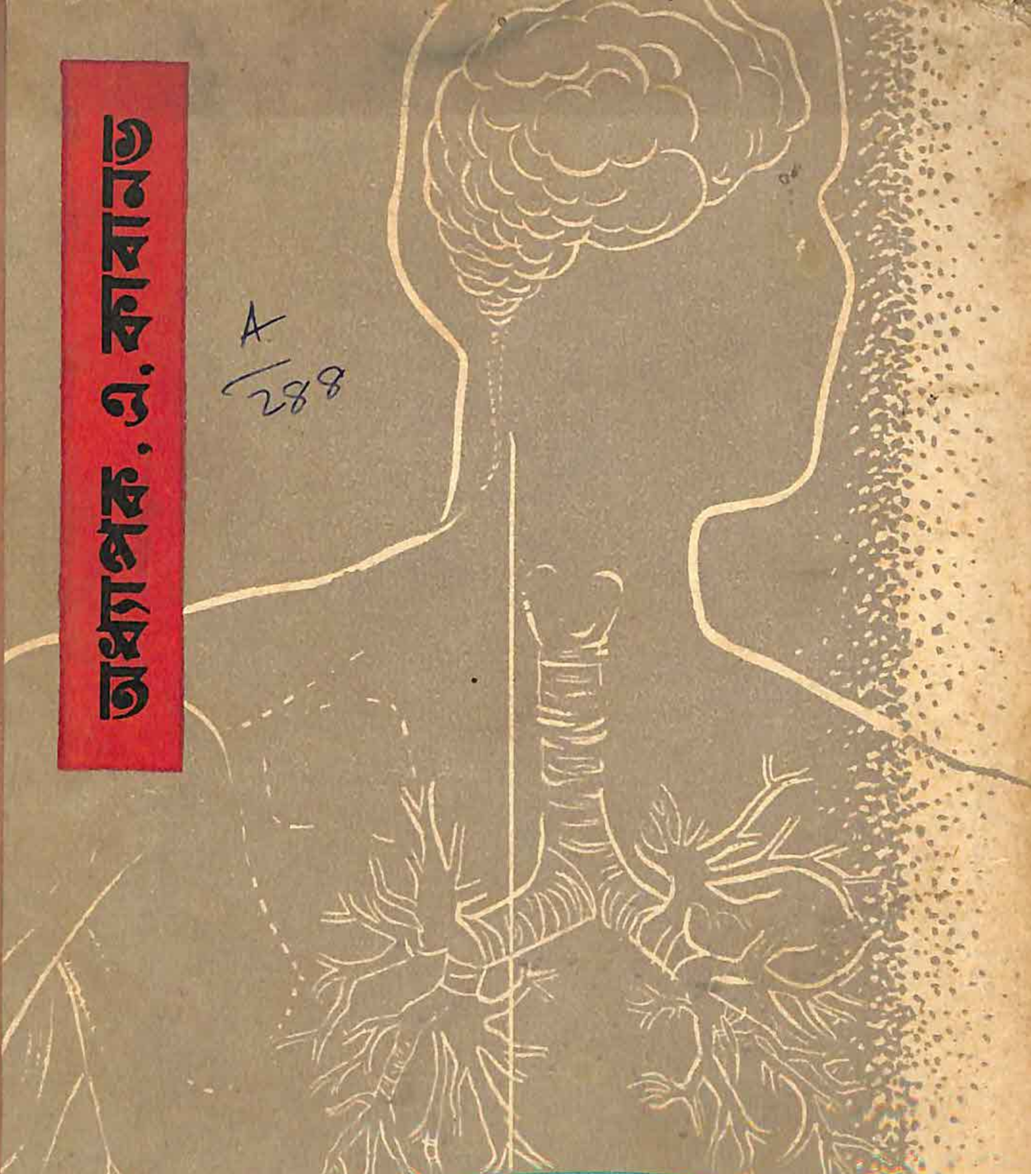
অধ্যাপক এ. কাবানভ



মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ

মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ

(Anatomy and Physiology of a Human being)

অধ্যাপক এ, এন, কাবানভ

অনুবাদ : ডাঃ সমর রায়চৌধুরী

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ১৯৫৮॥

মূল রুশ থেকে ইংরেজি অনুবাদঃ
এ, জ্যাকব্‌সন্‌ ও পি, ক্লাৎস্কায়া॥

প্রকাশকঃ
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২॥

মুদ্রকঃ
এন, এম, সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৯, আণ্টনীবাগান লেন,
কলিকাতা-৯॥

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ, ব্লক ও রঙীন প্লেটঃ
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানি
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি ঃ ৯॥

প্রচ্ছদপটঃ
এস-ডি-জি॥

বাঁধিয়েছেনঃ
কৃষ্ণা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬৭, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯॥

দাম ঃ সাত টাকা॥

ভূমিকা

১৯৫৬ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তৎকালীন চ্যান্সেলর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল স্বর্গীয় ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে শিক্ষা ক্ষেত্রে রাশিয়ার অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়া বলেন যে এই দেশটি যে আজ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, লণ্ডনের "টাইমস্" পত্রিকার মতে ইহার মূলে আছে সেই দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের এক মহান বিপ্লব যাহা ১৯১৭ সালের রাজনৈতিক বিপ্লবেরই সমতুল্য। অধ্যাপক জুকারম্যান (যিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কমিটি অন্ সায়াণ্টিফিক্ ম্যানপাওয়ারের সভাপতি ছিলেন) তাঁহার রিপোর্টে বলেন "ফলিত বিজ্ঞান ও টেকনলজির ক্ষেত্রে রাশিয়ার ছাত্রোৎপাদন ইউনাইটেড ষ্টেট্স্‌কেও ছাপাইয়া গিয়াছে।" তিনি একথাও বলিয়াছেন যে "এই সকল ছাত্রদের শিক্ষার মান যে কোনও ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অপেক্ষা উচ্চস্তরের।"

অধ্যাপক এ. এন. কাবানভের "মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ" নামক মূলগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া স্বর্গত ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক জুকারম্যানের মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে দ্বিধাবোধ করিতে হয় না। বত্রিশ বৎসরকাল শারীরতত্ত্বের শিক্ষকতা করিবার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে মাত্র জীবদেহের গঠনের কথা ছাত্রদের কাছে নিছক নীরস বলিয়া মনে হয়। গঠনের সহিত দেহযন্ত্রের বিভিন্ন কার্য-কলাপের কথা সন্নিবেশিত না হইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, পঠন এবং পাঠন সরস হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া অধ্যাপক কাবানভের এই পুস্তক অনবদ্য হইয়াছে বলিতেই হইবে।

এই পুস্তকের প্রারম্ভেই লিখিত আছে যে ইহা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক। ইহা হইতেই রাশিয়ার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সম্বন্ধে বেশ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের শারীরতত্ত্ব ও দেহযন্ত্রের কার্য-কলাপের জ্ঞান যদি এই পুস্তকে প্রতিফলিত হয় তাহা হইলে আরও উচ্চ শ্রেণীর ও কলেজ শিক্ষার মান কোথায় এবং কত উচ্চে তাহা বোঝা কঠিন নহে।

এই পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আর একটি দিক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাহা হইতেছে এই যে চিরাচরিত জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা প্রায় সকল পুস্তকেই পাওয়া যাইতে পারে তাহা ছাড়া শারীরতত্ত্ব ও দেহযন্ত্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধ অতি আধুনিক গবেষণার তথ্যও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ফলে ছাত্রদের মনোবৃত্তি ও জ্ঞান আধুনিকতম পর্যায়ের সহিত পরিচিত হইবে এবং জ্ঞান পিপাসা তীব্রতর হইয়া উঠিবে।

পরিশেষে এ কথাও বলিতে আনন্দ বোধ করিতেছি যে সকল বিজ্ঞানের সার্থকতা যে পটভূমিকায় যাচাই করা হয় সেই সামাজিক-অর্থনৈতিক (socio-economic) পটভূমিকার ইঙ্গিত বিজ্ঞান চর্চার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে অথচ মাত্র প্রয়োজনানুগ পরিমাণে উল্লেখ করিয়া এই পুস্তকের অপূর্ব সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

অধ্যাপক কাবানভের এই অমূল্য পুস্তক যে ছাত্রদের কাছে আদরণীয় হইবে এবং শিক্ষকদের এক অনবদ্য পাঠ্যপুস্তকের অভাব মিটাইবে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। এই অবসরে অনুবাদককেও আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি।

হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩রা জুন, ১৯৫৮
সিনেট হাউস
কলিকাতা

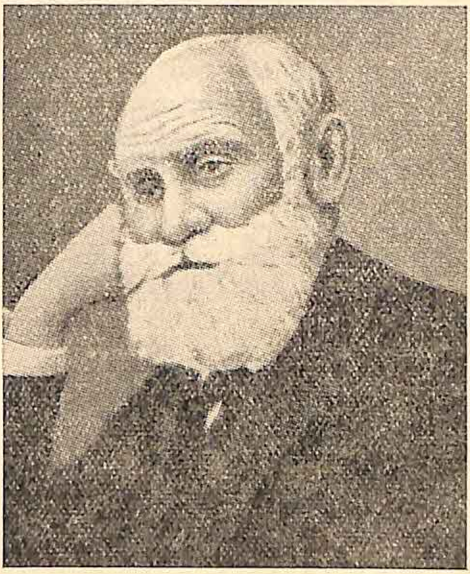
হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট
ডিপার্টমেণ্ট অফ এনাটমি
ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিন

সূচীপত্র

তরুণদের প্রতি আই. পি. পাভ্‌লভের চিঠি

"আমার দেশের যে সমস্ত তরুণ বিজ্ঞান-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিতেছে, তাহাদের নিকট আমি কি আশা করি?

সর্বপ্রথম আশা করি ধারাবাহিকতা। বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে সাফল্যলাভের পথে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটি সম্পর্কে কিছু বলিতে হইলে আমি উত্তেজিত না হইয়া পারি না। ধারাবাহিকতা-ধারাবাহিকতা-ধারাবাহিকতা। কাজ শুরু করার সময় হইতেই জ্ঞান আহরণ করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে ধারাবাহিক হওয়ার জন্য নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।



আই· পি· পাভ্‌লভ

শিখরে পৌঁছানর চেষ্টা করার পূর্বে বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ গুলি অনুধাবন করো। আগের ধাপগুলিতে দক্ষতা অর্জন না করা পর্যন্ত কখনও পরের ধাপে অগ্রসর হইবেনা। নিজ জ্ঞানের ত্রুটিগুলি ঢাকিবার জন্য কখনও খুব সাহসী অনুমান বা কল্পনারও আশ্রয় লওয়ার চেষ্টা করিওনা। সাবানের ফেনার অপূর্ব চিরপরিবর্তনীয় রং যতই চোখ ধাঁধান হউক না কেন, অনিবার্যভাবেই তাহা ফাটিয়া পড়িবে এবং তখন তোমার নিকট থাকিবে শুধু বিহ্বলতা, শুধু বিশৃঙ্খলতা।

বিচারবুদ্ধিতে ও ধৈর্যে নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তোল। বিজ্ঞানের জটিল কাজে অভ্যস্ত হও। অনুধাবন করো, তুলনা করো তথ্য সংগ্রহ করো। পাখীর ডানা যতই সঠিক হউক না কেন, বাতাসে ভর না করিয়া সে ডানা পাখীকে আকাশে তুলিতে পারে না। বিজ্ঞানীর নিকট তথ্য বাতাসের সমতুল্য। বিনাতথ্যে ঊর্দ্ধপানে উড়িতে পারিবেনা, বিনা তথ্যে সমস্ত তত্ত্বই নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত হইবে।

কিন্তু অনুধ্যান, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সময় তথ্যের উপরিভাগে থাকিওনা, তথ্যের সেরেস্তাদার হইওনা। ইহার গূঢ় গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করিও। যে নীতিগুলি তথ্যকে পরিচালনা করে, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাহাদের অনুসন্ধান করো।

দ্বিতীয় প্রয়োজন নম্রতা। কখনও মনে করিও না যে সব কিছুই তোমার শেখা হইয়া গিয়াছে। যত উচ্চ সম্মানই পাওনা কেন, তুমি যে অজ্ঞ, সব সময়ই নিজেকে একথা বলার সাহস রাখিবে।

নিজেকে দম্ভের বশীভূত হইতে দিওনা। যেখানে নম্রতা স্বীকার করা প্রয়োজন, দম্ভ তোমাকে অনমনীয় করিয়া তুলিতে পারে, প্রয়োজনীয় উপদেশ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করাইতে পারে। দম্ভের জন্য তোমার বাস্তবতাবোধ নষ্ট হইতে পারে।

যাহাদের সহিত আমি কাজ করি, এবং আমার নির্দেশানুসারে যাহারা কাজ করে, তাহাদের মধ্যে পরিবেশই হইল বড় কথা। আমাদের সকলের সম্মুখেই কর্তব্য মাত্র একটি, এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী সেই নির্দিষ্ট কার্যে অগ্রসর হই। 'আমার কাজ' ও 'তোমার কাজ'—এইভাবে পৃথকীকরণ করা কঠিন; কিন্তু তাহা সত্বেও আমাদের সাধারণ কাজ ঠিকই অগ্রসর হয়।

তৃতীয়টি হইল আবেগ। স্মরণ রাখিও, বিজ্ঞান চায় বৈজ্ঞানিকের সারাটি জীবন। যদি তোমার দুইটি জীবন থাকিত, তাহাও যথেষ্ট হইত না। বিজ্ঞানের দাবি—প্রচুর প্রচেষ্টা এবং গভীর আবেগ। তোমার কাজ ও গবেষণায় আবেগ থাকা প্রয়োজন।

আমাদের দেশ বিজ্ঞানীদের সম্মুখে প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে এবং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে উদারভাবে সমর্থন করা হয়; সে উদারতার পরিমাপও সর্বোচ্চ।

আমাদের দেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের অবস্থা সম্পর্কে কী আমার বক্তব্য? বক্তব্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার। তাঁহাদিগকে অনেক কিছুই দেওয়া হয় এবং চাওয়াও হয় অনেক। আমাদের পিতৃভূমি বিজ্ঞানের উপর যে বিপুল আস্থা রাখে, তাহা পূর্ণ করা তরুণদের এবং আমাদের পক্ষেও সম্মানের কথা"।

—আই. পি. পাভ্লভ্

ভূমিকা

১। শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত (Anatomy and Physiology)—জীবদেহের গঠন ও কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিজ্ঞান

শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্তের প্রশ্ন ঃ

শারীর-সংস্থান হইল জীবদেহের গঠন সম্পর্কিত প্রশ্ন; আর শারীর-বৃত্ত হইতেছে জীবন-পদ্ধতি অর্থাৎ জীবদেহে যে জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ (Vital functions) চলে, তাহারই সমীক্ষণ।

এই বিজ্ঞানে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয় সেগুলি শুধু যাহা দেখা যাইতেছে তাহারই যথাযথ বিবরণ নয়। শারীর-সংস্থান সমগ্র জীবদেহের এবং তাহার বিভিন্ন অংশের গঠন সম্পর্কিত নিয়মগুলি এমনভাবে প্রমাণ করে যাহার মাধ্যমে ইহাদের কার্যকলাপের উপর ইহাদের গঠন-পদ্ধতির নির্ভরশীলতাও প্রমাণিত হয়। শারীর-বৃত্ত হইতেছে জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটমান বিষয়ের (different life phenomena) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, তাহাদের পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী, এবং জীবদেহের প্রাণ ধারণের অবস্থার উপর তাহাদের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে গবেষণা।

গঠন ও কার্য-কলাপের মধ্যে সম্পর্ক ঃ

শারীর সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত—এই দুই বিজ্ঞানকে স্কুলের পাঠ্যক্রমে মিলিতভাবে রাখা হইয়াছে এই কারণে যে এই দুইটি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন দেহযন্ত্রের (organs) ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে হইলে ইহাদের গঠনও জানিতে হইবে। অনুরূপভাবে দেহযন্ত্রগুলির গঠন বুঝিবার জন্য তাহাদের জৈবিক কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

দেহযন্ত্রের গঠন ও কার্যকলাপের মধ্যে সম্পর্ক এত নিবিড় যে কোন যন্ত্রের কার্যকলাপের পরিবর্তন তাহার গঠনেও পরিবর্তন আনিয়া থাকে। আবার গঠনের পরিবর্তনও কার্যকলাপে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটায়।

কোন লোক প্রতিদিন ব্যায়াম করিলে তাহার দেহের কতকগুলি মাংসপেশীকে অধিকতর কাজ করান হয়। এইভাবে অধিক কাজ করার ফলে পেশীগুলি আকারে বড় এবং শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়। অপরপক্ষে কোন পেশী কাজ না করিলে—যেমন সেই পেশীতে অবস্থিত স্নায়ু (nerve) আহত হইলে—তাহা আকারে ছোট হইয়া যায় এবং ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ পেশীটির স্বাভাবিক গঠন নষ্ট হইয়া যায়।

পরীক্ষার গুরুত্ব ঃ

সাধারণত জীবদেহের দৈহিক গঠন অনুশীলন করা হয় শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া। কিন্তু জৈবিক কার্যকলাপ অনুশীলন করিতে হইলে অনুধাবন ও পরীক্ষা

(observation and experiment)—অর্থাৎ জীবন্ত জীবদেহকে অনুশীলন করা প্রয়োজন, কারণ, মৃত্যুর পর জৈবিক ক্রিয়া-কলাপের অবসান ঘটিয়া থাকে।

শারীরবৃত্তবিদরা বহু শতাব্দী ধরিয়ে পশুদের উপর পরীক্ষা চালাইতেছেন। কুকুর, ইঁদুর বা ব্যাঙের দেহে অস্ত্রোপচার দ্বারা তাহার হৃৎপিণ্ড বা অন্য যে-কোন দেহযন্ত্র উন্মুক্ত করিয়া তাহার ক্রিয়া-কলাপ অনুধাবন করা যায়; তেমনি, কোন একটি যন্ত্র—যেমন পাকস্থলী বা কোন পেশী—দেহ হইতে কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া পরীক্ষা করা যায়।

পরীক্ষা দ্বারা কোন বিচ্ছিন্ন দেহযন্ত্রকে বোঝা বা অনুশীলন করা সম্ভব। কিন্তু সে-পরীক্ষায় ঐ যন্ত্রটির ক্রিয়া-কলাপে অনিবার্যভাবে এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঈথার বা ক্লোরোফর্মের মত চেতনা-নাশক পদার্থের ব্যবহারে, অস্ত্রোপচারে, বিশেষত, বিভিন্ন দেহযন্ত্রের মধ্যে সহজাত পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হইলে উপরিউক্ত অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বিখ্যাত রুশীয় বিজ্ঞানী আই. পি. পাভ্‌লভ্‌ (১৮৪৯-১৯৩৬) বারবার বলিয়াছেন, "কোন দেহযন্ত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে সমগ্র এবং অখণ্ড জীবদেহটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় অনুশীলন করিতে হইবে।" জীবদেহের অনুশীলনে এই দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষামূলক শারীর-বৃত্তের অগ্রগতিকে এক নূতন স্তরে উন্নীত করিয়াছে।

আই. পি. পাভ্‌লভ্‌ ছিলেন প্রখ্যাত পরীক্ষক। অস্ত্র-চিকিৎসার কলা কৌশল তিনি সুনিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং কুকুরের উপর বহু প্রকার জটিল ও উদ্ভাবনশীল অস্ত্রোপচার করিতে পারিতেন। অস্ত্রোপচারের দ্বারাই তিনি জীবদেহের অখণ্ড অবস্থাতে পাকস্থলী, যকৃত ও অন্যান্য দেহযন্ত্রের কার্য-কারণ অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অগ্ন্যাশয়ের (pancreas) রসবাহী একটি নলকে (duct) অস্ত্রোপচার দ্বারা শরীরের অভ্যন্তর হইতে বাহিরে পরিচালিত করিয়া পাভ্‌লভ্‌ সেটিকে চর্মের সহিত যুক্ত করিয়া দেন। ক্ষত সম্পূর্ণ শুখাইয়া যাওয়ার পর পশুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে পরীক্ষা সুরু করা হইল। কুকুরটিকে তখন তিনি এক বিশেষ ধরণের খাদ্য দিলেন এবং ঐ নল মারফৎ ক্ষরিত রসের পরিমাণ ও উপাদান স্থির করিলেন।

মানবদেহের জৈব-বিন্যাস অনুশীলনের জন্য পরীক্ষার বিশেষ পরিবেশেরও প্রয়োজন। একথা সত্য যে সব পরীক্ষাই মানবদেহের উপর চালান সম্ভব নয়। তবে, মানব ও পশুদেহে শারীর-বৃত্ত সম্পর্কিত ক্রিয়া-কলাপ প্রায় একই রকম। সুতরাং মানব দেহের জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ অনুশীলন করিতে হইলে একদিকে সহযোগী ব্যবস্থা হিসাবে পশুদেহের উপর পরীক্ষা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানব দেহের জৈব-বিন্যাসের উপর পরীক্ষা ও অনুধাবন চালান যাইতে পারে। কিন্তু এই কাজ করিবার সময় যে-সব অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য মানব ও পশু দেহের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, সেগুলি ভুলিলে চলিবেনা।

পাভ্‌লভ্‌ বলিয়াছেন, "উচ্চ স্তরের পশুদের হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্যান্য যে-সব দেহযন্ত্র মানব দেহের সমতুল্য, সেগুলির ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত পরীক্ষালব্ধ তথ্যসমূহ খুব সতর্ক থাকিলে তবেই মানব দেহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মানব ও পশু দেহস্থিত এইসব যন্ত্রের কার্যকলাপে সত্য সত্যই কোন সমতা আছে কিনা সে-বিষয়ে নিরন্তর পরখ করা প্রয়োজন।" মানব দেহের উপর

পরীক্ষা চালান অসম্ভব হইলে রোগীর অবস্থা অনুধাবন করিয়াই পাভ্‌লভ্‌ বর্ণিত পরখ করার কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। জৈবিক ক্রিয়া-কলাপের অনুশীলনে অনুধাবন অন্যতম প্রধান পন্থা।

২। শারীর সংস্থান ও শারীর-বৃত্তের গুরুত্ব

প্রকৃতিতে মানুষের স্থানঃ

দেহের গঠন ও জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে প্রকৃতির মধ্যে মানুষের স্থান, জীব জগতের সহিত তাহার সম্পর্ক, এবং তাহার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা অসম্ভব। জৈবিক গঠন ও জৈবিক কার্য-কলাপ অনুশীলনের দ্বারাই মানুষকে সমগ্র প্রকৃতি ও জীব জগতের বিকাশের সহিত অখন্ডভাবে বুঝিবার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যাইতে পারে।

মানুষ ও পশুর উৎপত্তির সূত্র যে এক এই সত্য প্রমাণ করিয়া শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন এই অলীক ধর্মীয় ধারণা নষ্ট করে এবং মানুষকে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস হইতে মুক্ত করে।

মানবদেহস্থ জৈব প্রক্রিয়া অনুশীলন করিয়া দেখা গিয়াছে যে এ সব ক্রিয়া-কলাপ সব সময়ই প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অধীন—এবং বিশেষ করিয়া সমগ্র প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল বস্তু ও শক্তির নিত্যতা ও পরিবর্তনের নিয়মাধীন (laws of conservation and transformation of matter and energy)। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে জৈবিক প্রক্রিয়াকে কোন গূঢ় ঐশী শক্তির (vital force) বা আত্মার অস্তিত্ব দিয়া ব্যাখ্যা করার চেষ্টা কত ভুল, কত অবৈজ্ঞানিক।

শারীর-বৃত্ত ও শারীর-সংস্থানের গুরুত্বঃ

শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত এই দুই বিজ্ঞানেরই উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইয়াছে মানুষের বাস্তব প্রয়োজন হইতে। রুগ্ন মানুষকে চিকিৎসা করিতে হইলে এবং সুস্থ মানুষকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে জীবদেহের গঠন ও তাহার জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

দেহের গঠন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না-থাকিলে কোন অস্ত্র-চিকিৎসকের পক্ষে হৃৎপিন্ড, মস্তিষ্ক বা চক্ষুর মধ্যে ছুরি চালাইয়া কোন জটিল অস্ত্র-চিকিৎসা করা সম্ভব নয়।

জীবদেহের অনুশীলনের ফলে অতীতে যে-সব ব্যাধি নিরাময় করা অসাধ্য বলিয়া গণ্য হইত, বর্তমানে সেই ধরনের বহু রোগের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম চালান যাইতেছে। খাদ্যপ্রাণের আবিষ্কার এবং তাহাদের কার্যকারণ নির্ধারিত হওয়ার ফলে স্কার্ভি, রিকেট ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় নূতন নূতন নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব হইয়াছে।

রক্তের উপাদানসমূহ অনুশীলন দ্বারা রোগীর দেহে রক্ত দান করিয়া (transfusion) বহুক্ষেত্রেই জীবন রক্ষা করা গিয়াছে।

জীবসত্তার দেহ সংরক্ষক ও সংগঠক উপাদান সম্পর্কে বিশদ গবেষণার ফলে সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে ও তাহাদের প্রতিষেধের ব্যাপারে বহু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হইয়াছে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের ও জনস্বাস্থ্যের যে-সব বিধি পালন করা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অতীব প্রয়োজন, সেগুলিও শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত সম্পর্কিত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সঠিক পুষ্টি, কাজের ও জীবন-যাপনের অবস্থার উন্নতি, অবসাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত বহু প্রশ্ন শারীর-বৃত্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে সমাধান করা গিয়াছে। শারীরিক ও মানসিক শ্রমকে উপযুক্তভাবে সংগঠিত করা এবং কাজ ও বিশ্রামের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ক্রমিক সমন্বয় সাধনের জন্য শারীর-বৃত্তের গুরুত্ব অসীম। কাজের ধরণ এবং জীবদেহের উপর কাজের অবস্থার প্রভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন দ্বারা শারীর-বৃত্তবিদরা অবসাদ লাঘব করিয়া শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন।

৩। শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্তের অগ্রগতিতে রুশ বিজ্ঞানীদের অবদান

শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্তের অগ্রগতিতে রুশীয় বিজ্ঞানীরা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষত উচ্চস্তরের স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ অনুশীলনে রুশীয় বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুশীয় বৈজ্ঞানিক আই. এম. সেৎচেনভ্ (১৮২৯ হইতে ১৯০৫) সর্বপ্রথম মানসিক বা তথাকথিত আত্মিক কার্যকলাপের শারীর-বৃত্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করার চেষ্টা করেন। তিনি দেখান যে "শারীর-বৃত্তের মধ্যেই মানসিক ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের চাবিকাঠি রহিয়াছে।"

ইহার কয়েক বৎসর পরে আর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আই. পি. পাভ্‌লভ্ মস্তিষ্কের উচ্চতর অংশের, অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কের উপরিভাগ বা কর্টেক্সের (cortex of cerebral hemisphere) অনুশীলন করিয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন যে মানসিক প্রক্রিয়া হইল গুরুমস্তিষ্কের শারীর-বৃত্তিক বা জৈবিক কার্যকলাপ।

পাভ্‌লভের গবেষণা শারীর-বৃত্তের অনুশীলনকে উচ্চ স্তরে পরিচালিত করার পথ খুলিয়া দেয়; ফলে জীব-বিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিয়াছে এবং মার্কসীয় বস্তুবাদী বা সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করিতে এই গবেষণা বিপুলভাবে সাহায্য করে।

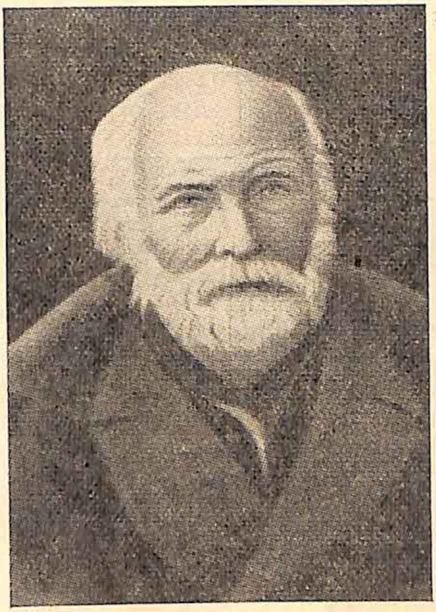
উচ্চস্তরের স্নায়ুতন্ত্রের শারীর-বৃত্তিক অনুশীলনের সার্থকতা স্মরণে রাখিয়াই মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে পাভ্‌লভ্ লিখিয়াছিলেন, "শারীর-বৃত্তিক গবেষণার বিরাট শক্তির জন্য আমরা সমগ্র জীবসত্তাকে জয় করিয়াছি, আংশিকভাবে নয়—অখণ্ডভাবে। বিশ্ব-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে, সমগ্রভাবে মানুষের চিন্তাজগতে ইহা অবিসংবাদীভাবে রুশীয় অবদান"।

পাভ্‌লভ্ সব সময়ই দাবী করিতেন যে বিজ্ঞানকে বাস্তব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলিবেনা—বিজ্ঞানকে জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ করিতে হইবে। আমাদের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কিত প্রশ্নে উৎসাহ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই রুশীয় বৈজ্ঞানিকরা রোগীর দেহে অপরের রক্ত দান (blood transfusion) ও নিদ্রাকারক ঔষধের

প্রয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন। আই. এম. সেৎচেনভ্ সব সময়ই ব্যবহারিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট শারীর-বৃত্তের প্রশ্ন সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। তিনি অবসাদ ও তাহার প্রতিকার সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং শ্রম সম্পর্কিত শারীর-বৃত্তের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আই. পি. পাভ্লভ্ সব সময় তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে বাস্তবে, বিশেষত চিকিৎসার কাজে নিয়োগ করিতেন।

খ্যাতনামা রুশীয় বিজ্ঞানী এন. আই. পিরোগভ্ (Pirogov; ১৮১০-১৮৮১) অস্ত্র-চিকিৎসার উন্নতির জন্য ঠাণ্ডায় জমান শবদেহে অস্ত্রোপচার করিয়া বিভিন্ন দেহযন্ত্র (organs) ও কলার (tissue) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের গবেষণা করিতেন। তাঁহার এই গবেষণার ফলে স্থানিক বা আঞ্চলিক (Topographical or regional Anatomy) শারীর-সংস্থান নামে নূতন এক বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শারীরিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুশীয় শারীর-সংস্থানবিদ পি. এস. লেস্গাফ্ট্-এর (Lesgraft) প্রচুর অবদান আছে। প্রত্যেকটি দেহযন্ত্রের গঠন তাহার কার্যকলাপের ভিত্তিতে অনুশীলন করিয়া শারীর-সংস্থান সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি এক নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। জীব-দেহের গঠন ও জৈবিক ক্রিয়াকলাপ তাহার জীবন ধারণের অবস্থা ও দেহযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল—ইহাই ছিল তাঁহার গবেষণার বিষয় বস্তু।



এন. আই. পিরোগভ

শারীরিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন-গুলি ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিচার করিয়া তিনি ব্যায়ামের এমন এক পদ্ধতি নির্ধারণ করেন যাহাতে জীবদেহের সর্বাধিক বিকাশ ঘটিতে পারে।

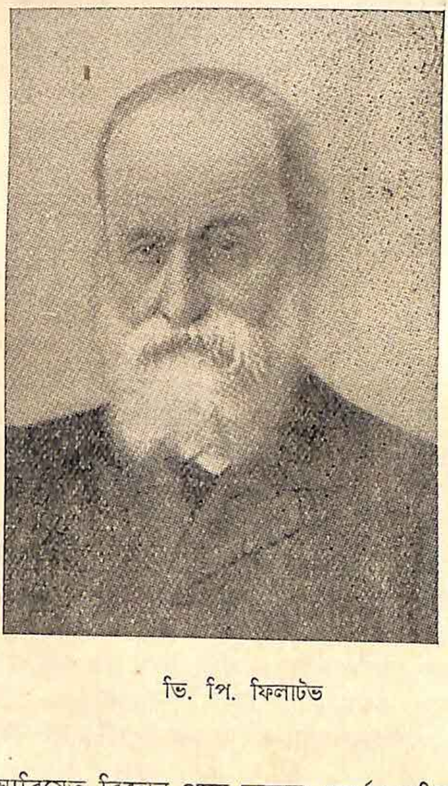
অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুশ বিজ্ঞানী আই. আই. মেচ্নিকভ্ (Metchnikov; ১৮৪৫-১৯১৬) রক্তের দেহ-সংরক্ষণশীল গুণাবলী সম্পর্কে যে অনুশীলন করেন, তাহা হইতে পরে অনাক্রম্যতা (immunity) বা সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়।

পিরোগভ্, লেস্গাফ্ট, মেচ্নিকভ্ প্রভৃতি বহু রুশীয় বিজ্ঞানী তাঁহাদের সমস্ত শক্তি জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ করেন। সেইজন্যই তাঁহারা একদিকে যেমন বিশিষ্ট জননেতা হইয়াছিলেন, অন্যদিকে জার সরকারের উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইয়াছিল।

সোবিয়েত বিজ্ঞানের সাফল্য ঃ

মহান অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী কালে শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্তের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিতে থাকে। মানব দেহের জৈবতন্ত্র অনুশীলনের জন্য সোবিয়েত ইউনিয়নে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ল্যাবরেটারি স্থাপিত হইয়াছে। পাভ্‌লভ্‌ এবং তাঁহার অসংখ্য ছাত্র ও অনুগামীর স্নায়ুতন্ত্র, পাচন তন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র ইত্যাদির অনুশীলন চালাইয়া নূতন নূতন যে-সব আবিষ্কারের দ্বারা বিজ্ঞানকে শক্তিশালী করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বর্তমানে চিকিৎসা কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। বিশেষত উচ্চ স্তরের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপকে ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞানীরা দীর্ঘস্থায়ী ঘুমের দ্বারা কোন কোন মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধির চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কলাসমূহকে এক স্থান হইতে কাটিয়া শরীরের অন্য স্থানে জোড়া লাগাইয়া (grafting), এমনকি, এক জীবদেহের একটি সমগ্র দেহযন্ত্র (organ) অন্য জীব-দেহে জোড়া লাগাইয়া অপূর্ব সাফল্য লাভ করা গিয়াছে। একজন সোবিয়েত বিজ্ঞানী একটি প্রাণীর হৃৎপিন্ডকে অন্য এক প্রাণীর দেহে দ্বিতীয় হৃৎপিন্ড হিসাবে এমনভাবে জোড়া লাগাইতে পারিয়াছেন যাহাতে এই দ্বিতীয় হৃৎপিন্ডটি তাহার নূতন স্থানে স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কুচিত হইয়া রক্ত নিষ্কাশিত করিয়াছে। সোবিয়েত বিজ্ঞানী ভি. পি. ফিলাটভ্‌ ক্ষত শুখাইবার উদ্দেশ্যে কলা জোড়া লাগাইবার কাজে (grafting of tissues) বিপুল সাফল্য লাভ করিয়াছেন। চর্মের 'লুপাস' কিংবা ক্ষয় রোগের মত বিষাক্ত রোগে মৃতদেহের চামড়া কাটিয়া রোগীর দেহে জোড়া লাগাইয়া তিনি সাফল্যের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন। দেখা গিয়াছে যে মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত চর্মে অন্যান্য দেহ-যন্ত্রের মত জৈবিক শক্তি টিঁকিয়া থাকে এবং চর্ম সক্রিয়ও থাকে। মৃতদেহের চর্ম রোগীদেহের যে অংশে জোড়া লাগান হয়, তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ কলাসমূহকে এবং অন্যান্য দেহযন্ত্রকেও সক্রিয় করিয়া তোলে এবং রোগ বীজাণুর বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াইতে সাহায্য করে। ইহারই ফলে ক্ষত শুকাইয়া যায়, রোগী আরোগ্য লাভ করে। ক্যান্সার ও অন্যান্য ব্যাধির অনুশীলনেও সোবিয়েত বিজ্ঞান প্রচুর সাফল্য অর্জন করিয়াছে।



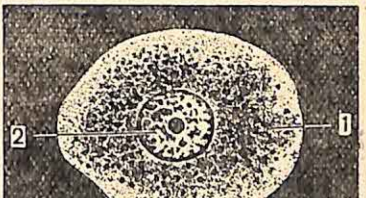
ভি. পি. ফিলাটভ

১। জৈবতন্ত্র এক অখণ্ড সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা

৪। জৈব বস্তুর গঠন ও রাসায়নিক উপাদান

প্রাণীদেহের কোষের গঠন ঃ

মানব ও প্রাণীদেহ কোষসমূহের দ্বারা গঠিত। প্রতিটি কোষ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান এক একটি যন্ত্র; ইহারই মধ্যে জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ চলিয়া থাকে। প্রত্যেক কোষের নির্দিষ্ট ধরণের জৈবিক কার্য-কলাপ আছে। অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে মানব ও জীব দেহের কোষগুলির আকৃতি, আকার ও গঠনে প্রচুর তারতম্য আছে। তাহা সত্বেও সমস্ত কোষের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ চরিত্র লক্ষ্য করাও কঠিন নয় (১নং চিত্র)। প্রত্যেক কোষের মধ্যে জীবোপাদান (protoplasm) ও নিউক্লিয়াস দেখা যায়। জীবোপাদান একটি অর্ধ-তরল পদার্থ; ইহা দ্বারাই কোষের অধিকাংশ গঠিত হয়। ইহার বহিরাংশে একটি পাতলা ঝিল্লীর (membrane) মত ঘন-সংবদ্ধ আবরণ আছে; তাহাকে বলা হয় কোষ-প্রাচীর (cell membrane)। নিউক্লিয়াসটি জীবোপাদানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে। ইহার গঠন ভিন্ন ধরণের এবং চতুঃপার্শ্বস্থ জীবোপাদান হইতে একটি আবরণী দ্বারা বিচ্ছিন্ন।



১নং চিত্র—জীব-কোষ
1. জীবোপাদান ; 2. নিউক্লিয়াস

সোবিয়েত বিজ্ঞানী ও. বি. লেপেশিন্‌স্কায়া বহু বৎসরের গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে জৈবিক পদার্থের গঠন সব সময় কোষযুক্ত নাও হইতে পারে। কোষহীন জীবন্ত পদার্থেও জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ চলিয়া থাকে এবং কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় ইহাদের মধ্যে কোষ গঠন দেখা যায়।

জৈবিক পদার্থের রাসায়নিক উপাদান ঃ

জৈবিক পদার্থের রাসায়নিক উপাদান অনুশীলন করিয়া দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় ঃ—

প্রথমত যে-সমস্ত পদার্থ দিয়া জৈবিক উপাদান গঠিত, সেগুলি হইল—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সাল্‌ফার, ফস্‌ফরাস্‌, ক্লোরিণ, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ এবং অন্যান্য এমন সব বস্তু যাহা অজৈব যৌগিক পদার্থেরও উপাদান। জৈবিক পদার্থের মধ্যে এমন কোন বিশেষ বস্তু নাই যাহা অজৈব প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত, যে-সব রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ জৈব পদার্থের বিশেষত্ব,

তাহাদের উপাদান অতীব জটিল এবং সেগুলি অজৈব প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় না। যে-সব যৌগিক পদার্থ শুধু জীবদেহের মধ্যেই পাওয়া যায়, এবং যেগুলিকে জৈব (organic) আখ্যা দেওয়া হয়, তাহার অধিকাংশই প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত; যথা, প্রোটিন, স্নেহ বা চর্বি এবং শর্করা।

প্রোটিন ঃ

পরিচিত সমস্ত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের মধ্যে প্রোটিনের চরিত্র সর্বাপেক্ষা জটিল। জৈব পদার্থের প্রধান উপাদান হইল প্রোটিন। ডিমের এ্যালবিউমেন (সাদা অংশ) এবং ময়দার গ্লাটেন্ (চট্‌চটে অংশ) হইল প্রোটিন।

প্রোটিনের প্রয়োজনীয় উপাদান হইতেছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার ও নাইট্রোজেন; ইহা ছাড়া কতকগুলি প্রোটিনে ফস্‌ফরাস এবং কিছু কিছু অন্যান্য পদার্থও পাওয়া যায়।

অন্যান্য যৌগিক পদার্থের তুলনায় প্রোটিনের অণুগুলি খুব বড়; এক একটি প্রোটিনের অণু শত শত পরমাণু দ্বারা গঠিত। প্রোটিন সম্পূর্ণ দ্রবণীয় নয়। প্রকৃত দ্রবে পদার্থটি বিশ্লিষ্ট হইয়া অণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কিন্তু প্রোটিন-দ্রবে এক একটি কণায় একগাদা অণু বর্তমান থাকে (a whole group of molecules)।

প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হইল স্থিতিশীলতার অভাব (instability)। ইহারা সহজেই রূপান্তরিত হয়; যেমন, গরম করিলে অথবা এ্যাসিড বা অন্য কোন বস্তুর প্রক্রিয়ায় প্রোটিন দানা বাঁধিয়া যায়।

স্নেহ বা চর্বি (Fat) :

স্নেহ জাতীয় পদার্থের উপাদান মাত্র তিনটি—কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। স্নেহ পদার্থের অণুগুলি প্রোটিনের অণু হইতে অনেক ছোট। অবশ্য ইহার অণুও বহু পরমাণু দ্বারা গঠিত। মানব দেহের জৈবতন্ত্রে সাধারণত যে-সব অণু থাকে, তাহাতে পরমাণুর সংখ্যা হইল ১৫০।

স্নেহ পদার্থ জলে দ্রবণীয় নয়। যে-কোন ধরণের সামান্য পরিমাণ স্নেহ পদার্থ এক টেস্ট-টিউব জলে কিংবা সামান্য সোডার জলে নাড়িলে উহা ভাঙিয়া এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যায় যাহা খালি চোখে দেখা অসম্ভব। স্নেহজাত কোন পদার্থ এইভাবে ভাঙিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে তাহাকে বলা হয় মিশ্র স্নেহ (fat emulsion)। যেমন দুধ। দুধে স্নেহ পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি শুধু অনুবীক্ষণের সাহায্যেই দেখা সম্ভব।

জীব-কোষগুলি অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে প্রায়ই তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহ-পদার্থের অংশ দেখা যাইবে (অবশ্য অন্যান্য পদার্থ হইতে স্নেহ পদার্থকে পৃথক করার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন)। কোষস্থ স্নেহ পদার্থের অধিকাংশই প্রোটিনের সহিত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থরূপে বিরাজ করার জন্য অনুবীক্ষণে দেখা যায় না।

স্নেহ পদার্থ ব্যতীত লিপিড্ (Lipides) নামে আর একটি পদার্থ কোষের গঠন ও কার্যকলাপে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। এই লিপিড্‌গুলি কোষের বহিরাবরণ গঠনে অংশ নেয়। তাহা ছাড়া ইহারা কোষ মধ্যস্থ প্রোটিনের সহিত যৌগিক অবস্থাতেও অবস্থান করে।

শর্করা (carbohydrate) :

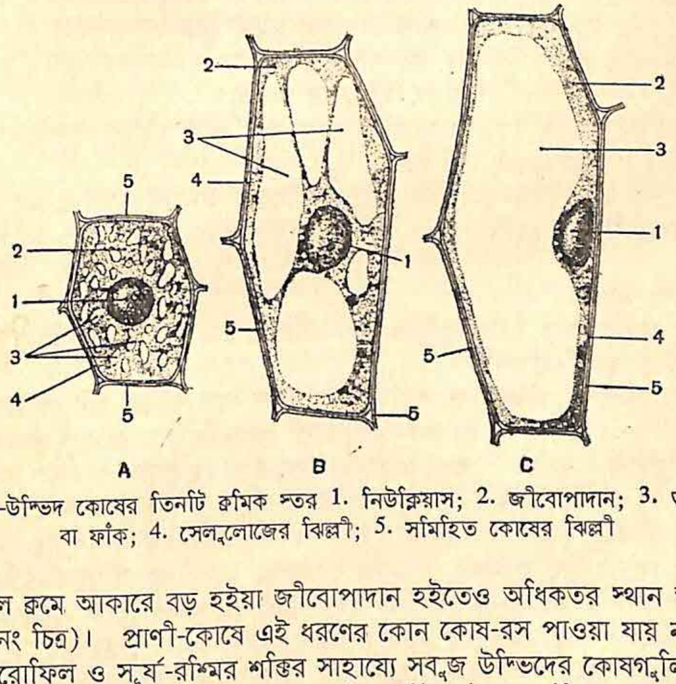
বিভিন্ন ধরণের চিনি (যেমন আঙুর, আখ বা দুধের চিনি, ল্যাকটোজ), শ্বেত-সার (starch), উদ্ভিদের সেলুলোজ ইত্যাদি শর্করার অন্তর্ভুক্ত।

স্নেহ-পদার্থের মত শর্করাও কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। অক্সিজেনে যত-সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে, এক একটি শর্করার অণুতে থাকে সাধারণত তাহার দ্বিগুণ। অর্থাৎ এক অণু জলে (H_2O) এই উপাদান-গুলি যে হারে পাওয়া যায়, শর্করাতেও সেই হারে পাওয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে রক্তে যে গ্লুকোজ পাওয়া যায়, তাহার রাসায়নিক উপাদান হইল $C_6H_{12}O_6$ এই ভাবেই কার্বোহাইড্রোটের নামকরণ হইয়াছে।

শর্করাগুলি হয় কোষ মধ্যস্থ প্রোটিনের সঙ্গে যৌগিকরূপে (compound) অবস্থান করে, অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জৈব-শ্বেতসার (animal starch) বা গ্লাইকো-জেনের রূপ লইয়া বিশেষ ধরণের জীবোপাদানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষ ঃ

উদ্ভিদ বিদ্যার জ্ঞান হইতে আমরা জানিতে পারি যে উদ্ভিদ কোষেরও জীবোপাদান বা নিউক্লিয়াস আছে। প্রাণীকোষ হইতে ইহাদের পার্থক্য হইতেছে এই যে উদ্ভিদ-কোষের বহির্ভাগে সেলুলোজ জাতীয় শর্করা গঠিত একটি অত্যন্ত নিবিড় আবরণ থাকে। ইহা ছাড়া উদ্ভিদ কোষের বৃদ্ধির সময় তাহার জীবো-পাদানে কোষ-রসে পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁক (Vacuoles) দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র



২নং চিত্র—উদ্ভিদ কোষের তিনটি ক্রমিক স্তর 1. নিউক্লিয়াস; 2. জীবোপাদান; 3. ভ্যাকিউল বা ফাঁক; 4. সেলুলোজের ঝিল্লী; 5. সন্নিহিত কোষের ঝিল্লী

ফাঁকগুলি ক্রমে আকারে বড় হইয়া জীবোপাদান হইতেও অধিকতর স্থান অধিকার করে (২নং চিত্র)। প্রাণী-কোষে এই ধরণের কোন কোষ-রস পাওয়া যায় না।

ক্লোরোফিল ও সূর্য-রশ্মির শক্তির সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদের কোষগুলি কার্বন ডাই-অক্সাইড্ এবং জল হইতে কতকগুলি জটিল জৈব যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি

করে। এই ব্যাপারে প্রাণী-কোষের সহিত উদ্ভিদ কোষের প্রচুর পার্থক্য আছে; প্রাণী-কোষ অজৈব যৌগিক পদার্থ হইতে জৈব যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে না; ইহাদের প্রয়োজন প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ ও শর্করা।

৫। কোষ ও তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ মাধ্যমের মধ্যে পদার্থের বিনিময় বা বিপাক (metabolism)

বিপাক বা মেটাবলিজম্ঃ

প্রত্যেকটি কোষ তাহার চতুপার্শ্বস্থ মাধ্যম হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদান পাইয়া থাকে। এই পুষ্টি-পদার্থগুলি কোষের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া অবশোষিত হইয়া থাকে (absorbed) অর্থাৎ জীবন্ত কোষের উপাদানে পরিণত হয়। এই গঠন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত উপাদানগুলি প্রতিনিয়তই আংশিকভাবে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং অক্সিজেন ঘটিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার (oxidation) প্রভাবাধীন হইয়া থাকে। ফলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সহ এমন কতকগুলি পদার্থের সৃষ্টি হয় যাহা কোষের উপরিভাগে নিঃসৃত হইয়া যায়।

এইভাবে কোষ ও তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ মাধ্যমের মধ্যে পদার্থের অবিরাম ও নিরবচ্ছিন্ন আদান প্রদান চলিয়া থাকে। বিপাক বা মেটাবলিজম্ বন্ধ হইলে জীবনের অবসান ঘটে। কোষহীন জৈব পদার্থের মধ্যেও মেটাবলিজম্ চলে।

জীবনের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ হইল উত্তেজনা-প্রবণতা বা উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা—অর্থাৎ, চতুস্পার্শ্বস্থ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের যে-সকল পরিবর্তন ঘটে, তাহাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতা।

উত্তেজনার ফলে কোষের মধ্যে যে সক্রিয়ভাব ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন ধরণের কোষে তাহার প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন।

বিপাক বা মেটাবলিজম্ বন্ধ হইলে জীবনের অন্যান্য লক্ষণের মত উত্তেজনা-প্রবণতারও অবসান ঘটে।

প্রোটিনের কাজঃ

যে সকল বস্তু দিয়া জৈব পদার্থ গঠিত, তাহার মধ্যে প্রোটিন সর্বাপেক্ষা জটিল এবং কম স্থিতিশীল।

প্রোটিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলির অবিরাম রাসায়নিক পরিবর্তনই বিপাক তথা জীবনের ভিত্তি। অজৈব প্রকৃতিতে পদার্থগুলির রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিলে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পায়; অক্সিজেন ঘটিত লৌহ আর লৌহ থাকে না, মরিচায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু প্রোটিনের ক্ষেত্রে বিপাকের সময় যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, তাহা উহার অস্তিত্বের জন্যই প্রয়োজন। বিপাক না হইলে প্রোটিন পচিয়া যায় বা নষ্ট হয়—অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বের অবসান ঘটে।

এঙ্গেলস বলিয়াছেন, "জীবন হইল প্রোটিন-কণাসমূহের অবস্থান-পদ্ধতি যাহার জন্য একান্ত প্রয়োজন হইল প্রোটিন-কণাগুলির ও তাহাদের চতুস্পার্শ্বস্থ বহির্জগতের মধ্যে পদার্থের বিনিময়; এই বিনিময় বন্ধ হইলে জীবনেরও অবসান ঘটে, এবং ফলে, প্রোটিন-কণাগুলির পচন হইয়া থাকে।"

৬। *কোষের প্রজনন বা বংশবৃদ্ধি* (reproduction)

নূতন কোষের উৎপত্তিঃ

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেই জানা যায় যে কোষগুলি বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে। প্রথমে নিউক্লিয়াসটি সমদ্বিখণ্ডিত হয়, পরে ভাগ হয় জীবোপাদান; এই-ভাবে একটি কোষ হইতে দুইটি কোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিশদ অনুশীলন দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বিরল ব্যতিক্রম ব্যতীত কোষ বিভাগ একটি অতি জটিল পদ্ধতি এবং ইহার সহিত জীবোপাদান ও বিশেষত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

কিছুকাল পূর্বেও কোষ বিভাগের এই পদ্ধতিই কোষের প্রজনন বা বংশবৃদ্ধির একমাত্র পন্থা হিসাবে গণ্য করা হইত। কিন্তু লেপেশিনস্কায়া প্রমাণ করিয়াছেন যে কোন কোন অবস্থায় কোষহীন জৈব পদার্থেও কোষের জন্ম হয়।

কলা প্রজনন করানর পদ্ধতি (culture of tissues):

কোন পুষ্টিকর মাধ্যমে জৈব পদার্থের বৃদ্ধি করাইয়া কোষ প্রজনন লক্ষ্য করা খুবই সহজ। সাধারণত কোন দেহযন্ত্রের অনধিক এক বর্গ মিলিমিটার পরিমাপের একটি পাতলা টুকরা কাটিয়া লইয়া এক বিন্দু রক্তরসে (plasma) অথবা ভ্রূণের কলা হইতে গৃহীত (যেমন মুরগীর ডিমে বর্ধনশীল ভ্রূণের কলা) এক বিন্দু তরল পদার্থে ডুবাইয়া রাখা হয়।

উপযুক্ত পরিবেশে পুষ্টিকর মাধ্যমে ডুবানো এই "কালচারে" জীবনের সমস্ত লক্ষণ দেখা যাইবে। পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করিয়া "কালচারটি" বিপাকের আবর্জনা পরিত্যাগ করিবে। এই অবস্থায় অনুবীক্ষণের সাহায্যে কোষের প্রজনন ও সমস্ত কলাটির বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। যথা সময়ে পুষ্টিকর মাধ্যমে পরিবর্তন করিয়া 'কালচারটি' বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব। মাঝে মাঝে এই বর্ধমান কালচারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ কাটিয়া নূতন পুষ্টিকর মাধ্যমে ডুবাইয়া রাখিলে ইহাকে বহু বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এইভাবে বারবার চারাইয়া (trans-planting) বিজ্ঞানীরা ১৯১২ সালে একটি মুরগীর ভ্রূণ হইতে সংগৃহীত হৃৎপিণ্ডের অংশকে আজও পর্যন্ত জীবন্ত রাখিতে পারিয়াছেন।

কলার 'কালচার' বা বংশবৃদ্ধি করার এই পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা বহু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্যা লইয়া কাজ করিতেছেন। আহত হওয়ার পর কলাগুলি কি করিয়া পুনর্জীবিত হয় এবং কোন্ অবস্থায় ক্ষতগুলি দ্রুত শুখাইতে পারে সে-অনুশীলনে তাঁহারা বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, বিশেষত ক্যান্সার জাতীয় টিউমারের উৎপত্তি সম্পর্কে সোবিয়েত বিজ্ঞানীদের গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ।

কোষহীন জৈব পদার্থে কোষের উৎপত্তি সম্পর্কিত গবেষণায় লেপেশিনস্কায়া কলা বা টিস্যু-কালচার পদ্ধতি গ্রহণ করেন। টাটকা জলের গুল্ম খলে ভালভাবে পিষিয়া তিনি কোষহীন জৈব পদার্থ সংগ্রহ করেন এবং এ-গুলিকে পুষ্টিকর মাধ্যমে ডুবাইয়া রাখেন। এই অবস্থায় অনুবীক্ষণের সাহায্যে তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্পষ্ট দাগ লক্ষ্য করেন যেগুলি পরে ক্রমশ বড় হইয়া কতকগুলি দানায় পরিণত হয়। লেপেশিনস্কায়া এগুলির আলোকচিত্রও গ্রহণ করেন। এই দানা-গুলি আরও বড় হইয়া সুনির্দিষ্ট জীবোপাদান ও নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষে পরিণত

হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এইসব কোষ গতিশীল হইয়া বারবার সমদ্বিখণ্ডিত হইতে থাকে।

কোষের গঠন প্রণালী আবিষ্কারের গুরুত্ব ঃ

কলা বা টিস্যু প্রজনন পদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান সাফল্য। ইহার ফলে মৃত কোষের পরিবর্তে জীবন্ত কোষ অনুশীলন করা এবং তাহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি অনুধাবন করা সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়া অনুবীক্ষণের সাহায্যে গবেষণার গুরুত্বও ইহাতে প্রচুর বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৫৮ সালে এঙ্গেলস বলিয়াছিলেন যে শারীর-বৃত্তের অগ্রগতিতে অনুবীক্ষণ যন্ত্র চূড়ান্ত অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তিনি মার্কসকে লিখিয়াছিলেন, "শারীর-বৃত্তে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহার প্রধান কথা হইল......কোষের আবিষ্কার।" ইহার প্রায় তিরিশ বৎসর পরে এঙ্গেলস আবার জীবদেহের কোষ গঠনের আবিষ্কারকে এক বিরাট তাৎপর্য-পূর্ণ ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করিয়া লেখেন, "এই আবিষ্কারের ফলেই প্রকৃতির জৈব পদার্থগুলির অনুশীলন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল......জীবসত্তার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও গঠন রহস্যের উপর প্রহেলিকার আবরণ দূর হইল।" অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্রমবর্ধমান সাফল্য এঙ্গেলস-এর ঐ উক্তিকে সমর্থন করে।

বর্ধিষ্ণু ভ্রূণের কোষগুলির প্রজনন ঃ

পরিপক্ক (fertilised) ডিম্ব-কোষের বিভাগ হইতেই ভ্রূণের উৎপত্তি সুরু হয়। বিভক্ত এই কোষ দুইটি আবার সম দুইভাগে ভাগ হইয়া যায়। এইভাবে কোষগুলি বারবার বিভক্ত হয় এবং তাহাদের সংখ্যাও অবিরাম বাড়িতে থাকে।

কোষহীন জৈব পদার্থ হইতেও বর্ধিষ্ণু ভ্রূণকোষগুলির বংশবৃদ্ধি বা প্রজনন হইয়া থাকে। অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় যে ডিমের কুসুমের (yolk) মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা (yolk globules) সৃষ্টি হয় এবং এইগুলি ক্রমশ কোষের আকার লইতে থাকে।

ভ্রূণের বৃদ্ধির শুরুতে নির্দিষ্ট এক রকমের কোষ দেখা যায়। শীঘ্রই ইহার বহিরাবরণের কোষগুলি অন্তস্থ কোষসমূহ হইতে পৃথক চরিত্র লইতে থাকে। ক্রমে উপরের ও ভিতরের আবরণের মধ্যে পৃথক ধরণের আর একটি তৃতীয় বা মধ্যম স্তরের আবির্ভাব হয়। এই প্রাথমিক জীবানু-স্তরগুলি হইতেই দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের সূত্রপাত হইয়া থাকে।

কলার উৎপত্তি ঃ

বিভিন্ন ধরণের কোষগুলির পার্থক্য ক্রমশ বাড়িতে থাকে। ইহাদের গঠনের তারতম্য নিজ নিজ শারীর-বৃত্তিক প্রকার ভেদের উপর নির্ভরশীল হইয়া ক্রমশ বাড়িতে ও সুনির্দিষ্ট রূপ লইতে থাকে। মূল তিনটি জীবানু-স্তরের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের কোষ-সমষ্টির উৎপত্তি হয়, এবং সেগুলি হইতে সৃষ্টি হয় সুনির্দিষ্ট জৈব-ক্রিয়া-সম্পন্ন বিভিন্ন দেহযন্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন এই কোষ সমষ্টি এবং কোষগুলির অন্তর্বর্তী-স্থান-পূরণকারী কোষহীন পদার্থকে কলা বা টিস্যু বলা হয়।

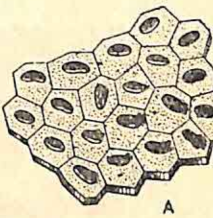
৭। কলার প্রধান প্রধান বিভাগ

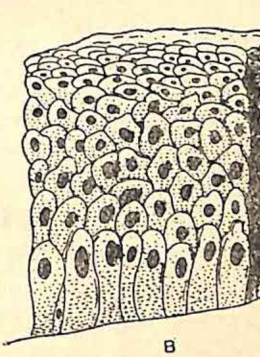
কলাগুলি প্রধানত চারিভাগে বিভক্ত; যথা, আবরণিক কলা (Epithelial tissue), সংযোজক কলা (Connective tissue), পৈশিক কলা (Muscular tissue) এবং স্নায়বিক কলা (Nervous tissue)।

আবরণিক কলা (Epithelial tissue) :

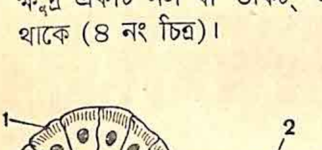
আবরণিক কলা শরীরের বাহিরের ও ভিতরের সমস্ত অংশকে ঢাকিয়া রাখে (৩নং চিত্র)। আবরণিক কলা দ্বারা গঠিত চর্মের বাহিরের স্তরটি জীবদেহকে বহির্জগতের যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও অন্যান্য প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। চর্মের আবরণিক কলা কয়েকটি কোষ-স্তর দ্বারা গঠিত।

উদর ও বক্ষ গহ্বর এবং সমস্ত আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের (যেমন পাকস্থলী, বৃক্ক ইত্যাদি) বহিরাংশ আবরণিক কলার একটি মাত্র স্তরে ঢাকা থাকে। মুখবিবর, শ্বাসনালী, গ্রাসনালী, পাকস্থলী, অন্ত্র এবং অন্যান্য দেহযন্ত্র যে শ্লেষ্মা-ঝিল্লী দিয়া ঢাকা থাকে, তাহাও আবরণিক কলা দ্বারা গঠিত। এই ঝিল্লীর কোন কোন কোষ হইতে শ্লেষ্মার উৎপত্তি ও ক্ষরণ হইয়া থাকে। যে সকল কোষের প্রধান কাজ বিভিন্ন পদার্থের ক্ষরণ, তাহাদিগকে বলা হয় গ্রন্থি-কোষ। এই ধরণের কোষ সমষ্টি হইতে বিশিষ্ট এক প্রকার রস সৃষ্টিকারী গ্রন্থির উৎপত্তি হয় এবং এই রস গ্রন্থি হইতে ক্ষুদ্র একটি নল বা 'ডাকট্' মারফৎ নিঃসৃত হইয়া থাকে (৪ নং চিত্র)।





৩নং চিত্র—(A) এক স্বতক বিশিষ্ট আবরণিক কলা; (B) বহু স্তর বিশিষ্ট আবরণিক কলা



৪নং চিত্র—একটি সাধারণ গ্রন্থি
1. গ্রন্থি-কোষ; 2. রস নিঃসরণের ডাকট্ বা নালী

আবরণিক কলার কোষ সমূহের একটি বিশেষ চরিত্র হইল এই যে ইহারা পরস্পরের সহিত পাশাপাশি ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। কোষগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে জীবোপাদানে গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল থাকার ফলে ইহাদের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেও নিবিড় পারস্পরিক সংযোগ থাকে।

সংযোজক কলা ঃ

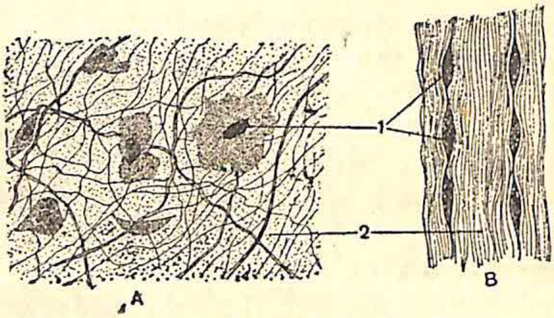
মধ্য জীবানু-স্তর দ্বারা গঠিত সংযোজক বা ধারক কলা শরীরের প্রায় সমস্ত যন্ত্রের গঠনে অংশ গ্রহণ করে।

চর্মে যে সংযোজক কলার স্তর আছে তাহা হইতেই ইহার স্থিতি-স্থাপকতার সৃষ্টি হয়। চর্মের নীচে এই অংশেই চর্বি বা স্নেহ-পদার্থ জমা হয়।

যে পেশী-কন্ডরা (tendon) এবং অস্থি-বন্ধনীগুলি (Ligament) নর-

কঙ্কালের অস্থিসমূহকে পরস্পরের সহিত যুক্ত করিয়া রাখে, সেগুলিও সংযোজক কলা দ্বারা গঠিত। তরুণাস্থি (cartilage) এবং অস্থিও আসলে পরিবর্তিত চরিত্রের সংযোজক কলা।

সংযোজক কলার কোষগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত নয়; যে আন্তঃকোষ পদার্থের দ্বারা কলার অধিকাংশ উপাদান গঠিত, সংযোজক কলার কোষগুলি তাহাতেই সন্নিবিষ্ট থাকে (৫নং চিত্র)।



৫নং চিত্র—সংযোজক কলা

(A) তন্তু জাতীয় কলা; (B) কণ্ডোরার কলা; 1. কোষ; 2. আন্তঃকোষ পদার্থ

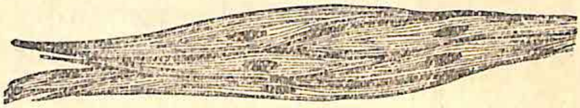
পৈশিক কলা ঃ

পৈশিক কলার উৎপত্তি সংযোজক কলার সহিত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। পৈশিক কলা সম্পূর্ণরূপে মধ্য-স্তর দ্বারা গঠিত।

পৈশিক কলা যে-কোন ধরণের উত্তেজনায় (তড়িৎ, অম্ল বা এ্যাসিড, আঘাত ইত্যাদি) আকারে ছোট বা সঙ্কুচিত হইয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সঙ্কুচিত হওয়ার এই ক্ষমতা বা সঙ্কোচন শক্তি পৈশিক কলার বৈশিষ্ট।

সমগ্র দৈহিক ওজনের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি পৈশিক কলার দ্বারা পূর্ণ হয়। শুধু কঙ্কালের পেশী নয়, পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রাশয় প্রভৃতি দেহমধ্যস্থ যন্ত্রও পৈশিক কলা দ্বারা গঠিত।

আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলির পেশীসমূহকে বলা হয় **মসৃণ পেশী** (Smooth muscles)। ইহাদের কোষগুলি অত্যন্ত দীর্ঘায়ত ধরণের (৬নং চিত্র)। ইহারা দৈর্ঘ্যে অনধিক ০.১ বা ০.২ মিলিমিটার, কিন্তু প্রস্থে মাত্র কয়েক মাইক্রোণ (১



৬নং চিত্র—মসৃণ পৈশীক কলা

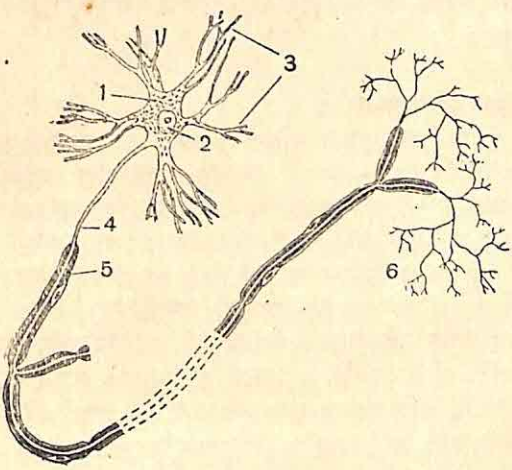
মাইক্রোণ=১ মিলিমিটারের এক সহস্রাংশ)। কোষগুলির মধ্যে লম্বালম্বি ভাবে অতি সূক্ষ্ম সব তন্তু থাকে; এইগুলিকে বলা হয় ফাইব্রিল্‌স্‌ (fibrils) বা **পেশী-সূত্র**। উত্তেজিত হইলে এই তন্তুগুলি ধীরে ধীরে ছোট হইয়া আসে এবং সেই অবস্থায় সমগ্র কোষটিও সঙ্কুচিত হয়।

মসৃণ পেশীর তুলনায় কঙ্কালের পেশীগুলির গঠন অতি জটিল; ইহাদের উত্তেজনা-প্রবণতাও অনেক বেশী এবং ইহারা দ্রুততর সঙ্কুচিত হয়।

স্নায়বিক কলা ঃ

স্নায়বিক কলার গঠন হয় বহিঃস্তবকের দ্বারা। ইহার প্রধান চরিত্র হইল উত্তেজনা পরিচালনা করা।

অধিকাংশ স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইট্ (dendrites) নামে শাখা-প্রশাখাযুক্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং এ্যাকসন (axon) নামে একটি দীর্ঘ উদ্গত অংশ আছে। উদ্গত অংশগুলি সহ স্নায়ুকোষটিকে 'নিউরন' (Neuron) বলা হয় (৭নং চিত্র)।



৭নং চিত্র—একটি নিউরন

1. স্নায়ুকোষের কাণ্ড; 2. নিউক্লিয়াস; 3. শাখা-প্রশাখার উদ্গত অংশ (ডেনড্রাইট); 4. এ্যাক্সন বা নিউরাইট; 5. আবরণ—আবরণ সহ এ্যাক্সনই স্নায়ুতন্তু গঠন করে; 6. এ্যাক্সনের শাখায়িত প্রান্ত

একটি আবরণে ঢাকা দীর্ঘ উদ্গত অংশগুলিকে বলে স্নায়ু-রজ্জু বা স্নায়ু-তন্তু (nerve fibres)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছে আবদ্ধ এই স্নায়ু-তন্তুগুলি এক একটি স্নায়ু তৈয়ারী করে।

কলার বৈশিষ্ট্য অর্জন ঃ

মানব দেহে অসংখ্য ধরণের কলা বর্তমান। প্রাথমিক কলাগুলি তাহাদের দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল বৃদ্ধির পথে বিশিষ্ট চরিত্র অর্জন করে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক জীবদেহের বিভিন্ন কলায় রূপান্তরিত হয়। ভ্রূণাবস্থায় এবং জন্মের বহুকাল পর পর্যন্ত কলাগুলি অবিরাম পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং তাহাদের জটিলতাও বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলনী ঃ

অনুবীক্ষণের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কলা পরীক্ষা কর এবং আবরণিক ও সংযোজক কলার গঠন বর্ণনা কর।

৮। বিভিন্ন দেহযন্ত্র (organs) ও তার তন্ত্র

দেহযন্ত্রসমূহ :

প্রাণীদেহ বিভিন্ন যন্ত্র (organ) দ্বারা গঠিত এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট গঠন ও জৈব-ক্রিয়া আছে। হৃৎপিন্ড তাহার ছন্দোবন্ধ সংকোচনের দ্বারা রক্তকে রক্তনালী সমূহের মধ্য দিয়া চালিত করে; অগ্ন্যাশয় খাদ্য-পরিপাক-রস ক্ষরিত করে; পাকস্থলী খাদ্য পরিপাক করে এবং সঙ্কোচনের দ্বারা সেই পরিপাক-কৃত খাদ্য অন্ত্রমধ্যে চালিত করে। ইহারা সকলেই দেহযন্ত্র। ইহাদের গঠন খুবই জটিল।

প্রত্যেকটি দেহযন্ত্রের গঠনগত বৈশিষ্ট্য তাহার নির্দিষ্ট ক্রিয়া-কলাপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

যন্ত্র-তন্ত্র (Systems of organs) :

জীবদেহের প্রধান জৈব-ক্রিয়ার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেহযন্ত্রগুলি কয়েকটি বিভাগে বা তন্ত্রে বিভক্ত। মানব দেহের তন্ত্রগুলি হইল,—স্নায়ুতন্ত্র বা Nervous System (মস্তিষ্ক, সুষুম্ন বা মেরুরজ্জু বা spinal cord, স্নায়ু বা nerve), পাচন-তন্ত্র বা Digestive System (গলনালী বা oesophagus, পাকস্থলী বা stomach, অগ্ন্যাশয় বা pancreas ইত্যাদি), রক্ত-সংবহন-তন্ত্র বা Circulatory System (হৃৎপিন্ড বা heart, রক্ত প্রণালী সমূহ বা blood vessels শ্বসন-তন্ত্র বা Respiratory System (শ্বাসনালী বা larynx), শ্বাসনালিকা বা trachea, ক্লোমশাখা বা bronchi, ফুসফুস বা lungs), রেচন বা নিঃসরণ-তন্ত্র বা Excretory System, গতি-যন্ত্রের তন্ত্র (কঙ্কাল ও পেশী) ইত্যাদি।

১নং প্লেটে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলি দ্রষ্টব্য।

৯। জীবদেহের অখণ্ড সামগ্রিকতা

বিচ্ছিন্ন দেহযন্ত্র :

কোন কোন অবস্থায় কোন একটি দেহযন্ত্র জীবানুদেহের বাহিরে অর্থাৎ দেহের বাকী অংশ হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান করিতে পারে। মেটাবলিজ্‌ম্ বা পরিপাক ক্রিয়া চলার মত অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিলে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরেও বিচ্ছিন্ন কোন দেহযন্ত্রে বা কলার কোন অংশে জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতে পারে।

সোবিয়েত বিজ্ঞানী ক্রাকভ্ এক ব্যক্তির মৃত্যুর দুইদিন পরে মৃতদেহ হইতে একটি অঙ্গুলি কাটিয়া লন। ইহার পর বিশেষ এক যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ঐ খণ্ডিত অঙ্গুলির রক্তপ্রণালীতে অক্সিজেনে পরিপূর্ণ পুষ্টিকর তরল পদার্থ সূচ দ্বারা ঢুকাইয়া দেন। কয়েক দিন যাবৎ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে ঐ অঙ্গুলির নখের বৃদ্ধি অপ্রতিহত থাকিতেছে এবং রক্তপ্রণালীগুলির সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ ক্ষমতাও বজায় আছে।

জীবদেহে ঐক্য :

পৃথক কোন দেহযন্ত্রের অনুশীলন করিতে হইলে প্রায়ই তাহাকে জীবদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিন্তু অনুশীলনের এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইলে

যথেষ্ট সাবধান থাকিতে হয়। কোন বিচ্ছিন্ন দেহযন্ত্রের সহিত সমগ্র জীবদেহের অখণ্ড অংশ হিসাবে সেই একই যন্ত্রের প্রচুর পার্থক্য থাকে। সমগ্র জীবদেহটি এমন এক অখণ্ড তন্ত্র যাহাতে একে অপরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ এবং পরস্পরের প্রভাবাধীন থাকে।

বাহিরের অথবা ভিতরের প্রতিটি উত্তেজনা জীবদেহের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহার প্রত্যেকটিই বিভিন্ন দেহযন্ত্রের কার্যকলাপে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পরিবর্তন আনে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে চলা বা দৌড়ানর সময় পা ও পৃষ্ঠদেশের পেশীগুলি একই সাথে সঙ্কুচিত না হইয়া একটি সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে সংকুচিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপও বাড়িয়া যায় এবং জীবদেহটির প্রয়োজনমত শ্বাস-প্রশ্বাসও দ্রুততর হইয়া থাকে; দেহের অন্যান্য যন্ত্রের কার্যকলাপেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

দেহযন্ত্র সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্যকলাপ এবং তাহার ফলে জীবদেহের ঐক্য রক্ত-সংবহন-তন্ত্র ও স্নায়ু-তন্ত্র দ্বারা সংরক্ষিত হয়।

রক্ত-সংবহন-তন্ত্র ঃ

রক্তের অবিরাম চক্রাবর্ত গতির জন্য রক্ত সংবহন তন্ত্র শরীরের যে-কোন স্থানে রক্ত ও কলার মধ্যে পদার্থের বিনিময় ঘটায়। প্রত্যেকটি দেহযন্ত্রের ক্রিয়া কলাপের ফলে রক্তের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার যে-সকল পদার্থ নিঃসৃত হয়, সেগুলি অন্য যন্ত্রের কার্যকলাপে প্রভাব সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইভাবে বিভিন্ন দেহযন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক রাসায়নিক সংযোগ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াও সৃষ্টি হয়।

স্নায়ু-তন্ত্র ঃ

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ হইল বিভিন্ন দেহযন্ত্রের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং সেই কার্যকলাপকে সুনির্দিষ্টভাবে সমগ্র জীবদেহের প্রয়োজনাধীন করা। মেরুরজ্জু, মস্তিষ্ক, এবং প্রচুর সংখ্যক স্নায়ু—ইহাই হইল স্নায়ুতন্ত্রের উপাদান। রক্ত-প্রণালী সমূহের মত স্নায়ুগুলিও সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত।

প্রতিটি স্নায়ুর দুই ধরণের স্নায়ু-তন্তু (nerve fibres) থাকে। একটির মারফৎ বিভিন্ন দেহযন্ত্র হইতে উত্তেজনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দিকে (অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও মেরু-রজ্জুর দিকে), এবং অন্যটির মারফৎ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হইতে সক্রিয় দেহযন্ত্রের দিকে প্রবাহিত হয়। প্রথমটিকে বলা হয় **অন্তর্মুখী** (centripetal or Afferent), এবং দ্বিতীয়টির নাম **বহির্মুখী** (centrifugal or Efferent)।

উত্তেজনাগুলি স্নায়ুপথে তরঙ্গের মত একে অপরের সহিত মিলিত না হইয়া পৃথক পৃথকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাককার মত প্রবাহিত হইয়া থাকে। এগুলিকে বলা হয় তাড়না (impulse)। এক এক সেকেন্ডে এইরূপ শত শত তাড়না প্রবাহিত হইতে পারে।

তাড়নাগুলি স্বল্পস্থায়ী ও ত্বরিৎগতিসম্পন্ন হওয়ার ফলে ইহাদের পর্যায়-ক্রমিক প্রতিক্রিয়ায় (alternative reactions) সুনির্দিষ্ট এবং দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়।

কোন বেহালা বা পিয়ানো বাদকের বাজনা বাজান লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে যে বাহু ও হাতের ডজন ডজন পেশীর সঙ্কোচনপ্রসূত দ্রুত সঞ্চালনের ফল কি হইতে পারে।

স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারাই জীবদেহ বহির্জাগতিক পরিবর্তনে দ্রুত সাড়া জাগাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোতে অপ্টিক নার্ভের (বা চোখের মূল স্নায়ুর) অন্তর্মুখী অংশে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহা মস্তিষ্কে প্রবাহিত হইয়া থাকে; মস্তিষ্ক হইতে এই উত্তেজনা আবার বহির্মুখী স্নায়ুপথে চালিত হয় পেশীতে; ফলে, পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া চক্ষু বন্ধ হয়।

ঠিক এইভাবে মুখের মধ্যে খাদ্য স্বাদ-সংশ্লিষ্ট-স্নায়ুতন্তুগুলিকে উত্তেজিত করিয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে চর্বন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে; সঙ্গে সঙ্গে লালা ও পাকস্থলীর রস ক্ষরিত হয়।

উত্তেজনায় এই ধরণের সাড়া জাগান এবং তাহার সহিত স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদনশীলতা—জীবদেহে এই যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি, ইহাকে বলা হয় **প্রতিবর্তন ক্রিয়া** (বা Reflex action)।

প্রতিবর্তন ক্রিয়াই (Reflex) স্নায়বিক কার্যকলাপের ভিত্তি ঃ

স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যের ভিত্তি হইল প্রতিবর্তন ক্রিয়া। দেহের যে-কোন যন্ত্রের প্রতিটি পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্তুতে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং তাহারই ফলে বিভিন্ন দেহযন্ত্রে প্রতিবর্তন-ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

জীবদেহে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে প্রধান অংশ গ্রহণ করে উচ্চ স্তরের স্নায়ুতন্ত্র অর্থাৎ মস্তিষ্কের কর্টেক্স (বা বহিরাংশ)। বহু বৎসরের গবেষণার ফলে আই. পি. প্যাভ্লভ্ প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রতিবর্তন-ক্রিয়ার দুইটি ধরণ আছে।

এক ধরণের প্রতিবর্তন-ক্রিয়াকে প্যাভ্লভ্ নাম দিয়াছেন অপ্রতিবন্ধ-প্রতিবর্তন (বা unconditional reflex); এগুলি স্থায়ী; যেমন, হাতে কোন কিছু বিদ্ধ হইলে ঝাঁকানি দিয়া হাত সরাইয়া লওয়া, মুখে খাদ্য লইলে লালা নিঃসৃত হওয়া, চোখে অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলো পড়িলে চোখ কুঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি। কুকুর বা অন্যান্য জন্তুদের মস্তিষ্কের কর্টেক্স্ কাটিয়া ফেলিলেও অপ্রতিবন্ধ-প্রতিবর্তন-ক্রিয়া বজায় থাকে। প্যাভ্লভের পূর্বে শুধু অপ্রতিবন্ধ-প্রতিবর্তন সম্পর্কেই অনুশীলন চলিতেছিল।

দ্বিতীয় ধরণের প্রতিবর্তন ক্রিয়াকে প্যাভ্লভ্ই সর্বপ্রথম গবেষণা করিয়া নাম দিয়াছেন সপ্রতিবন্ধ-প্রতিবর্তন; এগুলি অস্থায়ী, এবং জীবের জীবদ্দশায় এই প্রতিবর্তন অর্জিত হয়।

কুকুরের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মস্তিষ্কের কর্টেক্স্ কাটিয়া ফেলিলে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। মানবদেহে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে; খাদ্য দেখা মাত্র অথবা খাদ্যের কথা বলা মাত্রই লালা নিঃসৃত হওয়া, "বিদ্যুৎ চালান হইল"—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে (হাতে বিদ্যুতের উত্তেজনা না লাগা সত্ত্বেও) ঝাঁকানি দিয়া তার হইতে হাত সরাইয়া লওয়া, ইত্যাদি।

মানব ও পশুদেহে উচ্চস্তরের স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি হইল সপ্রতিবন্ধ-প্রতিবর্তন।

স্নায়ু নিয়ন্ত্রণের ত্রিধারা ঃ

স্নায়ুতন্ত্র বিভিন্নভাবে দেহযন্ত্রসমূহের কার্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্যাভ্‌লভের মতে স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণের তিনটি ধারা আছে;

প্রথমত স্নায়বিক তাড়নাগুলি দেহযন্ত্রের কার্যকলাপকে উদ্দীপ্ত অথবা বন্ধ করিতে পারে। যেমন, বিশেষ বিশেষ স্নায়ুকে উত্তেজিত করিলে পেশীকে সংকুচিত করা যায়, লালা-গ্রন্থিগুলির রস ক্ষরণ করান যায়, কিংবা হৃৎপিন্ডের সংকোচন বন্ধ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, স্নায়বিক তাড়না কোন দেহযন্ত্রের রক্ত প্রণালীগুলিকে সংকুচিত অথবা প্রসারিত করিতে পারে এবং তাহার জন্য রক্তের প্রবাহ কমিয়া অথবা বাড়িয়া যায়; ইহার ফলে অক্সিজেন ও পুষ্টি-পদার্থ সরবরাহে এবং পরিপাক বা মেটাবলিজ্‌ম্‌ ক্রিয়ার পরিত্যক্ত জিনিসগুলির নিঃসরণেও পরিবর্তন ঘটে। এ-সবই নির্দিষ্ট দেহযন্ত্রের উপর আশু প্রভাব সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তৃতীয়ত, জীবদেহে যাহা কিছু পরিপাক ক্রিয়া চলে, সে-সমস্তই স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন পরিপাক ক্রিয়ায় যে-কোন পরিবর্তন দেহযন্ত্রের কার্যকলাপকে প্রভাবান্বিত করে।

স্নায়ুতন্ত্রের এই ত্রিমুখী নিয়ন্ত্রণের ফলে দেহযন্ত্র জীবসত্তার প্রয়োজনানুসারে নিজেকে দ্রুত এবং সঠিকভাবে উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে।

জীবদেহের সহিত তাহার জীবন্ত থাকার অবস্থার ঐক্য ঃ

বিশিষ্ট জীববিদ্যাবিদ আই. ভি. মিচুরিন এবং তাঁহার শিষ্য টি. ডি. লাইসেঙ্কো দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেক জীবদেহের অস্তিত্বের জন্য বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন। জীবদেহ ও তাহার জীবন্ত থাকার এই অবস্থার মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়; পরিবেশের পরিবর্তন জীবদেহে গঠন ও কার্যকলাপেও অনুরূপ পরিবর্তন আনিয়া থাকে।

জীবদেহ ও তাহার জীবন্ত থাকার অবস্থার মধ্যে ঐক্য সম্পর্কে অনুশীলন করিয়া প্যাভ্‌লভ্‌ প্রমাণ করিয়াছেন যে উচ্চ স্তরের জীবরা জীবন ধারণের পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে প্রধানত মস্তিষ্কের সাহায্যে।

পরিবেশের প্রত্যেকটি পরিবর্তন নূতন নূতন সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন ক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে, অর্থাৎ, জীবানুর মধ্যে নূতন প্রতিক্রিয়া আনিতে পারে, এবং তাহারই জন্য জীবরা জীবন ধারণের নূতন অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে।

প্রত্যেক লোক নিজেই বেশ কিছু পরিমাণে তাহার চারিপাশের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং নিজের প্রয়োজন মত জীবন ধারণের অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লয়। এই কারণে মানব দেহের উপর পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রভাব খুবই কম। মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহার সামাজিক পরিবেশ—যে পরিবেশে সে বাঁচিয়া থাকে, কাজ করে।

শারীর বৃত্তের অগ্রগতিতে পাভ্‌লভীয় স্তর ঃ

শারীর বৃত্তের অগ্রগতির পথে নূতন পাভ্‌লভীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি ঃ

(১) সমগ্র জীবদেহটির স্বাভাবিক অবস্থায় দেহযন্ত্রগুলির কার্যকলাপ অনুধাবন করা; (২) স্নায়ুতত্বের ধারণা অর্থাৎ সমস্ত দেহযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং তাহাদের

মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার কাজ স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারাই চালিত হয় একথা স্বীকার করা, (৩) এবং এও স্বীকার করা যে জীবদেহের ক্রিয়াকলাপে এবং জীবদেহ ও তাহার বাহিরের পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধনে প্রধান অংশ গ্রহণ করে মস্তিষ্কের কর্টেক্স্।

অনুশীলনী :

১। কোন প্রধান রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ কোষের উপাদান গঠনে অংশ গ্রহণ করে ? সংক্ষেপে তাহাদের চরিত্র বর্ণনা কর।
২। উদ্ভিদ ও জীবকোষের গঠনে কি কি মিল আছে ? পার্থক্যই বা কি ?
৩। পরিপাক বা মেটাবলিজ্‌ম্ ক্রিয়া কাহাকে বলে ?
৪। এঙ্গেল্‌স্ জীবনের কি সংজ্ঞা দিয়াছিলেন ?
৫। কোষের প্রজনন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৬। জীবদেহের প্রধান চারটি কলার নাম লিখ এবং সংক্ষেপে তাহাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
৭। জীবদেহের ঐক্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ?
৮। জীবদেহের কার্যকলাপে পারস্পরিক সম্পর্ক কিভাবে স্থাপিত হয় ?
৯। প্রতিবর্তন ক্রিয়া কাহাকে বলে ?
১০। স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণের ত্রিধারা বর্ণনা কর।

অস্থি-পেশী-তন্ত্র

১০। *অস্থির গঠন, উপাদান ও চরিত্র*

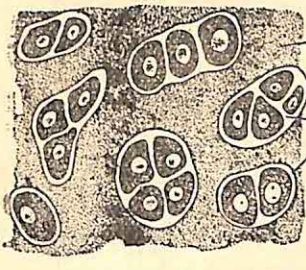
অস্থি-পেশী-তন্ত্রের গুরুত্ব :

কঙ্কালের অস্থিগুলি দেহের প্রয়োজনীয় ভার বহন করে—অন্যথায় দেহের আকৃতি বজায় রাখা সম্ভব হইত না।

অধিকাংশ অস্থির মধ্যে গতিশীল সংযোগের জন্য ইহারা পরস্পরের সহিত সংযোগ বজায় রাখিয়া গতি সৃষ্টি করিতে পারে। অস্থির সহিত সংযুক্ত পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া কঙ্কালের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে হয় তাহাদের নিজ নিজ স্থানে ধরিয়া রাখে অথবা গতিশীল করিয়া তোলে। এইভাবে অস্থি-পেশী-তন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বিন্যাস ও আকৃতি সৃষ্টিতে এবং প্রতিনিয়ত সকল রকম অঙ্গ সঞ্চালনে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া কঙ্কাল বহু গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রকে আকস্মিক আঘাত ও চাপ হইতে রক্ষা করে।

তরুণাস্থি (cartilage) ও অস্থি-কলা :

জীব-জগতের বৃদ্ধির পথে কঙ্কালের আবির্ভাব হইয়াছে অনেক পরে। বর্তমান মেরুদণ্ডী জীবদের পূর্বপুরুষদের কঙ্কাল তরুণাস্থি দিয়া গঠিত ছিল। মানুষের ভ্রূণের প্রথম পর্যায়ে কঙ্কাল তরুণাস্থি দিয়া তৈয়ারী হয়; পরে এই তরুণাস্থি ক্রমশ অস্থিতে পরিণত হয়। শুধু কয়েকটি অস্থি (যেমন করোটির অধিকাংশ অস্থি) তরুণাস্থির স্তর অতিক্রম না করিয়া প্রাথমিক সংযোজক কলা হইতে সরাসরি উদ্ভূত হয়।



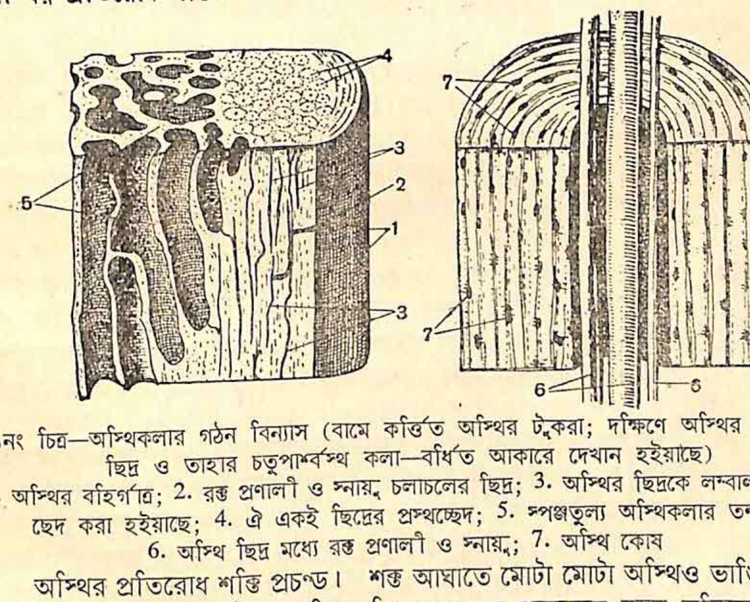
৮নং চিত্র—তরুণাস্থি কলা
1. তরুণাস্থির কোষ সমষ্টি;
2. অন্তঃকোষ পদার্থ

তরুণাস্থি আসলে এক প্রকার সংযোজক কলা। তরুণাস্থি কলার কোষগুলি একক অথবা ছোট ছোট দলে খুব ঘন স্থিতিস্থাপক আন্তঃকোষ পদার্থের মধ্যে অবস্থিত থাকে (৮নং চিত্র)। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দেহে কঙ্কালের ভিন্ন ভিন্ন অংশে সঞ্চালনশীল অস্থি-সন্ধির উপরিভাগে পাতলা পাতের আকারে অবস্থিত থাকে।

তরুণাস্থি-কঙ্কাল অস্থি-কঙ্কালে রূপান্তরের সময় তরুণাস্থি-কলাগুলি ক্রমশ ধ্বংস হয়। বিশেষ ধরনের কোষগুলিও সংখ্যা-বৃদ্ধির সময় অস্থি-কলার কোষে রূপান্তরিত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তন্তুযুক্ত আন্তঃকোষ পদার্থ সৃষ্টি করে।

আন্তঃকোষ পদার্থের তন্তুগুচ্ছগুলি পাতলা আস্তরণ বা স্তবকে পরিণত হয় এবং শীঘ্রই চুণ ঘটিত পদার্থে পূর্ণ হইয়া যায়। এই পাতলা আস্তরণগুলি অস্থিকলার মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের চারিপাশে স্তবকে স্তবকে জমা হয়। ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া যায় রক্তপ্রণালী ও স্নায়ুসমূহ। অস্থি-কলার কোষগুলি অস্থি নির্মিত আস্তরণসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে এবং দীর্ঘ উদ্গত অংশ দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে (৯নং চিত্র)।

অস্থির প্রতিরোধ শক্তি ঃ



৯নং চিত্র—অস্থিকলার গঠন বিন্যাস (বামে কর্ত্তিত অস্থির টুকরা; দক্ষিণে অস্থির মধ্যস্থিত ছিদ্র ও তাহার চতুপার্শ্বস্থ কলা—বর্ধিত আকারে দেখান হইয়াছে)
1. অস্থির বহির্গাত্র; 2. রক্ত প্রণালী ও স্নায়ু চলাচলের ছিদ্র; 3. অস্থির ছিদ্রকে লম্বালম্বিভাবে ছেদ করা হইয়াছে; 4. ঐ একই ছিদ্রের প্রস্থচ্ছেদ; 5. স্পঞ্জতুল্য অস্থিকলার তন্তু; 6. অস্থি ছিদ্র মধ্যে রক্ত প্রণালী ও স্নায়ু; 7. অস্থি কোষ

অস্থির প্রতিরোধ শক্তি প্রচণ্ড। শক্ত আঘাতে মোটা মোটা অস্থিও ভাঙিয়া যায় সত্য, কিন্তু সযত্নে চাপাইলে অস্থিগুলি অনায়াসে গুরুভার বহন করিতে পারে। মানবদেহের কোন কোন অস্থি এক হাজার কিলোগ্রামের চাপও সহ্য করিতে পারে।

অস্থির গঠন চরিত্র এবং রাসায়নিক উপাদান হইতেই এই প্রতিরোধ শক্তির জন্ম।

অস্থির আস্তরণগুলি জৈব পদার্থ এবং ধাতব লবণসমূহ (প্রধানত চুণ ঘটিত লবণ এবং প্রথমত ফস্‌ফেট্ অফ্ লাইম) দ্বারা তৈয়ারী হয় এবং পূর্ণ থাকে।

জৈব পদার্থগুলি অস্থিকে স্থিতিস্থাপকতা দান করে, আর ধাতব পদার্থগুলি দেয় দৃঢ়তা। জৈব পদার্থগুলি কয়লার আগুনে পুড়াইয়া দিলে অস্থিগুলি ভঙ্গুর হইয়া সামান্যতম চাপেই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু কোন অস্থির টুকরা হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের পাতলা দ্রবে (weak solution) ডুবাইয়া রাখিলে দেখা যাইবে যে কিছুক্ষণ পরে চূণের অংশ দ্রব হইয়া অস্থিটি রবারের মত নরম হইয়া গিয়াছে।

অস্থির জীবদ্দশায় তাহার উপাদান ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া থাকে। প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তির অস্থির দুই-তৃতীয়াংশ ধাতব লবণে এবং এক-তৃতীয়াংশ জৈব পদার্থে গঠিত। এই উপাদানই অস্থির প্রতিরোধ শক্তির উৎস।

শৈশবে অস্থিতে জৈব পদার্থের আধিক্য থাকে এবং লবণসমূহের পরিমাণ থাকে কম। ফলে, প্রাপ্ত-বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের অস্থি অনেক বেশী নমনীয় এবং কম ভঙ্গুর। এই কারণেই শিশু, বিশেষত কচি শিশুরা পড়িয়া গেলে বা আঘাত পাইলে তাহাদের অস্থি ভাঙিয়া যায় না।

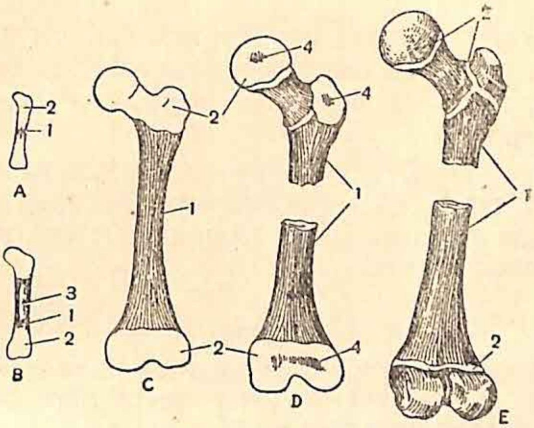
বার্দ্ধক্য আসার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিগুলি চুণে পূর্ণ হইয়া আসে এবং সেই সঙ্গে জৈব পদার্থের অংশ কমিতে থাকে। তখন অস্থিগুলি আরও শক্ত কিন্তু আরও ভঙ্গুর হইয়া যায়। এই কারণেই বৃদ্ধ বয়সে পড়িয়া যাইলে বা আহত হইলে অস্থি ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে।

অস্থির বৃদ্ধি ঃ

অস্থির বহিরাংশ একটি নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ঘন ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত থাকে; ইহার নাম পেরিঅস্টিয়াম্ (perieosteum)। পেরিঅস্টিয়ামের যে স্তবকটি অস্থির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত, সেটি এমন সব কোষ দ্বারা গঠিত যাহারা অস্থিকলায় রূপান্তরিত হইতে পারে। বিভাগের দ্বারা সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এই কোষগুলি অস্থির বৃদ্ধিতে এবং ভগ্ন অস্থির সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

দেহের প্রান্তসীমার (হাত-পা) বর্ধমান অস্থিগুলির কেন্দ্র ও গোলাকৃতি শেষভাগের মধ্যবর্তী স্থানে তরুণাস্থির কয়েকটি স্তবক আছে। ২০ অথবা ২৫ বৎসর বয়সে এগুলি অন্তর্হিত হইয়া থাকে। অস্থির কেন্দ্রভাগ এবং তরুণাস্থি গঠিত স্তবকের সংযোগস্থলে নূতন অস্থিকলার উৎপত্তি শুরু হয় এবং তাহার ফলে অস্থিটি দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায় (১০নং চিত্র)।

অস্থির উপরিভাগে পেরিঅস্টিয়াম গঠনকারী নূতন নূতন অস্থি-কোষগুলি স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে অস্থির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় অস্থি-কলার ভিতরের স্তবকগুলি আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। আভ্যন্তরীণ স্তবকগুলি ধ্বংস হওয়ার ফলে কঙ্কালের দীর্ঘাস্থি-গুলি তাহাদের বৃদ্ধির সময় ঘন প্রাকার বিশিষ্ট নলের আকৃতি লইয়া থাকে। অবশ্য ইহাতে অস্থির প্রতিরোধ শক্তি কমে না; নলাকৃতি অস্থিগুলির প্রতিরোধ শক্তি সম ঘনত্ব বিশিষ্ট নিরেট দণ্ডের প্রায় সমান।

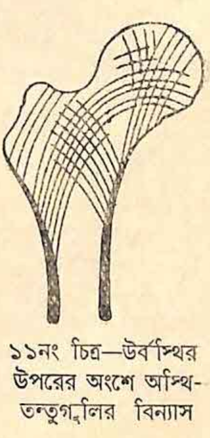


১০নং চিত্র—ভ্রূণের ও শিশুর উর্বাস্থির বিভিন্ন স্তরের গঠন ঃ
A—২ মাসের ভ্রূণ; B—৩ মাসের ভ্রূণ; C—নবজাত শিশু; D—৫/৬ বৎসরের শিশু;
E—১২/১৪ বয়স্ক বালক ঃ
1. অস্থির মধ্য অস্থিকলা; 2. অস্থির তরুণাস্থি গঠিত অংশ; 3. অস্থির মধ্য অংশে গহ্বরের আবির্ভাব; 4. অস্থির প্রান্ত দেশে অস্থিকলা গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু

অস্থির নিবিড় ও স্পঞ্জতুল্য উপাদান ঃ

নলাকৃতি দীর্ঘাস্থিগুলির প্রান্তভাগের অভ্যন্তরে এবং অধিকাংশ অন্যান্য অস্থির (পঞ্জর, মেরুদণ্ডের অস্থিসমূহ) ভিতরেও অস্থি-কলার আংশিক ক্ষয় হইয়া থাকে। এই অস্থিগুলিকে আড়া-আড়িভাবে ছেদ করিলে পরস্পরের মধ্যে ফাঁক বিশিষ্ট অসংখ্য পাতলা অস্থি-তন্তু (slats) দেখা যাইবে; এই কারণেই অস্থি-কলাকে স্পঞ্জের মত দেখায়।

যে-সমস্ত অংশে চাপ ও টান পড়ে না, সেই সকল স্থানে সহজেই অস্থির ক্ষয় হইয়া থাকে। ঠিক সেইরূপ যে অস্থি চাপ ও টানের গতিপথে অবস্থান করে, তাহার ক্ষয় হয় না। ফলে বিভিন্ন অস্থির তন্তুগুলির (slats) বিন্যাস কোন আকস্মিক ঘটনা নয়,—চাপ ও টানের গতিপথের সহিত পূর্ণ সমতা রাখিয়াই সে-বিন্যাস ঘটিয়া থাকে (১১নং চিত্র); অর্থাৎ প্রত্যেকটি অস্থির আভ্যন্তরীণ গঠন তাহার কার্যকলাপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। চাপ ও টানের গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তন্তুগুলির বিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। পা কাটিয়া ফেলিলে এবং দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকার ফলে অস্থিগুলি শরীরের ভার বহনে অনভ্যস্ত হইলে উপরিউক্ত ধরনের পুনর্বিন্যাস দেখা যাইতে পারে।



১১নং চিত্র—উর্বাস্থির উপরের অংশে অস্থি-তন্তুগুলির বিন্যাস

অর্থাৎ নিবিড় অস্থি-কলা দেখা যায় শুধু উপরি-ভাগে। ভিতরের স্তবকগুলি সছিদ্র ও স্পঞ্জতুল্য কলা দ্বারা গঠিত।

দীর্ঘাস্থিগুলি ভিতরের ছিদ্র এবং অন্যান্য অস্থির স্পঞ্জ-তুল্য কঙ্কালকে যথেষ্ট হাল্কা করে, অথচ ইহাতে অস্থির প্রতিরোধ শক্তি কমে না। সমগ্র কঙ্কালটি নিবিড় অস্থি-কলায় গঠিত হইলে তাহার ওজন দুই বা আড়াই গুণ বেশী হইত।

অস্থি-মজ্জাঃ

অস্থিকলা যে হারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অস্থি মধ্যস্থিত ছিদ্রগুলি সেই পরিমাণে প্রচুর রক্ত-প্রণালীযুক্ত বিশেষ ধরনের সংযোজক কলা গঠিত লাল-মজ্জায় (red marrow) পূর্ণ হয়। লাল মজ্জা রক্ত উৎপাদনকারী যন্ত্র বিশেষ—এই স্থানে রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয়।

প্রথম শৈশবে অস্থির স্পঞ্জতুল্য কলায় এবং নলাকৃতি অস্থিগুলির গহ্বরে লাল মজ্জা দেখা যায়। শিশুর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নলাকৃতি অস্থি গহ্বরে লাল-মজ্জার স্থলে ক্রমশ স্নেহ জাতীয় কলার আবির্ভাব হয়; তাহাকে বলা হয় পীত-মজ্জা (yellow marrow)।

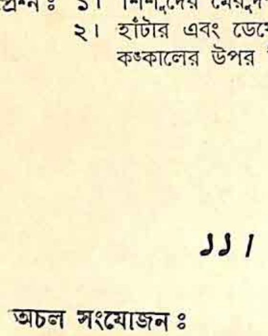
অনুশীলনীঃ

প্রশ্নঃ ১। শিশুদের মেরুদণ্ড এবং কঙ্কালের অন্যান্য অংশ বক্র হয় কেন?
২। হাঁটার এবং ডেস্কে বসার সময় দেহকে ভুলভাবে চালিত করিলে বা বসিলে কঙ্কালের উপর কিরূপ প্রভাব পড়ে?

১১। অস্থির সংযোজন বা গ্রন্থন

অচল সংযোজনঃ

মানব-দেহে দুই শতেরও অধিক অস্থি আছে। এগুলি বিভিন্নভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া কঙ্কালের রূপ লইয়া থাকে। অস্থির সংযোজন তিন প্রকার—অচল, অর্ধ-সচল এবং সচল।

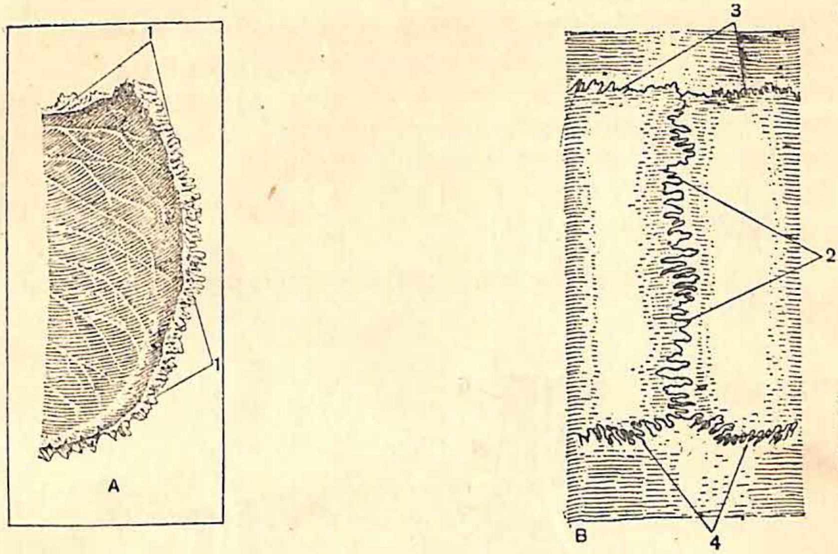


১২নং চিত্র—শিশুর শ্রোণিচক্র
1, 2, 3. তিনখানি অস্থি পরস্পর সংযোজিত হইয়া গিয়াছে; 4. উহাদের অন্তস্থিত তরুণাস্থির স্তবক

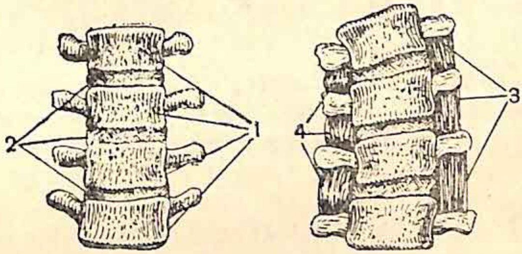
বিভিন্ন অস্থি পরস্পরের সহিত জোড়া লাগিবার ফলে অচল সংযোজন সৃষ্টি হইতে পারে। শৈশবের প্রথম কয়েক বৎসর শ্রোণিচক্রে (pelvis) স্বতন্ত্র তিনখানি অস্থি পাতলা তরুণাস্থির স্তবক দ্বারা গ্রন্থিত থাকে (১২নং চিত্র)। ক্রমে এই স্তবকগুলি অস্থি-কলায় পরিণত হইয়া যায় এবং গ্রন্থি তিনখানি পরস্পরের সহিত জোড়া লাগিয়া যায়।

করোটি (skull) অচল বা অনড় হওয়ার কারণ হইল এই যে ইহার প্রত্যেকটি অস্থির এমন অনেক উদ্গত অংশ আছে যেগুলি পার্শ্ববর্তী অস্থির অনুরূপ অবনত স্থানগুলিতে অবিকলভাবে খাপ খাইয়া যায়। অস্থির এই ধরনের সংযোজন বা গ্রন্থনকে বলা হয় জোড় বা সন্ধি (১৩নং চিত্র)।

অধিকাংশ অস্থির সংযোগ সচল। দুইটি অস্থির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি স্তবকের জন্য ইহারা কিছু পরিমাণে সচলতা প্রাপ্ত হয়।



১৩নং চিত্র—গ্রন্থন পদ্ধতি দ্বারা অস্থির সংযোজন
A—শিরকুম্ভাস্থির একাংশের ভিতরের দৃশ্য; B—করোটির একাংশের বহির্দৃশ্য; 1. শিরকুম্ভাস্থির প্রান্তভাগ; 2. দুইটি শিরকুম্ভাস্থির গ্রন্থন; 3. ললাটাস্থি ও শিরকুম্ভাস্থির গ্রন্থন; 4. শিরনিম্নাস্থি ও শিরকুম্ভাস্থির গ্রন্থন



১৪নং চিত্র—তরুণাস্থির সাহায্যে অস্থি-সংযোজন
1. কশেরুকা; 2. দুইটি কশেরুকার অন্তর্বর্তী তরুণাস্থি; 3. পেশীর শিথিল অবস্থায় কশেরুকাসমূহের অন্তবর্তী স্থানে অবস্থিত পেশী; 4. পেশীর সংকুচিত অবস্থায় কশেরুকাসমূহের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থিত পেশী।

অর্ধ-সচল সংযোজন:

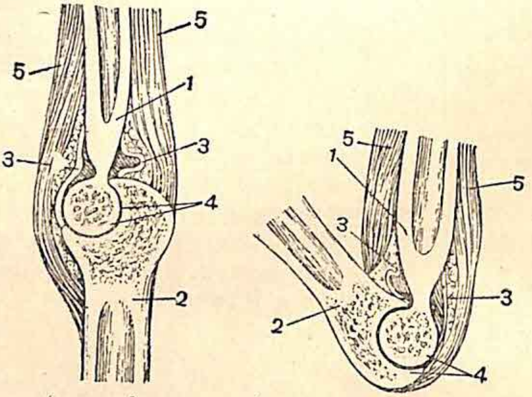
মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলির (vertebra) মধ্যবর্তী স্থানে এই ধরনের তরুণাস্থি-স্তবক আছে। পেশী সংকুচিত হইলে ইহাদেরও সংকোচন হয় এবং তাহার ফলে অস্থিগুলি পরস্পরের দিকে কিছুটা চালিত হইতে থাকে। সেইজন্য কোন লোক দেহ এলায়িত করিলে পেশীগুলি শ্লথ হইয়া যায় এবং সেই অবস্থায় তাহার দেহ দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে কিছুটা দীর্ঘতর হয়। মেরুদণ্ডের শুধু এক দিকের পেশীগুলি সংকুচিত হইলে সেই দিকের তরুণাস্থি স্তবকগুলিরও সংকোচন হয় এবং কশেরুকাগুলি পরস্পরের দিকে সরিয়া আসে। কিন্তু এই অবস্থায় দেহের

অপরদিকের কশেরুকা-প্রান্তগুলি পরস্পর হইতে কিছুটা দূরে সরিয়া যায়, এবং ফলে, মেরুদণ্ড পেশীর সঙ্কোচনের দিকে বাঁকিয়া যায় (১৪নং চিত্র)।

এইভাবে কশেরুকাগুলি, বিশেষত কটিদেশের ও ঘাড়ের কশেরুকাগুলি পরস্পরের দিকে অথবা বিপরীত দিকে বাঁকিতে পারে। সমগ্র মেরুদণ্ডটি যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চালিত করা যায় এবং সম্মুখে, পিছনে ও পার্শ্বে বাঁকানও সম্ভব।

অস্থি-সন্ধি ঃ

অস্থি-সন্ধিগুলি বিশেষ এক আবরণীর (capsule) সাহায্যে সচল সংযোজন সৃষ্টি করে।

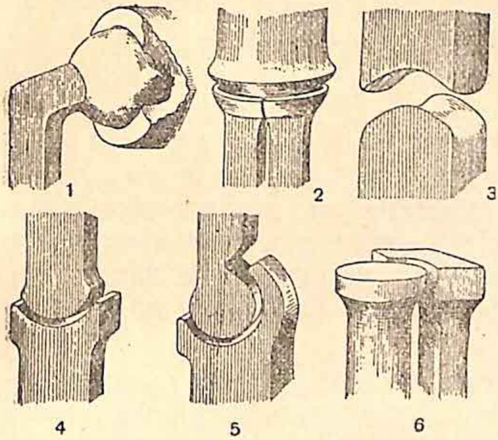


১৫নং চিত্র—কনুই-এর অস্থিচ্ছেদ—কনুইতে বাহুর ভাঁজ ও প্রসারণ দেখাইতেছে
1. প্রগণ্ডাস্থি; 2. অন্তঃ-প্রকোষ্ঠাস্থি; 3. অস্থিসন্ধির আবরণী বা ক্যাপসিউল;
4. তরুণাস্থিতে আবৃত অস্থি-সন্ধি; 5. পেশী

এই আবরণী খুব ঘন সংযোজক কলা দ্বারা গঠিত। ইহার গাত্রে এবং চারি-পাশে শক্ত কণ্ডরা-ঘটিত (tendinous) বন্ধনী (ligament) থাকে। আবরণীর প্রান্তভাগ ও বন্ধনী অস্থিগুলির সংযোজক স্থান হইতে কিছু দূরে সুদৃঢ়ভাবে উদ্ভূত হইয়া সন্ধি-গহ্বরটিকে বায়ুরোধীভাবে ঢাকিয়া রাখে।

অস্থির সংযোজক বা সন্ধিস্থান পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে খাপ খায় এবং তরুণাস্থি স্তবক দ্বারা আবৃত থাকে। তরুণাস্থির মসৃণতা অস্থিগুলির মধ্যে ঘর্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া দিয়া সচলতার সুবিধা করিয়া দেয়। আবরণীর ভিতরের অংশে প্রতিনিয়ত যে তরল পদার্থ ক্ষরিত হয়, তাহাতেও ঘর্ষণ কমিয়া যায় এবং মসৃণতা সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি স্তবকগুলি কঠিন আঘাতের চাপ সহ্য করিয়া দেহকে প্রচণ্ড আলোড়ন হইতে রক্ষা করে।

সন্ধি-গহ্বরটি বায়ুরোধীভাবে বন্ধ থাকার জন্য অস্থি-সন্ধির উপর চাপ পড়িলে সন্ধির মধ্যে নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি হয়। এই নেতিবাচক চাপ অস্থি দুইটিকে পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইতে বাধা দেয় এবং সন্ধির প্রতিরোধ-শক্তিকে প্রচুর পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। সন্ধির আবরণীতে ছিদ্র করিয়া দিলে



১৬নং চিত্র—প্রধান প্রধান অস্থি-সন্ধির রূপরেখা
1, 2. গোলাকার সঞ্চালন (সর্বদিকেই সঞ্চালন সম্ভব); 3. ঘোড়ার জিনের আকারে সঞ্চালন (যথাক্রমে দুইটি লম্বের সমতলে সঞ্চালন সম্ভব); 4, 5, 6. নলাকৃতি সঞ্চালন (এক সমতলে সঞ্চালন সম্ভব)

বাতাস ঢুকিয়া নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি হইতে দেয় না। কাজেই সছিদ্র আবরণীর প্রতিরোধ-শক্তিও কম। এই রকম সন্ধির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়িলে অস্থি দুইটি পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং সহজেই অস্থির সন্ধি-চ্যুতি ঘটে (dislocation)।

নিজের দেহ সঞ্চালন লক্ষ্য করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে বিভিন্ন অস্থি-সন্ধির সচলতা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কোন কোন সন্ধির সচলতা ঘটে শুধু একটি সমতলে (যেমন নীচু বা সোজা হওয়া); আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দুই লম্বের সমতলেও (যেমন পাশাপাশি এবং নীচু-সোজা হওয়া) সচলতা হইয়া থাকে। আর তৃতীয় ধরনের সচলতা ঘটে যে-কোন দিকে (যেমন নীচু-সোজা, পাশাপাশি ও ঘোরা)।

অনুশীলনী ঃ

প্রশ্ন ঃ ১। একজন লোকের সঠিক দৈর্ঘ্যের মাপ সকালে ও সন্ধ্যায় তফাৎ হয় কেন? মানুষ কোন সময় বেশী লম্বা হয়—সকালে না সন্ধ্যায়?

২। নিজের দেহ লক্ষ্য করিয়া, কঙ্কালের অস্থিগুলি দেখিয়া এবং ১৬নং চিত্রের সাহায্যে অস্থি-সন্ধির চরিত্রের উপর সচলতার নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা কর। উত্তর দাও—কঙ্কালের কোন কোন সন্ধি সচল—(ক) এক সমতলে, (খ) দুই লম্বের সমতলে, (গ) যে-কোন দিকে?

১২। সন্ধিচ্যুতি ও অস্থি ভগ্ন হওয়া

সন্ধি-চ্যুতি ঃ

লাফান, পড়িয়া যাওয়া বা ধাক্কা খাওয়ার মত যে-কোন প্রবল অসতর্ক আলোড়নে কঙ্কালে আঘাত লাগিতে পারে এবং তাহার ফলে সন্ধি-চ্যুতি বা অস্থি ভগ্ন হইতে পারে। সন্ধি-চ্যুতিতে সন্ধির অ[illegible]লি তাহাদের নির্দিষ্ট স্থান হইতে মোচড় দিয়া বাহির হইয়া আসে—অর্থাৎ, একটি অস্থির গোলাকৃতি প্রান্তটি অপর অস্থির গহ্বর হইতে বাহির হইয়া যায়। এই রকম অবস্থায় অস্থি-বন্ধনীর উপর

টান পড়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। সন্ধি-চ্যুতি, বিশেষত আহত সন্ধি সঞ্চালনের চেষ্টা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

সন্ধি-চ্যুতিতে প্রাথমিক পরিচর্যা ঃ

সন্ধি-চ্যুত অস্থিকে যথাযথ পরিচর্যা না করিলে অথবা পরিচর্যায় খুব বিলম্ব ঘটিলে গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি হইতে পারে। কাজেই কোন আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক পরিচর্যা করার সময় দুইটি মূলনীতি অনুসরণ করিতে হইবে; প্রথমত কখনও নিজে ভগ্ন অস্থি বা চ্যুত সন্ধিকে জোড়া লাগাইবার চেষ্টা করিবে না, এবং দ্বিতীয়ত শরীরের আহত অংশটি এমন আরামদায়ক অবস্থায় রাখিতে হইবে যাহাতে অঙ্গটি বিশ্রাম পায় এবং অচল থাকে। ইহার পর অবিলম্বে ডাক্তারের সাহায্য লইতে হইবে।

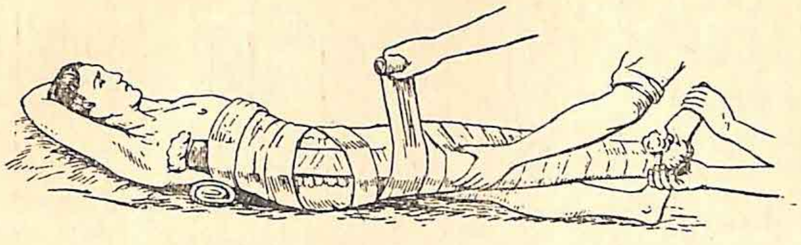
অস্থি ভগ্ন হওয়া ঃ

শৈশবে এবং কৈশোরে অস্থি খুব কমই ভগ্ন হয়। মধ্যবয়সী, বিশেষত বৃদ্ধদের অস্থি বেশী ভগ্ন-প্রবণ, কারণ, বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অস্থির উপাদানে পরিবর্তন আসে। সময় সময় এই উপাদানে জৈব পদার্থ খুব কমিয়া গেলে অস্থি এত ভঙ্গুর হইয়া যায় যে সামান্য ধাক্কা, ভারী জিনিস তোলা কিংবা প্রবল ঝাঁকানির ফলে অস্থিতে চিড় ধরে অথবা উহা ভাঙ্গিয়া যায়।

ভগ্ন অস্থির প্রাথমিক পরিচর্যা ঃ

সন্ধি-চ্যুতির মত ভগ্ন অস্থিতেও প্রথম কাজ হইল প্রাথমিক পরিচর্যা। আহত অংশটিকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে ও অচল রাখিতে হইবে। ভগ্নাংশের তীক্ষ্ন প্রান্তগুলি যাহাতে চর্ম ভেদ করিতে এবং বিশেষ করিয়া স্নায়ু ও রক্ত প্রণালী-সমূহের ক্ষতি করিতে না পারে তাহার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা ও অনড় করিয়া রাখা প্রয়োজন।

ভগ্ন অস্থি বাঁধার জন্য ব্যান্ডেজ ও অস্থি-ধারক (splint) ব্যবহার করা হয়। অস্থি-ধারকটি ব্যান্ডেজের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া আহত অঙ্গের সচলতা বন্ধ করা হয়। পাতলা কাঠের পাটা, মোটা কার্ডবোর্ডের লম্বা লম্বা টুকরা, লাঠি, গাছের সরু সরু ডালের গুচ্ছ কিংবা এই ধরনের অন্য কোন উপযোগী জিনিস অস্থি-ধারক হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। আহত অঙ্গ ও অস্থি-ধারকের মধ্য-বর্তী স্থানে নরম গদি বা প্যাড দিতে হয়। অস্থি-ধারকটি ভগ্ন অস্থির প্রান্ত হইতে আরও কিছুটা বাহির হইয়া থাকিবে। পা ভাঙ্গিলে অস্থি-ধারকটি গোড়ালি হইতে উরুর কিয়দংশ পর্যন্ত বাড়ান থাকিবে; অনুরূপভাবে উরুদেশ ভগ্ন হইলে অস্থি-ধারকের এক প্রান্ত থাকিবে বুক পর্যন্ত, এবং অপর প্রান্তটি পায়ের নিম্ন অংশ পর্যন্ত প্রসারিত থাকিবে (১৭নং চিত্র)। অস্থি-ধারকটি কাপড় দিয়া শক্ত করিয়া জড়াইয়া এমনভাবে বাঁধিতে হইবে যাহাতে আহত অঙ্গের উপর বেশী চাপ না পড়ে। ব্যান্ডেজের পরিবর্তে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা, তোয়ালে অথবা রুমাল ব্যবহার করা যাইতে পারে।



১৭নং চিত্র—উর্বাস্থি ভগ্ন হইলে অস্থি-ধারক প্রয়োগ বিধি

অস্থি-ধারক না পাওয়া যাইলে ভাঙ্গা হাতকে দেহের সহিত এবং ভাঙ্গা পাকে অপর পায়ের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া যায়।

কখনো কখনো অস্থি ভগ্ন হওয়ার ফলে চর্ম ভেদ করিয়া ক্ষত সৃষ্টি হইতে পারে। এই ধরনের জটিল উন্মুক্ত ভগ্নাস্থিতে ক্ষতমুখে ময়লা পড়া এবং তাহাতে পুঁজ হওয়া বন্ধ করার জন্য প্রথমেই কাপড় জড়াইয়া বাঁধিয়া ফেলা প্রয়োজন।

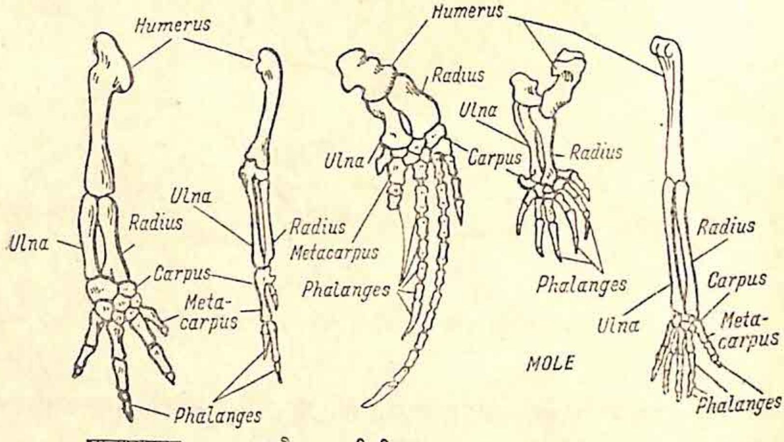
অস্থি ভাঙিগয়াছে এরূপ সন্দেহ হইলে প্রাথমিক পরিচর্যার পর অবিলম্বে ডাক্তার ডাকিতে হইবে অথবা আহতকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে। একথাও মনে রাখা দরকার যে আহতকে বহন করার বা গাড়ীতে লইয়া যাওয়ার সময় যথা-সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

১৩। নর-কঙ্কালের গঠন

নর ও পশুদের কঙ্কালে গঠন সাদৃশ্যঃ

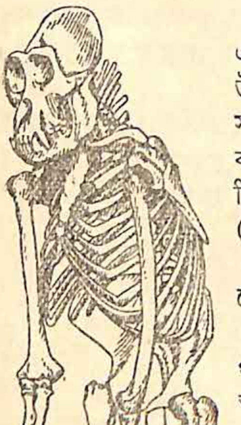
নর এবং মেরুদণ্ডী পশুদের কঙ্কাল তুলনা করিলে দৈহিক গঠনের আশ্চর্য-জনক সমতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি পাখী, উভচর ও সরীসৃপ প্রভৃতি যে সব প্রাণীর দৈহিক গঠন মানুষের গঠন হইতে কত পৃথক, তাহাদের প্রধান অস্থি-গুলিও মানুষের সমতুল্য।

বিভিন্ন সংখ্যায় পৃথক পৃথক কশেরুকা দ্বারা গঠিত মেরুদণ্ডই কঙ্কালের প্রধান বাহক। ইহাদের করোটির গঠনেও যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্যনীয়। এমনকি বিভিন্ন প্রাণীর দেহ-প্রান্তস্থ প্রত্যঙ্গগুলি (হাত, পা ইত্যাদি) বাহির হইতে দেখিতে পৃথক হইলেও এবং এগুলির ক্রিয়াকলাপে পার্থক্য থাকিলেও তাহাদের অস্থির গঠন সমস্ত মেরুদণ্ডীর ক্ষেত্রেই একরকম। তিমি মাছের পাখনা, পাখীর-ডানা কিংবা সালামান্দার বা ছুঁচোর থাবার সহিত মানুষের হাত তুলনা করিলে প্রধান প্রধান অস্থিগুলির সাদৃশ্য দেখা যাইবে (১৮নং চিত্র)।



সালামান্দার পাখী তিমি ছুঁচো মানুষ

১৮নং চিত্র—বিভিন্ন মেরুদণ্ডীর সম্মুখের দেহপ্রান্তের কঙ্কাল



১৯নং চিত্র—নর-বানরের কঙ্কাল

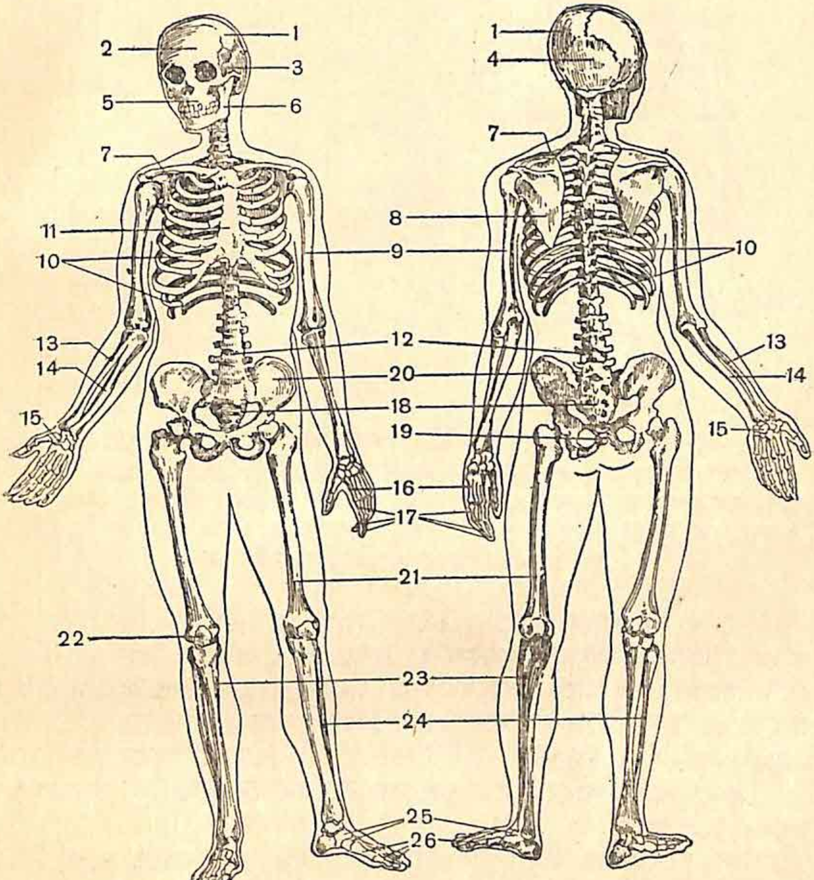
মানুষ ও অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর কঙ্কালের গঠনে এই সাদৃশ্যকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে তাহাদের উৎপত্তি হইল এক। পার্থক্য যাহা কিছু দেখা যায় তাহা সৃষ্টি হইয়াছে পৃথক পৃথক জীবন ধারনের অবস্থা হইতে। কঙ্কালের গঠন সাদৃশ্যের দিক হইতে জীবজগতে মানুষের নিকটতম আত্মীয় হইল নর-বানর বা man-like ape (১৯ ও ২০ নং চিত্র)।

সোজা হইয়া দাঁড়ান ও কর্মক্ষমতা অর্জন ঃ

সমস্ত মেরুদন্ডীদের কঙ্কালে অবিসংবাদী সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও নরকঙ্কালের কতকগুলি একান্ত বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান মানব সমাজের পূর্ব-পুরুষদের ক্রমবিকাশের সময় সোজা হইয়া দাঁড়ান ও কর্ম-ক্ষমতা অর্জনের সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত।

মানুষ ছাড়া অন্য সমস্ত স্তন্যপায়ী জীব চারিপায়ে ভর করিয়া হাঁটে। এমনকি বানরের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতি-ক্রম নাই—কারণ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য তাহারা পিছনে দুই পায়ের সঙ্গে সঙ্গে সামনের পা দুইটিও কম বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে। অবশ্য একথা সত্য যে বানরদের সম্মুখের ও পিছনের পায়ের কার্যকলাপে পরি-ষ্কার ভাগাভাগি আছে; বানররা সামনের পায়ের সাহায্যে বাসা তৈয়ারী করে, পিছনে সরিয়া যায় এবং শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে লাঠি ধরে বা পাথর ছুঁড়িয়া আত্মরক্ষা করে। কিন্তু এঙ্গেল্‌স্‌ বলিয়াছেন "বানরের হাত কখনও কোনদিন পাথর দিয়া কোন নিকৃষ্টতম কুঠারও তৈয়ারি করে নাই।"

জীবনধারণের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পূর্বপুরুষ নর-বানরদের সম্মুখের পা দুইটি ক্রমশ বেশী বেশী মুক্ত এবং চলার জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে। এইভাবে সম্পূর্ণ সোজা হইয়া দাঁড়ান এবং দুই পায়ে ভর দিয়া হাঁটিতে পারার শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া হাত দুইটি কাজের জন্য মুক্ত হইয়া গেল। ইহার পর কাজ করিতে করিতে এবং কাজের প্রভাবে হাতের কর্মকুশলতা আরও বাড়িয়া যায়। সোজা হইয়া দাঁড়ান পর্যন্ত ক্রমবিকাশের চিহ্ন সমগ্র নরকঙ্কালেই লক্ষ্য করা যায়।

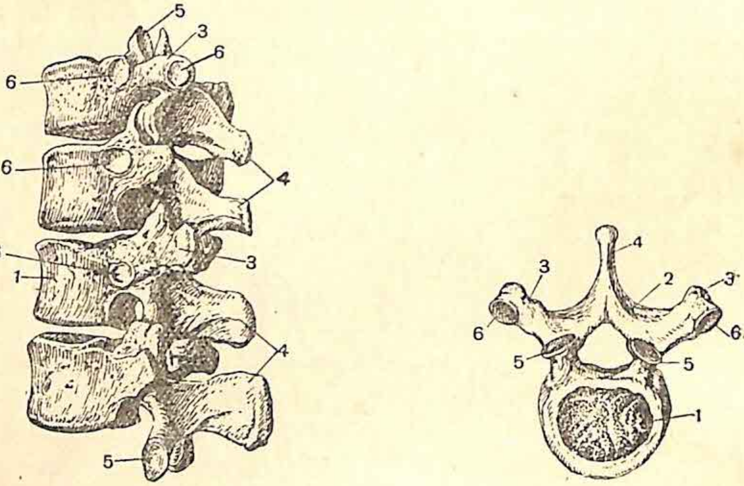


২০নং চিত্র—মানব-কঙ্কাল

১। শিরকুম্ভাস্থি; ২। ললাটাস্থি; ৩। রগাস্থি; ৪। শিরনিম্নাস্থি; ৫। উপরের চোয়াল; ৬। নীচের চোয়াল; ৭। অক্ষকাস্থি; ৮। অংসফলক; ৯। প্রগণ্ডাস্থি; ১০। পঞ্জর; ১১। উরঃফলক; ১২। মেরুদণ্ড; ১৩। বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি; ১৪। অন্তঃ প্রকোষ্ঠাস্থি; ১৫। করতলাস্থি; ১৬। করাঙ্গুলি মূলশলাকা; ১৭। অঙ্গুলিফলক; ১৮। ত্রিকাস্থি; ১৯। অনুত্রিকাস্থি; ২০। শ্রোণিচক্র; ২১। উর্বস্থি; ২২। জানুকাপালিক; ২৩। জংঘাস্থি; ২৪। অনুজংঘাস্থি; ২৫। গুল্ফাস্থি; ২৬। পদতলাস্থি ও পদাঙ্গুলি ফলক।

মেরুদণ্ড ঃ

৭টি গ্রীবাদেশীয় (cervical), ১২টি বক্ষদেশীয় (thoracic), ৫টি কটিদেশীয় (Lumber), ৫টি ত্রিকাস্থি (Sacral) এবং ৪/৫টি অনুত্রিকাস্থি (coccygeal) সহ সর্বসাকুল্যে ৩৩ অথবা ৩৪ খানি কশেরুকা দ্বারা মেরুদণ্ড গঠিত।



২১নং চিত্র—কশেরুকা (A—বক্ষদেশীয় নীচের তিনটি এবং উপরের কটিদেশীয় কশেরুকার পার্শ্বদেশের চিত্র; B—বক্ষদেশীয় একটি কশেরুকার উপরিভাগের চিত্র)।

1. কশেরুকার দেহকাণ্ড; 2. কশেরুকার খিলান; 3. আড়াআড়িভাবে অবস্থিত উদ্গত অংশ; 4. মেরুদণ্ডী উদ্গত অংশ; 5. দুইটি কশেরুকা পরস্পরের সহিত সংযোজিত হওয়ার সন্ধিস্থল; 6. কশেরুকা ও পঞ্জরাস্থির সন্ধিস্থল।

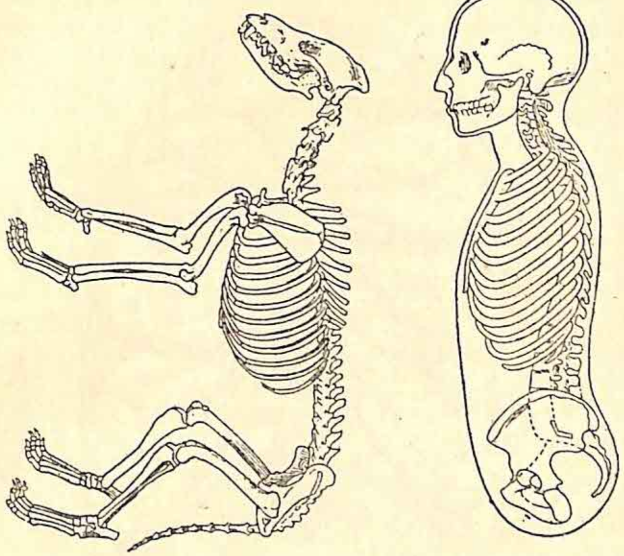
ভার্টিব্রা বা কশেরুকা একটি অস্থিচক্র; (২১ নং চিত্র) সম্মুখভাগ বা দেহ প্রচুর মোটা এবং এই স্থানে অনেকগুলি উদ্গত অংশ আছে। এই সব উদ্গত অংশে মাংসপেশী যুক্ত থাকে। কশেরুকাগুলি একে অপরের উপর সাজান থাকার ফলে ইহাদের ছিদ্রগুলি একটি নলের আকার ধারণ করে এবং তাহার মধ্যে থাকে সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord)। দুইটি কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে বেশ মোটা কতকগুলি তরুণাস্থি স্তবক থাকে এবং তাহারই জন্য মেরুদণ্ড স্থিতিস্থাপকতা ও সচলতা লাভ করে।

ত্রিকাস্থি কশেরুকাগুলি শৈশবে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইতে শুরু করে এবং পরিণত বয়সে একখানি ত্রিকাস্থিতে (sacrum) পরিণত হয়।

স্তন্যপায়ী জীবদের অনেকগুলি অনুত্রিকাস্থি লেজের কঙ্কাল গঠন করে। মানুষের সুদূর পূর্বপুরুষদেরও লেজ ছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ মানবদেহে ৪/৫ খানি অপরিণত অনুত্রিকাস্থি রূপে লেজের অবশেষ দেখা যায়।

পশুদেহে দেহকাণ্ডটি প্রায় সরল রেখায় প্রসারিত হইয়া শুধু একটি গ্রীবাদেশীয় বাঁক সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষের মেরুদণ্ডে গ্রীবাদেশীয় বাঁক ছাড়াও বক্ষ, কটি ও ত্রিকাস্থিদেশেও বক্রতা আছে (২২নং চিত্র); এবং সোজা হইয়া

দাঁড়ানর জন্য এই বক্রতাই মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী জীবদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আনিয়া দিয়াছে।



২২নং চিত্র—কুকুরের ও মানুষের মেরুদণ্ডের বক্রতা

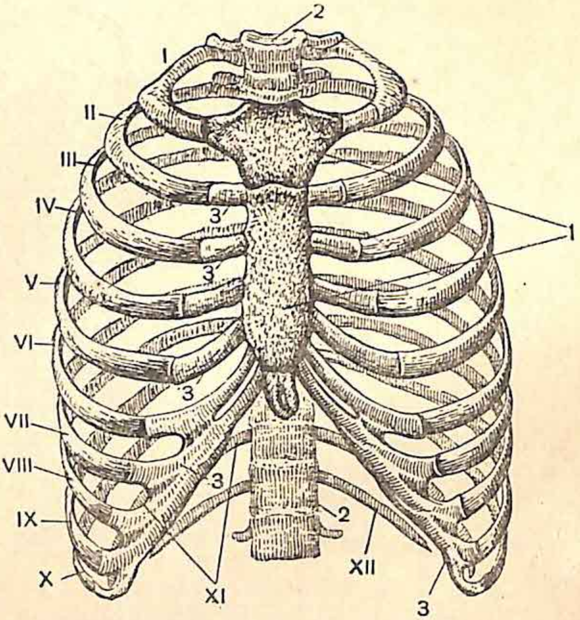
এই বক্রতাগুলির জন্য দণ্ডায়মান অবস্থায় ভারকেন্দ্রটি পিছনদিকে সরিয়া গিয়া একটি লম্বরেখার উপর অবস্থান করে এবং গোড়ালির কাছাকাছি পায়ের পাতার মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। ভারকেন্দ্রের এইরূপ অবস্থানের জন্য দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয় এবং দুই পায়ে হাঁটাও সহজসাধ্য হয়।

বক্রতাগুলি মেরুদণ্ডকে অধিকতর স্থিতিস্থাপকতা এবং নমনীয়তা দান করে। হাঁটা, দৌড়ান, লাফান, অথবা দেহের প্রবল আন্দোলনে মেরুদণ্ড স্প্রিং-এর মত কাজ করে এবং এইভাবে শির তথা মস্তিস্ককে আকস্মিক আঘাত ও গুরুতর আলোড়ন (concussion) হইতে রক্ষা করে।

বক্ষ-গহবর ঃ

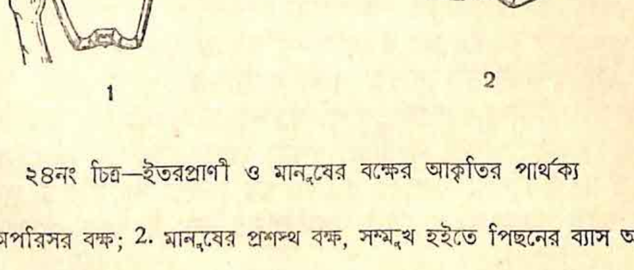
বক্ষদেশীয় কশেরুকাগুলি বক্ষ-গহবর তৈয়ারীর কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রত্যেকটি কশেরুকার উভয় পার্শ্ব হইতে একজোড়া পঞ্জরাস্থি প্রসারিত হয় এবং এগুলি ভার্টিব্রার সহিত সচল সংযোজনা সৃষ্টি করে। উপরের দশ-জোড়া পঞ্জরাস্থির সম্মুখপ্রান্ত তরুণাস্থির দ্বারা উরঃফলকের (sternum) সহিত সংযুক্ত; তাহা ছাড়া অষ্টম, নবম ও দশম পঞ্জরের তরুণাস্থিগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া সপ্তম পঞ্জরের তরুণাস্থির সহিত সংযোজিত হয়। একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্জর উরঃফলকের সহিত সংযুক্ত নয় এবং ইহাদের একপ্রান্ত মুক্ত।

বক্ষ-গহ্বর ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড এবং উদর-গহ্বরের উপরিভাগস্থ অন্যান্য দেহযন্ত্রকে আকস্মিক আলোড়ন ও আঘাত হইতে রক্ষা করে।



২৩নং চিত্র—বক্ষ

1. উরঃফলক; 2. মেরুদণ্ড; 3. পঞ্জরাস্থির তরুণাস্থি গঠিত অংশ; I—XII—পঞ্জরাস্থি।



২৪নং চিত্র—ইতরপ্রাণী ও মানুষের বক্ষের আকৃতির পার্থক্য

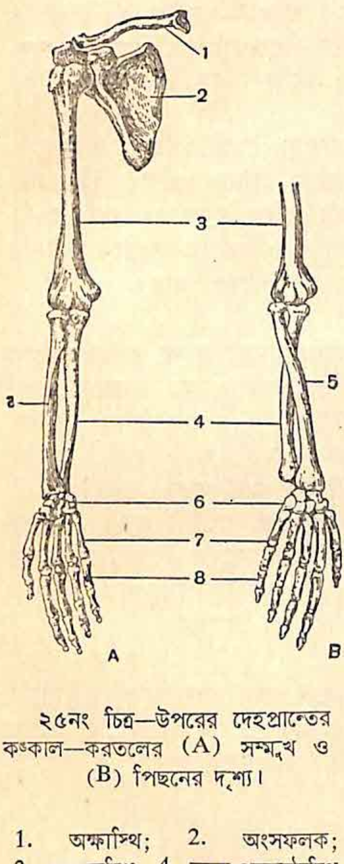
1. ভেড়ার অপরিসর বক্ষ; 2. মানুষের প্রশস্থ বক্ষ, সম্মুখ হইতে পিছনের ব্যাস অপ্রশস্ত।

মানুষের বক্ষ-গহ্বর প্রশস্ত হইলেও ইহার সামনে-পিছনের ব্যাস অপরিসর। বক্ষ-গহ্বরের এইরূপ আকৃতি দেহকান্ডের ঋজু অবস্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং ইহা দেহের ভারসাম্য বজায় রাখিতেও সাহায্য করে। চতুষ্পদ জীবদের বক্ষ-গহ্বর অপ্রশস্ত ও দীর্ঘতর, এবং মেরুদন্ড ও উরঃফলকের মধ্যে অধিকতর ফাঁক আছে; ইহাদের বক্ষ-গহ্বর সম্মুখের দুই পায়ের মধ্যে পাশাপাশি চ্যাপ্টা ধরনের (২৪নং চিত্র)।

স্কন্ধ ও শ্রোণিচক্রের ঘের ঃ

পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে অংসফলক নামে (scapula) দুইখানি চ্যাপ্টা ধরনের অস্থি আছে। ইহারা মেরুদন্ড এবং পঞ্জরাস্থি-গুলির সহিত শুধু পেশী সমূহের দ্বারা সংযুক্ত থাকে। প্রত্যেকটি অংসফলক অক্ষকাস্থির (clavicle) সহিত এবং অক্ষকাস্থির অপর প্রান্ত আবার উরঃফলকের সহিত সংযুক্ত।

অংসফলক ও অক্ষকাস্থি দেহকান্ডের উপরিভাগকে ঘিরিয়া রাখে এবং এইভাবে দেহের উপর প্রান্তের বা স্কন্ধের ঘের সৃষ্টি করে।



২৫নং চিত্র—উপরের দেহপ্রান্তের কঙ্কাল—করতলের (A) সম্মুখ ও (B) পিছনের দৃশ্য।

1. অক্ষাস্থি; 2. অংসফলক; 3. প্রগণ্ডাস্থি; 4. অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি 5. বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি; 6. করতলাস্থি; 7. করাঙ্গুলি মূলশলাকা; 8. অঙ্গুলিফলক।

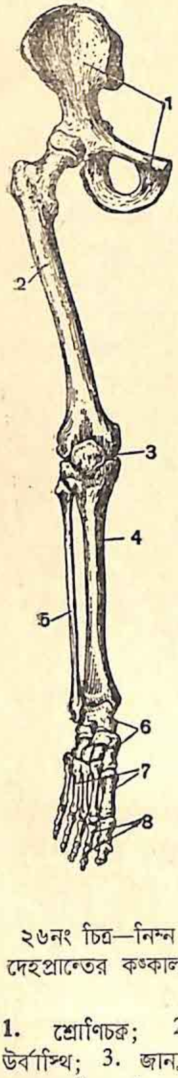
দেহের নিম্নপ্রান্তের ঘেরকে বলা হয় শ্রোণিচক্র। ইহাতে আছে ত্রিকাস্থি এবং দুই-খানি অচল সংযোজক শ্রোণিচক্রাস্থি। শ্রোণি-চক্রাস্থি দুইটি সম্মুখের দিকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত।

অংসফলকের মত শ্রোণিচক্রাস্থিতেও গোলা-কার গহ্বর আছে;—সেই গহ্বরে পায়ের উর্বাস্থির গোলাকৃতি প্রান্ত বা 'বল' নিবিড়-ভাবে লাগিয়া থাকে।

পশু অপেক্ষা মানুষের শ্রোণিচক্র প্রশস্ততর এবং দেখিতে গামলার মত। ইহার কারণও বোঝা যায়। পশুদেহে উদরগহ্বরের যন্ত্রগুলি ইহাদের সমস্ত ভার সহ পাকস্থলীর গাত্রে ভর করিয়া অবস্থান করে; অপরপক্ষে মানবদেহে এগুলির ভার বহন করে শ্রোণিচক্রাস্থি। এই-ভাবে মানব দেহে শ্রোণিচক্রের আকৃতি দেহ-কান্ডের ঋজু অবস্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট।

দেহপ্রান্ত ঃ

দেহের উপর এবং নিম্নপ্রান্তের অস্থিগুলির মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। (২৫ ও ২৬নং চিত্র)।



২৬নং চিত্র—নিম্ন দেহপ্রান্তের কঙ্কাল

1. শ্রোণিচক্র; 2. উর্বাস্থি; 3. জানু-কাপালিক 4. জংঘাস্থি; 5. অনু-জংঘাস্থি; 6. গুল্ফাস্থি 7. পদ-তলাস্থি; 8. পদাঙ্গুলি ফলক।

উপর প্রান্তে অর্থাৎ বাহুতে আছে (১) অংসফলকের সহিত সচল-সংযোজনায় আবদ্ধ প্রগণ্ডাস্থি (Humerus); (২) প্রকোষ্ঠে—বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (Radius) এবং অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (Ulna); (৩) হস্তে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করতলাস্থি (carpals), ৫টি দীর্ঘ করাঙ্গুলি-মূলশলাকা (Metacarpals) এবং ১৪টি অঙ্গুলি ফলক (Phalangs)।

নিম্নপ্রান্তের অনুরূপ অংশে (পায়ে) দেখা যায় (১) উরুতে উর্বাস্থি (Femer), (২) পায়ে—জংঘাস্থি (Tibia) ও অনুজংঘাস্থি (Fibula); চরণে—গুলফাস্থি (Tarsals), পদ-তলাস্থি (Metatarsals) ও পদাঙ্গুলি ফলক (Phalanges)।

উর্বাস্থি ও জংঘাস্থি মিলিয়া তৈয়ারি হয় জানুসন্ধি (knee-joint); ইহার সম্মুখভাগে জানুকাপালিক (Patella or knee-caps) নামে একটি ক্ষুদ্র অস্থি বিদ্যমান। জানুকাপালিকের অনুরূপ হিসাবে উপর প্রান্তে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির উপরিভাগস্থ একটি বৃহৎ উদ্গত অংশ দেখা যায়।

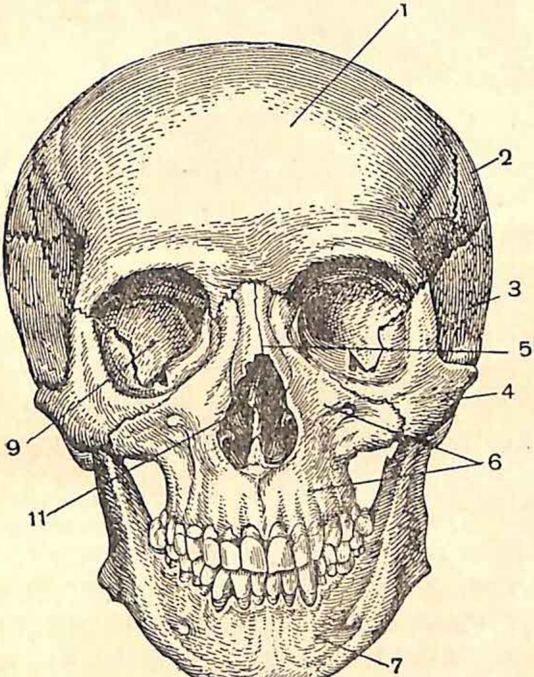
মানুষের বাহুর সহিত পশুদের সম্মুখের পা তুলনা করিলে দেখা যায় যে মানবদেহের সন্ধিগুলি পশুদের তুলনায় বেশী সচল; করতলাস্থি ও করাঙ্গুলি-মূল শলাকাগুলি মিলিয়া তৈয়ারি হয় প্রশস্ত করতল; এবং বৃদ্ধাঙ্গুলটি অন্যান্য অঙ্গুলির সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অবস্থিত। গঠনের এই পার্থক্য কার্যকলাপের পার্থক্য হইতেই সৃষ্টি হয়। পশুরা সম্মুখের এবং পিছনের দেহপ্রান্ত (পদযুগল) প্রধানত চলার জন্যই ব্যবহার করে; কিন্তু মানুষের উপরের দেহপ্রান্ত (অর্থাৎ বাহু ও হাত) ব্যবহৃত হয় কাজের যন্ত্র হিসাবে।

পদযুগল হইল চলার যন্ত্র এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় ইহারাই দেহের ভার বহন করে। সেই কারণে পায়ের অস্থিগুলি বাহুর অস্থি অপেক্ষা আকারে বড়; আর চরণযুগল প্রশস্ত ও নির্ভর-শীল অবলম্বনের কাজ করে।

করোটি ঃ

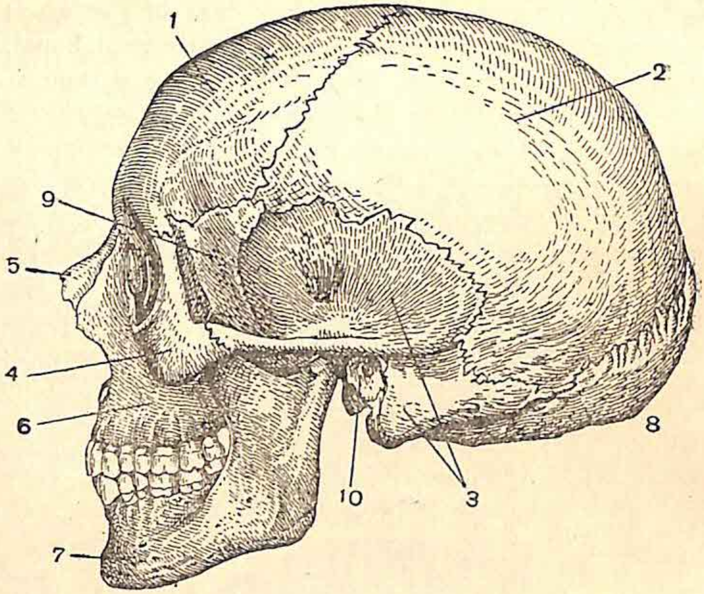
করোটি প্রধান দুইভাগে বিভক্ত (২৭ ও ২৮নং চিত্র); প্রথম মস্তিষ্কাধার এবং দ্বিতীয় মুখমণ্ডলের অস্থি-সমূহ।

মস্তিষ্কাধারের (cranium) বিশাল গহ্বরের মধ্যে মস্তিষ্ক থাকে। ইহা নিম্নলিখিত অস্থিসমূহ দ্বারা গঠিতঃ ললাটাস্থি (Frontal bone), দুইটি শিরকুন্ডাস্থি (Parietal bones), শিরনিম্নাস্থি (occipital bone), দুইটি রগাস্থি (Temporal bones), স্ফিনয়েড (Sphenoid) ও এথ্‌ময়েড (Ethmoid)। এই অস্থিগুলি জোড় মারফৎ পরস্পরের সহিত অচল সংযোজনে আবদ্ধ থাকে। মস্তিষ্কাধারের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া রক্ত-প্রণালী ও স্নায়ু-সমূহ প্রবিষ্ট হয়। রগাস্থি দুইটির মধ্যে শ্রবণযন্ত্র অবস্থান করে এবং ইহার মধ্য দিয়া বহিস্কর্ণপথ একটি প্রশস্ত প্রণালী বা ডাক্ট্‌ (duct) চলিয়া গিয়াছে। মস্তিষ্কাধারের গহ্বরের সহিত শিরনিম্নাস্থিতে অবস্থিত একটি বৃহৎ ছিদ্র দ্বারা মেরুদণ্ডের ছিদ্রপথের সংযোগ আছে। মেরুরজ্জু উপরের গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা (upper cervical vertibra) এবং শিরনিম্নাস্থির সংযোজন স্থলের সমতলে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে।



২৭নং চিত্র—করোটির সম্মুখ দৃশ্য

1. ললাটাস্থি; 2. শিরকুণ্ডাস্থি; 3. রগাস্থি; 4. জাইগোম্যাটিক বা কপোলাস্থি; 5. নাসিকাস্থি; 6. উপরের চোয়াল; 7. নীচের চোয়াল; 9. স্ফিনয়েড; 11. এথ্‌ময়েড



২৮নং চিত্র—করোটির পার্শ্বদৃশ্য

1. ললাটাস্থি; 2. শিরকুন্ডাস্থি; 3. রগাস্থি; 4. জাইগোম্যাটিক; 5. নাসিকাস্থি; 6. উপরের চোয়াল; 7. নীচের চোয়াল; 8. শিরনিম্নাস্থি; 9. স্ফিনয়েড; 10. কর্ণ-গহ্বরের মুখ

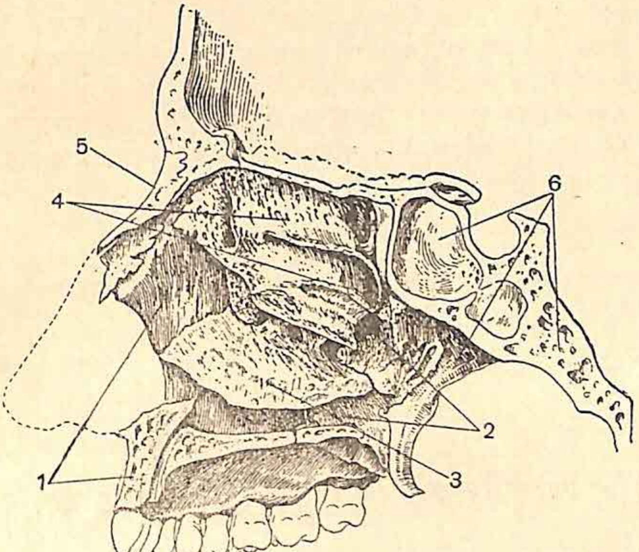
মুখমন্ডলের অস্থিগুলি শ্বসন ও পাচন যন্ত্রসমূহের (Respiratory and Digestive organs) উপরিভাগের অস্থি নির্মিত কাঠামোটি তৈয়ারি করে। মুখ-মন্ডলের অস্থিগুলি হইল—উপরের ও নীচের চোয়ালের অস্থি, গন্ডাস্থি, তালু-দেশীয় অস্থি (Palatine), ভোমার (Vomer), নাসিকার অস্থিসমূহ, নিম্ননাসা-কণ্ঠা (Lower Nasal Conchae) এবং অশ্রুবাহী অস্থিসমূহ (Lachrymal bones) (২৯নং চিত্র)।

হনু (Maxilla) এবং তালুদেশীয় অস্থিগুলি কঠিন তালু (hard Palate) অর্থাৎ নাসা ও মুখগহ্বরের মধ্যে অস্থি নির্মিত প্রাচীর তৈয়ারি করে। এইগুলি এবং নাসিকার অস্থিগুলি মিলিয়া নাসাগহ্বরের পার্শ্বদেশ গঠন করে। ভোমার এবং এথময়েড অস্থির নিম্নভাগ দ্বারা নাসা-গহ্বর দক্ষিণ ও বাম অর্ধে বিভক্ত হয়। এথময়েড অস্থির উপরিভাগে প্রচুর সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে; ইহাদের মধ্য দিয়া ঘ্রাণ-বাহী (olfactory) স্নায়ুগুলি নাসাগহ্বর হইতে মস্তিষ্কাধারের গহ্বরে প্রবেশ করে। এথময়েড অস্থির উদ্গত অংশগুলি উপর ও মধ্য নাসা-কণ্ঠা গঠন করে। নিম্ন-নাসা-কণ্ঠা স্বতন্ত্র অস্থি হইতে সৃষ্ট।

গন্ডাস্থিগুলি উপরের চোয়ালের সহিত ললাটাস্থি ও রগাস্থিদিগকে যুক্ত করিয়া মুখমন্ডলের অস্থি-কাঠামোকে শক্তিশালী করে।

অক্ষি-গহ্বর অনেকগুলি অস্থি দ্বারা গঠিত, যথা, হনু (Maxillary), ললাটাস্থি, গণ্ডাস্থি, স্ফিনয়েড, এথময়েড ও অশ্রুবাহী (Lachimal) অস্থি।

সমগ্র করোটিতে নীচের চোয়ালেই একমাত্র সচল অস্থি। নীচের ও উপরের চোয়ালের অস্থিতে কয়েকটি নালীর মধ্য দিয়া রক্তপ্রণালী ও স্নায়ুসমূহ দন্তে প্রবেশ করে।



২৯নং চিত্র—করোটির মুখমণ্ডলাংশের প্রস্থচ্ছেদ

1. উপরের চোয়াল; 2. প্যালেটাইন বা তালুর অস্থি 3. নিম্ন-নাসা-কণ্ডা; 4. উপরের ও মধ্য নাসা-কণ্ডা; 5. নাসিকাস্থি; 6. স্ফিনয়েড

পশুদের মুখমণ্ডলের অস্থিগুলি আক্রমণ ও আত্মরক্ষার যন্ত্র হিসাবে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। সেইজন্য এই অস্থিগুলির গঠন খুব শক্ত; কোন কোন পশুর মুখমণ্ডলের অস্থি আকারে ও ওজনে মস্তিষ্কাধার হইতেও বড় এবং ভারী।

মানুষের পূর্বপুরুষদের ক্রমবিকাশের পথে সোজা হইয়া দাঁড়ান এবং উপরের দেহপ্রান্ত (বা বাহু ও হাত) মুক্ত হওয়ার পর মুখমণ্ডলের অস্থিগুলি আক্রমণ ও আত্মরক্ষার ভূমিকা হারাইয়া ফেলে। ঠিক সেইরূপ খাওয়ার পূর্বে খাদ্য রন্ধন করার রীতি চালু হওয়ার পর চোয়ালের চর্বণ করার ভূমিকাও দুর্বল হইয়া পড়ে। পরিবর্তে, কাজ করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া মস্তিষ্ক প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পশুদের মস্তিষ্ক অপেক্ষা মানুষের মস্তিষ্ক আকারে অনেক বড় হইয়া যায়। এই সবের ফলে একদিকে মুখমণ্ডলের, বিশেষত চোয়ালের অস্থিগুলির বৃদ্ধি কমিয়া যায় এবং অন্যদিকে মস্তিষ্কাধারের বৃদ্ধি শক্তিশালী হয়।

দেহের অনুভূমিক অবস্থায় মস্তকটি স্বভাবতই নীচু দিকে ঝুলিয়া থাকে। পশুদেহের বিশাল ও ভারী মুখমন্ডলের অস্থিগুলিসহ মস্তক শির-নিম্নাস্থির শক্তিশালী পেশীসমূহের দ্বারা অবলম্বিত হয়। তাহা ছাড়া করোটির উপরি-ভাগে কতকগুলি বড় বড় অংশ ও আলি আছে; এইগুলি শিরনিম্নাস্থির ও চিবাইবার পেশীসমূহকে শক্তিশালী করে।

মানুষের মস্তক ইহার অধোদেশে অবলম্বিত থাকে। ঋজু করিয়া ধরিলে মস্তকের ভারকেন্দ্র অবলম্বিত বিন্দুর কিছুটা সম্মুখে সরিয়া যায়। পেশীগুলি শিথিল করিলে সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িলেও মস্তককে যথাস্থানে ধরিয়া রাখার জন্য বিশেষ কষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহাই মানুষের শিরনিম্নাস্থির পেশী-সমূহের ক্ষীণ বৃদ্ধির কারণ। চিবাইবার পেশীগুলিও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি নীচের চোয়ালের মত অপরিপুষ্ট। শক্তিশালী পেশীর অভাবে মানুষের করোটিতে কোন বৃহৎ উদ্গত অংশ বা আলি নাই।

প্রশ্ন ঃ কঙ্কালের কোন্ কোন্ অংশ দেহযন্ত্রগুলিকে রক্ষা করে? সেই সব দেহযন্ত্রের নাম লিখ।

১৪। অস্থিসংশ্লিষ্ট পেশীসমূহের গঠন ও উপাদান

অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীর গঠন ঃ

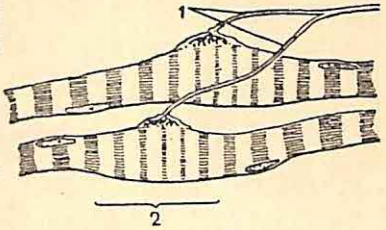
প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণের অস্থিসংশ্লিষ্ট পেশীগুলির সহিত মসৃণ-পেশীর (Smooth muscles) খুব অল্পই পার্থক্য থাকে। পরে পেশী-কোষগুলি দ্রুত বর্ধিত হইতে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ১০/১২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। বৃদ্ধির সময় নিউক্লিয়াসগুলি বার বার বিভক্ত হইয়া থাকে; ফলে যে দীর্ঘ পেশীতন্তুর সৃষ্টি হয়, তাহাতে অনেকগুলি নিউক্লিয়াস থাকে এবং তখন আর তাহাকে কোষ বলা যায় না।

অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীর তন্তু (fibre) বহুসংখ্যক পরস্পর অবিচ্ছেদ্য কোষ সমষ্টি দ্বারা গঠিত। এই ধরনের জটিল গঠনকে "অবিচ্ছেদ্য" গঠন বলা হয় (Syncytial Structure)।

পেশীতন্তুর সমগ্র জীবোপাদানটি অতি সূক্ষ্ম পেশী-সূত্র (fibrils) দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ থাকে, এবং এই সূত্রগুলি পেশীতন্তুর সমগ্র দৈর্ঘ্য ব্যাপিয়া প্রসারিত হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে পেশী-সূত্রগুলি সমান্তরে একটির পর একটি গুচ্ছ দ্বারা গঠিত, এবং গুচ্ছগুলির একটির রং ফিকা ও পরেরটি গাঢ়। লম্বালম্বিভাবে গঠিত পেশীসমূহের ফিকা ও গাঢ় রঙের গুচ্ছগুলি আড়াআড়িভাবে অবস্থিত এবং সমগ্র তন্তুটি মুখোমুখিভাবে ডোরাকাটা থাকে। (৩০নং চিত্র)। এই কারণে অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীগুলিকে ডোরাকাটা (Striated) পেশী বলে।

পেশীর সংকোচন ঃ

পেশী-তন্তুর গাঢ় অংশটি ছোট হওয়ার ফলে পেশীর সঙ্কোচন হয়। রবার টানিয়া ছাড়িয়া দিলে যে অবস্থা ঘটে, ঠিক সেইরূপ পেশী ছোট হইলে ঘন হইয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সঙ্কোচনের ফলে সমস্ত পেশীটি ঘন ও ছোট হইয়া যায়।



৩০নং চিত্র—ডোরাকাটা পেশীর তন্তু
1. স্নায়ুতন্তুর প্রান্ত; 2. সংকুচিত অবস্থায় পেশীতন্তুর একাংশ

মসৃণ পেশীগুলির উত্তেজিত হওয়ার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম; ইহারা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু ডোরাকাটা পেশীগুলি সহজেই উত্তেজিত হয় এবং ইহাদের সঙ্কোচন ক্রিয়াও ঘটে ত্বরিত গতিতে। মানবদেহের অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীগুলি সেকেন্ডে দশ-বারেরও বেশী সঙ্কুচিত হইতে পারে; কিন্তু কীট-পতঙ্গের ডানার ডোরাকাটা পেশীগুলি সেকেন্ডে ২০০ হইতে ৩০০ বার পর্যন্ত সঙ্কুচিত হইতে পারে। অপর পক্ষে মসৃণ তন্তুতে গঠিত পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশীগুলির একটিমাত্র সঙ্কোচন ঘটিতে কয়েক সেকেন্ড লাগিতে পারে।

উত্তেজনায় পেশীর প্রতিক্রিয়া ঃ

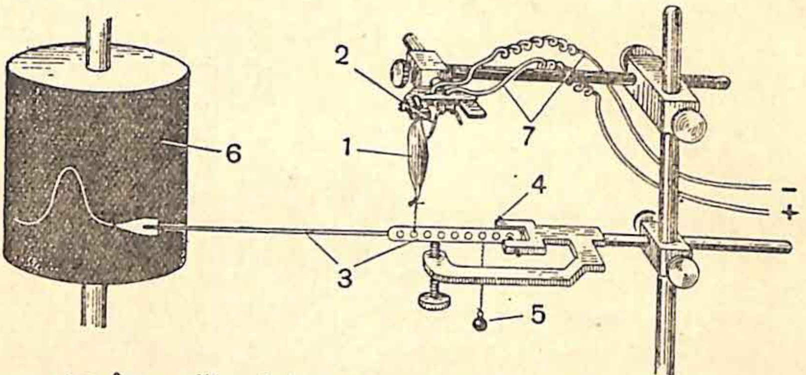
কোন ব্যাঙের দেহ হইতে একটি পেশী কাটিয়া লইয়া তাহাতে আলপিনের খোঁচা দিলে, চিমটার দ্বারা আঘাত করিলে, অগ্নিতপ্ত তারের দ্বারা স্পর্শ বা তড়িৎস্পৃষ্ট করিলে কিংবা তাহার উপর একটু লবণ রাখিলে পেশীটির সঙ্কোচন হইবে। অর্থাৎ যান্ত্রিক, তাপোদ্দীপক, বৈদ্যুতিক অথবা রাসায়নিক, যে কোন উত্তেজনায় পেশীর সঙ্কোচন হয়। এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে **উত্তেজকটি যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন।**

জীবন্ত দেহের পেশীকে শুধু ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই এই ধরনের কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত করা যায়। আমাদের পেশীগুলির সাধারণ ও স্বাভাবিক উত্তেজনা আসে স্নায়ুতাড়না হইতে (from nerve impulses)।

ব্যাঙের দেহ হইতে স্নায়ুসহ একটি অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশী কাটিয়া লইয়া তাহার উপর পরীক্ষা চালাইলে সহজেই এই ব্যাপারটি বুঝা যাইবে।

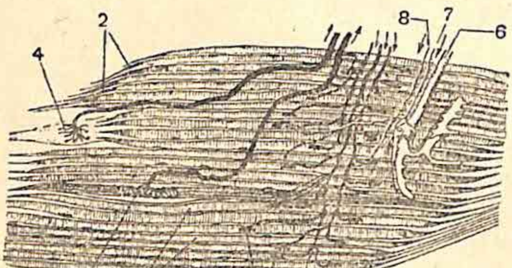
পেশীটির একপ্রান্ত চিমটার সাহায্যে শক্ত করিয়া ধরিয়া অপর প্রান্তটি সুতার দ্বারা একটি ভারোত্তলক যন্ত্রের (lever) সহিত যুক্ত করিয়া (৩১নং চিত্র) দিলে পেশীর সঙ্কোচন দেখা যাইবে। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা স্নায়ুর উত্তেজনায় পেশীর প্রত্যেকটি সঙ্কোচন লিভারের সঞ্চালন দ্বারা সঠিকভাবে রেখায়িত হইবে।

পেশীতে প্রবিষ্ট স্নায়ুগুলি বহুসংখ্যক স্নায়ুতন্তু দ্বারা গঠিত। পেশীর অভ্যন্তরে এই স্নায়ুতন্তুগুলি বহু শাখা-প্রশাখায় ভাগ হইয়া পেশীর পৃথক পৃথক তন্তুগুচ্ছকে স্নায়ু-সূত্র সরবরাহ করে (৩২নং চিত্র)।



৩১নং চিত্র—একটি আবর্তিত ড্রামের মসীলিপ্ত গাত্রে একটি ব্যাঙের পেশী সংকোচনের রেখাচিত্র।

1- 2—পেশী ও ইহার একটি স্নায়ু; 3. কিমোগ্রামের ড্রামগাত্রে সংকোচন চিত্রিত করার লিভার; 4. লিভারের আবর্তনের অক্ষ; 5. লিভারটিকে টানিয়া নীচে নামাইবার ভার; 7. ইলেকট্রোডের উপর অবস্থিত স্নায়ু। তরঙ্গের উৎসের সহিত ইলেকট্রোডের সংযোগ দেখান হইয়াছে।



৩২নং চিত্র—অস্থি সংশ্লিষ্ট পেশীর স্নায়ুপ্রান্ত
1. পেশীতন্তু; 2. পেশী কণ্ডোরা; 3. বহির্মুখী স্নায়ুতন্তুর প্রান্ত; 4. ও 5. পেশীতে ও কণ্ডোরায় অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্তুর প্রান্ত; 6. রক্ত-প্রণালী; 7. রক্ত-প্রণালীতে আগত স্নায়ুতন্তু; 8. পেশীর পরিপাক ক্রিয়ার প্রভাব সৃষ্টিকারী স্নায়ুতন্তু।

বহির্মুখী স্নায়ুতন্তুর সূত্র হইতে তাড়নাসমূহ পেশীতন্তুতে চালিত হয় এবং তাহারই ফলে পেশীর সংকোচন ঘটে। সমস্ত তন্তুগুলি একযোগে উত্তেজিত হইলে পেশীটি প্রবল শক্তিতে সংকুচিত হয়। উত্তেজনার প্রবাহ শতকরা ৫০ অথবা ২৫ ভাগ স্নায়ু-তন্তুকে প্রভাবিত করিলে সংকুচিত পেশীতন্তুর সংখ্যা এবং পেশীসংকোচনের শক্তিও অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ কমিয়া যাইবে। একটিমাত্র স্নায়ু-তন্তু উত্তেজিত হইলে পেশীর ন্যূনতম সংকোচন হইয়া থাকে। স্নায়ুপথে পরিচালিত প্রতিটি উত্তেজনার তরঙ্গের ফলে যে পেশী-সংকোচন হয়, আমাদের দেহের অধিকাংশ পেশীতেই তাহা এক সেকেন্ডের এক-দশমাংশ সময় অবস্থান করে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হইতে পেশীতে আগত তাড়নাগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একের পর এক আসিয়া পড়ে এবং সংকোচনের পর পেশীগুলি শিথিল হওয়ার অবসরই পায় না। ইহার ফলে পৃথক পৃথক সংকোচনগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এক দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন বা "টেটানিক" (Tetanic) সংকোচনে পরিণত হয়। অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীর এই সাধারণ সংকোচন দেহের যে-কোন সঞ্চালনেই দেখা যাইতে পারে।

অস্থির সহিত পেশীর সংযোগ ঃ

যে সমস্ত পেশী এক বা উভয় প্রান্তে অস্থির সহিত সংযুক্ত, তাহাদিগকেই অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশী বলে। এইগুলি একটি পাতলা স্থিতিস্থাপক ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত থাকে। পেশীগুলি সাধারণত উভয় প্রান্তেই খুব শক্ত সাদা ফিতার ন্যায় কন্ডোরাতে (tendon) আসিয়া শেষ হয় এবং এইগুলি অস্থিত্বকের সহিত মিশিয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশীর উভয় প্রান্ত নিকটস্থ সচল অস্থি-সন্ধির সহিত যুক্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কন্ডোরাগুলি বহুদূর প্রসারিত হইয়া দুই বা ততোধিক সন্ধির উপর দিয়া চলিয়া যায় (৩৩নং চিত্র)।

সঙ্কোচনের ফলে ছোট হইয়া পেশীগুলি হয় দেহকে সচল করে অথবা নির্দিষ্ট অবস্থায় ধরিয়া রাখে।

পেশী সঙ্কোচনের ফলে সচলতা ঃ

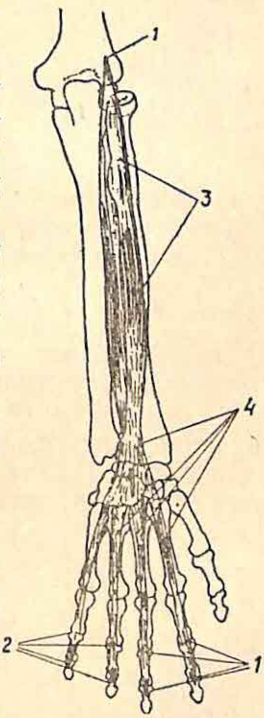
সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকরা অস্থিকে পেশী দ্বারা সচলতাপ্রাপ্ত ভারোত্তলক বা কপিকল হিসাবে গণ্য করিতেন। সত্য সত্যই আমাদের দেহের অধিকাংশ সঞ্চালনই কপিকল তত্ত্বের ভিত্তিতে ঘটিয়া থাকে।

শরীরের পৃথক পৃথক অংশের সঞ্চালন হয় কপিকল তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায় অনুসারে—অর্থাৎ অবলম্বনের বিন্দুটি যখন শক্তি অর্পণ ও প্রতিরোধের মিলন রেখার উপর অবস্থান করে, সেই পর্যায় অনুসারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশীর সংযোগের বিন্দুটি ভারকেন্দ্র অপেক্ষা অবলম্বন বিন্দুর নিকটবর্তী। সুতরাং প্রতিরোধ কাটাইয়া ওঠার জন্য পেশীকে প্রচুর শক্তি অর্জন করিতে হয়। অবশ্য ইহাতে সঞ্চালনেরও অনেক সুবিধা হয়।

সন্ধির চারিদিকে সাধারণত একাধিক পেশী থাকে এবং ইহাদের প্রত্যেকটির সঙ্কোচন কিছু কিছু নির্দিষ্ট সচলতা সৃষ্টি করে।

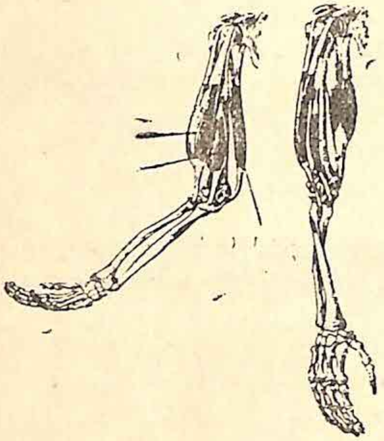
কনুইতে অবস্থিত এক ডজন বিভিন্ন পেশীর সঙ্কোচনের ফলে প্রকোষ্ঠ বাঁকিয়া কিংবা সোজা হইয়া যায় এবং হাত ভিতর অথবা বাহিরের দিকে ঘুরিয়া যায় (৩৪নং চিত্র)। প্রত্যেকটি পেশীর সঙ্কোচন-প্রসূত সচলতা অস্থির উপরে পেশীর সংযোগ বিন্দুর অবস্থানের উপর নির্ভর করে। প্রগণ্ডাস্থি ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সম্মুখভাগে সংযুক্ত ব্রেকিয়াল (brachial) পেশীটি সঙ্কুচিত হইলে কনুই বাঁকিয়া যায়; বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির ভিতরের পৃষ্ঠে সংযুক্ত উপরের বাহুর দ্বিমুখী বাইসেপ্স (biceps) শুধু যে কনুইকে বাঁকায় তাহা নয়, ইহা হাতকে সজোরে বাহিরের দিকে ঘুরায়; অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির পিছনের দিকে সংযুক্ত বাহুর ত্রিমস্তক বিশিষ্ট ট্রাইসেপ্স পেশীর সঙ্কোচনের ফলে বাহু কনুইতে সোজা হইয়া যায়।



৩৩নং চিত্র—হাতের অঙ্গুলিগুলি প্রসারণকারী পেশীর অস্থির সহিত সংযোগ
1. প্রগণ্ডাস্থির নিম্নদেশে পেশীর সংযোগস্থল; 2. অঙ্গুলি ফলকের সহিত পেশীর সংযোগ-স্থল; 3. পেশী; 4. একটী দীর্ঘায়ত পেশী-কণ্ডোরা

সন্ধির চারিদিকে অবস্থিত পেশীগুলি পৃথক পৃথক ভাবে অথবা ভিন্ন ভিন্ন জোড়ে একযোগে সঙ্কুচিত হইতে পারে। সাধারণত এককালীন সঙ্কোচনই বেশী হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জোড়ের এককালীন সঙ্কোচনের জন্যই আমাদের দেহের বিভিন্ন ধরনের সচলতা সৃষ্টি হয়। অবশ্য সচলতা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকটি পেশীর সঙ্কোচন শক্তিও প্রচুর তাৎপর্যপূর্ণ।

পরস্পর বিরোধী পেশীগুলি—যেমন কনুই বাঁকাইবার বাইসেপ্‌স্‌ এবং সোজা করিবার ট্রাইসেপ্‌স্‌ একযোগে সঙ্কুচিত হইবার ফলে সচলতা সৃষ্টি না হইলেও এই ধরনের সঙ্কোচনে সন্ধিটি নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হইয়া থাকে।



৩৪ নং চিত্র—পরস্পর বিরোধী ক্রিয়াশীল পেশীর পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও শৈথিল্য

অনুশীলনী ঃ

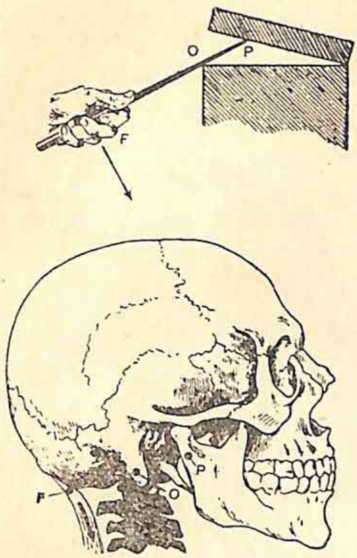
(১) করোটির সহিত মেরুদণ্ডের সচল সংযোজন-গুলি লক্ষ্য কর। (৩৫নং চিত্র); অবলম্বন, শক্তি অর্পণ (পেশীর সংযোগ স্থান) ও প্রতিরোধের (মস্তকের ভারকেন্দ্র রেখা) কেন্দ্রগুলি নির্ণয় কর; চিত্রের উপরের অংশের সাহায্যে এই ক্ষেত্রে কী ধরনের ভারোত্তলক ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা নির্ণয় কর।

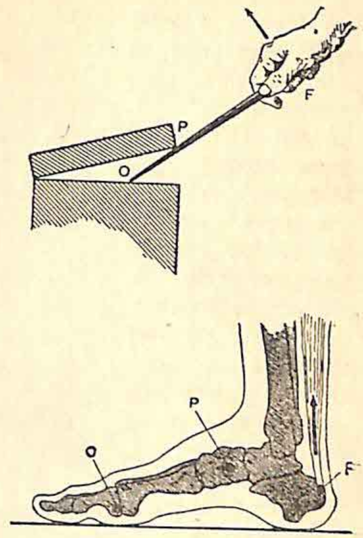
(২) একই উপায়ে পায়ের আঙ্গুলে ভর করিয়া দাঁড়াইলে গুল্‌ফ-সন্ধির (anklejoint) (gastrocneium) পেশীগুলির কার্যকারণ ব্যাখ্যা কর। (৩৬নং চিত্র)।

(৩) একইভাবে বাহু হইতে কনুইতে বাঁকিবার কার্যকারণ ব্যাখ্যা কর (৩৭নং চিত্র); চিত্রের বাম অংশে বর্ণিত ভারোত্তলক কৌশল তথাকথিত তৃতীয় পর্যায়ের ভারোত্তলক যন্ত্র খুব কমই ব্যবহৃত হয় কেন তাহা ব্যাখ্যা কর।

১৫। অস্থিসংশ্লিষ্ট পেশীর প্রধান বিভাগ

মানবদেহে ছয় শতেরও অধিক অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশী আছে (৩৮ ও ৩৯নং চিত্র)। দেহের সচলতা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে ইহাদিগকে কয়েকটি

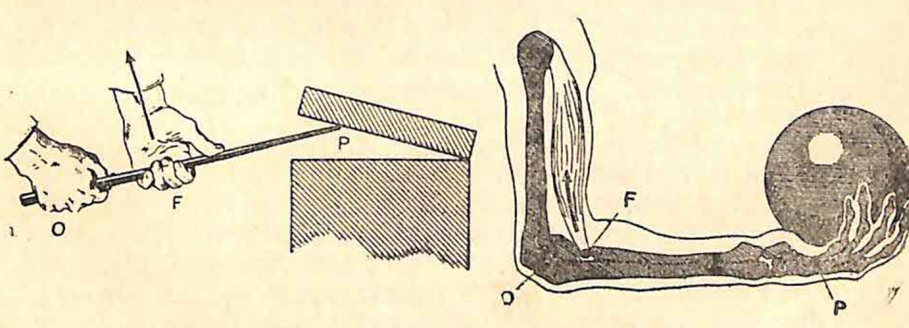




৩৫নং চিত্র—
মস্তকের ধারক অক্‌সিপিটাল (বা শিরনিম্ন) পেশীর ক্রিয়া কলাপের চিত্র।

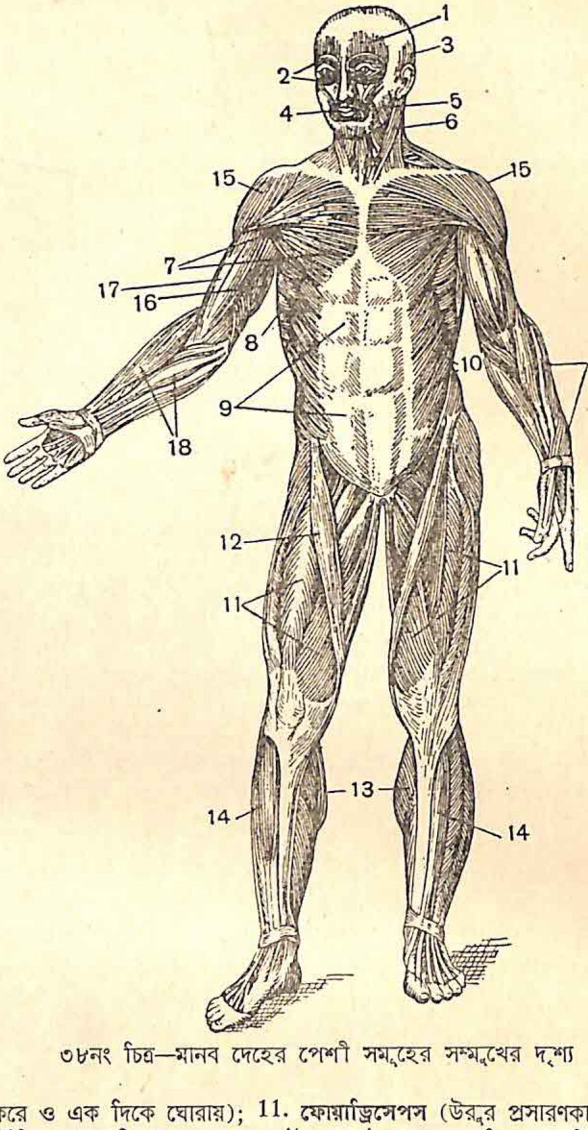
৩৬নং চিত্র
গুল্‌ফ-সন্ধিতে গ্যাসট্রক্‌নাসিক পেশীর ক্রিয়া-কলাপের চিত্র।

O—ধারক বিন্দু; F—শক্তি-প্রয়োগ বিন্দু (এই স্থানে পেশীটি সংযুক্ত); P—প্রতিরোধ বিন্দু। উপরে একটি ছড়ি দ্বারা ঢাকনা খোলা হইতেছে,—O, P, F বিন্দুগুলির অবস্থান একই ধরনের।



৩৭নং চিত্র—কনুইতে বাহুর ভাঁজ দেখান হইয়াছে। চিহ্নগুলি ৩৫ ও ৩৬নং চিত্রের মত।

1. ললাটের চর্মকে লম্বা-লম্বিভাবে ভাঁজ সৃষ্টি-কারী **ফ্রন্টাল** পেশী; 2. চক্ষু বন্ধকারী চক্ষুর **অর্বিকুলার** পেশী; 3. **টেম্পরাল** পেশী; 4. মুখ বিবর বন্ধকারী মুখের **অর্বিকুলার** পেশী; 5. অন্যান্য পেশীর সহযোগিতায় চর্বণক্রিয়া সৃষ্টিকারী **ম্যাস্‌টিকেটারী** পেশী; 6. **স্টারনোক্লিডো-ম্যাসটয়েড্‌** পেশী (এই দুইটি পেশী সঙ্কোচনের দ্বারা মস্তককে সম্মুখের দিকে অবনমিত করে; ইহাদের মধ্যে একটি নিজে সংকুচিত হইয়া মস্তককে সঙ্কোচনের দিকে ঘোরায় ও অবনমিত করে;) 7. বৃহৎ **পেক্টরাল** পেশী (ইহা বাহুকে নিম্নাভিমুখে নামায় ও সম্মুখের দিকে লইয়া যায়; বাহুটি নিষ্ক্রিয় থাকিলে ইহা বক্ষকে উত্তোলিত করে); 8. **সিরেটেড্‌ পেশী** (গভীর প্রশ্বাসের সময় ইহা বক্ষকে উত্তোলিত করে); 9. **ঋজু** উদরের পেশী বা **ইরেক্ট্‌ এ্যাবডোমিন্যাল** পেশী (ইহা দেহকাণ্ডকে সম্মুখের দিকে অবনমিত করে এবং বক্ষকেও অবনমিত করে); 10. **উদরের তির্যক পেশী বা ওব্‌লিক্‌ এ্যাবডোমিন্যাল পেশী** (দেহকাণ্ডকে সম্মুখের দিকে অবনমিত করে ও এক দিকে ঘোরায়); 11. **ফোয়াড্রিসেপস** (উরুর প্রসারণকারী চতুর্মুখ পেশী); 12. **সার্টোরিয়াল পেশী** (পদযুগলকে হাঁটুতে ভাঁজ করে ও ভিতরের দিকে ঘোরায়); 13. **গ্যাসট্রিকনেমিক্‌ পেশী** (গুল্‌ফ-সন্ধিকে ভাঁজ করে অর্থাৎ পায়ের পাতার সম্মুখভাগ নীচু করিয়া গোড়ালি তুলিয়া ধরে এবং এইভাবে অংগুলিতে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করে); 14. **এ্যান্টিরিয়ার টিবিয়াল** পেশী (গুল্‌ফ-সন্ধিকে সোজা করে); 15. **ডেল্‌টয়েড** পেশী (বাহু উত্তোলন করে); 16. **ট্রাইসেপ্‌স্‌ পেশী** (বাহুকে কনুইতে সোজা করে—ত্রিমুখী পেশী); 17. **বাইসেপ্‌স্‌** পেশী (বাহুকে কনুইতে ভাঁজকারী দ্বিমুখী পেশী); 18. মনিবন্ধ ও অংগুলির **ভাঁজ সৃষ্টিকারী** পেশী সমূহ; 19. মনিবন্ধ ও অংগুলির প্রসারণকারী **পেশীসমূহ।**



৩৮নং চিত্র—মানব দেহের পেশী সমূহের সম্মুখের দৃশ্য

প্রধান প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

মস্তকের পেশী ঃ

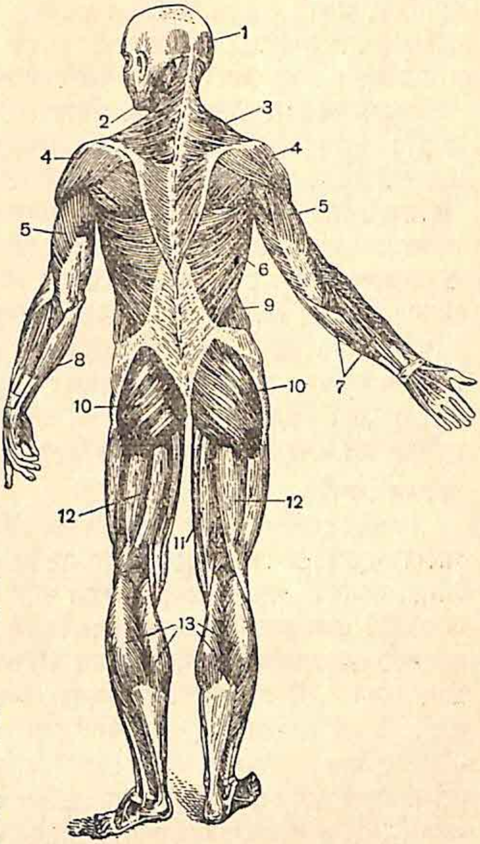
মস্তকের পেশীগুলি চিবানর ও মুখের ভাবসৃষ্টিকারী পেশী-সমূহের দ্বারা গঠিত। চিবানর পেশীগুলির সঙ্কোচনের ফলে নীচের চোয়ালটি সচল হয়। মুখের ভাব সৃষ্টিকারী পেশীগুলি এক বা উভয় প্রান্ত দ্বারা চর্মের সহিত সংযুক্ত। এই পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইলে চর্মের ভিন্ন ভিন্ন অংশ একস্থান হইতে অপর স্থানে সরিয়া গিয়া মুখের বিভিন্ন ভাব সৃষ্টি করে। চোখের এবং মুখ-গহবরের বৃত্তাকার পেশীগুলির সঙ্কোচনের ফলে চোখের পাতা ও ঠোঁট চাপিয়া (সঙ্কুচিত হইয়া) যায়। এই পেশীগুলি চর্মের নীচে অবস্থান করে।

দেহকান্ডের পেশী ঃ

বক্ষ, পাকস্থলী ও পৃষ্ঠদেশের পেশীগুলির দ্বারা দেহকান্ডের পেশীগুলি গঠিত।

পঞ্জরাস্থি সমূহের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থিত বক্ষের পেশীগুলি অন্যান্য পেশীর সহযোগিতায় বক্ষকে উত্তোলিত ও অবনমিত করে। এই পেশীগুলি শ্বাস-কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। পর-বর্তীকালে শ্বাসনালী অনু-শীলনের সময় এইগুলি আলোচনা করা হইবে।

পৃষ্ঠদেশের অসংখ্য পেশী মেরুদণ্ডের সহিত বিন্যস্ত থাকে। ইহাদের অধিকাংশই কশেরুকা-সমূহের উদ্গত অংশগুলির সহিত সংযুক্ত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মেরুদণ্ডকে সোজা করিতে এবং পিছনের দিকে বাঁকাইতে সাহায্য করে; কতকগুলি সাহায্য করে



৩৯নং চিত্র—মানব দেহের পেশী সমূহের পশ্চাৎ-দৃশ্য

1. অক্সিপিটাল পেশী; 2. স্কন্ধের পেশী (মস্তক সঞ্চালন করে); 3. ট্র্যাপিজয়েডাল পেশী (অংস-ফলককে মেরুদণ্ডের দিকে আকর্ষণ করে); 4. ডেলটয়েড পেশী; 5. উপরের বাহুর ট্রাইসেপ্স পেশী; 6. পৃষ্ঠের প্রশস্ত পেশী (বাহুকে ভিতরের দিকে ও পিছনের দিকে ঘোরায়) 7. মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির প্রসারণকারী পেশী; 8. মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির ভাঁজসৃষ্টিকারী পেশী; 9. পাকস্থলীর তির্যক পেশী; 10. বৃহৎ গ্লুটিয়াল পেশী (উরুকে বাহিরের দিকে ঘোরায়); 11. সেমি-টেণ্ডিনাস বা অর্ধকণ্ডোরা পেশী (পদযুগলকে শ্রোণিচক্র ও উরুর সন্ধিস্থলে সোজা করে হাঁটুতে ভাঁজ করে এবং ভিতরের দিকে ঘোরায়); 12. উরুর বাইসেপ্স্ (পদযুগলকে হাঁটুতে ভাঁজ করে); 13. গ্যাসট্রক-নেমিক পেশী.

ঘুরাইতে, আবার কতকগুলি একপাশ হইতে অপর পাশে বাঁকাইয়া দেয়। পৃষ্ঠের কয়েকটি পেশী একপ্রান্তে মেরুদণ্ডের সহিত এবং অপর প্রান্তে পঞ্জরাস্থিসমূহের সহিত যুক্ত। এই পেশীগুলি বক্ষের সচলতা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে।

দেহকাণ্ডকে সম্মুখের দিকে বাঁকায় প্রধানত পাকস্থলীর পেশীগুলি। পাকস্থলীর মধ্যরেখা দিয়া একটি অত্যন্ত মজবুত কস্তেরা জাতীয় ফিতা উপর হইতে তলদেশ পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। এই ফিতার উভয় পার্শ্বে দক্ষিণ ও বাম ঋজু ঔদরিক পেশী (erect abdominal muscles) অবস্থিত; ইহারা উপরে বক্ষের নিম্নপ্রান্তে এবং নিম্নে শ্রোণিচক্রাস্থির সংযোগস্থলে সংযুক্ত। পাকস্থলীর বহিস্থ ও অন্তঃস্থ তির্যক পেশী দুইটি (outer and inner oblique muscles of the stomach) ঋজু ঔদরিক পেশীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। দক্ষিণ ও বাম তির্যক পেশী দুইটি একযোগে সঙ্কুচিত হইলে দেহকাণ্ড সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্তু পৃথকভাবে যে-কোন একটি পেশী সঙ্কুচিত হইলে দেহকাণ্ড পার্শ্বের দিকে ঘুরিয়া যায়। ইহা ব্যতীত সঙ্কোচন হইলে উদরের পেশীগুলি উদর গহ্বরকে চাপিয়া ধরে এবং বক্ষকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করে।

স্কন্ধের পেশী ঃ

স্কন্ধের পেশীগুলি মস্তককে পিছনে ঠেলিয়া দিতে, সম্মুখে নত করিতে, এবং পার্শ্বে ঘুরাইতে সাহায্য করে; ইহা ব্যতীত কোন কোন পেশী নীচের চোয়ালকে টানিয়া নামায়। মস্তক অনড় রাখিলে স্টারনোক্লিডোম্যাস্‌টয়েড্‌ (sternocleido-mastoid) এবং স্কন্ধের অন্যান্য পেশীগুলি বক্ষকে টানিয়া তোলে।

স্কন্ধের কতকগুলি পেশী হায়ড (Hyoid) অস্থির সচলতা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে। এই অস্থিটি উপরে জিহ্বা এবং নিম্নে স্বরযন্ত্রের (Larynx) সহিত যুক্ত। হায়ড অস্থির সহিত সংশ্লিষ্ট পেশীগুলির অপরপ্রান্ত সন্নিহিত রগাস্থি, নীচের চোয়াল বা উরঃফলকের যে-কোন একটির সহিত সংযুক্ত থাকে। এই পেশীগুলির সঙ্কোচনে হায়ড অস্থি সচল হয় এবং গলাধঃকরণ বা বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণের সময় জিহ্বা ও স্বরযন্ত্রের অবস্থানে পরিবর্তন আনে।

প্রান্তীয় পেশী (Muscles of the Extremities) :

দেহপ্রান্ত (হাত-পা), স্কন্ধের ঘের এবং শ্রোণিচক্রের পেশীগুলি হাত ও পায়ের সচলতা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে। ভাঁজ করা ও সোজা করার (Flexors and (Extensors) পেশীগুলি ছাড়াও এমন কতকগুলি পেশী আছে যাহারা অঙ্গকে ঘুরাইয়া থাকে। (যেমন, প্রকোষ্ঠকে এমনভাবে ঘুরান যাইতে পারে যাহাতে হাতের তালু সম্মুখে অথবা পিছনে ফিরান যায়)। অন্যান্য পেশীগুলি দেহপ্রান্তকে সচল করে (যেমন, হাত অথবা পা সম্মুখে অথবা পিছনে লইয়া যাওয়া)। একদিকে দেহপ্রান্ত এবং অন্যদিকে দেহকাণ্ডের সহিত সংযুক্ত পৃষ্ঠের প্রকাণ্ড পেশী, বক্ষের পেকটোরাল (Pectoral) প্রভৃতি অনেকগুলি পেশী হাত ও পায়ের সচলতা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে।

অনুশীলনী ঃ

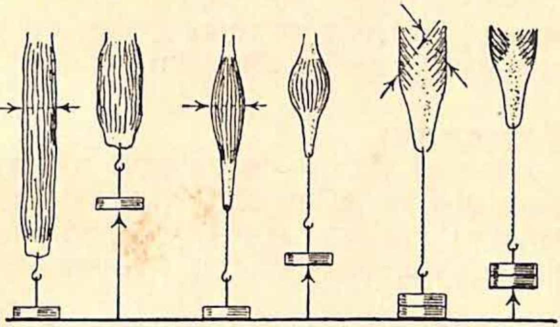
চিত্র দেখিয়া নিজ বাহুর উপরের অংশে বাইসেপ্‌স্‌ ও ট্রাইসেপ্‌স্‌ পেশীর অবস্থান নির্ণয় কর। কনুইতে বাহু ভাঁজ করিয়া এবং পরে সোজা করিয়া কোন পেশীটি প্রসারিত এবং কোনটি আল্‌গা অবস্থায় আছে তাহা স্থির কর (অঙ্গ সঞ্চালনের সময় জোর দিবে না)।

পরস্পর বিরোধী পেশীগুলির অন্যান্য ক্রিয়া কলাপের উদাহরণ দাও।

১৬। পেশীর কাজ

পেশীর শক্তি এবং সঙ্কোচনের পরিমাপের গুরুত্ব ঃ

পেশীর ক্রিয়া নির্ভর করে তাহার শক্তি এবং সঙ্কোচনের পরিমাপের উপর। পেশীটি যত পুরু হইবে, এবং তাহার গঠনকারী তন্তুর সংখ্যা যত বেশী হইবে, তত বেশী পরিমাণে কাজ করিতে পারিবে। পেশীর সঙ্কোচনের অর্থাৎ ছোট হইতে পারার পরিমাপ নির্ভর করে তন্তুগুলির দৈর্ঘ্যের উপর। তন্তুগুলি যত দীর্ঘ ততই ছোট হইতে পারিবে।



৪০নং চিত্র—পেশীর গঠনের উপর ইহার দৈর্ঘ্য ও সঙ্কোচনের নির্ভরশীলতা।
1. দীর্ঘ সমান্তরাল তন্তুযুক্ত পেশী; 2. হ্রস্ব সমান্তরাল তন্তুযুক্ত পেশী; 3. তির্যক তন্তুযুক্ত পেশী (অন্যান্য পেশীর তুলনায় ইহাদের তন্তুসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ)

গ্যাসট্রক্নমিক্ প্রভৃতি কতকগুলি পেশীতন্তু লম্বালম্বির পরিবর্তে পাখীর পালকের ফলকের মত তির্যক ভঙ্গীতে বিন্যস্ত থাকে। সম ঘনত্ব বিশিষ্ট এই ধরনের পেশীতে লম্বালম্বি বিন্যস্ত পেশী অপেক্ষা অধিক সংখ্যক তন্তু থাকে; ফলে ইহাদের শক্তিও শেষোক্ত পেশী অপেক্ষা দুই তিন গুণ বেশী। কিন্তু তন্তুর তির্যক বিন্যাসের জন্য ইহাদের সঙ্কোচনের পরিমাপ খুবই কম; ইহারা খুব কম ছোট হয়। (৪০ নং চিত্র)।

পেশীর কার্যে স্নায়ু-নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা ঃ

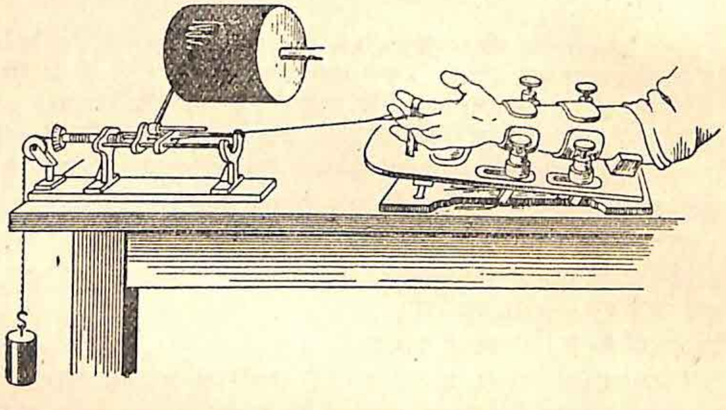
স্নায়ুতন্ত্র হইতে আগত তাড়না প্রবাহই পেশী-সঙ্কোচনের কারণ। পেশীর কর্মতৎপরতাও অর্থাৎ শিথিল থাকাকালে ইহার প্রসারিত অবস্থাও স্নায়ুতন্ত্রের উপর নির্ভর করে। এই কর্মতৎপরতা এবং কার্যকলাপ দুই-ই পেশীমধ্যে যে মেটাবলিজ্ম বা পরিপাক ক্রিয়া চলে তাহার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। অন্যরূপভাবে পরিপাক ক্রিয়া আবার স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, এই নিয়ন্ত্রণও সংঘটিত হয় পেশীতে রক্ত সরবরাহ ব্যবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ রক্তপ্রণালীসমূহের সঙ্কোচন ও প্রসারণ মারফৎ। সুতরাং পেশীগুলি তিন প্রকার স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণের অধীন।

মনুষ্যদেহে পেশীর কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে উচ্চস্তরের স্নায়ু তন্ত্র অর্থাৎ মস্তিষ্কের কর্টেক্স্ দ্বারা পরিচালিত। কর্টেকসের মোটর (Motor) বা পরিচালক অংশে আঘাত লাগিলে চলৎশক্তি অবশ হইয়া যায়। মস্তিষ্কের একদিক আহত হইলেও চলৎশক্তির অবসান ঘটে কিন্তু সে অবস্থায় দেহের একদিক অর্থাৎ বিপরীত দিক অবশ হইবে।

কর্টেক্‌স্‌ মারফৎ জৈবতন্ত্রে এবং তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যে সব পরিবর্তন ঘটে, তাহাতে পেশীর কর্মক্ষমতা প্রভাবিত হইতে পারে। কোন লোক ক্লান্ত বা মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইলে অথবা মেজাজ খারাপ হইলে তাহার সচলতা কমিয়া আসে, বিভিন্ন ধরণের সচলতার মধ্যে সমন্বয় থাকে না এবং পেশীর কর্মতৎপরতাও কমিয়া যায়; দেহ ঝুলিয়া পড়ে, কাঁধ গোল হইয়া আসে—মুখের ভাবপ্রকাশকারী পেশীগুলির কর্মতৎপরতা হ্রাস পাওয়ার ফলে মুখের ভাবে অবসাদ ও বিষণ্ণতা লক্ষিত হয়। অপর পক্ষে কোন লোক প্রফুল্ল থাকিলে সে স্বেচ্ছায় এবং সোৎসাহে কাজ করে, তাহার দেহের সঞ্চালন হয় সঠিক, দ্রুত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং পেশীর কর্মতৎপরতাও বাড়িয়া যায়—দেহ কাঠামোটি ঋজু এবং মুখের ভাবও উৎসাহব্যঞ্জক হইয়া উঠে।

পেশীর কার্যে ছন্দের গুরুত্ব ঃ

হাঁটা বা দৌড়ানর মত দেহের যে সঞ্চালনে কার্যের সৃষ্টি হয় (যেমন কাঠ-কাটা, করাত টানা, লেখা ইত্যাদি), তাহাতে বিভিন্ন পেশী সমষ্টি পর্যায়ক্রমে সংকুচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া পৃথক পৃথক পেশীও নিয়মিত পর্যায়ে একবার সংকুচিত ও আর একবার শিথিল হয়। দেহ সঞ্চালনের এই ছন্দ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।





৪১নং চিত্র—উপরে—পেশীর কার্যকলাপ নির্দ্ধারণের যন্ত্র
নিম্নে—কিমোগ্রাফে অংগুলি সঞ্চালনের রেখাচিত্র
1. সঞ্চালনের সর্বাধিক দ্রুততা; 2. ও 3. অপেক্ষাকৃত কম দ্রুততা (২—প্রারম্ভে; ৩—দশ মিনিট পরে)

পেশী যখন কাজ করে, সেই অবস্থায় পেশীতন্তুর উপাদান সৃষ্টিকারী কয়েকটি পদার্থের ক্ষয় শুরু হয়। পৃথক পৃথক সঙ্কোচনের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পেশীটি বিশ্রাম পায়; এবং এই ভাবে সঙ্কোচনের পূর্বাবস্থায় দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া পেশীর কর্মক্ষমতা পুনরায় সম্পূর্ণতা লাভ করে।

কিন্তু কোন পেশী বা পেশীসমষ্টি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করিতে থাকিলে শীঘ্রই অবসাদ আসিবে। বাহু উঁচু করিয়া ও বাড়াইয়া সামান্য ওজনও হাতে ধরিয়া রাখা কি কষ্টকর তাহা সকলেই জানে। বাহুর পেশীগুলি শীঘ্রই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে বাহু ঝুলিয়া পড়িবে। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া সঙ্কুচিত হইলে পেশীর কর্মক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়।

বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে পেশীর অবসাদ এবং কর্মক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তি অনুধাবন করা যায়। ৪১ নং চিত্রে এই ধরণের চিত্র দেখান হইয়াছে। ইহা দ্বারা যে সমস্ত পেশী হাতের অঙ্গুলিকে বাঁকায় তাহাদের কাজ ও অবসাদ অনুশীলন করা যাইবে। অঙ্গুলি বাঁকাইলেই পেশীগুলি কাজ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কপিকলে ঝোলান ওজনগুলি উত্তোলিত হইবে। যন্ত্রের সহিত অচলভাবে সংযুক্ত একটি পেন্সিল কাগজের উপর পেশী সংকোচনের বক্রলেখ আঁকিয়া দেয়। অনেক সময় এইভাবে লেখ অঙ্কনের জন্য পেন্সিলের বদলে সূচল মুখ বিশিষ্ট বিশেষ ধরনের কলম ব্যবহৃত হয় যাহা একটি চলমান চোঙের কালো রঙ-করা গাত্রে অথবা কিমোগ্রাফে দাগ কাটে। উপরিউক্ত চিত্রে এইভাবে দাগ ফেলা দেখান হইয়াছে।

ঐ চিত্র হইতে দেখা যাইবে যে অঙ্গুলিটি দ্রুত সঞ্চালিত হইলে শীঘ্রই অবসাদ আসিবে, সঙ্কোচনের তীব্রতা ক্রমশ কমিয়া আসিবে এবং কিছুক্ষণ পরে ভারটি আর উঠিবে না। অপরপক্ষে সঞ্চালনের গতি কম হইলে প্রতিটি সঙ্কোচনের পর পেশী বিশ্রামের অবকাশ পায় এবং ফলে এমন কি ১০ মিনিট কাজ করার পরও ক্লান্তির লক্ষণ দেখা যায় না।

ভারের গুরুত্ব ঃ

শুধু গতির তীব্রতা নয় কাজের ব্যাপারে সঞ্চালন ক্ষমতার গুরুত্বও প্রচুর। ৪২ নং চিত্রে এমন একটি পেশীর কাজের ফলাফল দেখা যাইবে যাহার সঞ্চালনের



ওজন ('গ্রাম' হিসাবে)	0	100	200	300	400	500
উত্তোলনের উচ্চতা	6	7	5	3	$1\frac{1}{2}$	0
ক্রিয়াকলাপের পরিমাণ	0	700	1000	900	600	0

৪২নং চিত্র—ভারের পরিমাপের উপর পেশীর ক্রিয়াকলাপের নির্ভরশীলতা

গতি অপরিবর্তনীয় রাখিয়া ভারের পরিমাপকে পরিবর্তন করা হইয়াছে (†)

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে কাজের পরিমাপ ভাগের পরিমাপের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। ভার বাড়াইয়া দিলে কাজের পরিমাপ ক্রমশঃ বাড়িয়া সর্বোচ্চ সীমায় পেঁছায় এবং তাহার পর কমিতে শুরু করে; শেষ পর্যন্ত ভারের ওজন এত বাড়িয়া যাইতে পারে যে পেশীটি আর টানিতে পারে না এবং কাজের পরিমাপ শূন্যে আসিয়া পেঁছায়।

বিভিন্ন কাজ করার সময় কাজের শক্তি ও গতিকে আমরা ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতে পারি। কিন্তু তাহাতে কাজের পরিমাপেরও পরিবর্তন হইবে। অত্যধিক ভার বা গতি কর্মরত পেশীকে দ্রুত ক্লান্ত করিয়া কাজের পরিমাণও কমাইয়া দিবে। প্রত্যেকটি শারীরিক শ্রমের পরিমাপ ও গতি এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যাহাতে ন্যূনতম ক্লান্তি আনিয়া সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করা যায়।

অনেক শক্তিমান ও স্বাস্থ্যবান লোকের পক্ষে ঘণ্টায় ৫ বা ৫½ কিলোমিটার হারে হাঁটা সর্বাপেক্ষা সংগত, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা কম ক্লান্তিতে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ কাজ করা সম্ভব। ভার সহ চলা কিংবা পাহাড়ে উঠিবার সময় সুষম বা শ্রেষ্ঠ গতিবেগ বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়।

মহান রুশ বৈজ্ঞানিক সেচনেভ্ পেশীর কাজ মাপিবার একটি যন্ত্রের সাহায্যে অংগুলিকে ক্লান্ত না হইয়াও মিনিটে ২০ বার বাঁকাইতে যে পরিমাণ ভার প্রয়োজন হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করেন। পরীক্ষায় দেখা যায় যে অংগুলিটি অবিরত ৪ ঘণ্টা যাবৎ ঐ পরিমাণ ভার উঠাইতে পারিল। কিন্তু অধিকতর ভার বা দ্রুততর কাজের ফলে শীঘ্রই ক্লান্তি আসিয়া পড়িল।

জীবদেহের উপর পেশীর কাজের প্রভাব ঃ

যে পেশী যথেষ্ট পরিমাণ কাজ করে তাহা আকারে বড় হয় এবং অধিকতর পুরু ও শক্তিশালী হয়।

পেশীগুলি যত বেশী কাজ করে তত বেশী পরিমাণে অক্সিজেন ও পুষ্টির প্রয়োজন। অর্থাৎ কাজের দ্বারা পেশীগুলি যে শুধু নিজেদেরকে শক্তিশালী করে তাহা নয়, সংগে সংগে শ্বাস ও রক্তসংবহন যন্ত্রগুলির কাজও বাড়াইয়া দেয় এবং এইভাবে বক্ষ ও হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলিকেও ব্যায়াম করাইয়া থাকে। তাহা ছাড়া পেশীগুলির উদ্যমপূর্ণ কার্যকলাপ ক্ষুধা বাড়াইয়া দেয়, দেহে সতেজ অনুভূতি জাগে এবং মেজাজ ভাল হয়। এইভাবে সমগ্র জীবদেহের জৈবিক কার্যকলাপ বাড়িয়া যায়।

ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে শারীরিক শ্রম, খেলাধুলা, দৌড় ঝাঁপ, ব্যায়াম, পদ-পর্যটন ইত্যাদি অস্থি-পেশী-তন্ত্রকে, তথা সমগ্র মানব দেহকে শক্তিশালী করিতে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বাল্যবয়সে আই পি. পাভ্লভ দুর্বল ও রুগ্ন ছিলেন; নিয়মিত ব্যায়াম ও

† এই হিসাবে প্রতিটি ভার উত্তোলনের উচ্চতা মাপিতে হইবে। সমস্ত উচ্চতাগুলি যোগ করিলে অংগুলির সমস্ত সঞ্চালনের ফলে ভারোত্তোলনের সামগ্রিক উচ্চতা পাওয়া যাইবে। গ্রামের হিসাবে ভারগুলির সহিত মিলিমিটার হিসাবে উচ্চতা গুণ করিয়া পেশীর সমগ্র কাজের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। সেই পরিমাণ গ্রাম-মিলিমিটারে প্রকাশ করা হইয়াছে।

শারীরিক শ্রমের দ্বারাই তিনি স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করেন। ১৯৩৬ সালে ডনেজ্ বেসিনের খনি শ্রমিকদের সম্মেলনে সম্ভাষণ জানাইয়া পাভলভ লিখিয়াছিলেন "সারা জীবনে মানসিক ও শারীরিক শ্রম আমি ভালবাসিয়াছি—এখনও ভালবাসি; এবং শেষেরটিই আমার বেশী পছন্দ।"

অনুশীলনী ঃ

একটি ভারী পদার্থ লইয়া বাহু বাড়াইয়া ইহা কতক্ষণ ধরিয়া থাকিতে পার দেখ। কিছুক্ষণ বিশ্রাম লও, এবং তাহার পর ঐ একই পদার্থটি হাতে লইয়া বাহুকে ছন্দক্রমে কতক্ষণ উঠাইতে ও নামাইতে পার দেখ।

প্রশ্ন ঃ

১। অস্থির উপাদান কি এবং কিসের উপর ইহা নির্ভরশীল?
২। অস্থির দৈর্ঘ্য কি ভাবে বৃদ্ধি পায়?
৩। অচল ও বিভিন্ন ধরনের সচল অস্থি সংযোজনের কয়েকটি উদাহরণ দাও।
৪। সন্ধিচ্যুতি ও অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক পরিচর্যার মূল নীতিগুলি বর্ণনা কর।
৫। নরকঙ্কালের গঠনে বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর এবং মানুষের ঋজু হইয়া দাঁড়ানর সহিত এই বৈশিষ্ট্যগুলির কি সম্পর্ক তাহা ব্যক্ত কর।
৬। মসৃণ ও ডোরাকাটা পেশীর গঠন ও উপাদানে পার্থক্য কি কি?
৭। পেশীর কর্মতৎপরতা (tone) কাহাকে বলে, কি ভাবে ইহা বজায় থাকে?
৮। কাজ করিতে ছন্দের গুরুত্ব কি?
৯। পেশীর কার্যের পরিবর্তন ভারের পরিমাণ পরিবর্তনের উপর কি ভাবে নির্ভরশীল তাহা প্রমাণ কর।
১০। পেশীর কার্যকলাপ জীবদেহকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে?

রক্ত সংবহন যন্ত্র

১৭। রক্ত সংবহনের গুরুত্ব

কলা রস (Tissue fluid) :

কলা রস বা কলা লসিকা দৈহিক ওজনের প্রায় অর্ধেক গঠন করে এবং কোষ সমূহের অন্তর্বর্তী স্থান পূরণ করিয়া রাখে। এই রস কোষ সমূহের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং ইহা জীবদেহের আভ্যন্তরীণ মাধ্যম।

কোষ এবং কলার অস্তিত্বের জন্য কলারসের প্রয়োজন আছে। কোষ ও কলা এই রস হইতে অবিরত অক্সিজেন ও পুষ্টিপদার্থ অবশোষণ করে এবং কার্বনিক এ্যাসিড্ ও পরিপাকের অন্যান্য ত্যাজ্য পদার্থ নিঃসৃত করে।

কলা-রসে কোষের প্রয়োজনীয় ঐ সকল পদার্থের অপ্রাচুর্য ঘটিলে অথবা ত্যাজ্যদ্রব্যের আধিক্য ঘটিলে কোষের স্বাভাবিক কাজ কর্ম ব্যাহত হয়। পরিপাক ক্রিয়া এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জৈবিক কার্যকলাপ স্বাভাবিকভাবে চলিতে হইলে কলারসের উপাদান অপরিবর্তনীয় রাখিতে হইবে। অর্থাৎ কলা-রসে কোষের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি অবিরাম জোগান দিতে হইবে এবং পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলি নিঃসৃত করিতে হইবে।

রক্ত সংবহনের চক্রাবর্তন ঃ

রক্তপ্রণালী সমূহের মধ্য দিয়া রক্তের অবিরাম গতি হইতেই কলারসের উপাদান অপরিবর্তনীয় থাকে।

মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী জীবদেহে রক্তপ্রণালী সমূহ এক বদ্ধ চক্রাবর্তন (closed ciruit) সৃষ্টি করে। রক্তপ্রণালীসমূহের মধ্য দিয়া রক্তের এই চক্রাবর্তনকে বলা হয় রক্ত-সংবহন। মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে সংবহন তন্ত্রের দুইটি আবর্তন পথ আছে—বৃহত্তর বা systemic এবং ক্ষুদ্রতর বা pulmonary (২নং রঙীন চিত্র)।

রক্ত সংবহন তন্ত্রের বৃহত্তর বা দেহতন্ত্রগত চক্র ঃ

বৃহৎ চক্র শুরু হয় মহাধমনী হইতে। ইহা বাম নিলয় (left ventricle) হইতে বাহির হইয়া উপরের দিকে ওঠে, এবং তাহার পর একটি অর্ধচক্র তৈয়ারি করিয়া নিম্নাভিমুখে মেরুদণ্ডের পথে চলিতে থাকে।

বৃহৎ ধমনীগুলি (large arteries) মহাধমনীর অর্ধচক্রাংশ হইতে বাহির হইয়া মস্তকে এবং উপরের দেহপ্রান্তে রক্ত সরবরাহ করে।

মহাধমনীর অর্ধচক্রের নিম্নাংশ হইতে যে সকল শাখা প্রশাখা বাহির হয়, তাহারা দেহকাণ্ডের এবং উদর গহ্বরস্থিত যন্ত্রগুলির (abdominal viscera) পেশীতে চলিয়া যায়। কটিদেশীয় কশেরুকাসমূহের নিকটে মহাধমনী বৃহৎ দুইভাগে ভাগ হইয়া নিম্ন-দেহপ্রান্তকে রক্ত সরবরাহ করে।

বৃহৎ ধমনীগুলি বারে বারে শাখা প্রশাখা যুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অসংখ্য প্রণালী সৃষ্টি করে; এবং সমগ্রদেহে রক্ত সরবরাহ করে। ক্ষুদ্রতম ধমনীগুলি তাহাদের শেষপ্রান্তে ঘন সন্নিবিষ্ট অতি সূক্ষ্ম কেশের মত প্রণালী সমূহে ভাগ হইয়া যায়; ইহাদিগকে বলা হয় কৈশিক বা জালক নালী (capillaries) ইহারা এত সূক্ষ্ম যে প্রস্থচ্ছেদে ইহাদের গড়পড়তা আয়তন হয় অনধিক এক বর্গ মিলিমিটারের ৮ লক্ষের এক ভাগ। অর্থাৎ ইহারা মানুষের কেশ হইতেও সূক্ষ্মতর। কৈশিক নালীর দৈর্ঘ্যও অতি নগণ্য—এক মিলিমিটারেরও কম। পরিষ্কার বোঝা যায় যে কৈশিক নালী সমূহের যথাযথ হিসাব নির্ণয় করা অসম্ভব। যাহাই হউক ধরিয়া লওয়া হয় যে মানবদেহে কৈশিক নালীর সংখ্যা প্রায় শত-পরার্ধ (১০ লক্ষ × ১০ লক্ষ × ১০ লক্ষ)।

কৈশিক নালীগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া শিরা গঠন করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাগুলি মিলিত হইয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর শিরা সৃষ্টি করে। দেহের সমস্ত অংশ হইতে আসিয়া রক্ত দুইটি বৃহত্তম শিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়—ইহাদিগকে বলা হয় উচ্চ ও নিম্ন মহাশিরা (superior and inferior vena cava) —এবং তথা হইতে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে (Right ventricle) ফিরিয়া আসে। এইখানেই রক্তসংবহনতন্ত্রের দৈহিক বা বৃহত্তর চক্রের শেষ হয়।

রক্তসংবহন তন্ত্রের ক্ষুদ্র বা ফুস্‌ফুসের চক্র ঃ

দক্ষিণ নিলয় হইতে রক্ত ফুসফুসের ধমনী (pulmonary artery) এবং তাহার শাখা প্রশাখা দিয়া বাহির হইয়া বাম ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসের মধ্যে ক্ষুদ্রাতিতম ধমনীগুলি শাখায়িত হইয়া কৈশিক নালী গঠন করে এবং এগুলি আবার মিলিত ভাবে শিরা সৃষ্টি করে। বৃহত্তর চক্রের মত এ ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাগুলি মিলিত হইয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর শিরা গঠন করে

এবং শেষ পর্যন্ত ফুসফুসের চারিটি শিরা দিয়া রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে সজোরে প্রবেশ করে। দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম অলিন্দ পর্যন্ত রক্তের পরিক্রমাকে বলা হয় রক্ত সংবহন তন্ত্রের ক্ষুদ্র অথবা ফুসফুসের চক্র।

কৈশিক নালীর চুয়াইবার গুরুত্ব :

রক্তপ্রণালী সমূহের অভ্যন্তরস্থ রক্ত যন্ত্রকোষ ও কলা সমূহের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে না। কিন্তু কৈশিক নালীর পাতলা গাত্র দিয়া (চ্যাপ্টা কোষের একটি মাত্র স্তবকে গঠিত) অক্সিজেন ও পুষ্টি পদার্থ রক্ত হইতে বাহির হইয়া কলারসের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং অপর দিকে কোষের মধ্যে নিঃসৃত কার্বনিক এ্যাসিড ও অন্যান্য পরিত্যক্ত পদার্থ রক্তে চলিয়া যায়।

রক্তের সমস্ত উপাদানই কৈশিক নালীর গাত্র দিয়া সহজে যাইতে পারে না কারণ সকল পদার্থ কৈশিক নালী দিয়া সমভাবে চুয়াইতে পারেনা। সেইজন্যই কলারসের উপাদান রক্ত হইতে পৃথক। কলারসে প্রোটিন নাই, অথচ রক্তে ৭ ভাগ প্রোটিন থাকে।

ধমনীর ও শিরার রক্ত :

রক্ত সংবহন তন্ত্রের দৈহিক চক্রের ধমনী দিয়া প্রবাহিত রক্ত অক্সিজেনে সংপৃক্ত (saturated) থাকে। ইহাকে বলা হয় ধমনীর রক্ত (arterial blood)। কৈশিক নালীতে রক্ত প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন হারায় এবং কার্বনিক এ্যাসিডে পুষ্ট হয়। খুব কম অক্সিজেন ও প্রচুর কার্বনিক এ্যাসিড যুক্ত রক্তকে শিরার রক্ত বলা হয়। শিরার রক্ত দৈহিক-চক্রের শিরাপথে প্রবাহিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভাগে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে ইহা ফুসফুস চক্রের ধমনীগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

ফুসফুস রক্তের ধমনীগুলিতে শিরার রক্ত (venous blood) প্রবাহিত হয়। ফুসফুসের কৈশিক নালীতে অবস্থিত শিরার রক্ত অতিরিক্ত কার্বনিক এ্যাসিড্ পরিত্যাগ করিয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে। ধমনীর রক্ত (arterial blood) ফুসফুস্ চক্রের শিরোপথে প্রবাহিত হইয়া হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে।

পরিপাক ক্রিয়ায় রক্ত সংবহনের ভূমিকা :

রক্ত সংবহনের বিরাট ভূমিকা এখন বোঝা যাইতেছে। কলারসের উপাদানে অপরিবর্তনীয়তা রক্তের অবিরাম গতির জন্যই বজায় থাকে। রক্ত কলারসে অক্সিজেন ও পুষ্টি পদার্থ লইয়া যায় এবং কার্বনিক এ্যাসিডে ও পরিপাকের অন্যান্য পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি দূর করে।

পরিপাক ক্রিয়ার পরিত্যক্ত যে সমস্ত পদার্থ রক্তে জমা হয়, সেগুলি অবিরাম বহিস্থ মাধ্যমে নিক্ষিপ্ত হয়; কার্বনিক এ্যাসিড্ ফুসফুস দিয়া নিঃসৃত হয় এবং অধিকাংশ অন্যান্য পদার্থ নিঃসৃত হয় বৃক্ক দিয়া। বাহিরের পরিবেশ হইতে নূতন নূতন পুষ্টি-পদার্থ ও অক্সিজেন অবিরাম রক্তমধ্যে প্রবেশ করে; অন্ত্র হইতে প্রবেশ করে পুষ্টি-পদার্থ এবং ফুসফুস দিয়া প্রবেশ করে অক্সিজেন।

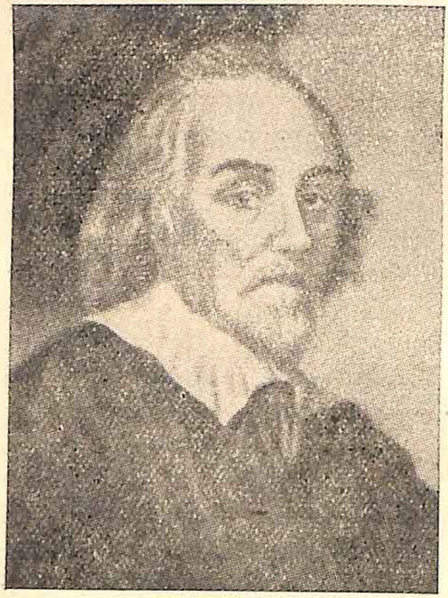
রক্ত-সংবহন ও জীবানুর মধ্যে ঐক্য :

রক্ত-সংবহন তন্ত্রের গুরুত্ব শুধু জীবানুর কলা ও বাহিরের পরিবেশের মধ্যে পদার্থ-বিনিময়ের কাজেই সীমাবদ্ধ নয়। রক্ত-সংবহনের দ্বারা বিভিন্ন দেহযন্ত্রের

মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াও ঘটিয়া থাকে। বিভিন্ন দেহ গঠন ও কার্যকলাপে পার্থক্য থাকায় তাহাদের পরিপাকপ্রসূত পদার্থগুলিও ভিন্ন। প্রত্যেকটি দেহ-যন্ত্র রক্তে যে সমস্ত পদার্থ পরিত্যাগ করে সেগুলি অন্যান্য দেহযন্ত্রের কার্য-কলাপকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। পেশীগুলির কার্যরত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি পদার্থের সৃষ্টি হয় যেগুলি রক্তে প্রবেশ করিয়া বহু দেহযন্ত্রকে প্রভাবিত করে। এইগুলি বিশেষ করিয়া জারক-রসের ক্ষরণ তীব্রতর করিয়া ক্ষুধা বাড়াইয়া দেয়। অপরপক্ষে রক্তে এই পদার্থগুলি অতিরিক্ত জমা হইলে ক্ষরণ ব্যাহত হয় এবং ক্ষুধামান্দ্য হয়। পৌষ্টিক নালীর (intestinal canal) গাত্র হইতে ক্ষরিত অন্যান্য কয়েকটি পদার্থ রক্তের সাহায্যে বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও পেশীর উপর কাজ করে। পদার্থের এই বিনিময়, বিভিন্ন দেহযন্ত্রের মধ্যে এই রাসায়নিক সম্পর্ক জীবানুর সামগ্রিক ঐক্য সাধনে ও অবিরাম কার্যকলাপে সহায্য করে।

রক্ত-সংবহন আবিষ্কারের ইতিহাস হইতেঃ

রক্ত-সংবহন আবিষ্কার হইতেই বিজ্ঞানসম্মত ও পরীক্ষামূলক শারীর-বৃত্তের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-চিকিৎসক হার্ভে প্রকাশিত এক-খানি পুস্তকে সর্বপ্রথম রক্তের চক্রাবর্তনশীল গতি বর্ণিত হয়। পুস্তকের ভূমিকায় হার্ভে বিজ্ঞানীদের আহবান জানান "শিখিতে ও শিখাইতে হইবে বই হইতে নয়, অনুশীলনের বস্তু হইতে—শিক্ষার একদশীতা হইতে নয়, প্রকৃতির কারখানায়।" হার্ভের সমসাময়িক কালে ধর্মতত্ববিদ হইতে বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত স্বীকার করিতেন যে "হৃৎপিণ্ডের গতি একমাত্র ঈশ্বর-জ্ঞাত।" পরীক্ষার ভিত্তিতে হার্ভে প্রমাণ করেন যে হৃৎপিণ্ড রক্তকে নিষ্কাশিত করিয়া চক্রাবর্তনে চালিত হইতে বাধ্য করে। এইভাবে তৎকালীন প্রচলিত আত্মার অবিনশ্বরতা এবং হৃৎপিণ্ডই তাহার জীবন্ত শিখা—এই অস্পষ্ট তত্ত্বের উপর আঘাত আসিল। হার্ভের আবিষ্কার মানব-জীবানুর অনুশীলনে এক প্রকৃত বিপ্লব সৃষ্টি করে।



উইলিয়াম হার্ভে

রক্ত-সংবহন সম্পর্কে হার্ভের তত্ত্ব তর্কের প্রচণ্ড ঝড় উঠাইল। প্রাচীনের 'অভ্রান্ত' অধিকার এবং 'স্বগীয় জ্ঞানের' অস্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্য ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীলরা

হার্ভেকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী লেখক মলিয়ের (Moliere) তাঁহার "কল্পিত অশক্ত" (The imaginary invalid) পুস্তকে এবং "মঁসিয়ে দ্য পুরসুনক" (Monsieur de Pourceaugnac) নাটকে, পারসীক শারীর-সংস্থানবিদ রায়োলান (Riolan) ও অন্যান্য হার্ভে-বিরোধীদের নূতনকে অস্বীকার করার মনোবৃত্তিকে ব্যঙ্গ করেন।

রক্ত-সংবহন তত্ত্ব সম্পর্কে অর্থাৎ নূতন যথার্থ বিজ্ঞানের সমর্থক এবং পুরাতন মতাবলম্বীদের মধ্যে এই বিতর্ক শেষ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, যখন বিজ্ঞানীরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সর্বপ্রথম দেখিতে পাইলেন যে কৈশিক নালীগুলি ধমনী ও শিরাকে যুক্ত করিয়াছে।

অনুশীলনী :

রক্তসংবহন-তন্ত্রের একটি চিত্র অংকণ কর এবং তীরের সাহায্যে রক্তের গতির দিক নির্ণয় কর।

১৮। হৃৎপিণ্ডের গঠন

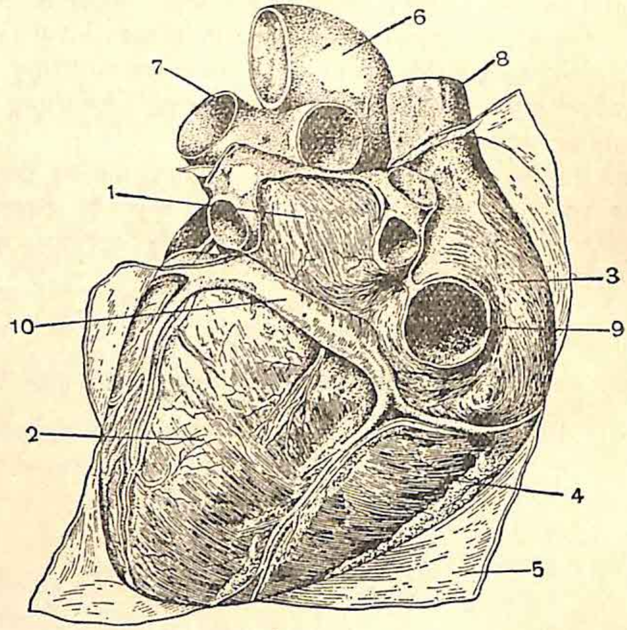
হৃৎপিণ্ডের অবস্থান :

বক্ষগহ্বরের অভ্যন্তরে, দেহকান্ডের মধ্য-রেখার প্রায় উপরে এবং উরঃফলকের পিছনে ও কিছুটা বামে হৃৎপিন্ড অবস্থান করে। ইহার উপরের অংশ, যেখান হইতে রক্তনালীসমূহ বাহির হয়, তাহাকে বলা হয় **মূল** বা Base এবং নিম্নস্থ ক্রমশঃ সরু হইয়া আসা অংশকে বলা হয় **শৃঙ্গ** বা apex (৪৩ নং চিত্র)।

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর গাত্রের অধিকাংশই পেশী দ্বারা গঠিত; ইহার বহিস্থ ও অন্তস্থ গাত্র একটি মসৃণ ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। দৃঢ়সংবদ্ধ ঝিল্লী গঠিত যে থলিটি সমগ্র হৃৎপিণ্ডকে ঘিরিয়া রাখে, তাহাকে বলা হয় **হৃদ্ধরা-কলা** বা Pericardium। হৃৎপিণ্ডের বাহিরের গাত্র ও হৃদ্ধরা-কলার মধ্যে একটি বদ্ধ গহ্বর আছে. উহার গাত্র সব সময়ই আর্দ্র থাকে। ইহা হৃৎপিন্ডকে ঘর্ষণ হইতে রক্ষা করে এবং ইহার ক্রিয়াকলাপকে সহজসাধ্য করিয়া তোলে।

হৃৎপিণ্ডের পেশী :

অন্যান্য আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের ও হৃৎপিণ্ডের পেশীর মধ্যে পার্থক্য এই যে ইহা আড়াআড়িভাবে ডোরাকাটা। হৃৎপিণ্ডের পেশীতন্তুগুলি পরস্পরের সহিত জীবোপাদানের উদ্গত অংশসমূহের দ্বারা যুক্ত থাকে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ দিয়া এক তন্তুর জীবোপাদান সন্নিহিত তন্তুর জীবোপাদানে সরাসরি চলিয়া যাইতে পারে।



৪৩নং চিত্র—হৃৎপিণ্ড (পশ্চাদ্ভাগ)

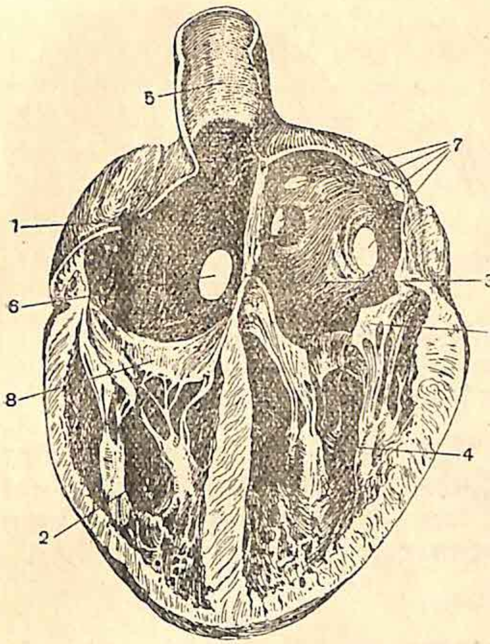
1. বাম অলিন্দ ও তাহার মধ্যে প্রবেশকারী পালমনারি শিরা; 2. বাম নিলয়; 3. দক্ষিণ অলিন্দ; 4. দক্ষিণ নিলয়; 5. পেরিকার্ডিয়াম—কর্তিত প্রান্তগুলি বাহিরের দিকে উল্টান; 6. মহাধমনী; 7. পালমনারি ফুসফুসের ধমনী; 8. উচ্চ মহাশিরা; 9. নিম্ন মহাশিরা; 10. হৃৎপিণ্ডের করনারি রক্ত প্রণালী

পেশীতন্তুকে উত্তেজিত করিলে (যেমন বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা) উত্তেজনার বিন্দুতে সঙ্কোচন সুরু হইয়া দ্রুত সমগ্র তন্তুতে ছড়াইয়া পড়ে। অস্থি-সংশিলষ্ট সঙ্কোচনের তরঙ্গ পেশীতে শুধু উত্তেজিত তন্তু বাহিয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের পেশীতে সঙ্কোচনতরঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ বাহিয়া এক তন্তু হইতে অপর তন্তুতে ছড়াইয়া পড়ে এবং দ্রুতবেগে সমগ্র পেশীতে পরিচালিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের পেশীর যে কোন অংশেই সঙ্কোচন উদ্ভূত হউক না কেন অবিলম্বে ইহা সমগ্র পেশীতে ছড়াইয়া পড়ে।

হৃৎপিণ্ড-পেশীর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা অবিরাম (tetanic) সঙ্কোচন সৃষ্টি করিতে পারে না। যে কোন অস্থি-সংশিলষ্ট পেশী কয়েক সেকেন্ডে এমন কি কয়েক মিনিট পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সংকুচিত অবস্থায় থাকিতে পারে। কিন্তু হৃৎপিণ্ড সব সময়ই প্রতিটি সঙ্কোচনের পর শিথিল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (একটি সঙ্কোচন ১ সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ কাল থাকে)।

ইহাকে নিম্নলিখিত পন্থায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব; কোন পেশীতে উত্তেজনা প্রবাহ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি উত্তেজনা দান করিলে নূতন কোন উত্তেজনা-প্রবাহ উদ্ভূত হয় না, পেশীটি নূতন উত্তেজনায় অবিচল থাকে। অস্থি-



৪৪নং চিত্র—হৃৎপিন্ড (কর্ত্তিত)

1. দক্ষিণ অলিন্দ; 2. দক্ষিণ নিলয়; 3. বাম অলিন্দ; 4. বাম নিলয়; 5. উচ্চ মহাশিরা; 6. নিম্ন মহাশিরার গাত্র; 7. পালমনারি বা ফুসফুসের শিরা-গাত্র; 8. অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী কপাটিকা

সংশ্লিষ্ট পেশীতে সঙ্কোচন শেষ হইবার বহু পূর্বেই নূতন উত্তেজনা-প্রবাহ সৃষ্টির ক্ষমতা ফিরিয়া আসে; সঙ্কোচন থাকে ০.১ সেকেন্ড, আর উত্তেজনা থাকে এক সেকেন্ডের কয়েক সহস্র ভাগ কাল। এই কারণে অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীতে উত্তেজনার তরঙ্গগুলি ঘন ঘন উদ্ভূত হইয়া অবিরাম সঙ্কোচন বজায় রাখিতে পারে।

হৃৎপিন্ডের পেশীতে উত্তেজনার নূতন প্রবাহ সৃষ্টির ক্ষমতা অনেক দেরীতে ফিরিয়া আসে; শুধু শ্লথ হইবার মুহূর্তেই ইহা উত্তেজনায় সংবেদনশীল হয় এবং তখন পুনরায় সঙ্কুচিত হইতে পারে।

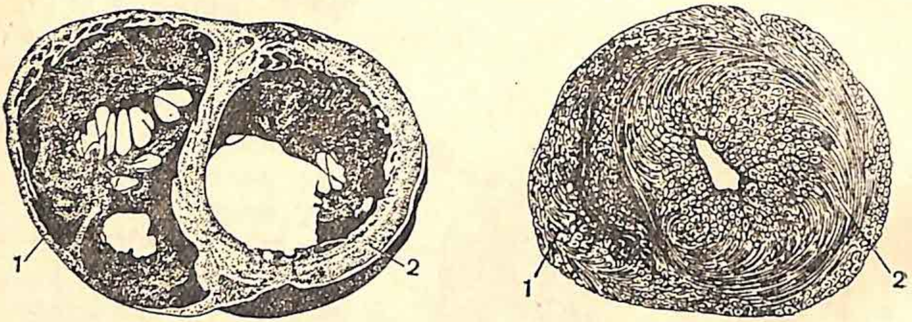
অলিন্দ ও নিলয়ঃ

একটি নিবিড় প্রাচীর হৃৎপিন্ডকে দক্ষিণ ও বাম এই দুই ভাগে বিভক্ত করে (৪৪নং চিত্র)। প্রতি ভাগেই দুইটি পরস্পর সম্পর্কিত কক্ষ আছে—একটি পাতলা গাত্র বিশিষ্ট অলিন্দ (auricle) এবং অপরটি পেশীপুষ্ট নিলয় (ventricle)

দুইটি বৃহৎ শিরা দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে, উচ্চমহাশিরা (superior venacava) দেহের উপরিভাগে এবং নিম্ন মহাশিরা (inferior venacava) দেহের নিম্নাংশ হইতে রক্ত বহন করিয়া আনে। ইহা ছাড়া একটি শিরা হৃৎপিন্ডের নিজস্ব পেশীসমূহ হইতে রক্ত লইয়া দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। প্রতিটি ফুসফুস হইতে দুইটি করিয়া চারিটি ফুসফুসের শিরা (pulmonary veins) বাম অলিন্দে প্রবিষ্ট হয়।

হৃৎপিন্ডের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে নিলয় দুইটি। দক্ষিণ নিলয় হইতে বাহির হয় ফুসফুসের ধমনী (pulmonary artery) এবং বাম নিলয় হইতে উদ্গত হয় দেহের প্রধান ধমনী বা মহাধমনী (aorta)।

অলিন্দ ও নিলয়ের দেহ-গাত্রের ঘনত্বের পার্থক্য তাহাদের কার্যের পার্থক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। অলিন্দের পেশীগুলি রক্তকে নিলয় মধ্যে ঠেলিয়া দেয়, আর নিলয়ের সঙ্কুচিত পেশীগুলি রক্তকে দীর্ঘ এবং শাখা-প্রশাখাযুক্ত রক্তপ্রণালী-সমূহের মধ্য দিয়া নিষ্কাশিত করে।



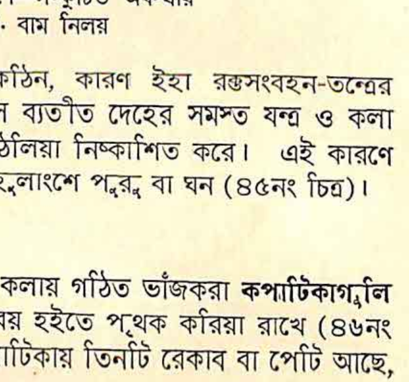
৪৫নং চিত্র—হৃৎপিণ্ডের নিলয়ের প্রস্থ-ছেদ
বামে—শিথিল অবস্থা; দক্ষিণে—সঙ্কুচিত অবস্থায়
1. দক্ষিণ নিলয়; 2. বাম নিলয়

বাম নিলয়ের কাজই বিশেষ করিয়া কঠিন, কারণ ইহা রক্তসংবহন-তন্ত্রের দৈহিক চক্রের মারফৎ, অর্থাৎ শুধু ফুসফুস ব্যতীত দেহের সমস্ত যন্ত্র ও কলা মধ্যস্থিত কৈশিক নালীর মধ্য দিয়া রক্তকে ঠেলিয়া নিষ্কাশিত করে। এই কারণে বাম নিলয়ের পেশী দক্ষিণ নিলয় অপেক্ষা বহুলাংশে পুরু বা ঘন (৪৫নং চিত্র)।

হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাঃ

রেকাবের আকার বিশিষ্ট ঘন সংযোজক কলায় গঠিত ভাঁজকরা **কপাটিকাগুলি** (folding valves) অলিন্দ দুইটিকে নিলয়দ্বয় হইতে পৃথক করিয়া রাখে (৪৬নং চিত্র)। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভাগের কপাটিকায় তিনটি রেকাব বা পেটি আছে, এবং বাম ভাগে আছে দুইটি। পেটিগুলি বন্ধ হইলে কপাটিকাটি অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী পথকে সুদৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া দেয়। কতকগুলি কন্ডোরা-গঠিত সূত্র নিলয়ের ভিতরের গাত্রে অবস্থিত পেশীগঠিত উদ্গত অংশের তলদেশ হইতে কপাটিকার পেটিগুলি পর্যন্ত প্রসারিত থাকে।

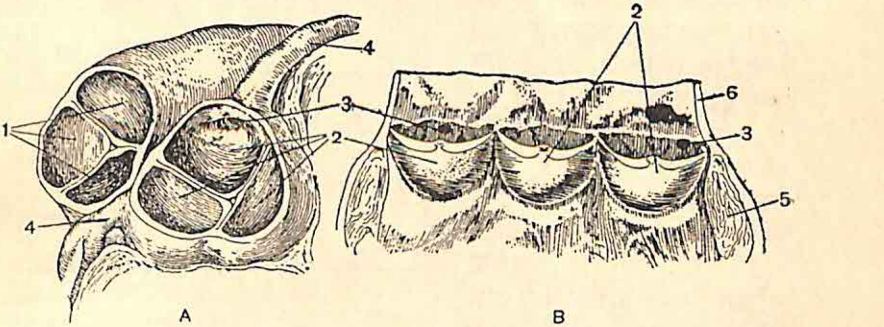
ভাঁজকরা কপাটিকা শুধু একদিকেই অর্থাৎ নিলয়ের দিকেই খুলিতে পারে। নিলয়গুলি শিথিল হইলে কপাটিকা খুলিয়া যায় এবং অলিন্দ হইতে রক্ত অবাধে নিলয় মধ্যে প্রবেশ করে। নিলয়গুলি সঙ্কুচিত হইলে সেই রক্ত কিন্তু অলিন্দ মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে না। কারণ রক্তের চাপে কপাটিকার পেটিগুলি বন্ধ হইয়া যায় এবং সুদৃঢ়ভাবে প্রসারিত কন্ডোরা সূত্রগুলি পেটিগুলিকে অলিন্দের দিকে উল্টাইয়া যাইতে দেয় না।



৪৬নং চিত্র—অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী ভাঁজ করা কপাটিকা

1. দক্ষিণ অলিন্দ; 2. বাম অলিন্দ; 3. দক্ষিণ নিলয়; 4. বাম নিলয়; 5. কপাটিকা সমূহ; 6. কণ্ডরা গঠিত তন্তু—ইহারা কপাটিকাগুলিকে অলিন্দের দিকে পুনরায় উল্টাইয়া যাইতে বাধা দেয়; 7. উচ্চ ও নিম্ন মহাশিরা

নিলয় হইতে রক্ত ধমনীসমূহের মধ্যে প্রবাহিত হয়। মহাধমনী ও ফুসফুসের ধমনী হৃৎপিণ্ড হইতে উদ্গত হওয়ার মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলির ন্যায় যে সব **অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা** (Semi-lunar valves) অবস্থান করে, তাহারা রক্তকে বিপরীত দিকে চালিত হইতে দেয় না (৪৭নং চিত্র)। নিলয় হইতে ধমনীতে রক্ত যাইবার সময়ে এই কপাটিকার থলিগুলি ধমনীগাত্রে চাপিয়া গিয়া রক্তকে অবাধে প্রবাহিত হইতে দেয়। কিন্তু বিপরীত দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় কপাটিকার থলিগুলি রক্তে পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া ওঠে এবং এইভাবে ধমনীছিদ্রকে সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া ধমনীর রক্তকে নিলয়ে ফিরিয়া যাইতে বাধা দেয়।



৪৭নং চিত্র—অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি কপাটিকা A—উপরের দৃশ্য; B—পার্শ্ব-দৃশ্য (প্রস্থচ্ছেদ)

1. দক্ষিণ নিলয় ও পাল্‌মনারি বা ফুসফুসের ধমনীর মধ্যস্থিত কপাটিকা; 2. বাম নিলয় ও মহাধমনীর মধ্যস্থিত কপাটিকা; 3. করনারি বা হৃৎপিণ্ডের ধমনীর মুখ; 4. হৃৎপিণ্ডের পেশীতে রক্ত সরবরাহকারী করনারি ধমনী সমূহ; 5. নিলয়-গাত্র; 6. মহাধমনী গাত্র

অনুশীলনী :

হৃৎপিণ্ডের গঠনের একটি চিত্র অঙ্কণ কর এবং তীরের সাহায্যে রক্তের গতিপথ দেখাও।

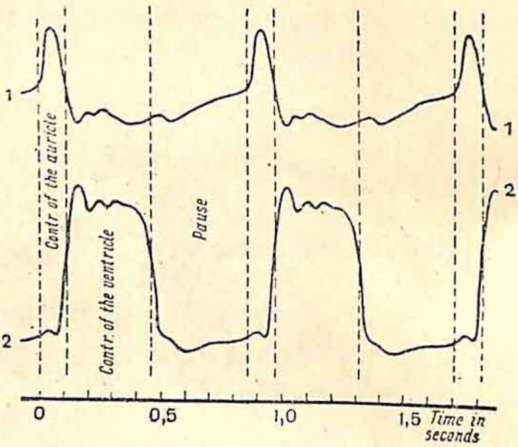
১৯। হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ।

হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের ছন্দ :

হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ অনুধাবন করার জন্য সাধারণত পশুদেহের উপরেই পরীক্ষা চালান হইয়া থাকে। চেতনা লোপ এবং কৃত্রিম শ্বাস প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা

করার পর বক্ষগহ্বর কাটিয়া হৃৎপিণ্ডকে উন্মুক্ত করা হয়; ইহার পর যন্ত্রের একটি ক্ষুদ্র ভারোত্তলক (lever) অলিন্দের সহিত ও অপরটি নিলয়ের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে কিমোগ্রাফে দুই প্রকার তরঙ্গ-রেখার দাগ পড়িবে; একটি অলিন্দের ও অপরটি নিলয়ের সঙ্কোচন ব্যাখ্যা করিবে (৪৮নং চিত্র)।

হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিলে প্রথমেই দেখা যাইবে ইহার পর্যায়-ক্রমিক (ছন্দোবদ্ধ) সঙ্কোচন। প্রত্যেকটি নূতন সঙ্কোচন পূর্ববর্তী সঙ্কোচনের পর একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে তবেই আসিবে। কঠিন পরিশ্রম না করিলে একজন প্রাপ্ত বয়স্কের হৃৎপিণ্ড এক মিনিটে ৬০ হইতে ৮০ বার সঙ্কুচিত হয়। শিশুদের, বিশেষত ছোট্ট শিশুদের হৃৎপিণ্ড আরও দ্রুত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

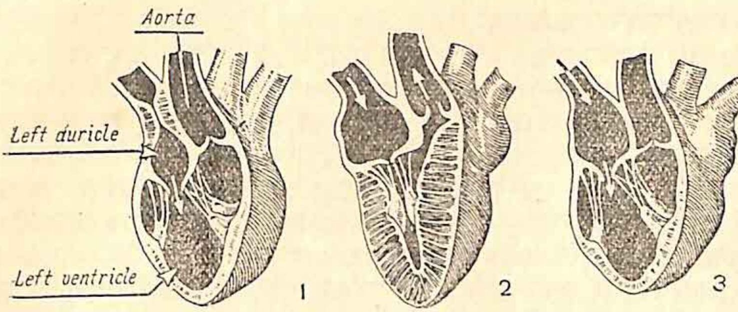


৪৮নং চিত্র—অলিন্দের সঙ্কোচনের হিসাব
1. অলিন্দ ও 2. নিলয়ের পৃথক পৃথক সঙ্কোচন
নিম্নে—সময়ের মাপ (১/১০ সেকেন্ড অনুসারে)

সঙ্কোচন সুরু হয় দক্ষিণ অলিন্দে উচ্চ এবং নিম্ন মহা-শিরা যেখানে প্রবেশ করে, সেই স্থান হইতে। সেই সঙ্কোচন দ্রুত সমগ্র অলিন্দে ছড়াইয়া পড়িয়া নিলয়ে চলিয়া যায় এবং দুইটি নিলয় একই সাথে সঙ্কুচিত হয় (৪৯নং চিত্র)। অলিন্দের সঙ্কোচন ০.১ সেকেন্ডের সামান্য কিছু বেশী সময় অবস্থান করে এবং এই সময় নিলয় দুইটি শিথিল অবস্থায় থাকে। অলিন্দের সঙ্কোচনের পরই নিলয় দুইটির সঙ্কোচন সুরু হয়, এবং ইহাদের এক একটি সঙ্কোচন থাকে ০.৩—০.৪ সেকেন্ড। নিলয়দ্বয়ের সঙ্কোচনের সময় অলিন্দ দুইটি শিথিল থাকে। নিলয়ের সঙ্কোচনের পর সমগ্র হৃৎপিণ্ডটি শিথিল হইয়া যায় এবং শিথিলতার এই মুহূর্তকে বলা হয় **'বিরতি'** (pause)। বিরতির সময় হৃৎপিণ্ড শিরাগত রক্তে পূর্ণ হয়। সঙ্কোচনের পৌণঃ-পৌণিক দ্রুততার উপর বিরতির সময় বহুলাংশে নির্ভর করে। মিনিটে ৬০ হইতে ৮০ বার সঙ্কোচন হইলে প্রায় ০.৪ সেকেন্ডে বিরতি হয়।

হৃৎপিণ্ডের স্বাধীন কার্যকলাপঃ

অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীগুলি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হইতে আগত তাড়না আসিলে তবে সঙ্কুচিত হয়। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে ইহারা নিজেরা সঙ্কুচিত হইতে পারে না। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের পেশী সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কাজ করে—উত্তেজনার তরঙ্গগুলি স্বাধীনভাবেই উদ্ভুত হইতে পারে।



৪৯নং চিত্র—হৃৎ-স্পন্দনের বিভিন্ন পর্যায়
1. অলিন্দের সঙ্কোচনের সূত্রপাত; 2. নিলয়ের সঙ্কোচন; 3. বিরাম

ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক গ্লাস শারীরবৃত্তিক দ্রবে* (physiological solution) ডুবাইয়া রাখিলে ইহা ছন্দোবদ্ধভাবে সংকুচিত হইতে থাকে। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন স্তন্যপায়ী জীবদের হৃৎপিণ্ড স্বাধীনভাবে সংকুচিত হয়। ইহার জন্য রক্তের অনুরূপ বিশেষভাবে প্রস্তুত একটি পুষ্টিপদার্থ পূর্ব হইতে অক্সিজেনে সংযুক্ত করিয়া এবং নির্দিষ্ট তাপে গরম করিয়া হৃৎপিণ্ডপেশীর রক্তপ্রণালীর মধ্যে সূচযোগে প্রয়োগ করিতে হয়।

কখনও কখনও দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন মানুষের হৃৎপিণ্ডকেও সংকুচিত করা সম্ভব। রুশীয় বৈজ্ঞানিক কুলিয়াব্কো মৃত্যুর ২০ ঘণ্টা পরে একটি শিশুর হৃৎপিণ্ডকে পুনরুজ্জীবিত করেন। উচ্চ ও নিম্নমহাশিরা যে বিন্দুতে প্রবেশ করে, স্বাভাবিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের সেই অংশকে সর্বাপেক্ষা সহজে উত্তেজিত করা যায়। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন কেন এই বিন্দু হইতে সুরু হয় ইহা হইতেই তাহার ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

হৃৎপিণ্ড-পেশীর কার্যকলাপ ঃ

হৃৎপিণ্ড প্রচুর কাজ করিয়া থাকে। মানুষের হৃৎপিণ্ড প্রতিবার সঙ্কোচনের দ্বারা ধমনীপ্রবাহের মধ্যে ৬০ হইতে ৮০ কিউবিক সেন্টিমিটার রক্ত উৎক্ষেপ করে। বাম নিলয়টি প্রতি সঙ্কোচনে গড়পড়তা ০.০৮ বা ০.০৯ কিলোগ্রাম মিটারের সমান কাজ করে। দক্ষিণ নিলয় শুধু ফুসফুসের মধ্যে রক্ত নিষ্কাশন করে বলিয়া ইহার কাজও কম—অনধিক ০.০২ কিলোগ্রাম-মিটারের সমান। ধরা যাইতে পারে যে প্রতি সঙ্কোচনের সময় হৃৎপিণ্ডের দুইটি নিলয় একত্রে প্রায় ০.১ কিলোগ্রাম মিটারের সমান কাজ করিয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডের এক মিনিটের কাজ ৬ বা ৮ কিলোগ্রাম মিটারের সমতুল্য। এক-দিনে হাজার হাজার মিটার রক্ত নিষ্কাশন করিয়া হৃৎপিণ্ড যে বিপুল কার্য সমাধান করে, তাহা ১০ হাজার কিলোগ্রাম মিটারেরও অধিক। একটি ক্রেন ২ টন ভার ৫ মিটার ঊর্ধ্বে তুলিতে এই পরিমাণে কাজ করিয়া থাকে।

* শারীরবৃত্তিক দ্রব আসলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রব। ব্যাঙের রক্ত স্তন্যপায়ী জীবদের দ্রব হইতে পৃথক হওয়ায় ইহাদের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক দ্রব ব্যবহার করা হয়; ব্যাঙের ক্ষেত্রে ০.৬% সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে ০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য লবণ ও গ্লুকোজ প্রভৃতি মিশাইয়া আরও জটিল ধরনের দ্রব ব্যবহার করা হয়।

হৃৎপিণ্ডের শ্রান্তিহীনতার কারণ ঃ

৩০০ গ্রাম ওজনের হৃৎপিণ্ডটি একজন মানুষের জীবদ্দশায় শুধু যে বিপুল কার্য সাধন করে তাহা নয়, এক মুহূর্তের জন্যও কাজ বন্ধ করে না। আপাত দৃষ্টিতে এই অসাধ্য কি করিয়া সাধিত হয়? হৃৎপিণ্ডের ক্লান্তিহীনতার আসল কারণ হইল ইহার কার্যের ছন্দোবদ্ধ গতি, সুনির্দিষ্ট পর্যায় ক্রমিক সঙ্কোচন ও শৈথিল্য। বিভিন্ন পেশীসমষ্টির পর্যায়ক্রমিক সংকোচন হইলে অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীও অবসাদগ্রস্ত না হইয়া বহুক্ষণ কাজ করিতে পারে। বেড়াইতে, করাত দিয়া কাঠ চিরিতে, লেদে কাজ করিতে এবং অন্যান্য শ্রমশীল কার্যে এই-রূপই ঘটিয়া থাকে। শ্বাসযন্ত্রের পেশীগুলির কার্যকলাপ ক্লান্তিহীন কাজের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

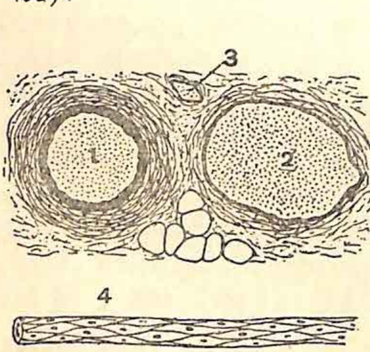
কোন পেশী অবিরত সঙ্কুচিত হইতে থাকিলে শীঘ্রই অবসাদ আসিয়া পড়ে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইবে কেন দীর্ঘ সময় ধরিয়া দড়ির মত টান্ টান্ অবস্থায় অনড়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা কিংবা একটি ক্ষুদ্র ভার হাতে লইয়াও বাহু বাড়াইয়া থাকা অসম্ভব।

হৃৎপিণ্ড কখনও কাজ বন্ধ করে না; কিন্তু প্রতি সেকেন্ডেই বিশ্রাম গ্রহণ করে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ডের ৭৫ বার সঙ্কোচন হয়, তাহা হইলে প্রতিটি সম্পূর্ণ সংকোচনের সময় লাগে ০.৮ সেকেন্ড। এই সময়ের মধ্যে অলিন্দের সঙ্কোচনের জন্য যায় ০.১ সেকেন্ড। অর্থাৎ নিলয় দুইটি যতক্ষণ কাজ করে, তাহার প্রায় দ্বিগুণ সময় বিশ্রাম পায়। অলিন্দদ্বয় আরও একটু বেশী বিশ্রাম পাইয়া থাকে। প্রতি সঙ্কোচনের পর এই সামান্য বিশ্রাম হৃৎপিণ্ডকে একই শক্তিতে পুনরায় সঙ্কুচিত হইবার উপযুক্ত করিতে যথেষ্ট।

২০। *প্রণালী বাহিয়া রক্ত ও লসিকা প্রবাহ*

রক্তবহা প্রণালীসমূহের গঠন ঃ

ধমনী, কৈশিকনালী ও শিরার গঠন প্রকৃতিতে প্রচুর পার্থক্য আছে (৫০নং চিত্র)।



৫০নং চিত্র—রক্তপ্রণালী সমূহের গঠন (প্রস্থচ্ছেদ) (১) একটি বৃহৎ ধমনী, (২) একটি বৃহৎ শিরা, ও (৩) একটি ক্ষুদ্র শিরা; (৪) জালক বা কৈশিক নালী।

বৃহৎ ধমনীগুলির পুরু গাত্র-প্রাচীর মসৃণ পেশীতন্তু এবং প্রচুর সংখ্যক মজবুত স্থিতিস্থাপক তন্তু দ্বারা গঠিত। এইরূপ গঠন প্রকৃতির জন্য ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা ও প্রতিরোধ শক্তি জন্মায়।

হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি সঙ্কোচনে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত ধমনীর মধ্যে নিষ্কাশিত হইলে রক্তের চাপে মহাধমনী ও অন্যান্য বৃহৎ ধমনী প্রসারিত হইয়া থাকে। ধমনী-গাত্রের স্থিতি-স্থাপকতার জন্য ইহারা প্রসারণকে প্রতিরোধ করে, এবং হৃৎপিণ্ডের বিরতির সময় ইহাদের অন্তস্থ অতিরিক্ত রক্ত ধীরে ধীরে চাপ দিয়া নিষ্কাশিত করে ও পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। ধমনী-গাত্রের এই সম্প্রসারণ ও তৎপরবর্তী চাপের ফলে বৃহৎ হইতে

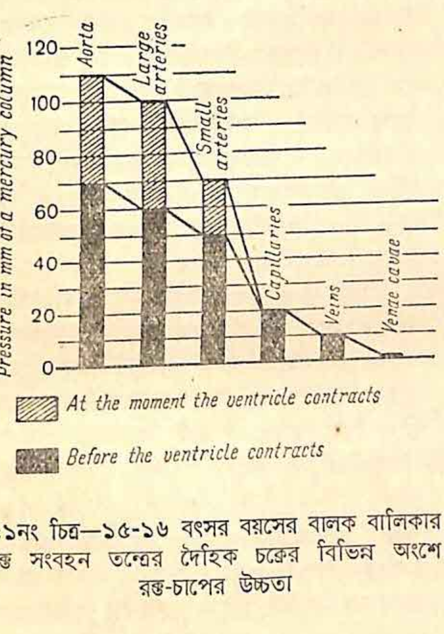
ক্ষুদ্র ধমনীতে রক্তের প্রবাহ হৃৎপিণ্ডের দুইটি সঙ্কোচনের অন্তর্বর্তীকালে বন্ধ হইয়া যায় না। অর্থাৎ শুধু নিলয়ের সঙ্কোচনের মুহূর্তেই রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইলেও রক্তবহা প্রণালীসমূহে রক্তের সংবহন কখনও থামিয়া যায় না।

ধমনীছিদ্র যত অপ্রশস্ত, ইহার গাত্র ততই পাতলা। মধ্য আকারের ধমনীর গাত্রে একটি পুরু পৈশীক স্তবক ও অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে। ক্ষুদ্রতম ধমনীগুলির গাত্রে এক স্তবক চ্যাপ্টা কোষ এবং বহিরাংশে একটি সারিতে বিন্যস্ত পেশীতন্তুর আবরণ থাকে। শেষ পর্যন্ত পেশীতন্তু সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় এবং ধমনী রূপান্তরিত হয় একসারি পাতলা ও চ্যাপ্টা কোষ-বিশিষ্ট কৈশিক নালীতে; ইহার গাত্র দিয়া রক্ত এবং লসিকার মধ্যে অনায়াসে আদান-প্রদান চলে।

প্রণালীসমূহে রক্তের চাপ ঃ

নিষ্কাশন যন্ত্রের ন্যায় কাজ করিয়া হৃৎপিণ্ড মহাধমনী ও ফুসফুসের ধমনী মধ্যে রক্ত ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়। ফলে বৃহৎ ধমনীগুলির মধ্যস্থিত রক্তের উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তাহা প্রণালী প্রবাহ দিয়া রক্তকে নিষ্কাশিত করে।

সমগ্র রক্তবহা প্রণালী তন্ত্রে রক্তের গতি উচ্চ চাপ বিশিষ্ট বিন্দু হইতে নিম্ন-চাপ বিশিষ্ট অংশাভিমুখে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ রক্তপ্রবাহের গতিপথে চাপ ক্রমশ কমিয়া যাইতে থাকে, কারণ, রক্তকে ঠেলিতে ঠেলিতে ইহা ক্রমশ ক্ষয় হইয়া যায়। এই চাপ হৃৎপিণ্ডের অনতি-দূরে বৃহৎ ধমনীগুলিতেই সর্বাধিক এবং যে শিরাগুলি রক্তকে হৃৎপিণ্ডে লইয়া যায়, তাহাতে সর্বনিম্ন।



৫১নং চিত্র—১৫-১৬ বৎসর বয়সের বালক বালিকার রক্ত সংবহন তন্ত্রের দৈহিক চক্রের বিভিন্ন অংশে রক্ত-চাপের উচ্চতা

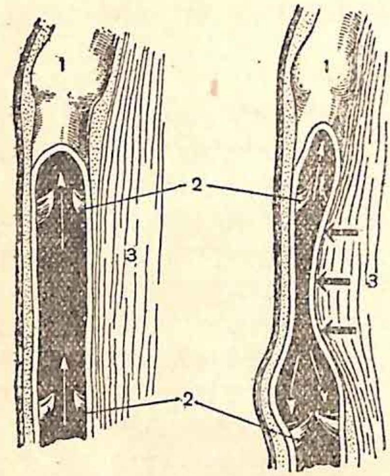
রক্তের চাপ রক্তপ্রবাহের গতি-পথে অসমানভাবে কমিতে থাকে (৫১নং চিত্র)। রক্তপ্রবাহের প্রতিরোধ যেখানে সর্বাধিক, প্রণালী প্রবাহের সেই সকল অংশেই চাপ দ্রুততম বেগে কমিতে থাকে। মানবদেহের বিভিন্ন দেহযন্ত্রে রক্ত সরবরাহকারী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী অপেক্ষা ২ বা ৩ সেন্টিমিটার ব্যাসের প্রশস্ত ছিদ্র বিশিষ্ট মহাধমনীতে রক্ত অপেক্ষাকৃত অনায়াসে প্রবাহিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীগুলি রক্তপ্রবাহকে ক্ষুদ্রাতিতম ধমনিকাসমূহ অপেক্ষা, বিশেষ করিয়া এক মিলিমিটারের এক সহস্রাংশ ব্যাস বিশিষ্ট কৈশিকনালী অপেক্ষা অনেক কম প্রতিরোধ দিয়া থাকে।

কৈশিক নালীতে প্রবাহিত রক্ত অপ্রশস্ত নালী গাত্রের সহিত রক্তের ঘর্ষণের ফলে উদ্ভূত প্রচণ্ড প্রতিরোধকে জয় করে। প্রণালী পথের এই সংক্ষিপ্ত অথচ কষ্টকর অংশ দিয়া রক্তকে পরিচালিত করিতে যাইয়া রক্তের চালিকাশক্তির অর্থাৎ

রক্তের চাপের একটি বৃহৎ অংশ ব্যয় হইয়া যায়। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এইখানেই রক্তের চাপ দ্রুত কমিয়া যায়।

শিরাপথে রক্তের গতি ঃ

ক্ষুদ্র শিরাগুলিতে রক্তের চাপ পারদদণ্ডের (Murcury Column) ১০ মিলি-মিটারের বেশী ওঠে না। হৃৎপিণ্ডের সন্নিহিত বৃহৎ শিরাগুলিতে এই চাপ আরও কম। সুতরাং শিরামধ্যে রক্তের চালিকাশক্তি খুবই অল্প। চালিকা শক্তির অধিকাংশ ইতিমধ্যেই বিশেষ করিয়া ধমনিকা ও কৈশিক নালীপথে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে শিরাপথে রক্তের গতি অনেক কম সাবলীল। নিম্নদেহ প্রান্তস্থিত শিরাপথে এই গতি বিশেষ কষ্টকর এই কারণে যে উপরে উঠিবার সময় রক্তকে নিজের ভারাকর্ষণের শক্তিকে জয় করিতে হয়।



৫২নং চিত্র—শিরায় রক্ত সঞ্চালনের উপর পেশী-সঙ্কোচনের প্রভাব।
বামে—পেশীর শিথিল অবস্থা; দক্ষিণে—সঙ্কুচিত পেশী
(১) শিরার নিম্নাংশ কাটিয়া উন্মুক্ত করা হইয়াছে; (২) শিরার কপাটিকাসমূহ; (৩) পেশী;
কাল শরচিহ্নগুলি শিরার উপর পেশী সঙ্কোচনের ফল দেখাইতেছে; সাদা শরচিহ্নগুলি শিরার মধ্যে রক্ত চলাচল দেখাইতেছে।

বেড়ান, ব্যায়াম প্রভৃতি কাজের গতি এবং বিশেষ করিয়া পেশীর কার্যকলাপ শিরাপথে রক্তসঞ্চালনের উন্নতি সাধন করে, কারণ প্রতিটি পেশী সঙ্কোচনে শিরা প্রবাহের কোন-না কোন অংশে চাপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই চাপের ফলে রক্ত শুধু হৃৎপিণ্ডের দিকেই পরিচালিত হয়। ইহার গতি হৃৎপিণ্ডের বিপরীত দিকে চালিত হয় না কারণ মহাধমনী ও ফুসফুসের উৎপত্তিস্থলে অবস্থিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকার ন্যায় শিরামধ্যস্থিত কপাটিকা-গুলি এই বিপরীত গতিতে বাধা সৃষ্টি করে (৫২নং চিত্র)। সমস্ত শিরাতেই এইরূপ কপাটিকা আছে।

সামান্য হইলেও আমরা সব সময়েই কিছু কিছু অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া থাকি। সচল অবস্থায় পেশীসমষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া তাহাদের অভ্যন্তরস্থ শিরাগাত্রে চাপ দিয়া থাকে। এই কারণে পেশীর কার্যকলাপ শিরাপথে রক্তসঞ্চালনে একটি নিরবচ্ছিন্ন ও অবশ্য প্রয়োজনীয় সহায়ক-শক্তি হিসাবে কাজ করে।

জীবনযাত্রা প্রণালীতে শ্রম-হীনতা কিংবা প্রায় অচল অবস্থা আসিলে অথবা দেহ সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হইলে শিরামধ্যস্থ রক্তের পশ্চাৎ-প্রবাহে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে রক্তে স্রোতহীনতা সৃষ্টি হইয়া সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়।

নাড়ী বা পাল্স্ (Pulse) :

শরীরের কোন কোন অংশে ধমনীগুলি অনায়াসেই অনুভব করা যায়। অঙ্গুলির সাহায্যে ছন্দোবদ্ধ স্পন্দন অনুভব করিয়া ঐস্থানে ধমনীর অবস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। ধমনী-গাত্রের ছন্দোবদ্ধ স্পন্দনকে বলা হয় নাড়ী বা 'পাল্স্'।

কোন ধমনীকে অংগুলির দ্বারা সজোরে চাপিয়া ধরিলে রক্তের গতি বন্ধ হইয়া যাইবে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পেষিত অংশের ঠিক উপরে (অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের নিকটতর অংশে) পুনরায় নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যাইবে। ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে নাড়ীর স্পন্দন রক্তের গতি পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে প্রতিবার নিলয় হইতে উৎক্ষিপ্ত রক্ত মহাধমনীতে যাইবার সময় ধমনী মধ্যে যে আকস্মিক চাপ বৃদ্ধি করে তাহার উপর। নাড়ীর স্পন্দন রক্ত-প্রবাহের গতি অপেক্ষা বহুগুণ দ্রুতবেগে সমস্ত ধমনীতে ছড়াইয়া পড়ে। নাড়ী অনুভব করিয়া আমরা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গুণিতে পারি।

রক্তের গতির হার ঃ

অপ্রশস্ত নদীবক্ষে জল দ্রুতগতিতে বহিয়া যায়। পথ যত প্রশস্ত হইবে জলের গতি ততই মন্থর হইবে। রক্তসংবহন তন্ত্রে রক্তের গতির হারও রক্তপ্রবাহের বিস্তারের উপর নির্ভর করে।

হৃৎপিণ্ড হইতে মহাধমনীতে রক্ত এক সেকেন্ডে $\frac{1}{2}$m হারে প্রবাহিত হয়। তাহা হইলে ক্রমশ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ধমনীতে এবং তথা হইতে কৈশিক নালীতে যাইবার সময় রক্ত প্রবাহের হার কিভাবে পরিবর্তিত হয়? মহাধমনীর প্রস্থ-চ্ছেদের ব্যাস হইল প্রায় ৩০০ বর্গ মিলিমিটার, আর কৈশিক নালীর সে-ব্যাসের আয়তন এক বর্গ মিলিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রক্তবহা প্রণালীসমূহের পথ ক্রমশ অপরিসর হওয়া এবং রক্তস্রোতের গতিবেগ ক্রমশ বাড়িয়া যাওয়া উচিত। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু রক্তস্রোত ক্রমশ মন্থর হইয়া আসে। ইহার কারণ রক্তের গতিপথ ক্রমশ বেশী সংখ্যক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া প্রচুর প্রশস্ত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক বার শাখায়িত হইবার সময় রক্ত-প্রণালীগুলি কিছুটা অপরিসর হইলেও তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়া যায়।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে কৈশিক নালীর প্রবাহ (অর্থাৎ একই সংগে রক্তবাহী সমস্ত কৈশিক নালীর ছিদ্রের সামগ্রিক প্রস্থ) মহাধমনীর স্রোতের প্রস্থ অপেক্ষা ৫০০ হইতে ১০০০ গুণ বড়। কাজেই কৈশিক নালীস্থ রক্তস্রোত মহা-ধমনীর স্রোত অপেক্ষা ৫০০ হইতে ১০০০ গুণ মন্থর; গড়পড়তায় এই হার হইল প্রতি সেকেন্ডে ১ মিলিমিটার।

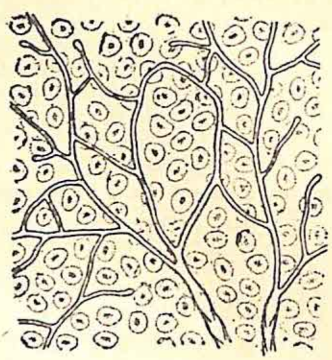
আমরা জানি যে অক্সিজেন ও পুষ্টি-পদার্থ কৈশিক নালীস্থ রক্ত হইতে কলা-লসিকায় চলিয়া যায় এবং কলাতে উদ্ভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য পদার্থ কৈশিক নালীর রক্তে নিঃসৃত হয়। রক্তপ্রবাহ মন্থর হইলে পদার্থগুলির এই বিনিময় অনেক সহজ এবং অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণতার সহিত সাধিত হইয়া থাকে।

কৈশিক নালী হইতে অলিন্দাভিমুখে যাত্রাপথে রক্তপ্রবাহের পথ পুনরায় অপ্রশস্ত হইতে থাকে এবং স্রোতবেগের হারও বাড়িতে থাকে।

লসিকার উৎপাদন ও সঞ্চালন ঃ

রক্ত হইতে জল এবং তাহার সহিত রক্তের মধ্যে দ্রব অন্যান্য পদার্থগুলি প্রতি-নিয়ত কৈশিক নালীর পাতলা গাত্র হইতে চুঁয়াইয়া কোষসমূহের অন্তর্বর্তী স্থানে (Intercellular interstices) চলিয়া যাইতেছে। এইভাবে দেহের সমস্ত কলা-মধ্যেই কলারস বা কলালসিকা উৎপন্ন হইতেছে। অতিরিক্ত রস রক্ত মধ্যে ফিরিয়া

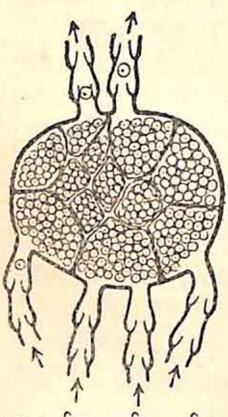
যায় কিংবা লসিকাপ্রণালী নামক বিশেষ ধরনের প্রণালীতে প্রবেশ করে (৫৩নং চিত্র)। ইহারা প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বদ্ধ থলির আকারে দেখা দিয়া ঘন জালকের আকৃতি ধারণ করে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাথমিক লসিকাপ্রণালীগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর প্রণালীতে পরিণত হয়। অবশেষে দুইটি বৃহৎ লসিকা প্রবাহ বাহিয়া লসিকা হৃৎপিণ্ডের সন্নিকটে রক্তসংবহন তন্ত্রের দৈহিক চক্রের দুইটি বৃহৎ শিরায় আসিয়া পতিত হয় (রঙীন চিত্র—২)।



৫৩নং চিত্র—কলার মধ্যে লসিকা-প্রণালীর জন্ম

লসিকা অতি মন্থর গতিতে প্রবাহিত হয়। দুইটি লসিকা প্রবাহ বাহিয়া যে পরিমাণ লসিকা রক্তস্রোতে আসিয়া পড়ে তাহা দৈনিক ১০ হইতে ২০ লিটারের বেশি হইবে না।

লসিকা যে অবস্থায় লসিকাপ্রণালীতে প্রবাহিত হয়, তাহা শিরায় রক্তস্রোতের সমতুল্য। লসিকা প্রণালীতেও শিরার মত কপাটিকা আছে। পেশী সঙ্কোচন যেভাবে শিরায় রক্তস্রোতকে পরিচালিত করে ঠিক সেইভাবেই লসিকা প্রবাহকেও সাহায্য করে।



৫৪নং চিত্র—লসিকা পিণ্ড বা গ্রন্থি। শরচিহ্নগুলি লসিকা-প্রণালীতে লসিকার গতি নির্ণয় করিতেছে; কতকগুলি লসিকা পিণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে এবং কতকগুলি বাহির হইয়া যাইতেছে।

লসিকাপিণ্ড (Lymph nodes) :

লসিকা হইবার সময় লসিকা প্রণালীগুলি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফীত অংশ সৃষ্টি করে, এগুলিকে বলা হয় লসিকাপিণ্ড (৫৪নং চিত্র)। ইহারা সূক্ষ্ম সংযোজক কলায় গঠিত।

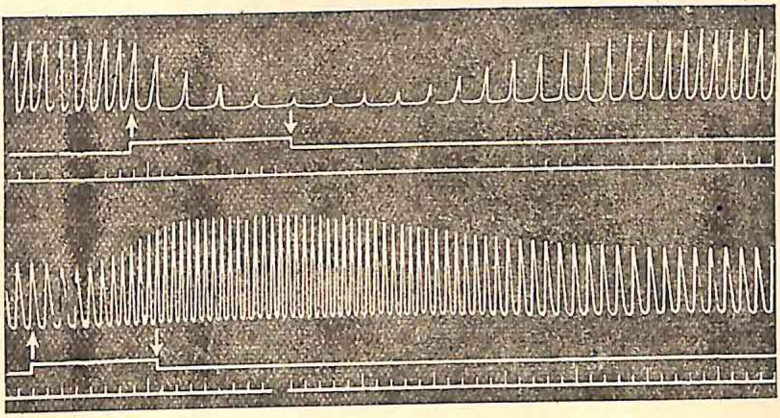
সংযোজক কলার তন্তুসমূহের অন্তর্বর্তী স্থানে প্রচুর সংখ্যক সক্রিয় কোষ থাকে; এইগুলি হইল লসিকাপিণ্ডের সংযোজক কলা হইতে উদ্ভূত শ্বেত-রক্ত-কণিকা; ইহারা কোষ বিভাগের ফলে সংখ্যা বাড়াইতে পারে।

লসিকাপিণ্ডগুলি খুব ভাল পরিস্রাবক ও ছাঁকনির ভূমিকা গ্রহণ করে। রক্তে প্রবিষ্ট কোন বীজাণু সংক্রমিত হইয়া জীবদেহের পক্ষে মারাত্মক হইলে এইখানে ধরা পড়ে ও আবদ্ধ হয় এবং পরে নিহত হয়। তাহা ছাড়া লসিকাপিণ্ড বিষাক্ত দ্রব্যাদি ধরিয়া তাহাদের নির্দোষ করিয়া ফেলে।

২১। রক্ত সংবহনের নিয়ন্ত্রণ

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও জীবদেহের প্রয়োজনঃ

যে দেহযন্ত্র যতবেশি কাজ করে, তাহার ততবেশি অক্সিজেন ও পুষ্টি-পদার্থের প্রয়োজন হয় এবং ফলে, তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত রক্তের প্রয়োজনও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যায়।



৫৫নং চিত্র—কিমোগ্রাফে খরগোসের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত করিলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন রেখায়িত হইতেছে। নিম্নে সিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ু; উপরে—ভেগাস স্নায়ু। সর্বনিম্নে আনুভূমিক রেখাটি সময়ের মাপ দেখাইতেছে; উপরের আনুভূমিক রেখাটির দ্বারা স্নায়ুর উদ্দীপনা দেখান হইয়াছে; শরচিহ্নগুলি উত্তেজনা সুরু ও শেষ হওয়ার নির্দেশক।

হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের গতি ও শক্তি জীবাণুর প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ-ভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

শুইয়া থাকা অবস্থা হইতে উঠিয়া বসা অথবা বসা হইতে উঠিয়া দাঁড়ান—শারীরিক অবস্থানের এই অতি সাধারণ পরিবর্তনও হৃৎপিণ্ডের কার্যে আশু পরিবর্তন আনে। নিজেকে লক্ষ্য করিলে একথা বোঝা কঠিন নয় যে শারীরিক শ্রম, ভোজনের পর পাচন-প্রক্রিয়া, মানসিক উত্তেজনা অথবা নিদ্রা এ সমস্তই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপকে প্রচুর প্রভাবান্বিত করে।

তাহা হইলে কিভাবে জীবানুর পক্ষে অসীম গুরুত্বপূর্ণ এই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া এবং অন্যান্য দেহযন্ত্রের কার্যকলাপের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন পারস্পরিক যোগ-সূত্র বজায় থাকে?

হৃৎপিণ্ডের স্নায়ু সরবরাহঃ

বিভিন্ন দেহযন্ত্রের মধ্যে অখণ্ড কার্যকলাপে সাহায্য করে স্নায়ুতন্ত্র। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দুই ধরনের স্নায়ু থাকে; মস্তিষ্ক হইতে আগত যাযাবর স্নায়ু বা ভেগাস (Wandering or Vagus), এবং সুষুম্নাকাণ্ড হইতে আগত সংবেদীয় বা সিম্‌প্যাথেটিক (Sympathetic) স্নায়ু।

পশুদেহে পরীক্ষা চালাইলে এই স্নায়ুগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। একটি কুকুর বা ইঁদুরের ভেগাস্ স্নায়ু কাটিয়া দিলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-গুলি দ্রুততর হইয়া থাকে। অপর পক্ষে, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা ভেগাস্ স্নায়ু-

গুলিকে উত্তেজিত করিলে এই সঙ্কোচন মন্থর ও দুর্বল হইয়া পড়ে; আর খুব শক্তিশালী উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে সঙ্কোচন সম্পূর্ণ থামিয়া যায়—হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভেগাস্ স্নায়ু হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করে; সঙ্কোচনকে দুর্বল করে এবং সঙ্কোচনের গতিবেগ কমাইয়া আনে।

সংবেদনীয় (Sympathetic) স্নায়ুগুলি কাটিয়া দিলে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন মন্থর হইয়া যায়। ইহাদিগকে উত্তেজিত করিলে সঙ্কোচন দ্রুততর হইবে। বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকে আই, পি, প্যাভ্লভ্ তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের প্রারম্ভেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর কয়েকটি ক্ষুদ্র শাখাকে উত্তেজিত করিলে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন বাড়িয়া যায়। অতএব সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুগুলি হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকে শক্তিশালী ও দ্রুততর করিয়া থাকে।

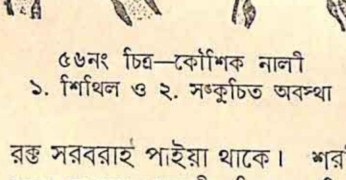
অর্থাৎ ভেগাস্ ও সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুগুলি হৃৎপিণ্ডের উপর পরস্পর বিরোধী প্রভাব সৃষ্টি করে।

দেহযন্ত্রে রক্ত-সরবরাহ ঃ

জীবদেহে সমস্ত যন্ত্রগুলি একই সঙ্গে অধিক কাজ খুব কমই করিয়া থাকে।

পশুদেহে এবং মানুষের উপরেও অসংখ্য পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে যন্ত্রগুলি কর্মরত থাকিলে রক্তপ্রণালীসমূহ প্রসারিত হয় (dilate) এবং কর্মহীন অথবা অতি সামান্য কর্মরত অবস্থায় সঙ্কুচিত (constricted) থাকে।

শ্লথপেশীর অধিকাংশ কৈশিক নালী অবসন্ন অবস্থায় থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্য দিয়া রক্ত চলাচল করিতে পারে না (৫৬নং চিত্র)। পেশী সঙ্কুচিত হইলে অনেক কৈশিক নালী প্রসারিত হয়। প্রসারিত কৈশিক নালীর সংখ্যা এবং তাহাদের প্রসারণের মাত্রা পেশীর কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে। প্রচণ্ড সক্রিয় পেশীর মধ্যে প্রবাহিত রক্তের স্রোত বহুগুণ বাড়িয়া যাইতে পারে। ভূরিভোজনের পর উদরগহ্বরস্থিত দেহযন্ত্রগুলির রক্তস্রোত বহুলাংশে বাড়িয়া যায়। গণিতের প্রশ্ন সমাধান করিবার সময় মস্তিষ্কের রক্তবহা-প্রণালীগুলি প্রসারিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত সরবরাহ পাইয়া থাকে। শরীরের অংশের রক্তবহা প্রণালীগুলি প্রসারিত হইলে অন্য অংশে প্রণালীগুলি সঙ্কুচিত হয়। এই জন্যই ভূরিভোজনের পর মস্তিষ্কে ও পেশীতে কম রক্ত সরবরাহ হয় এবং শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে; শারীরিক ও মানসিক শ্রমবিমুখতা জাগে।



৫৬নং চিত্র—কৌশিক নালী
১. শিথিল ও ২. সঙ্কুচিত অবস্থা

রক্তবহা প্রণালীর স্নায়ু সরবরাহ ঃ

কোন সাদা ইঁদুরের গ্রীবার বামদিকে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু কাটিয়া দিলে গ্রীবার দক্ষিণ এবং বাম কর্ণে রক্ত সরবরাহে সুস্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়িবে। দক্ষিণ অপেক্ষা বাম কর্ণে বেশি সংখ্যক রক্তবহা প্রণালী দেখা যায়। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ

দ্বারা বাম কর্ণের সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুকে উত্তেজিত করিলে তরঙ্গ প্রয়োগের কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এই কর্ণের রক্তবহা প্রণালীগুলি সঙ্কুচিত হইতে শুরু করে। যথেষ্ট শক্তিশালী বৈদ্যুতিক তরঙ্গপ্রয়োগে কর্ণটি সম্পূর্ণ বিবর্ণ হইয়া যায়।

এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রক্তবহা প্রণালীগুলির সঙ্কোচন হয় সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর প্রভাবে এবং প্রণালী গাত্রের পেশীতে ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা প্রণালীসমূহের কার্যকলাপে স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাব:

বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সংশিলষ্ট (অন্তর্মুখী) স্নায়ুতে উত্তেজনা প্রয়োগের দ্বারা হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ এবং রক্তবহা প্রণালীর মধ্যস্থিত রক্তের পরিমাণ পরিবর্তিত হইতে পারে। এইভাবে চর্মের উপর শৈত্যের প্রভাবে চর্মের রক্তবহা প্রণালীগুলি সংকুচিত হইয়া যায় (বিবর্ণ), অপর পক্ষে তাপের প্রভাবে ইহারা প্রসারিত হয় (রক্তিম)। ঠাণ্ডা জলে অকস্মাৎ ডুব দিলে হৃৎপিণ্ড "স্তব্ধ" (failure) হইয়া যাইতে পারে। উচ্চগ্রামের আকস্মিক শব্দ শুনিয়াও এইভাবে হৃৎস্পন্দন থামিয়া যাইতে এবং চর্মের রক্তপ্রণালীসমূহের সঙ্কোচন হইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবে একই প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইলে তাহাকে বলা হয় প্রতিবর্তন ক্রিয়া।

মস্তিষ্কের কর্টেক্স্ হইতে আগত তাড়নাগুলি হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা প্রণালী-সমূহের উপর প্রচুর প্রভাব সৃষ্টি করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ মানসিক উত্তেজনা ও ভয়ে হৃৎস্পন্দন বাড়িয়া যাওয়া কিংবা স্তব্ধ হওয়া এবং মুখ রক্তিম কিংবা বিবর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রক্তসংবহন তন্ত্রের উপর কর্টেক্সের প্রভাব মেজাজ বা মানসিক অবস্থার উপর—অর্থাৎ প্রফুল্ল অথবা বিষণ্ণ মেজাজের উপর, কাজ করিতে আগ্রহ অথবা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে।

হৃৎপিণ্ড-রক্তপ্রণালীতন্ত্রের আত্মনিয়ন্ত্রণ:

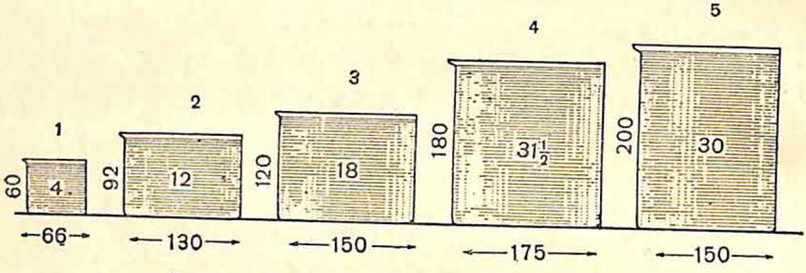
রক্তবাহী প্রণালীসমূহ হইতে আগত উত্তেজনা স্বয়ং হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহী প্রণালীগুলির গাত্রে অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্ত্রগুলি নিহিত থাকে। কোন রক্তবাহী প্রণালী প্রসারিত হইলে এই তন্তুগুলির কোন কোনটি উত্তেজিত হয়; কতকগুলি তন্তুতে আবার কার্বনিক এ্যাসিড্ প্রভৃতি কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি হইতে পারে। এই স্নায়বিক তাড়না অন্তর্মুখী তন্তু বাহিয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সুষুম্নাশীর্ষকে (Medulla oblongata) পৌঁছায়; এইখানেই হৃৎপিণ্ড-রক্তপ্রণালী সংশিলষ্ট কেন্দ্রটি অবস্থিত। এইখানে যে সংবেদন-শীল তাড়না উদ্ভূত হয় তাহা বহির্মুখী স্নায়ুতে বাহিয়া হৃৎপিণ্ড ও রক্তপ্রণালী-সমূহতে গিয়া পৌঁছায় এবং তাহাদের কার্যকলাপে প্রতিবর্তন ক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বহু বৎসর পূর্বে একজন রুশ বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে মহাধমনীতে রক্তের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে এবং ইহার গাত্র অত্যন্ত প্রসারিত হইলে গাত্রস্থিত অন্তর্মুখী স্নায়ুপ্রান্তসমূহে উত্তেজক অবস্থার উদ্ভব হয়। এই উত্তেজনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পরিচালিত হইয়া ভেগাস্ স্নায়ুতে আসে এবং তথা হইতে

হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়; হৃৎপিণ্ডটি তখন অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিতে এবং ক্ষীণভাবে সঙ্কুচিত হয় এবং তাহার ফলে রক্তের চাপ কমিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসে।

সময় সময় এমন হইয়া থাকে যে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণার্ধে রক্তস্রোত এত বাড়িয়া যায় যে হৃৎপিণ্ড এই রক্তকে ফুসফুসের ধমনী দিয়া নিষ্কাশিত করিবার সময় পায় না। এরূপ ক্ষেত্রে উচ্চ এবং নিম্নমহাশিরা এবং দক্ষিণ অলিন্দ প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং এইভাবে নিজেদের গাত্রস্থিত অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্ত্রগুলিকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা মস্তিষ্কাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুগুলিকে প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত করে এবং ভেগাস স্নায়ুকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। ইহার ফলে হৃৎপিণ্ড দ্রুততর বেগে এবং অধিকতর শক্তিতে সঙ্কুচিত হয় এবং ইহার অভ্যন্তরে প্রবাহিত সমস্ত রক্তকে সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত করিতে সক্ষম হয়।

আই. পি. প্যাভলভই সর্বপ্রথম এই প্রতিবর্তন ক্রিয়াসমূহকে প্রমাণ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে রক্তপ্রণালী তন্ত্র সুনির্দিষ্ট পরিমাণে আত্মনিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং সেই কারণে হৃৎপিণ্ড ও রক্তপ্রণালীসমূহের কার্যকলাপে সম্পূর্ণ আকস্মিক পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব।



৫৭নং চিত্র—ব্যায়ামকুশলী কোন লোকের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-কলাপ

১। শয়নরত অবস্থায়; ২। দ্রুত চলমান অবস্থায়; ৩। ধীর গতিতে ধাবমান অবস্থায়, ৪ ও ৫। বর্ধমান গতিতে ধাবমান অবস্থায়। কাঁচপাত্রের (বীকার) প্রস্থ দ্বারা প্রত্যেকটি সঙ্কোচনে হৃৎপিণ্ড কর্তৃক মহাধমনীর মধ্যে নিঃসৃত রক্তের পরিমাণ (কিউবিক সেন্টিমিটার) বুঝাইতেছে; কাঁচ পাত্রে লিখিত সংখ্যা দ্বারা প্রতি মিনিটে মহাধমনীর মধ্যে প্রবেশকারী রক্তের পরিমাণ (লিটার) বুঝাইতেছে।

রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ ঃ

বিভিন্ন দেহযন্ত্র হইতে রক্তের মধ্যে নিঃসৃত বিভিন্ন পদার্থ হৃৎপিণ্ডের উপর এবং পৃথক পৃথক দেহযন্ত্রে রক্ত সরবরাহের উপর প্রভাব সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণকে বলা হয় রাসায়নিক (humoral)† নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ রক্তের দ্বারা সংঘটিত নিয়ন্ত্রণ।

যে-সকল পদার্থ হৃৎপিণ্ড-রক্তনালী তন্ত্রের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে, তাহাদের মধ্যে এ্যাড্রিনালিন ও এ্যাসিটিলকোলিন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উভয় পদার্থই স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় জীবানুমধ্যে নিরন্তর কমবেশি উৎপন্ন হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড এবং রক্তপ্রণালী সমূহ এ্যাড্রিনালিনের দ্বারা সিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ুর উত্তেজনার মতই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রক্তের মধ্যে এ্যাড্রিনালিন প্রবিষ্ট করাইলে রক্তপ্রণালীগুলি সঙ্কুচিত হইবে এবং হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন দ্রুততর ও

† ল্যাটিন শব্দ humor (হিউমর)=আর্দ্রতা

অধিকতর শক্তিশালী হইবে। এ্যাসিটিলকোলিনে ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; ইহা হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকে দুর্বল ও মন্থর করে এবং রক্তপ্রণালীসমূহকে প্রসারিত করে।

স্নায়বিক ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের জন্য হৃৎপিণ্ডের শক্তি সযত্নে পরিমিতভাবে ব্যয় হয়। বিভিন্ন দেহযন্ত্রে যথাযথ এবং নিরন্তর পরিবর্তনশীল রক্ত সরবরাহের ফলে হৃৎপিণ্ড অতিরিক্ত শ্রম হইতে রক্ষা পায় এবং জীবদেহ ৪ অথবা ৫ কিলো-গ্রাম রক্তেই কাজ চালাইয়া যাইতে পারে।

প্রশ্ন

ভূরিভোজনের পর শারীরিক ব্যায়াম অথবা স্নান করা অনিষ্টকর কেন?
ব্যাখ্যা কর—"ভরা পেটে কাজ হয় না, পড়াও হয় না।"

অনুশীলনী

ভোর বেলা বিছানায় শুইয়া থাকাকালে নিজের নাড়ীর স্পন্দন শুনিয়া দেখ। হৃৎপিণ্ড তাহার প্রতিটি সঙ্কোচনে মহাধমনীর মধ্যে ৬০cm^3 রক্ত ঢালিয়া দিলে হৃৎপিণ্ডের বাম অর্ধ দিয়া প্রতি মিনিটে কতটা রক্ত প্রবাহিত হয়?

দ্রুত দৌড়াইবার কিংবা কঠিন কায়িক শ্রমের পর মুহূর্তে নাড়ীর স্পন্দন শুনিয়া উপরের ন্যায় হিসাব কর, ইহা করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি সঙ্কোচনের পর মহাধমনীর মধ্যে যে পরিমাণে রক্ত যায় তাহা ৯০cm^3-এর সমান।

২২। *হৃৎপিণ্ডের ব্যায়াম*

দুর্বল ও সবল হৃৎপিণ্ডঃ

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে, দ্রুত দৌড়াইতে কিংবা অন্য কোন কষ্টসাধ্য কায়িক শ্রমের সময় হৃৎপিণ্ড প্রচুর কাজ করিয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডের কাজে দুইভাবে জোর পড়িয়া থাকেঃ (১) সঙ্কোচনের গতিবেগ বাড়াইয়া এবং (২) প্রতিবার সঙ্কোচনের সময় নিষ্কাশিত রক্তের পরিমাণ বাড়াইয়া। এই দুই পদ্ধতি একত্রিত হইলে হৃৎপিণ্ড হইতে প্রতি মিনিটে নিষ্কাশিত রক্তের পরিমাণ প্রায় পাঁচগুণ বা ততোধিক বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছন্দের গতিবেগ অথবা প্রতি সঙ্কোচনে মহাধমনীর মধ্যে নিঃসৃত রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া রক্ত-সংবহন ত্বরান্বিত হইয়া থাকে।

খেলাধুলায় বা ব্যায়ামে কুশলী অথবা শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত লোকের ক্ষেত্রে প্রতি সঙ্কোচনে নিষ্কাশিত রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াই হৃৎপিণ্ডের কাজ শক্তি-শালী হয়, ইহাদের হৃৎপিণ্ডের কাজ অত্যাধিক শ্রমসাধ্য হইলে তবেই সঙ্কোচনের গতিবেগও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

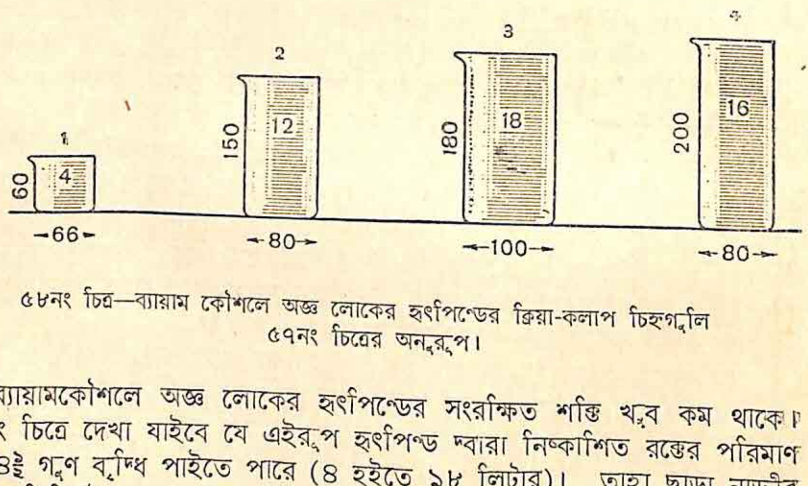
আয়াসী জীবনযাত্রা এবং শ্রমহীন কাজে অনভ্যস্ততার জন্য ব্যায়াম কৌশলে অশিক্ষিত লোকের হৃৎপিণ্ড সঙ্কোচনের মাত্রাকে খুব সামান্যই পরিবর্তন করিতে পারে। ইহাদের হৃৎপিণ্ড শুধু সঙ্কোচনের গতিবেগ বাড়াইয়াই জোরদার হইতে পারে। ইহার ফলে হৃৎপিণ্ডের কার্যের সমগ্র চক্রাবর্তনটি (সঙ্কোচন ও বিরতি)

যথেষ্ট ছোট হইয়া আসে। অর্থাৎ মিনিটে ১৬০ হইতে ১৮০টি সঙ্কোচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি চক্রাবর্তন সম্পূর্ণ করিতে 0.8 সেকেন্ডেরও কম সময় লাগে। এইরূপ হারে নিলয়দ্বয়ের সঙ্কোচন এত দ্রুত সংঘটিত হয় যে ইহারা পূর্ণ শক্তিতে সঙ্কুচিত হইতে অথবা সমস্ত রক্ত নিষ্কাশিত করিতে পারে না। তাহা ছাড়া যে বিরতির সময় হৃৎপিন্ড বিশ্রাম পায় ও রক্তে পূর্ণ হয়, তাহারও অবকাশ পাওয়া যায় না। ইহার ফলে হৃৎপিন্ডের কাজ দুর্বলতর হইয়া পড়ে এবং যে রক্ত শিরা হইতে আসিয়া হৃৎপিন্ডকে পূর্ণ করে, তাহার পরিমাণও কমিয়া যায়।

হৃৎপিন্ডের সংরক্ষিত শক্তি ঃ

কাজের শক্তি অর্থাৎ নিষ্কাশিত রক্তের পরিমাণ বাড়াইবার ক্ষমতাই হইল হৃৎপিন্ডের সংরক্ষিত শক্তি।

৫৭নং চিত্রে একজন ব্যায়ামকুশলী লোকের হৃৎপিন্ডের সংরক্ষিত শক্তি দেখান হইয়াছে। হৃৎপিন্ডের উপর দাবি যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে, সেই অনুপাতেই প্রতি মিনিটে নিষ্কাশিত রক্তের পরিমাণও বাড়িতে থাকে। ব্যায়ামকুশলী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি প্রথমে সঙ্কোচনের পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। কাজ অত্যধিক শ্রমসাধ্য হইলে শুধু তখনই সঙ্কোচনের সংখ্যা বৃদ্ধির নিদর্শন পাওয়া যায়—অর্থাৎ মিনিটে ১৬০ হইতে ১৮০ পর্যন্ত ওঠে। কাজের ভার আরও বৃদ্ধি করিলে হৃৎপিন্ড আর আঁটিয়া উঠিতে পারে না, সঙ্কোচনগুলি দ্রুততর কিন্তু পরিমাণে কম হয়, এবং নিষ্কাশিত রক্তের সামগ্রিক পরিমাণ প্রতি মিনিটে ৩১.৫ হইতে ৩০ লিটারে কমিয়া আসে। তখন হৃৎপিন্ড জীবদেহের প্রয়োজনের তুলনায় পিছনে পড়িয়া থাকে এবং কাজ কর্মীর ক্ষমতার সীমা ছাড়াইয়া যায়।



৫৮নং চিত্র—ব্যায়াম কৌশলে অজ্ঞ লোকের হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া-কলাপ চিহ্নগুলি ৫৭নং চিত্রের অনুরূপ।

ব্যায়ামকৌশলে অজ্ঞ লোকের হৃৎপিন্ডের সংরক্ষিত শক্তি খুব কম থাকে। ৫৮নং চিত্রে দেখা যাইবে যে এইরূপ হৃৎপিন্ড দ্বারা নিষ্কাশিত রক্তের পরিমাণ মাত্র ৪২ গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে (৪ হইতে ১৮ লিটার)। তাহা ছাড়া নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ১৮০ পর্যন্ত উঠিলেও সঙ্কোচনের আয়তন অতি সামান্যই বৃদ্ধি পাইয়াছে (৯৬ হইতে ১০০ কিউবিক সেণ্টিমিটার)। হৃৎপিন্ডের উপর দাবি আরও বাড়াইয়া দেখা গিয়াছে যে সে দাবি মিটাইতে হৃৎপিন্ডের কাজ বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে।

হৃৎপিণ্ডের ব্যায়াম ঃ

প্রত্যেক মানুষেরই তাহার হৃৎপিণ্ডকে শক্তিশালী করার ও ইহার সংরক্ষিত শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত যাহাতে শ্রমসাধ্য ও বহুক্ষণব্যাপী কাজ করিবার প্রয়োজন হইলে তাহাকে আঁটিয়া ওঠা যায়; জীবনে এরূপ প্রয়োজন প্রায়ই আসিয়া থাকে।

নিউমোনিয়া ও অন্যান্য গুরুতর অসুস্থতায় প্রায়ই হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপের উপর মৃত্যু নির্ভর করে। এইরূপ অবস্থায় জীবদেহের উপর ব্যাধি সংক্রান্ত অতিরিক্ত দাবি মিটাইবার পক্ষে হৃৎপিণ্ডকে অত্যধিক দুর্বল বোধহয়।

হৃৎপিণ্ডকে সবল ও স্বাস্থ্যবান করিতে হইলে হৃৎপিণ্ড-পেশীর ব্যায়াম করা প্রয়োজন। ইহার জন্য হৃৎপিণ্ডকে অধিক এবং ঘনঘন শ্রমসাধ্য কাজ করান উচিত। অর্থাৎ সক্রিয় জীবন যাপন করিতে হইবে; বিশ্রামের সময় বেড়াইতে হইবে, উন্মুক্ত স্থানে খেলাধুলা করিতে হইবে। প্রাতঃকালীন ব্যায়াম হৃৎপিণ্ড ও সমগ্র জীবদেহকে শক্তিশালী করার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রমসাধ্য কাজ হৃৎপিণ্ডের পেশীকে শক্তিশালী করে। অনেক ধরনের কাজ, বিশেষত বসিয়া বসিয়া কাজ করিলে হৃৎপিণ্ডের ব্যায়াম হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যায়াম ও খেলাধুলার দ্বারা হৃৎপিণ্ডকে ব্যায়াম করান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

হৃৎপিণ্ডের ব্যায়াম পদ্ধতি স্থির করার সময় বয়স ও স্বাস্থ্যের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং এই ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

হৃৎপিণ্ডের অত্যধিক অবসাদ ঃ

হৃৎপিণ্ডকে ক্ষমতার অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য কাজ করাইলে ইহা দ্রুত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ইহার সঙ্কোচন দুর্বল হইয়া যায় এবং মহাধমনীতে নিষ্কাশিত রক্তের পরিমাণ কমিয়া যায়।

অত্যধিক চাপ পড়িলে হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলি শক্তিশালী না হইয়া ইহার উপর এবং সমগ্র জীবদেহের উপর অনিষ্টকারী প্রভাব পড়িবে। ঘনঘন অত্যধিক চাপ পড়িলে হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয় এবং ইহার পেশী হীনবল ও শ্লথ হইয়া পড়ে।

অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্ত হৃৎপিণ্ডবিশিষ্ট মানুষ কঠিন পরিশ্রম করিতে পারে না; ইহারা অতি কষ্টে সিঁড়ি দিয়া উপরে ওঠে এবং গুরুতর অসুস্থতায় ভাঙিয়া পড়ে। এইরূপ লোকের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুও ঘটিতে পারে।

কোন্ কোন্ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্বল হয় ?

অত্যধিক কষ্টকর শ্রমশীল কাজ, অত্যধিক খেলাধুলা, দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক শ্রম ও নিদ্রাহীন রাত্রি যাপনে হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া দুর্বল হইতে পারে।

ধূমপানের ফলেও প্রায়ই হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যায়।

নিরন্তর মদ্যপানের ফলে হৃৎপিণ্ডের পেশীতে স্নেহ ঘটিত প্রতিক্রিয়া (falty degeneration) সৃষ্টি হইয়া পেশী কলার স্থলে ক্রমশ স্নেহজাতীয় কলার

আধিক্য ঘটে। এই সঞ্চিত স্নেহ হৃৎপিণ্ডের পেশীকে দুর্বল করিয়া ফেলে এবং ইহার ক্রিয়া অপ্রতুল হইতে পারে।

প্রশ্ন

১। জীবদেহের আভ্যন্তরীণ মাধ্যম কাহাকে বলে? ইহার তাৎপর্য কি?
২। চক্রাবর্তনে রক্ত চলাচলের তাৎপর্য কি?
৩। ধমনী, শিরা ও কৈশিক নালীর গঠনে বৈশিষ্ট্য কি?
৪। ধমনীর ও শিরার রক্তে পার্থক্য কি?
৫। কোন কোন ধমনীতে শিরার রক্ত প্রবাহিত হয়? কোন কোন শিরায় ধমনী-রক্ত প্রবাহিত হয়?
৬। হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা কর। হৃৎপিণ্ডে রক্ত একদিকে প্রবাহিত হয় কেন?
৭। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন স্পন্দন কাহাকে বলে?
৮। রক্ত প্রণালী-তন্ত্রের বিভিন্ন অংশে রক্তের চাপ ভিন্ন ভিন্ন হয় কেন?
৯। নাড়ী কাহাকে বলে?
১০। রক্ত-প্রণালী প্রবাহের বিভিন্ন অংশে রক্তের গতিবেগ পার্থক্য হয় কেন এবং কিরূপে হইয়া থাকে?
১১। কৈশিক নালীতে মন্থর রক্ত সঞ্চালনের গুরুত্ব কি?
১২। পৈশিক কার্যকলাপ রক্ত-সংবহনকে কিভাবে প্রভাবিত করে?
১৩। হৃৎপিণ্ডের কাজ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?
১৪। দেহযন্ত্রগুলি রক্তে পূর্ণ হইবার কাজে পরিবর্তন হয় কেন?
১৫। হৃৎপিণ্ড-রক্তনালী-তন্ত্রের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অর্থ কি?
১৬। বিভিন্ন ধরনের কাজের ফলে ব্যায়াম কৌশলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ায় পরিবর্তন আসে কিভাবে?
১৭। হৃৎপিণ্ডের অত্যাধিক অবসাদ কিভাবে হইয়া থাকে?

২৩। রক্তের উপাদান

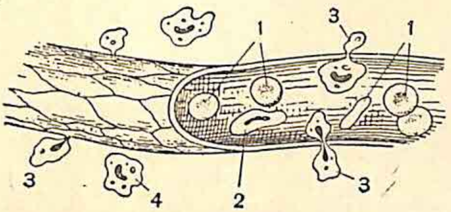
রক্ত অস্বচ্ছ, ইহার রং লাল। ইহা তরল পদার্থ; অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত-কণিকা এই জলীয় পদার্থে ভাসিয়া বেড়ায়; এগুলিকে শুধু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায় (রঙীন চিত্র ৩)। বিশেষ পদার্থ প্রয়োগের দ্বারা রক্তকে জমিয়া তঞ্চিত (clot) হইতে না দিলে রক্তকণিকাগুলিকে জলীয় অংশ হইতে পৃথক করা যায়। অতঞ্চিত রক্ত থিতাইলে সুস্পষ্টভাবে পৃথক দুইটি স্তর দেখা যায়; নীচের অস্বচ্ছ স্তরটিতে থাকে রক্তকণিকাগুলি, ইহার রং গাঢ় লাল এবং একটি অতি পাতলা সাদা আস্তরণে ঢাকা; উপরের স্তরটি অত্যন্ত স্বচ্ছ, ঈষৎ হরিদ্রাভ ও তরল।

রক্তরস (Plasma):

রক্তের তরল অংশকে বলা হয় রক্তরস। রক্তরসের শতকরা ৯০ ভাগ জলীয়; শতকরা ১ ভাগ থাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম কার্বনেট এবং অন্যান্য অজৈব লবণ ঘটিত পদার্থে গঠিত। অবশিষ্টাংশ প্রোটিন (৭%), চিনি (grape sugar) এবং সামান্য পরিমাণে কোষের প্রয়োজনীয় অথবা তাহাদের কার্যপ্রসূত

অন্যান্য জিনিস লইয়া গঠিত। রক্তরসে কিছু কিছু গ্যাসও, বিশেষ করিয়া অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে।

শ্বেত রক্ত কণিকা ঃ



৫৯নং চিত্র—রক্তপ্রণালী হইতে বহিরাগত এবং কোষ-মধ্যস্থিত স্থানে প্রবেশকারী শ্বেত-রক্ত-কণিকা।
রক্তপ্রণালীটি আংশিকভাবে কর্তিত; কর্তিত অংশের মধ্যে 1. লোহিত ও 2. শ্বেত কণিকা দেখা যাইতেছে; 3. শ্বেত কণিকা প্রণালী-গাত্র হইতে বাহির হইতেছে; 4. রক্ত-প্রণালীর বাহিরে ভ্রাম্যমাণ শ্বেত-কণিকা।

যে সূক্ষ্ম সাদা আস্তরণটি গাঢ় লাল তলানিকে ঢাকিয়া রাখে, তাহা শ্বেত কণিকা বা (leucocytes) দ্বারা গঠিত। মেরুদণ্ডী অথবা মেরুদণ্ডহীন উভয় প্রকার প্রাণী-দেহেই এইগুলি পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডীদের দেহে বিভিন্ন ধরনের শ্বেত-কণিকা থাকে এবং প্রত্যেকটিরই আপন আপন বিশিষ্ট চরিত্র আছে।

শ্বেত কণিকা ঠিক এ্যামিবার মত। এ্যামিবার ন্যায় শ্বেত কণিকাও আকৃতি পরিবর্তন করিতে এবং চলিতে পারে। ইহারা রক্ত প্রণালীর গাত্র বাহিয়া এমন কি রক্তস্রোতের বিপরীত দিকেও চলিতে পারে। তাহা ছাড়া ক্ষুদ্রতম রক্তপ্রণালীর পাতলা গাত্র ভেদ করিয়া ইহারা কোষ ও কলা সমূহের অন্তর্বর্তী স্থানে চলিয়া গিয়া দেহের বিভিন্ন কলার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় (৫৯নং চিত্র) অথবা শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর উপরেও আসিয়া পড়ে।

শ্লেষ্মা ঝিল্লীর উপরে আসিয়া কিন্তু ইহারা সাধারণত মরিয়া যায়। প্রদাহের (inflamation) পুঁজে অথবা শ্বাস নালীর প্রদাহে ইহারা প্রচুর সংখ্যায় ধ্বংস হয়। পুঁজের প্রায় সমস্ত অংশই মৃত শ্বেত-কণিকায় গঠিত।

শ্বেত কণিকার সংখ্যা সব সময় সমান থাকে না। ভোজনের পর এবং পেশীর ক্রিয়ার সময় ইহাদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। সাধারণত ইহাদের সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে ৫০০০ হইতে ১০,০০০ পর্যন্ত হইয়া থাকে।

লোহিত কণিকা ঃ

মেরুদণ্ডী জীবের রক্তে শ্বেত কণিকা ছাড়া প্রচুর সংখ্যায় লোহিত কণিকা (erythrocytes) থাকে। ইহাদের জন্যই রক্তের রং লাল। মানবদেহের লোহিত কণিকাগুলির আকৃতি উভয় পার্শ্বে অবতল চাকতির মত। শ্বেত কণিকার সহিত ইহাদের পার্থক্য হইল এই যে ইহাদের নিজস্ব চলিবার বা আকৃতি পরিবর্তনের ক্ষমতা নাই।

মাছ এবং উভচরদের লোহিত কণিকায় একটি বৃহৎ নিউক্লিয়াস থাকে এবং ইহা কণিকা দেহের বৃহৎ অংশ জুড়িয়া অবস্থান করে। সরীসৃপ ও পাখীদের কণিকায় নিউক্লিয়াসটি অপেক্ষাকৃত ছোট। মানুষ ও স্তন্যপায়ী জীবদের কণিকায় কোন নিউক্লিয়াসই নাই; কিন্তু ইহাদের ভ্রূণে কিছুকাল পর্যন্ত নিউ-

ক্লিয়াস থাকে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে জীবজগতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের পথে লোহিতকণিকা ক্রমশ নিউক্লিয়াস হারাইয়াছে; প্রথমে আকারে ছোট হইয়া পরে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছে।

মানুষের রক্তে প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে ৪.৫ হইতে ৫ মিলিয়ন লোহিত কণিকা থাকে। অতএব প্রতিটি শ্বেত কণিকায় ৫০০ হইতে ১০০০ লোহিত-কণিকা আছে।

অনুচক্রিকা (Blood Platelets) :

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে লোহিত কণিকাগুলি হইল নিউক্লিয়াসহীন কোষ; কিন্তু অনুচক্রিকাগুলি কোষই নয়—ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবোপাদানের কণিকামাত্র। শ্বেত ও লোহিত কণিকা হইতেও ক্ষুদ্র অনুচক্রিকাগুলির সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৩ হইতে ৫ লক্ষ।

রক্তপ্রণালী হইতে রক্ত বাহিরে আসার সময় অনুচক্রিকাগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তঞ্চক পিণ্ডে (clots) পরিণত হয়।

রক্তকণিকার উৎপত্তিঃ

শ্বেত কণিকার মত লোহিত কণিকাও মৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মৃত কণিকার স্থান পূরণ করিয়া অহরহ নূতন নূতন কণিকা সৃষ্টি হইতেছে। যে সমস্ত দেহযন্ত্রে কণিকা সৃষ্টি হয়, তাহাদিগকে রক্ত উৎপাদনকারী দেহযন্ত্র বলে। প্রধান রক্ত উৎপাদনকারী দেহযন্ত্র হইল অস্থির লাল মজ্জা। এই স্থানে লোহিত এবং শ্বেত উভয় ধরনের কণিকার উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্লীহা এবং লসিকা-গ্রন্থি হইতেও কোন কোন ধরনের শ্বেত কণিকা সৃষ্টি হয়।

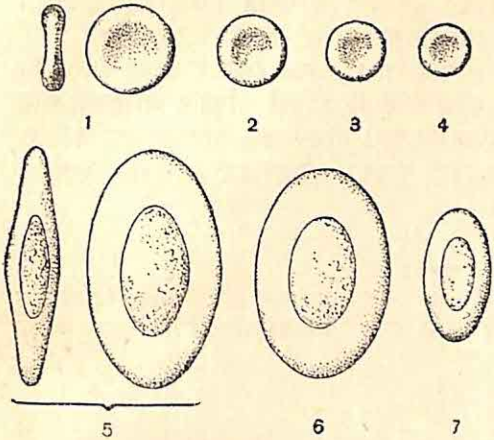
২৪। লোহিত কণিকা ও তাহার কার্যকলাপ

হিমোগ্লোবিনঃ

লোহিত কণিকাগুলি অক্সিজেন বহন করে। লোহিত কণিকার সর্বাপেক্ষা জটিল উপাদান হইল হিমোগ্লোবিন। প্রোটিন এবং লৌহযুক্ত এক বিশেষ রঞ্জন পদার্থের (dye-stuff) যৌগিক প্রক্রিয়ায় হিমোগ্লোবিনের উৎপত্তি। ইহা সহজেই অক্সিজেন গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে পারে। ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়া যাইবার সময় রক্ত অক্সিজেনে সংপৃক্ত হইলে সেই অক্সিজেনের প্রায় সমুদয় অংশ লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সহিত যুক্ত হয়। কিন্তু দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে রক্ত প্রবাহিত হইবার সময় হিমোগ্লোবিন তাহার অক্সিজেন কোষগুলিতে দিয়া দেয়।

লোহিত কণিকার আকার ও আকৃতিঃ

অক্সিজেন লোহিত কণিকার বহির্ভাগ (surface) দিয়া অবশোষিত (absorbed) হয়। বহির্ভাগের আয়তন যত বড়, হিমোগ্লোবিন তত দ্রুত এবং



৬০নং চিত্র—মানুষ ও অন্যান্য ইতর প্রাণীর লোহিত কণিকা উপরের সারিতে নিউক্লিয়াসহীন লোহিত কণিকা; নিম্নের সারিতে কণিকার নিউক্লিয়াস রহিয়াছে।

1. হাতি; 2. মানুষ; 3. ঘোড়া ও গরু; 4. ছাগল ও শূয়র; 5. মৎস্য; 6. ব্যাঙ; 7. পায়রা

সম্পূর্ণতার সহিত অক্সিজেনে সংপৃক্ত হইয়া থাকে। কণিকার আকার এবং আকৃতির উপরেই বহির্ভাগের আয়তন নির্ভর করে। একটি পাথরের নুড়ি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙিলে বহির্ভাগের আয়তনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, দেখা যাইবে যে নুড়িটির বহির্ভাগের আয়তন ভগ্নাংশগুলির মিলিত আয়তন অপেক্ষা অনেক ছোট। অংশগুলি যত ক্ষুদ্র হইবে মিলিত বহির্ভাগের আয়তন তত বেশি হইবে।

৬০নং চিত্রে মানুষের ও বিভিন্ন জন্তুর লোহিত কণিকা দেখান হইয়াছে। স্তন্যপায়ী জীবদের লোহিত কণিকা পাখি, মাছ, এবং উভচরদের কণিকা অপেক্ষা অনেক ছোট। নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্তে মানুষ ও স্তন্যপায়ীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত কণিকাগুলির বহির্ভাগের আয়তন অন্য প্রাণীদের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কণিকার আয়তন হইতে অনেক বেশি। তাহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার হিমোগ্লোবিনের কণাগুলি বহির্ভাগের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় ইহারা অতি সহজেই অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইতে পারে।

মানুষের লোহিত কণিকার উভয় পার্শ্ব অবতল (concave) চাকতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ার জন্য ইহাদের ঘনফলের (volume) তুলনায় বহির্ভাগের আয়তন আরও বাড়িয়া যায়।

এইভাবে মানুষের রক্তকণিকার আকার ও আকৃতি হিমোগ্লোবিনকে অতি দ্রুত ও সম্পূর্ণতার সহিত অক্সিজেনে সংপৃক্ত হইতে দেয়।

নিউক্লিয়াস না থাকার তাৎপর্য:

নিউক্লিয়াস না থাকার জন্য মানুষ ও স্তন্যপায়ী জীবদের লোহিত কণিকা স্বল্প জীবন সম্পন্ন হইয়া থাকে; সেই কারণে অস্থিমজ্জায় প্রতিদিনই কোটি কোটি নূতন নূতন কণিকার উৎপত্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়। অবশ্য সৌভাগ্যের কথা, নিউক্লিয়াস না থাকার জন্য লোহিত কণিকাগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি হিমোগ্লোবিনে পুষ্ট হইয়া থাকে এবং আরো সম্পূর্ণভাবে অক্সিজেনে পূর্ণ হইতে পারে! মানবদেহের পক্ষে এই সুবিধা প্রচুর তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ মানুষের অক্সিজেনের প্রয়োজন অনেক বেশি।

রক্তাল্পতা (Anaemia) ঃ

অসুস্থতা, অপুষ্টি এবং রক্তক্ষয়ে লোহিত কণিকার সংখ্যা গুরুতরভাবে কমিয়া যাইতে পারে। কখন কখনও কণিকার সংখ্যা ঠিকই থাকে, কিন্তু প্রতি কণিকায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমিয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই রক্তের অক্সিজেন অবশোষণের ক্ষমতা কমিয়া যায়। ফলে জীবদেহ যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন পায় না এবং অক্সিজেন ঘটিত প্রক্রিয়া (oxidation) ব্যাহত হয়; সাধারণ দুর্বলতা ও জড়তা জাগে, ক্ষুধামান্দ্য ও ক্লান্তি দেখা যায়। জীবদেহের এইরূপ অবস্থাকে রক্তাল্পতা বা এ্যানিমিয়া বলা হয়।

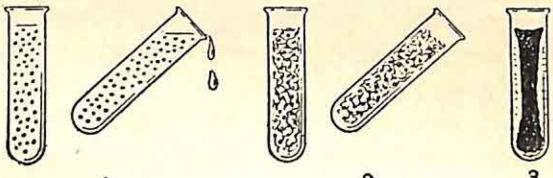
প্রশ্ন ঃ

পার্বত্য অধিবাসীদের লোহিত কণিকার সংখ্যা বেশি (সময় সময় প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে ৮ মিলিয়ন পর্যন্ত) হয় কেন? বাতাসের বিশেষ কোন উপাদানের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে? জীবানুর পক্ষে ইহার গুরুত্ব কি?

২৫। রক্ত জমাট বাঁধা বা তঞ্চিত হওয়া

রক্ত জমাট বাঁধা ঃ

একটি টেস্ট টিউবে রক্তপ্রণালী হইতে সদ্যনিষ্কাশিত রক্ত রাখিলে দেখা যাইবে যে ইহা দ্রুত ঘন হইয়া যাইতেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই রক্ত জমাট বাঁধিয়া

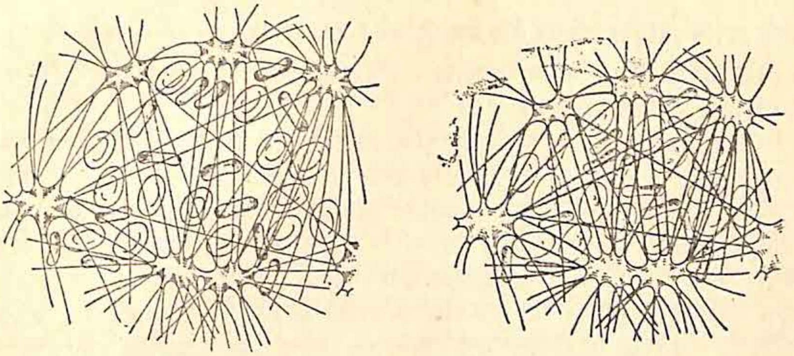


৬১নং চিত্র—রক্তের তঞ্চন

1. শিরা হইতে সংগ্রহ করার অব্যবহিত পরে; 2. তঞ্চিত অবস্থা; 3. তঞ্চিত রক্তের কুঞ্চিত অবস্থা।

জেলির ন্যায় তঞ্চিত পিণ্ডে পরিণত হইবে. কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে তঞ্চিত পিণ্ডটি সঙ্কুচিত হইয়া টেস্ট টিউবের গাত্র হইতে ক্রমশ সরিয়া যাইতেছে এবং ইহার চারিপাশে এক হরিদ্রাভ তরল পদার্থ সঞ্চিত হইয়াছে (৬১নং চিত্র)।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সহায্যে রক্তের জমাট বাঁধা অবস্থা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে রক্তরসের মধ্যে একের পর এক কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম তন্তু আবির্ভূত



৬২নং চিত্র—রক্তের তঞ্চন

ক—তঞ্চনের প্রাথমিক অবস্থা; পরস্পর সন্নিবদ্ধ অনুচক্রিকাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে এবং সেই সব পিণ্ড হইতে ফাইব্রিন তন্তু বাহির হইয়াছে; এই সব তন্তুর মধ্যে রক্ত কণিকা দেখা যাইতেছে। খ—তঞ্চিত রক্তের কুঞ্চিত অবস্থা; ফাইব্রিন তন্তুগুলির আকার মোটা ও ছোট।

হইতেছে। এইগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে একটি ঘন জালের আকার ধারণ করে এবং সেই জালের বুনানির মধ্যে রক্ত কণিকাগুলি আবদ্ধ হইয়া যায় (৬২নং চিত্র)।

ফাইব্রিন ঃ

রক্তরসের মধ্যে অন্যান্য প্রোটিনের সহিত অল্প পরিমাণে ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিন থাকে বলিয়াই রক্ত জমাট বাঁধিতে পারে। ফাইব্রিনোজেন সহজেই কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং দ্রবীভূত অবস্থা হইতে অতি সূক্ষ্ম তন্তুর আকারে তলানি পড়িয়া তঞ্চিত হয়। অদ্রবনীয় অবস্থায় এই প্রোটিনকে ফাইব্রিন বলে।

রক্তপ্রণালী হইতে সদ্যনিষ্কাশিত কিছু পরিমাণ রক্তের উপর ক্ষুদ্র ও পাতলা ছড়ি বা গাছের ডাল দিয়া আঘাত করিতে থাকিলে সহজেই ফাইব্রিন পাওয়া যাইতে পারে। ঐ ছড়ি বা ডালের উপর ফাইব্রিনের পাতলা তন্তুবিশিষ্ট পিণ্ড সঞ্চিত হইবে।

রক্তমস্তু (Serum of the blood) ঃ

ফাইব্রিন পৃথক হইয়া যাইবার পর রক্তের যে অংশ পড়িয়া থাকে তাহা আর জমাট বাঁধিতে পারে না। এই অবস্থায় রক্তকে টেস্ট টিউবের মধ্যে রাখিয়া দিলে কণিকাগুলি তলদেশে থিতাইয়া পড়ে এবং উপরে যে স্বচ্ছ হরিদ্রাভ তরল পদার্থ দেখা যায় তাহাকে বলে রক্তমস্তু। রক্তরসের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে ইহা হইতে ফাইব্রিন পৃথক হইয়া গিয়াছে। সাধারণভাবে তঞ্চিত রক্ত হইতেও রক্তমস্তু পাওয়া যায়। তঞ্চিত পিণ্ড সংকুচিত হইলে ইহা হইতে যে তরল পদার্থ বাহির হয় তাহাকেই রক্তমস্তু বলে।

কিণ্ব পদার্থ বা এনজাইম (Ferments of Enzymes) :

রক্ত জমাট বাঁধার জটিল পদ্ধতি বুঝিতে হইলে জীবদেহের অপূর্ব চরিত্রটি অনুশীলন করিতে হইবে।

দেহের সমস্ত যন্ত্র ও কলার মধ্যে বিভিন্ন ও সময়ে সময়ে জটিল রাসায়নিক রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। ল্যাবরেটরীর মধ্যে এই সব প্রক্রিয়া সৃষ্টি করিতে হইলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হয় যাহা জীবদেহের মধ্যে কখনও ঘটে না। আমরা জানি যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহের গতি নির্ভর করে তাপের উপর; তাপ যত বেশি হইবে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া তত দ্রুত এবং সক্রিয় হইয়া থাকে। জীবদেহের মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত শর্করার অক্সিজেন ঘটিত প্রক্রিয়ার মত বহু প্রক্রিয়া জীবদেহের বাহিরে সৃষ্টি করা সম্ভব হইলেও তাহার জন্য অতি উচ্চ মাত্রায় তাপের প্রয়োজন হয়। কিন্তু জীবদেহের মধ্যে এই একই প্রক্রিয়া স্বাভাবিক দৈহিক তাপেই যথেষ্ট তরান্বিত হইয়া থাকে।

কয়েকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া কতকগুলি পদার্থের উপস্থিতিতে প্রচুর শক্তিতে ও দ্রুত গতিতে ঘটিয়া থাকে। এই পদার্থগুলিকে বলা হয় গতিবর্দ্ধক বা অনুঘটক (catalytic agents) যে কোন জীবদেহেই এইরূপ অনুঘটক পাওয়া যাইতে পারে। তাহাদিগকে বলা হয় গাঁজ বা এনজাইম।

এনজাইমগুলি প্রাণবন্ত জীবানুকোষ দ্বারা সৃষ্ট হয়। ইহাদের ভূমিকা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। জীবদেহের মধ্যে যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলে, তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন এনজাইম সক্রিয় এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

এনজাইমের চরিত্র ঃ

এনজাইমগুলির অন্যতম অপূর্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র হইল এই যে কেবল মাত্র ইহাদের উপস্থিতিই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। ইহারা হইল রাসায়নিক প্রক্রিয়ামধ্যস্থ, অথচ প্রক্রিয়ার সময় ইহাদের পরিমাণের প্রায় কোন পরিবর্তনই হয় না! কয়েক ডজন কিলোগ্রাম জান্তব শর্করাকে চিনিতে পরিণত করিতে অতি সামান্য পরিমাণ এনজাইমই যথেষ্ট।

এনজাইমগুলি স্বাভাবিক দৈহিক তাপেই সর্বোৎকৃষ্ট কাজ করে। তাপ কমাইয়া দিলে ইহাদের কাজ দুর্বল হইয়া পড়ে। ফুটাইলে এনজাইম নষ্ট হইয়া যায়।

এনজাইমগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এই যে ইহাদের কার্যকলাপ সুনির্দিষ্ট। প্রতিটি এনজাইম কতকগুলি সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি মারফত সুনির্দিষ্ট চরিত্রের অভিব্যক্তি দিয়া থাকে।

রক্ত জমাট বাঁধার কাজে এনজাইমের ভূমিকা ঃ

রক্তে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অন্যতম Thrombin রক্তকে জমাট বাঁধিতে সাহায্য করে।

থ্রমবিন সাধারণত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রক্তে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন বিশেষ বস্তু "কর্মকারক" হিসাবে ইহার উপর প্রক্রিয়া সৃষ্টি করিলে তবেই ইহা সক্রিয় হইয়া ওঠে; এবং তখন রক্ত জমাট বাঁধে। স্বাভাবিক অবস্থায় "কর্মকারক" না থাকায় রক্ত

জমাট বাঁধে না। এই "কর্মকারক" থাকে অনুচক্রিকাগুলির মধ্যে। রক্তপ্রণালী হইতে রক্ত বাহিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনুচক্রিকাগুলির ক্ষয় হয় এবং রক্তের মধ্যে সেই ক্ষয়প্রাপ্ত অনুচক্রিকায় "কর্মকারকের" আবির্ভাব হইয়া থাকে; তখন থ্রমবিন সক্রিয় হইয়া ওঠে এবং দ্রবণীয় ফাইব্রিনকে অদ্রবণীয় ফাইব্রিনে রূপান্তরিত করে। রক্তের মধ্যে সব সময়ই চুণ ঘটিত পদার্থ (লাইম বা ক্যালসিয়াম) থাকে; রক্ত জমাট বাঁধার জন্য চুণ ঘটিত পদার্থের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। সোডিয়াম অক্‌জালেটের মত কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ রক্তের সহিত মিশাইলে চুণ ঘটিত পদার্থগুলি থিতাইয়া যায় এবং তাহার ফলে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। শিরা হইতে সংগৃহীত রক্তকে জমাট বাঁধিতে না দিয়া তরল অবস্থায় রাখার জন্য ইহার সহিত সামান্য পরিমাণ সোডিয়াম অক্‌জালেক মিশাইয়া দেওয়া হয়।

রক্তপ্রণালীতে রক্ত জমাট বাঁধা (Thrombosis of blood vessels) :

রক্তপ্রণালীর মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে না। কিন্তু কখনও কখনও বাত (rheumatism) বা অন্য কোন ব্যাধিতে হৃৎপিণ্ড অথবা রক্তপ্রণালীর আভ্যন্তরীণ ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় আক্রান্ত স্থলে রক্ত জমাট বাঁধিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তঞ্চিত পিণ্ড বা Thrombi সৃষ্টি হয়। এইরূপ কোন একটি তঞ্চিত পিণ্ড বা থ্রমবাস (Thrombus) বিচ্ছিন্ন হইয়া রক্তস্রোতের সহিত কোন দেহযন্ত্রের মধ্যে চলিয়া যায় এবং সেইস্থানে কোন রক্তপ্রণালীর মধ্যে রক্তকে জমাট বাঁধায়। মস্তিষ্ক অথবা অন্য কোন দেহযন্ত্রস্থিত রক্তপ্রণালীতে থ্রমবসিস্‌ বা রক্ত জমাট বাঁধিলে গুরুতর অসুস্থতা, এমনকি মৃত্যুও হইতে পারে।

রক্ত জমাট বাঁধার গুরুত্ব :

রক্ত জমাট বাঁধার গুরুত্ব সুস্পষ্ট, তঞ্চিত পিণ্ডটি আহত রক্তপ্রণালীর ক্ষতমুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং পুনরায় রক্তপাত বন্ধ করে। রক্তপ্রণালী হইতে নিঃসৃত হইবার পর রক্ত তঞ্চিত না হইলে সামান্যতম আঘাতেও রক্তপাত বন্ধ হইত না এবং মৃত্যু অবধারিত হইত।

অস্ত্রোপচার করার সময় রক্ত ক্ষয়ের তারতম্য রোগীর রক্ত জমাট বাঁধার গতিবেগের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কোন কোন রোগীর রক্ত এত ধীরে ধীরে জমাট বাঁধে যে অতি সামান্য কাটিয়া গেলেও দীর্ঘকাল রক্তপাত হইয়া থাকে। সেইজন্য অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীর রক্ত জমাট বাঁধার গতিবেগ নির্ধারণ করিয়া লইতে হয়।

সোবিয়েত ইউনিয়নে অস্ত্রোপচারের রোগীদের রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বলিয়া অস্ত্রচিকিৎসকরা সকল রোগীকেই পূর্ণ আশ্বাস দান করিয়াই অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন।

রক্তপাত :

আহত হইলে অথবা ক্ষত হইলে অনেক সময় প্রচুর রক্তপাত হইয়া থাকে। ধমনী, শিরা বা কৈশিকনালী যে-কোনটি আহত হউক, তথা হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতে পারে। ধমনী হইতে রক্তপাতই সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ। ধমনীর মধ্যে উচ্চ চাপের ফলে আহত অংশ হইতে সজোরে ফিন্‌কি দিয়া, সময়ে সময়ে স্পন্দিত ঝরণার ন্যায় রক্তপাত হইতে থাকে।

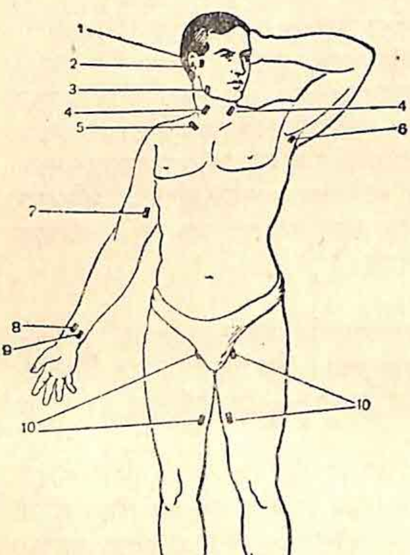
শিরা হইতে রক্তপাত হইলে তাহা সমধারায় বহিয়া থাকে এবং তাহাতে বিশেষ কোন চাপ দেখা যায় না।

শিরা হইতে এবং বিশেষ করিয়া ধমনী হইতে গুরুতর রক্তপাত হইতে ক্ষত-মুখে রক্ত তঞ্চিত হইবার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না, এবং তঞ্চিত হইলেও পিণ্ডগুলি রক্তস্রোতে ভাসিয়া যায়।

চর্মের বহির্ভাগে ক্ষত হইলে সাধারণত কৈশিকনালী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনিকা ও শিরাগুলি আহত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষতের উপরিভাগস্থ সমগ্র অংশে রক্তপাত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবিন্দুতে ভরিয়া যায়। ইহাকে কৈশিকনালীর রক্তপাত বলে।

রক্তপাত বন্ধ করার উপায়ঃ

কৈশিকনালীর এবং সামান্য পরিমাণে ধমনীর ও শিরার রক্তপাতে ক্ষতের উপর প্রথমে গজ, তুলা অথবা খানিকটা গজ-ব্যাণ্ডেজের টুকরা দিয়া তাহার পর কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।



৬৩নং চিত্র—রক্তপাত হইলে ধমনীতে এই সকল অংশে চাপ দেওয়া প্রয়োজন।

1. অকসিপিটাল ধমনী; 2. টেম্পরাল ধমনী; 3. ম্যাক্সিলারি ধমনী; 4. ক্যারটিড ধমনী; 5. সাবক্লোডিয়ান ধমনী; 6. এ্যাকজিলারি ধমনী; 7. ব্রেকিয়াল ধমনী; 8. রেডিয়াল ধমনী; 9. আলনার ধমনী; 10. ফিরলাম ধমনী; 11. এ্যান্টিরিয়ার টিবিয়াল ধমনী; 12. পোস্টিরিয়ার টিবিয়াল ধমনী।

ধমনী হইতে গুরুতর রক্তপাত হইতে থাকিলে অবিলম্বে যে ধমনী হইতে ক্ষতমুখে রক্ত আসিতেছে সেইটি অঙ্গুলি দ্বারা ভাল করিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়। রক্তপাত হইলে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ ধমনীগুলি যে যে স্থানে চাপিয়া ধরিতে হয়, ৬৩নং চিত্রে তাহা দেখান হইয়াছে। নিজের দেহে অঙ্গুলি দিয়া অনুভব করিয়া এই স্থানগুলি দ্রুত এবং সহজেই নির্দিষ্ট করা যায়।

আহত বাহু অথবা পায়ের ধমনী দীর্ঘকাল ধরিয়া চাপিয়া ধরিতে হইলে প্রগণ্ডাস্থি ও উর্বাস্থির অবস্থানে বাঁধন দিতে হয়। বাঁধনের জন্য রবারের নল, চামড়ার কটিবন্ধ, গজ-ব্যাণ্ডেজ কিংবা রুমাল ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। ধমনীকে ভাল করিয়া চাপিবার জন্য বাঁধনের নীচে একটি শক্ত করিয়া জড়ান গজ-ব্যাণ্ডেজ অথবা পরিষ্কার কাপড়ের বল ঢুকাইয়া দিতে হয়। ব্যাণ্ডেজের মধ্যে কোন বাঁধন দুই-তিন ঘণ্টার বেশি রাখা উচিত নয়; কারণ অধিকক্ষণ রাখিলে কলার পচন শুরু হইয়া যাইতে পারে।

ধমনীকে চাপ দিয়া এবং তাহার পর শক্ত করিয়া ব্যাণ্ডেজ দ্বারা বাঁধিয়া রক্ত-পাত আংশিকভাবে বন্ধ করিলে রক্ত শীঘ্র জমাট বাঁধিয়া যায়।

গুরুতর রক্তপাতে উপরোক্ত প্রাথমিক পরিচর্যা করিবার সঙ্গে সঙ্গে অবিলম্বে চিকিৎসককে ডাকিয়া পাঠাইতে হইবে।

মস্তিষ্ক হইতে রক্ত নির্গমন কমাইবার জন্য এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে চলিতে দিবার জন্য আহত লোকটির মস্তক দেহকাণ্ড হইতে কিছুটা নীচু করিয়া এবং পা দুইটি কিছুটা উঁচু করিয়া রাখিতে হয়। গরম জলের থলি অথবা বোতল প্রয়োগ করিতে হয় এবং রোগীকে গরম রাখিবার জন্য বার-বার গরম পানীয় দিতে হয়।

থ্রম্বিন প্রয়োগঃ

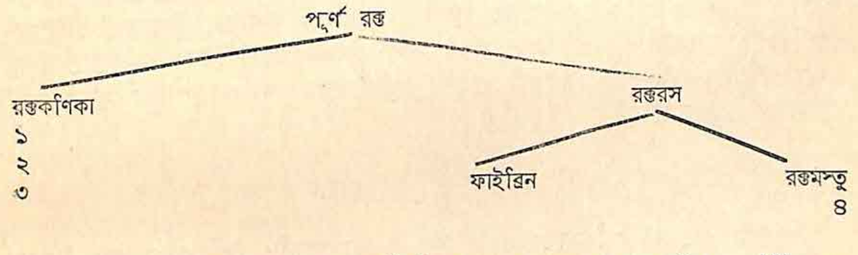
সোবিয়েত বৈজ্ঞানিকগণ রক্তরস হইতে থ্রম্বিন উৎপন্ন করিবার এ পদ্ধতি নির্ধারণে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এই থ্রম্বিনে ভিজান গজ দ্রুত রক্তপাত বন্ধ করে। গত মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে বিশেষ করিয়া মস্তিষ্ক এবং আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রসমূহের আঘাতে এই পদ্ধতি সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

প্রশ্নঃ

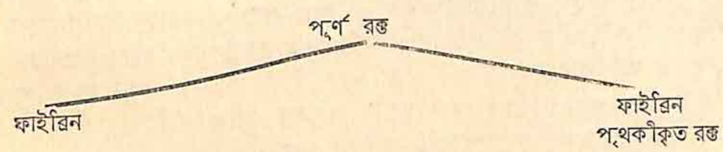
বালক বালিকারা ঠাণ্ডায় বাড়ির বাহিরে খেলিবার সময় কাটিয়া বা ছড়িয়া গেলে সময় সময় বহুক্ষণ ধরিয়া রক্তপাত হইতে থাকে। এইরূপ দীর্ঘস্থায়ী রক্তপাতকে কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে?

অনুশীলনী

১। নীচের রক্তের উপাদান সম্পর্কিত নক্সাটি নকল কর। ১ ২ ৩-এর পরিবর্তে রক্ত-কণিকার নাম লিখ এবং বন্ধনীর মধ্যে তাহাদের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৪ না-লিখিয়া রক্তমস্তুর উপাদানগুলি লিখ।



২। নীচে রক্তের উপাদানের আর একটি ভিন্ন ধরনের নকসা দেওয়া হইল। এইটি নকল করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়া নক্সাটি শেষ কর।



৩। ৬৩নং চিত্রের সাহায্যে রক্তপাত হইলে গুরুত্বপূর্ণ ধমনীগুলির কোন কোন অংশে চাপিয়া ধরিতে হয় নিজ দেহে তাহা স্থির কর।

২৬। রক্তের প্রতিরক্ষা চরিত্র

সংক্রামক ব্যাধি ঃ

জলে, স্থলে, বাতাসে সর্বত্রই অসংখ্য বীজাণু (microbes) বিদ্যমান। খাদ্য ও জলের সহিত অহরহ আমরা এগুলিকে গলাধঃকরণ করিতেছি, বাতাস হইতে নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানিয়া লইতেছি। অধিকাংশ বীজাণু আমাদের পক্ষে ক্ষতি-কারক নয়; কিন্তু কতকগুলি দেহমধ্যে রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে। বীজাণু-সৃষ্ট অসুস্থতাকে সংক্রামক ব্যাধি বলে।

মানুষ সর্বদাই যক্ষ্মা, ডিপথিরিয়া ও অন্যান্য রোগ-বীজাণুর সংস্পর্শে আসিয়া থাকে। কিন্তু বীজাণু দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেই অসুস্থতা ঘটিবে একথা মনে করিবার কারণ নাই। দেহমধ্যে প্রবিষ্ট বীজাণু তাহাদের বংশ-বৃদ্ধির এবং দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে পরাস্ত করিবার অনুকূল অবস্থা পাইলে তবেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

বীজাণু এবং জীবাণুর (প্রাণী দেহ) মধ্যে অহরহ সংগ্রাম চলিয়া থাকে এবং তাহার পরিণামের উপরই স্বাস্থ্য, এমন কি জীবনও নির্ভর করে। কোন সংক্রামক রোগের বীজাণুগুলি যখন দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহকে সেই রোগে সংক্রামিত না করিয়া দ্রুত মরিয়া যায়, তখন তাহাকে সেই ব্যাধিতে অনাক্রম্য বলা হয়।

রোগের উৎপত্তিতে বাধা সৃষ্টি করিবার জন্য আমাদের শরীরের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক প্রতিরোধকারী পদার্থ আছে। উদাহরণস্বরূপ পাকস্থলীর মধ্যে প্রবিষ্ট-কারী বহু বীজাণু পাচক রসের (gastric juice) অন্যতম উপাদান হাইড্রো-ক্লোরিক এ্যাসিডের প্রক্রিয়ার ফলে মরিয়া যায়; শ্লেষ্মাঝিল্লী হইতে ক্ষরিত শ্লেষ্মা বহু বীজাণুর উপর ধ্বংসকারী প্রভাব সৃষ্টি করে অথবা ইহাদের দ্রুত বংশ বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।

প্রদাহ ঃ

ছড়িয়া যাওয়া, পুড়িয়া যাওয়া, ক্ষত হওয়া প্রভৃতি দৈহিক আঘাত কিংবা কলার গাত্রে বীজাণু বা ঘন মাত্রার এ্যাসিডের মত প্রদাহ সৃষ্টিকারী পদার্থের উপস্থিতিতে প্রতিটি দেহযন্ত্র প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে।

এরূপ ক্ষেত্রে আহত স্থানের রক্তনালীগুলি প্রসারিত হয় এবং শ্বেতকণিকা-সমূহ রক্তনালী হইতে বাহির হইয়া নবাগতের ও সমগ্র আক্রান্ত স্থলের চারিপাশে জমা হইতে থাকে। জীবাণুর এই ধরনের প্রতিক্রিয়াকে প্রদাহ বলা হয়। প্রদাহ-স্থলটি রক্তস্রোতের অধিকারহেতু রক্তিম এবং স্বাভাবিক স্থলের তুলনায় বেশি উষ্ণ হয়। কলা ও কোষসমূহের অন্তবর্তী স্থলের অংশ অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়ার জন্য প্রদাহপীড়িত স্থানটি ফুলিয়া ওঠে।

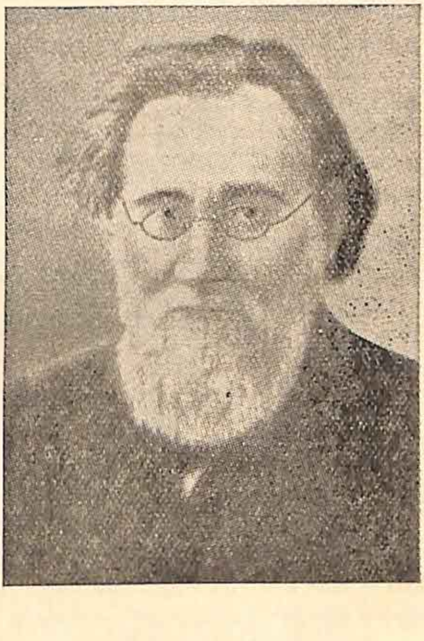
ফুস ফুস, ক্লোমশাখা (bronchi) বা বৃক্ক প্রভৃতি দেহযন্ত্রের প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই দেহের তাপ বাড়িয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু স্থানীয়ভাবেই প্রদাহ সৃষ্টি হইতে পারে। চর্মে আঘাত লাগিলে অথবা বহিরাগত কোন পদার্থ

প্রবেশ করিলে সেই বিশেষ স্থানে চর্মপ্রদাহের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্নায়ুতন্ত্র মেটাবলিজম বা পরিপাকক্রিয়ার উপর প্রভাব খাটাইয়া প্রদাহের প্রতিক্রিয়ার গতি-প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করে।

ছড়িয়া যাওয়া, পুড়িয়া যাওয়া কিংবা জীবানুমধ্যে প্রবিষ্ট বীজানুর আক্রমণ—যে-কোন ধরনের আঘাতের বিরুদ্ধে জীবানুর প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রদাহের প্রতিক্রিয়া দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই সংগ্রাম চলে কীভাবে? ব্যাধির প্রতি অ-সংবেদনশীলতা মূলত কিসের উপর নির্ভর করে? সুবিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক মেচ্নিকভ্ এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

অনাক্রম্যতা তত্ত্বের উদ্ভাবক আই. আই. মেচ্নিকভ্ঃ

বিশ্ববিশ্রুত আই. আই. মেচ্নিকভ্ ১৮৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আট বৎসর বয়সেই প্রাকৃত-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার আসক্তি দেখা দেয়। ২১ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম-বার্ষিক ছাত্র-জীবনেই তাঁহার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া মেচ্নিকভ্ মেরুদণ্ড-হীন প্রাণীদের উপর অনুশীলন চালাইয়া বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন। তরুণ বয়স হইতেই তিনি মানুষের সেবা করার এবং মানুষের সুখের জন্য কাজ করার স্বপ্ন দেখিতেন।



আই আই মেচনিকভ

সৌভাগ্যক্রমে মেচ্নিকভের এই স্বপ্ন সার্থক হয়। ১৮৮২ সালে তিনি এমন এক আবিষ্কার করেন যাঁহাতে তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকে। তিনি প্রমাণ করেন যে—শ্বেতকণিকাগুলির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষার ভূমিকা আছে—ইহারা বীজানুকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে।

জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি মেচ্নিকভ্ সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে জীবানুর সংগ্রাম সম্পর্কে গবেষণা চালাইয়া যান। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকেই অনাক্রম্যতা, অর্থাৎ সংক্রামক রোগে অসংবেদনশীলতা তত্ত্বের উদ্ভাবক বলা যাইতে পারে।

মেচ্নিকভের গবেষণার আর একটি বিষয় ছিল অকাল-বার্দ্ধক্যের সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। জার-শাসিত রাশিয়ায় নিরন্তর বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ায় মেচ্নিকভ্ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে যাইয়া বসবাস করিতে বাধ্য হন।

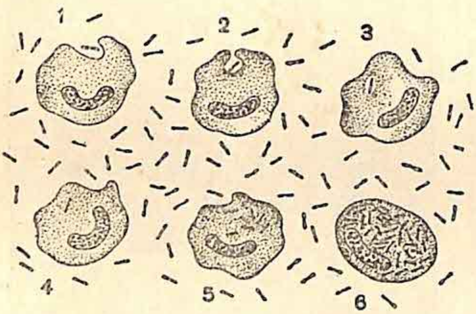
পরবর্তীকালে মেচ্নিকভ্ লিখিয়াছিলেন, "কেহ হয়ত ভাবিতে পারেন যে রাশিয়ায় বিজ্ঞানের কার্যকারিতার দিন এখনও আসে নাই। আমি এই মতের বিরোধী। বরং আমার মতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা রাশিয়ার পক্ষে প্রয়োজন এবং আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যতে ইহার জন্য আরও অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হইবে।"

২৮ বৎসর কাল ফ্রান্সে অবস্থানকালে মেচ্নিকভ্ কচিৎ রাশিয়ায় আসিলেও রুশ-বিজ্ঞানীদের সহিত তিনি নিরন্তর সংযোগ রাখিতেন। প্যারীর বিখ্যাত পাস্তুর গবেষণাগারে (Pasteur Institute) শত শত রুশীয় চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক তাঁহার নেতৃত্বে কাজ করিতেন।

মেচ্নিকভ্ সর্বদাই স্বপ্ন দেখিতেন যে একদিন রাশিয়া মুক্ত হইবে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে, মেচ্নিকভ্ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই মহান সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব সেই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে; ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্বেত-কণিকার ভূমিকা ঃ

শ্বেত-কণিকাদের ভূমিকা সম্পর্কে মেচ্নিকভ্ যে গবেষণা করেন তাহাই তাঁহার অনাক্রম্যতা তত্ত্বের ভিত্তি। শ্বেত-কণিকা বা লিউকোসাইটগুলি তাহাদের সচল উদ্গত অংশের সাহায্যে নিরেট পদার্থকে ঘিরিয়া ধরিয়া নিজেদের দেহের মধ্যে দ্রবীভূত এবং পরিপাক করিতে পারে।



৬৪নং চিত্র—ফেগোসাইটোসিস্
১—৫ বীজাণুকে ঘিরিয়া ধরিয়া ফেলার ক্রমিক পর্যায়; ৬। পুঁজ-কণিকা।

জীবদেহের কোন অংশে আহত বা ক্ষয়প্রাপ্ত কোষ থাকিলে অথবা বীজানু বা অন্য কোন বহিরাগত পদার্থ উপস্থিত হইলে সেই স্থানে প্রচুর সংখ্যক শ্বেত-কণিকা দেখা যায়। ইহারা ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের অবশিষ্টাংশ এবং বহিরাগত বীজানু ধরিয়া ঘিরিয়া ফেলে (৬৪নং চিত্র)। ঠিক এই কারণেই শরীরের প্রদাহ-পীড়িত স্থানে প্রচুর সংখ্যক শ্বেত-কণিকা আসিয়া জমা হয়।

বীজানুগুলিকে ধরা এবং পরিপাক করা ছাড়াও শ্বেত-কণিকারা শরীরের মধ্যে প্রবেশকারী বিভিন্ন অনিষ্টকারী ও বিষাক্ত পদার্থের প্রতিষেধক উৎপন্ন করিতে পারে।

কোষ কর্তৃক বিভিন্ন পদার্থ ও বীজানুর ধ্বংস সাধন বা ফেগোসাইটোসিস (*Phagocytosis*) ঃ

শুধু রক্তে নয়, বিভিন্ন দেহযন্ত্রে, বিশেষত প্লীহা ও যকৃতে এমন কোষ পাওয়া যায় যাহারা বীজানু এবং অন্যান্য পদার্থকে ঘিরিয়া ধরিয়া পরিপাক

করিয়া ফেলিতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ কোন জন্তুর রক্তের মধ্যে নীল বা অন্য কোন রঞ্জনের কণামিশ্রিত তরল পদার্থ ঢুকাইয়া দিলে দেখা যাইবে যে কণাগুলি রক্ত হইতে অদৃশ্য হইয়াছে এবং কিছুক্ষণ পরে বিশেষ ধরনের কোন কোন কোষের মধ্যে পুনরাবির্ভূত হইয়াছে।

যে সমস্ত কোষ বহিরাগত পদার্থকে ঘিরিয়া ধরিয়া গ্রাস করিতে পারে, সেই লিউকোসাইট (বা শ্বেত কণিকা) এবং অন্যান্য কোষকে মেচ্নিকভ্ ফেগোসাইট বা গ্রাসকারী কোষ আখ্যা দেন। ইহারা শুধু বীজানুকে নয়, দেহের আহত ও ক্ষয়িষ্ণু কোষগুলিকেও ধরিয়া পরিপাক করিতে পারে। ফেগোসাইটরা যকৃৎ ও প্লীহার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু লোহিত কণিকাগুলিকে ধরিয়া থাকে; চুলের রঞ্জক (Pigment) বিশিষ্ট কোষগুলিকে গ্রাস করার ফলে চুল সাদা হইয়া যায়। ব্যাঙাচি ব্যাঙে রূপান্তরিত হওয়ার সময় তাহাদের অদৃশ্যমান লেজের কোষগুলির ধ্বংসের কাজে ফেগোসাইটগুলি অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। বিভিন্ন পদার্থকে এইভাবে ধরা এবং গ্রাস করাকে ফেগোসাইটোসিস্ বলে।

মেচ্নিকভের ফেগোসাইটোসিস্ তত্ত্বই সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে জীবানুর সংগ্রামের বর্তমান ধারণার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। ইহা নিশ্চিতরূপেই স্থির হইয়াছে যে ফেগোসাইটরা আক্রমণকারী বীজানুকে কত দ্রুত এবং উদ্যমশীল হইয়া ধ্বংস করিতে পারে ও তাহার সহিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে অসংবেদনশীলতার সম্পর্ক আছে। ফেগোসাইটদের কাজ মন্থর ও ঢিলা হইলে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বীজানুগুলি সহজেই বংশবৃদ্ধি করিতে পারে—এবং তাহার ফলে ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

ফেগোসাইট কর্তৃক বীজানুগুলি দ্রুতগতিতে ধরা এবং গ্রাস করা রক্ত এবং অন্যান্য শারীরিক তরল পদার্থের উপাদানের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। বহুকাল পূর্বেই জানা গিয়াছে যে রক্তকণিকাবিহীন রক্তমস্তু বীজানুকে দুর্বল করিতে পারে, তাহাদের বংশবৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে এবং এমনকি তাহাদের মারিয়া ফেলিতেও পারে। লালা, শ্লেষ্মা এবং অশ্রুতেও এই ধরণের বীজানু-দুর্বল-কারী বস্তু পাওয়া যায়। বীজানুর উপর এই সব পদার্থের ক্রিয়া ফেগোসাইটদের কার্যকলাপকে সহজ ও শক্তিশালী করে।

প্রতিরোধক পদার্থ (Anti body) ঃ

কোন সংক্রামক রোগের বীজানু দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে রক্তে এক বিশেষ প্রতিরোধক পদার্থের (anti body) উৎপত্তি হয়। প্রত্যেকটি প্রতিরোধক পদার্থ নির্দিষ্ট জাতের বীজানুকে ধ্বংস করিতে পারে। অর্থাৎ টাইফয়েড রোগাক্রান্ত কোন লোকের রক্তমস্তুতে যে প্রতিরোধক পদার্থ জন্মায় তাহা টাইফয়েড বীজনুর উপরেই কাজ করিতে পারে, ডিপ্থিরিয়া বীজানুর উপর ইহার কোন ক্রিয়া নাই। অনুরূপভাবে, ডিপ্থিরিয়া রোগীর রক্তমস্তুতে যে প্রতিরোধক পদার্থ জন্মায়, টাইফয়েড বীজানুর উপর তাহার কোন প্রভাব থাকে না।

প্রতিরোধক পদার্থের বিভিন্ন চরিত্র থাকিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার আক্রমণকারী বীজানুগুলি পরস্পরের সহিত জড়িত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিন্ড সৃষ্টি করে; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারা বীজানুগুলিকে দ্রবীভূত করে অথবা বীজানু-সৃষ্ট বিষকে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলে।

বীজানুগুলি নিহত বা দুর্বল করিয়া অথবা তাহাদের বিষকে নিষ্ক্রিয়করণ

দ্বারা প্রতিরোধক পদার্থে ফেগোসাইটদের কার্যকলাপ তীব্রতর করার অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট করে এবং এইভাবে দেহকে শক্তিশালী করিয়া সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সহজসাধ্য করিয়া থাকে। কোন লোকের বিশেষ বিশেষ ব্যাধির প্রতি সংবেদনশীলতা প্রতিরোধক পদার্থের উৎপত্তির উপর নির্ভরশীল।

জীবদেহের অন্যান্য কার্যকলাপের মত প্রতিরোধক পদার্থের উৎপত্তি ও স্নায়ুতন্ত্র, বিশেষত উচ্চস্তরের স্নায়ুতন্ত্র তথা গুরুমস্তিষ্কের উপরিভাগের (কর্টেক্স) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে কোন জীবদেহের ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম-ক্ষমতা তাহার সাধারণ অবস্থা এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

২৭। অনাক্রম্যতা

সব লোকই সকল প্রকার সংক্রামক রোগে সমানভাবে সংবেদনশীল নয়। কোন কোন লোক রোগীর সংস্পর্শে আসিলেও অথবা রোগের পরিচর্যা করিলেও রোগাক্রান্ত হয় না। ব্যাধির প্রতি এই ধরনের অ-সংবেদনশীলতাকে বলা হয় অনাক্রম্যতা (immunity)।

সহজাত অনাক্রম্যতা ঃ

কোন কোন লোক জন্ম হইতেই বিশেষ কোন ব্যাধিতে অ-সংবেদনশীল থাকে। সাধারণত রোগে ভুগিবার পর সেই রোগে অনাক্রম্যতা অর্জিত হয়। কোন লোকের টাইফাস বা বসন্ত হইলে দ্বিতীয়বার সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ লোকটি ঐ রোগে অনাক্রম্যতা অর্জন করে।

এমন অনেক সংক্রামক ব্যাধি আছে যাহাতে আক্রান্ত হইলে অল্পকালের জন্য অনাক্রম্যতা অর্জিত হয়, আবার কোন কোন ব্যাধিতে যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জায় কোন অনাক্রম্যতাই অর্জিত হয় না। জন্মগত এবং অর্জিত অনাক্রম্যতাকে সহজাত বলা হইয়া থাকে।

কৃত্রিম অনাক্রম্যতা ঃ

টিকা অথবা রক্তমস্তু ইন্‌জেকসন দ্বারা কোন কোন ব্যাধিকে কৃত্রিম উপায়ে অনাক্রম্য করিয়া তোলা যায়।

সংক্রামক ব্যাধির প্রতি অসংবেদনশীল করিবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা অতি প্রাচীন কালেই শুরু হইয়াছিল। হাজার বৎসরেরও পূর্বে জর্জিয়াতে বসন্ত রোগের প্রসার প্রতিরোধ করার জন্য বসন্তের পুঁজে সূঁচ ডুবাইয়া সেই সূঁচ সুস্থ ব্যক্তির গায়ে বিদ্ধ করা হইত। স্মরণাতীত কাল হইতে আফ্রিকায় বিষধর সর্প দংশনের সাংঘাতিক পরিণামের বিরুদ্ধে টিকা দেওয়ার প্রথা চালু আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন ইংরাজ গ্রাম্য চিকিৎসক "জেনার" বহু-বৎসরের অনুশীলনের ফলে কৃত্রিম অনাক্রম্যতার এক সঠিক ও নিরাপদ পন্থা আবিষ্কার করেন। জেনার প্রমাণ করেন যে কোন লোককে গো-বসন্তের বীজ দ্বারা টিকা দিলে যৎসামান্য অসুস্থতা সৃষ্টি হইলেও পরে ঐ লোকটি সাংঘাতিক বিষাক্ত বসন্ত ব্যাধির প্রতি অসংবেদনশীল হয়।

জেনারের ঐ তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই রাশিয়া সহ পৃথিবীর সব দেশেই গো-বসন্ত দ্বারা টিকা দেওয়া ব্যাপকভাবে শুরু হইয়া যায়।

কিন্তু টিকার সুস্পষ্ট সাফল্য সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীলেরা জেনারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলিল। তথা কথিত "বিজ্ঞানীরা" প্রচার করিতে লাগিলেন যে

গো-বসন্ত দ্বারা টিকা দিলে মানুষ জন্তুতে পরিণত হইবে। রোম হইতে পোপ ঘোষণা করিলেন যে যাহারা টিকা লইয়াছে তাহারা সব নাস্তিক। পার্লামেন্ট-সভ্যরা টিকা দেওয়াকে জঘন্য অপরাধ আখ্যা দিয়া বক্তৃতা দিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইংলন্ডে টিকা দেওয়া এখনও পর্যন্ত বাধ্যতামূলক নয়।

বর্তমানে বসন্ত, টাইফয়েড, টাইফাস্ ডিপ্থিরিয়া আমাশা ও অন্যান্য রোগে টিকা দেওয়া হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই হীনবল বা মৃত বীজানু শরীরের মধ্যে ইনজেক্সন করা (সূঁচ প্রয়োগে ঢুকাইয়া দেওয়া) হয়।

মানুষকে বসন্তের টিকা দেওয়ার পূর্বে প্রথমে গো-বৎসের দেহে ইঞ্জেক্সন দ্বারা ঐ ব্যাধি সৃষ্টি করা হয়। গো-বৎসটি মৃদু ধরনের বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহার দেহাভ্যন্তরে বীজানুগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে। পশুদেহের বসন্তের ফোস্কা হইতে তরল পদার্থ লইয়া মানুষের দেহে প্রয়োগ করা হয়। হীনবল বীজানগুলি তীব্র ব্যাধি সৃষ্টি করিতে পারে না। শরীরের যে স্থানে টিকা দেওয়া হয় তথাকার চর্মের উপর দুই তিনটি ফোস্কার উৎপত্তি হয়; কখনও কখনও অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং জ্বর হইতে পারে; কিন্তু শীঘ্রই এইসব উপসর্গ দূর হইয়া যায়। টিকা লওয়ার ফলে বসন্তের বীজানু হইতে এমন কি সে বীজানু হীনবল না হইলেও নিরাপদ হওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জীবদেহ দ্রুত প্রতিরোধ-পদার্থ সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করে এবং প্রতিরোধ-পদার্থগুলি নির্দিষ্ট রোগবীজানু ধ্বংস করে।

চিকিৎসায় সিরামের প্রয়োগ ঃ

শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট রোগ বীজানুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করিবার জন্য তথাকথিত 'সিরাম' ইঞ্জেকসন দেওয়া হইয়া থাকে।

ডিপথিরিয়ার বীজানুগুলি সাধারণত গলার মধ্যে টনসিলে অবস্থান করে। কিন্তু ঐ স্থানে অবস্থান করা সত্ত্বেও ইহাদের দ্বারা ক্ষরিত শক্তিশালী বিষ (Toxin) সমগ্র দেহে ছড়াইয়া পড়িয়া তীব্র ব্যাধি সৃষ্টি করে। এই বিষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহে যে অনুরূপ প্রতিরোধ পদার্থের উৎপত্তি হয় তাহার ফলে ডিপথিরিয়ার বীজানু নিঃসৃত বিষ বা টক্সিনের অনিষ্ট-কারিতা দূর হয়। এই প্রতিরোধ-পদার্থ পাওয়া যায় রক্তের মধ্যে এবং ইহাকে বিষঘ্ন বা এ্যাণ্টি-টক্সিন (anti-toxin) বলে। এ্যাণ্টি-টক্সিনের উৎপত্তি দ্রুত ও শক্তিশালী হইলে জীবদেহ ডিপথিরিয়া বিষের অনিষ্টকর প্রভাবকে দোষমুক্ত করিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়া থাকে। অনেক সময় এত দ্রুত রোগ বৃদ্ধি পায় যে জীবদেহ যথেষ্ট পরিমাণ এ্যাণ্টি-টক্সিন সৃষ্টি করার অবকাশ না পাওয়ায় রোগীর মৃত্যু হয়। এরূপ ক্ষেত্রে এ্যাণ্টি-টক্সিন হইতে প্রস্তুত সিরাম সময় থাকিতে রক্ত ও লসিকার মধ্যে ইন্জেকসন্ দ্বারা প্রয়োগ করিলে ইহা সারা দেহে ছড়াইয়া পড়িয়া ডিপথিরিয়ার বিষের অনিষ্টকারিতা নষ্ট করে।

বর্তমানে শুধু ডিপথিরিয়া নয়, অন্যান্য ব্যাধির বিরুদ্ধেও সিরাম ব্যবহার করা হয়। ঔষধ রূপে ব্যবহারের জন্য প্রতিরোধ পদার্থের সিরাম প্রস্তুত করিতে হইলে ঘোড়া অথবা ইঁদুর জাতীয় পশুকে অনাক্রম্য করিয়া লইতে হয়; অর্থাৎ বীজানু কিংবা বীজানুর বিষ ক্রমশ কম হইতে অধিক মাত্রায় ইন্জেকসন্ করিয়া পশুদেহে কৃত্রিম অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা হয়। এইভাবে পশুটির রক্তে

অনুরূপ প্রতিরোধ পদার্থ সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। এখন এই পশুর রক্তমস্তু রোগীর দেহে ইঞ্জেকসন দ্বারা প্রয়োগ করিলে রোগী রক্তমস্তুর সহিত প্রতিরোধ-পদার্থও পাইয়া থাকে।

নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় অনাক্রম্যতা ঃ

অনাক্রম্যতা সৃষ্ট পশুদেহের রক্তমস্তু কোন সুস্থ লোকের দেহে ইন্‌জেকসন্ করিলে যে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয়, তাহার উৎপত্তিতে মানব দেহের কোন ভূমিকা নাই; সে প্রতিরোধ পদার্থ পায় পশুদেহের রক্তমস্তু হইতে। জীবদেহের অংশ-গ্রহণ ব্যতীত যে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হইয়া থাকে তাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা। ইহা সাধারণত স্বল্পস্থায়ী অর্থাৎ একমাসেরও কম স্থায়ী থাকে এবং তাহার পর সিরাম ইন্‌জেকসন করিবার পুনরাবির্ভূত হয়।

প্রতিষেধক টিকা লইলে যে সক্রিয় অনাক্রম্যতার উৎপত্তি হয় তাহা জীবদেহ নিজেই সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং এই জন্যই ইহাকে বলা হয় সক্রিয় অনাক্রম্যতা। ইহার ফলে জীবদেহ নিজের প্রতিরোধ-পদার্থ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা অর্জন করে। সক্রিয় অনাক্রম্যতা বহুকাল পর্যন্ত, সাধারণত কয়েক বৎসর, কখনও কখনও সারা জীবনও স্থায়ী হয়। ইহার উৎপত্তি হইতে কিছু সময় লাগে; টিকা লওয়ার পর এক, দুই বা ততোধিক সপ্তাহ পার হইলে তবেই জীবদেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হইতে থাকে।

অনাক্রম্যতা সৃষ্টির উপর জীবদেহের অবস্থার প্রভাব ঃ

সময়ে সময়ে কোন লোক প্রতিষেধক টিকা লওয়া সত্ত্বেও ব্যাধিতে সংক্রামিত ও আক্রান্ত হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাধির প্রকোপ হয় সামান্য এবং সামান্য অসুস্থতাবোধেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্বভাবতই ব্যাধির প্রতি অসংবেদনশীলতা সব সময় সম্পূর্ণ হয় না; রোগ বীজানুর প্রচণ্ড অনিষ্টকারী শক্তি এবং তাহাদিগকে ধ্বংসকারী প্রতিরোধ-পদার্থ সৃষ্টির ক্ষমতার তারতম্যের উপরে এই সম্পূর্ণতা নির্ভর করে।

ব্যাধির প্রতি সংবেদনশীলতার তারতম্য হইতে পারে; জীবদেহের অবস্থা ও তাহার পরিবেশ অনুপাতে ইহা বাড়িতে অথবা কমিতে পারে।

অত্যধিক ঠাণ্ডা জীবদেহের জৈবিক ক্রিয়াকলাপ স্তিমিত করিয়া ইহাকে দুর্বল করিয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তিও কমাইয়া দেয়। পশুদেহে পর পর কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা ব্যাধির প্রতি সংবেদনশীলতার উপর ঠাণ্ডার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাস্তুর কয়েকটি মুরগীকে তথাকথিত জলবসন্ত দ্বারা সংক্রামিত করেন। ইহার পর কয়েকটি মুরগীর উভয় পা ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া রাখেন। দেখা গেল যে ঠাণ্ডা লাগান মুরগীগুলিই অধিক সংখ্যায় বসন্তে আক্রান্ত হইল।

মানবিক জীবদেহের অবস্থা এবং স্বভাবতঃই ব্যাধির প্রতি তাহাদের সংবেদনশীলতা স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা বহুল পরিমাণে নির্ধারিত হয়। একজন লোক যেভাবে ও যে সামাজিক পরিবেশে জীবন যাপন করে বা কাজ করে, সেই সব অবস্থা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের তথা গুরুমস্তিস্কের কর্টেক্সের মাধ্যমে জীবদেহের উপর প্রক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেই কারণে অবসাদ, নিরুৎসাহী ও অবসন্ন মেজাজ ব্যাধির প্রতি সংবেদনশীলতা বাড়াইয়া দেয়।

সোবিয়েত রাশিয়ায় সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে সাফল্যজনক সংগ্রামঃ

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ১৯১৯ সালে লেনিন এক ডিক্রি-জারি করিয়া টিকা লওয়া বাধ্যতামূলক করিয়া দেন। তাহার পর হইতে এক-কালে জারশাসিত রাশিয়ায় অসংখ্য জীবননাশকারী এবং আরও অসংখ্য মানুষকে অন্ধ ও বিকলাঙ্গকারী বসন্তরোগ বিলুপ্ত হইয়াছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে প্লেগ বা কলেরা আর দেখা যায় না। প্রাক্ বিপ্লব যুগের তুলনায় যক্ষারোগে মৃত্যুহারও বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে স্কুলে ও কিণ্ডার-গার্টেন সমূহে ডিপথিরিয়া ও স্কার্লেট জ্বরের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়। টাইফয়েড, আমাশা ও অন্যান্য ব্যাধির টিকাও ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। ফলে সোবিয়েত ইউনিয়নের খুব অল্প লোকই টাইফাস, আমাশা, স্কার্লেট জ্বর বা ডিপথিরিয়ায় আক্রান্ত হয়, এবং আক্রান্ত হইলেও ব্যাধির প্রকোপ মৃদু ধরনের হইয়া থাকে। ব্যাধির বিরুদ্ধে জীবদেহের সংগ্রামে সাহায্যকারী এবং দ্রুত আরোগ্যকারী ঔষধরূপী সিরাম সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় এখানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া ডিপথিরিয়ার চিকিৎসায় এই সিরামের বিরাট ভূমিকা আছে। জার শাসিত রাশিয়ায় এই ব্যাধিতে অসংখ্য শিশুর জীবনাবসান হইত। সোবিয়েত যুগে ডিপথিরিয়া জনিত মৃত্যু ক্বচিৎ হইয়া থাকে।

জীবদেহের সাধারণ অবস্থা তাহার সামাজিক পরিবেশ অর্থাৎ যে সামাজিক ব্যবস্থার অধীনে মানুষ জীবনযাপন করে ও কাজ করে, তাহার দ্বারা বিপুল-ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমের শোষণ শুধু যে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান কমাইয়া শ্রমশক্তির অপচয় ও শারীরিক অবসাদ ঘটায় তাহা নয়, মানসিক অবসাদও সৃষ্টি করে। এইসব অবস্থার ফলে ব্যাধির প্রতি সংবেদনশীলতা বাড়িয়া যায়। স্বভাবতই বুর্জোয়া দেশগুলিতে শাসকশ্রেণী অপেক্ষা সর্বহারাদের মধ্যেই ব্যাধির প্রকোপ ও মৃত্যু হার বেশি হওয়ার এবং কতকগুলি ব্যাধি শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই।

সোবিয়েত ইউনিয়নে শোষকশ্রেণীকে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রম শোষণের সম্ভাবনা অদৃশ্য হইয়াছে। যেসব সামাজিক অবস্থা স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং ব্যাধির প্রতি সংবেদনশীলতা কমাইতে সাহায্য করে বৎসরের পর বৎসর সেগুলির ক্রমোন্নতি হইতেছে। ফলে প্রাক্ বিপ্লব যুগের তুলনায় রোগ ভোগ, মৃত্যুর হার যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে।

প্রশ্নঃ

পরিবারে কোন সংক্রামক রোগ (যেমন ডিপথিরিয়া) হইলে রোগীর সংস্পর্শে আসিয়াছে এমন লোকের দেহে কিভাবে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা যায়? এই বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য কোন পন্থা গ্রহণযোগ্য নয় কেন তাহা ব্যাখ্যা কর।

২৮। রক্তদান

রক্ত দানে রোগীর মৃত্যুর কারণঃ

কোন কোন ব্যাধিতে এবং গুরুতর রক্তপাতে সুস্থ লোকের দেহ হইতে রক্ত লইয়া রোগীর দেহে রক্তদানের প্রয়োজন হয়।

অতীতে পশুদেহ হইতে রক্ত লইয়া মানবদেহে প্রয়োগ করার বহু প্রচেষ্টা

হয়। কিন্তু এ প্রচেষ্টা মারাত্মক প্রমাণিত হইয়াছে। এমনকি সম্পূর্ণ সুস্থ-দেহী মানুষের রক্তও সব সময় মানুষের দেহে প্রয়োগের উপযুক্ত নয়।

বিশদ অনুশীলন দ্বারা দেখা গিয়াছে যে লোহিত কণিকাগুলির পরস্পর জড়িত হইয়া যাওয়াই রক্ত প্রবিষ্ট করাইবার পর রোগীর মৃত্যুর কারণ।

ভেড়ার রক্তের সহিত মানুষের রক্তমস্তু মিশ্রিত করিলে অনুবীক্ষণের সাহায্যে লোহিত কণিকাগুলির পরস্পর জড়িত হওয়া দেখা যাইতে পারে। দেখা যাইবে যে লোহিত কণিকাগুলির পৃথক পৃথক অবস্থার পরিবর্তে বহুসংখ্যক কণিকা জড়িত অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডে পরিণত হইয়াছে। কখনও কখনও একজনের রক্তের তরল অংশের সহিত অপর একজনের লোহিত কণিকা মিশ্রিত করিলেও ঐ একই অবস্থা ঘটিতে পারে। দেহ মধ্যে রক্ত প্রবিষ্ট করাইবার সময় এইরূপ অবস্থা ঘটিলে ক্ষুদ্র পিণ্ডগুলি রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধাইয়া (থ্রমবোসিস্) স্বাভাবিক রক্ত চলাচল বন্ধ করে এবং তাহার ফল মারাত্মক হইতে পারে।

লোহিত কণিকাগুলিকে জড়িত হইতে হইলে দুইটি অবস্থার প্রয়োজন; প্রথমত, রক্তরসের মধ্যে এমন এক প্রতিরোধ পদার্থের উপস্থিতি প্রয়োজন যাহার ফলে কণিকাগুলি জড়িত হইবে; দ্বিতীয়ত, লোহিত কণিকাগুলির মধ্যে এমন এক বস্তুর প্রয়োজন যাহার উপর ঐ প্রতিরোধ পদার্থটি কাজ করিতে পারে। মানুষের রক্তরসের মধ্যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরোধ-পদার্থ থাকিতে পারে এবং ইহাদের কাজ করিবার জন্য লোহিত কণিকার মধ্যেও দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থাকিতে পারে।

রক্তের প্রকৃতি বিন্যাস (Blood grouping) ঃ

রক্তে কখনও একই সঙ্গে প্রতিরোধ-পদার্থ এবং যাহার উপর ইহা কাজ করে সেই বস্তুটির উপস্থিতি থাকিতে পারে না। যদি সেইরূপই হইত, তাহা হইলে রক্তরস নিজের লোহিত কণিকাগুলির সহিত জড়িত হইয়া রক্ত চলাচল অসম্ভব করিয়া তুলিত।

প্রতিরোধ পদার্থ এবং যে বস্তুর উপর এই পদার্থ কাজ করে, রক্তে তাহাদের উপস্থিতি অনুসারে সমস্ত মানুষকে প্রধানত চারিটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়।

লোহিত কণিকায় প্রাপ্ত বস্তুতে ল্যাটিন 'A' ও 'B' (ক ও খ) এবং অনুরূপ প্রতিরোধ-পদার্থকে গ্রীক a (আলফা) ও b (বিটা) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

প্রতিরোধ পদার্থ a ও b বিশিষ্ট লোকদিগকে প্রথম দলে ফেলা হইয়াছে। ইহা নিশ্চিত যে এইসব লোকের লোহিত কণিকার A বা B জাতীয় প্রতিরোধ পদার্থ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় দলের লোকদের রক্তে শুধু b প্রতিরোধ পদার্থ আছে; সুতরাং ইহাদের লোহিত কণিকায় A বস্তু থাকিতে পারে—কিন্তু B বস্তু কোনমতেই থাকিতে পারে না। অপর পক্ষে তৃতীয় দলের লোকদের রক্তরসে প্রতিরোধ পদার্থ a এবং লোহিত কণিকায় B বস্তু থাকিবে। চতুর্থ দলের লোকদের লোহিত কণিকায় A ও B উভয় বস্তুই উপস্থিত আছে; ইহাদের রক্তরসে প্রতিরোধ পদার্থ a ও b কোনটিই নাই এবং থাকিতেও পারে না।

দেহে রক্ত দানের (transfusion) সময় রোগীর দেহে প্রবেশকারী লোহিত কণিকাগুলি যাহাতে জড়িতবন্ধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রক্ত কণিকার উপর ক্রিয়াশীল প্রবেশকারী প্রতিরোধ পদার্থগুলি হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং প্রথম দলের লোকদের রক্তে লোহিত কণিকায় A ও B বস্তু না থাকায় ইহাদের রক্ত যে-কোন লোকের দেহে প্রবেশ করান যাইতে পারে। কিন্তু ঐ দলের রক্তে প্রতিরোধ পদার্থ a ও b দুই-ই থাকায় ঐ দলভুক্ত রোগীর দেহে সম দলীয় লোকের রক্ত ভিন্ন অন্য কোন রক্ত দেওয়া যাইবে না।

প্রতিরোধ পদার্থ এবং যে বস্তুর উপর এই পদার্থ কাজ করে, রক্তে তাহাদের উপস্থিতি অনুসারে সমস্ত মানুষকে প্রধানত চারিটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়।

কোন রোগীর দেহে রক্তদান করিতে হইলে দাতার (যাহার দেহ হইতে রক্ত সংগ্রহ করা হয়) রক্ত কোন দলভুক্ত হওয়া প্রয়োজন তাহা ১নং তালিকায় দেখান হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, কোন দাতার রক্ত প্রথম দলভুক্ত হইলে তাহা সব রোগীর দেহেই প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে; আবার চতুর্থ দলভুক্ত লোকের রক্ত শুধু সেই দলভুক্ত লোকের দেহেই প্রবিষ্ট করান যায়।

দাতার রক্ত	প্রথম দল a, b	দ্বিতীয় দল A, b	তৃতীয় দল B, a	চতুর্থ দল A, B
প্রথম দল a, b	সম্ভব	সম্ভব	সম্ভব	সম্ভব
দ্বিতীয় দল A, b	অসম্ভব	সম্ভব	অসম্ভব	সম্ভব
তৃতীয় দল B, a	অসম্ভব	অসম্ভব	সম্ভব	সম্ভব
চতুর্থ দল A, B	অসম্ভব	অসম্ভব	অসম্ভব	সম্ভব

রক্তদানের গুরুত্ব :

দাতা ও রোগীর রক্ত পূর্বে পরীক্ষা করিয়া লওয়ার ফলে রক্তদান (transfusion) সম্পূর্ণ নিরাপদে ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। রক্তদানের দ্বারা বহু ব্যাধিতে রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে। প্রচুর রক্তপাতে, যেমন আঘাতে, রক্তদানের বিশেষ তাৎপর্য আছে।

অন্য কোন দেশেই সোবিয়েতের মত এত প্রচুর পরিমাণে রক্তদান পদ্ধতির প্রচলন নাই। সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা রক্ত সঞ্চয় করার নতুন পন্থা, এমনকি মৃতের রক্ত ব্যবহার করার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় রক্তদান ব্যবস্থার বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছিল। এই সংগঠনের কাজের ফলে সোবিয়েত বাহিনীর হাজার হাজার আহত সৈনিকের জীবন রক্ষা হইয়াছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রের পুরোভাগে পাঠাইবার জন্য বড় বড় শহরে রক্ত সংগ্রহের ও সঞ্চয়ের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। দেশের স্বাধীনতা-রক্ষাকারীদের জীবন রক্ষার জন্য ৫৫ লক্ষ সোবিয়েত নরনারী নিজেদের রক্তদান করিয়াছিলেন।

৪। শ্বসন যন্ত্র

২৯। শ্বাস যন্ত্রের তাৎপর্য

অক্সিজেনের গুরুত্ব ঃ

জীবানুর মধ্যে অক্সিজেন ঘটিত প্রক্রিয়ার (oxidation) জন্য জীবানুর অক্সিজেন প্রয়োজন। অক্সিজেন ঘটিত প্রক্রিয়ার সময় এবং অন্যান্য যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোষ পদার্থগুলি বিভক্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই সময় প্রচ্ছন্ন কর্মশক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া কোষ ও কলাসমূহের ক্রিয়া-কলাপের ফলে উদ্ভূত বিযাক্ত পরিত্যক্ত পদার্থগুলি অক্সিজেন ঘটিত প্রক্রিয়ার ফলেই অনিষ্টকারিতা হইতে মুক্ত হয়।

অক্সিজেন ঘটিত প্রক্রিয়ার ফলে যেসকল পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যে অন্যতম প্রধান হইল কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা কার্বনিক এ্যাসিড।

জীবানু ও তাহার পরিবেশের মধ্যে গ্যাসের আদান প্রদান ঃ

জীবানু প্রতিনিয়তই তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ মাধ্যম হইতে অক্সিজেন গ্রহণ এবং অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করিয়া থাকে। জীবানু ও তাহার বহিস্থ পরিবেশের মধ্যে গ্যাসের এই আদান প্রদানকে শ্বাসকার্য বলে।

কোন কোন সামুদ্রিক মেরুদণ্ডহীন জীব তাহাদের দেহগাত্র মারফৎ জল হইতে অনায়াসেই অক্সিজেন গ্রহণ বা অবশোষণ করিতে পারে। একইভাবে ইহারা ইহাদের শরীরে উদ্ভূত কার্বনিক এ্যাসিড পরিত্যাগ করিতে পারে। অবশ্য বহু মেরুদণ্ডহীন জীবের পৃথক শ্বাস যন্ত্র থাকে এবং তাহার দ্বারা জীবানু ও তাহার বহিস্থ পরিবেশের মধ্যে গ্যাসের আদান প্রদানের যথেষ্ট সুবিধা হয়।

মেরুদণ্ডী জীবদেহে শ্বাসযন্ত্র ঃ

প্রত্যেক মেরুদণ্ডী জীবের শ্বাসযন্ত্র থাকে; এমনকি ব্যাঙের শ্বাস-প্রশ্বাস চর্ম দিয়া চলিলেও ইহাদেরও শ্বাসযন্ত্র আছে। প্রাণী জগতের ক্রমবিকাশের পথে অন্যান্য দেহযন্ত্রের মত শ্বাসযন্ত্রেরও পরিবর্তন হইয়াছে এবং ইহার জটিলতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডী জলচরদের শ্বাসযন্ত্র হইল ইহাদের ফুল্‌কা বা কানকুয়া (gills)। জলচর হইতে ক্রমশ স্থলচরে রূপান্তরিত হইবার পর বাতাসের থলি বা ফুস্‌ফুসের উৎপত্তি হয়। ডিপ্‌নোই মাছ ও কিছু কিছু উভচরদের কানকুয়া ও ফুসফুস দুই-ই থাকে; এগুলি অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র হিসাবে কাজ করে।

কোন কোন নিম্নস্তরের উভচরদের (যেমন প্রোটিয়াস) ফুসফুসের থলির গাত্রটি মসৃণ হওয়ার ফলে রক্তপ্রণালীসমূহ ও ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বাতাসের মধ্যে সংযোগস্থল খুবই অপ্রশস্ত। সালমান্দারের ফুসফুস থলিতে ছোট ছোট খাঁজগুলি বাতাস অবশোষণের পরিসর বাড়াইয়া দেয়।

উভচরদের ফুসফুসে যথেষ্ট পরিমাণে গ্যাসের আদান প্রদান হইতে পারে না। অতীতের মত এখনও কানকুয়াই ইহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রধান যন্ত্র। ব্যাঙের ফুসফুসে অবশোষণের পরিসর যথেষ্ট বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও ইহাদের দেহে প্রধানত শ্লেষ্মাবৃত্ত চর্মের মধ্য দিয়াই গ্যাসের আদান প্রদান চলে। ফুস-ফুস কাটিয়া বাহির করিয়া লইলেও ব্যাঙ বাঁচিয়া থাকে; কিন্তু ফুসফুস অক্ষত

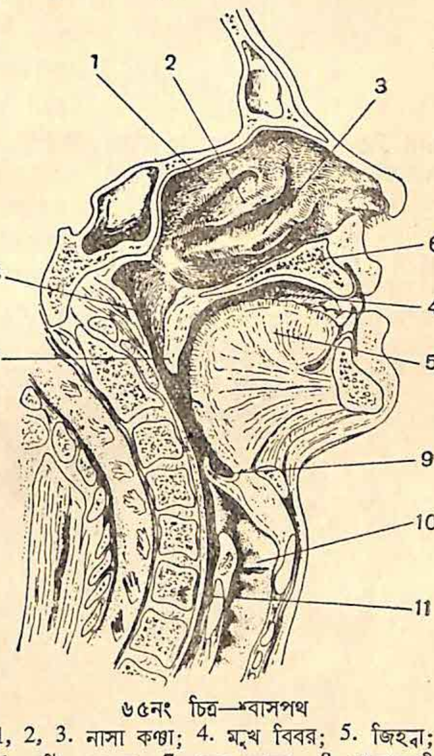
রাখিয়া চর্মের মধ্য দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ করিয়া দিলে ইহারা মরিয়া যাইবে।

সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী জীবদের ফুসফুসই শ্বাসপ্রশ্বাসের একমাত্র যন্ত্র; এবং ইহার বাতাস অবশোষণের পরিসর বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৩০। শ্বাস-যন্ত্রসমূহের গঠন ঃ

শ্বাসনালী ঃ

মানুষ কেবলমাত্র ফুসফুস দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া থাকে। ফুসফুসে প্রবেশ করিবার পূর্বে বাতাসকে এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়। শ্বাস-পথের শুরু নাসা-গহবর হইতে; ইহা মুখবিবর হইতে সম্মুখে একটি কঠিন (কঠিন তালু) এবং পিছনে একটি কোমল (নরম তালু) প্রাচীর দ্বারা পৃথক থাকে (৬৫নং চিত্র)। নাসিকার বহির্প্রান্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমগুলি ধূলা ও অন্যান্য বাহিরের জিনিসকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়। নাসা-গহবর একটি নিবিড় প্রাচীর দ্বারা দক্ষিণ ও বাম অর্ধে বিভক্ত। প্রতি অর্ধের বহির্গাত্র হইতে নাসা-কণ্ডা উদ্গত হইয়াছে; এগুলি নাসা-গহবরকে বাতাস যাতায়াতের কতকগুলি অপরিসর ফাটলে বিভক্ত করিয়াছে (৬৬নং চিত্র)।



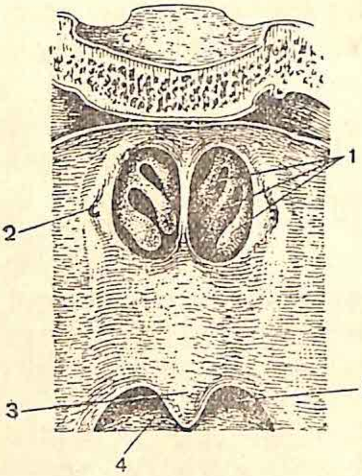
৬৫নং চিত্র—শ্বাসপথ

1, 2, 3. নাসা কণ্ডা; 4. মুখ বিবর; 5. জিহ্বা; 6. কঠিন তালু; 7. নরম তালু; 8. খাদ্যনালী 9. উপজিহ্বা; 10. স্বরযন্ত্র (স্বরতন্ত্রী দেখা যাইতেছে); 11. গলনালী।

প্রশ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া বাতাস নাসা-গহবর হইতে গলবিলের (Pharynx) নাসিকাংশে প্রবেশ করে। গলবিলের নিম্নাংশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—সম্মুখের অংশকে বলা হয় শ্বাস-নালী এবং পিছনের অংশের নাম খাদ্যনালী (Oesophagus)।

শ্বাসনালীর উপরের অংশকে স্বরযন্ত্র (Larynx) বলা হয় (৬৭ নং চিত্র)। **স্বরযন্ত্রের গাত্রে** কয়েকটি সচল তরুণাস্থির সংযোজন আছে। ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম থাইরয়েড তরুণাস্থিটি স্বরযন্ত্রের সম্মুখ ভাগে প্রসারিত। ইহা সহজেই হাত দিয়া

অনুভব করা যায়। স্বরযন্ত্রের সম্মুখে থাইরয়েডের উপরে থাকে উপজিহ্বা (epiglottis)। খাদ্য গলা দিয়া নামিবার সময় ইহা স্বরযন্ত্রের প্রবেশপথকে বন্ধ করিয়া দেয়।



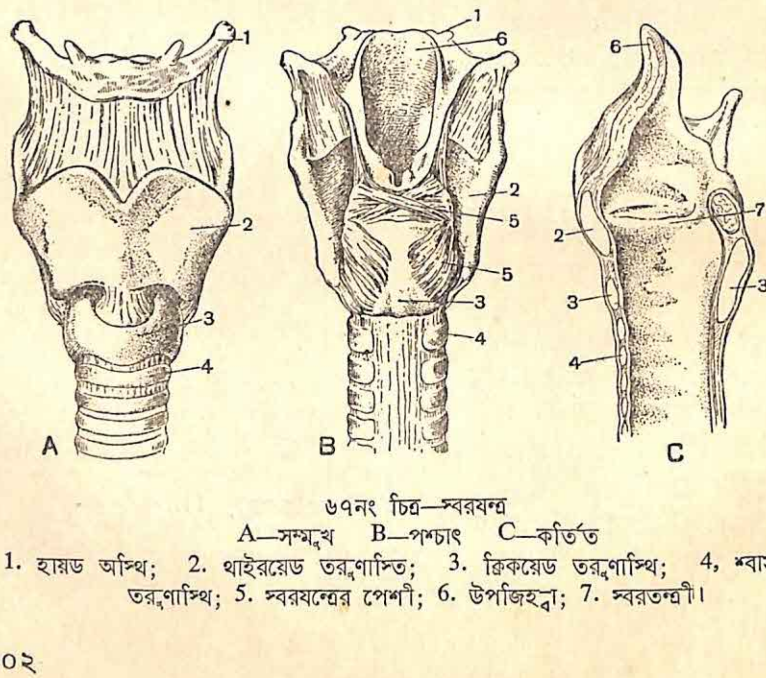
৬৬নং চিত্র—নাসাগহ্বর (পশ্চাৎ হইতে খাদ্যনালী—নাসাংশের পার্শ্ব দিয়া দেখা যাইতেছে)

1. নাসা কণ্ডা; 2. মধ্য-কর্ণের গহ্বর পর্যন্ত প্রসারিত নালিকার মুখ; 3. আলজিহ্বা; 4. জিহ্বার পশ্চাদ-ভাগের পিছনের অংশ; 5. মুখ বিবর।

স্বর-যন্ত্র সমূহ ঃ

স্বরযন্ত্রের মধ্যে ইহার সম্মুখ হইতে পিছনে প্রসারিত স্বরতন্ত্রী (vocal cords) নামে দুইটি শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর ভাঁজ আছে। এই ভাঁজ দুইটির অন্তবর্তী প্রণালীকে গ্লটিস (glottis) বলা হয় (৬৮নং চিত্র)।

স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় স্বর-তন্ত্রী দুইটি শিথিল হইয়া গ্লটিস্‌টি খুলিয়া যায়। কিন্তু স্বরতন্ত্রী প্রসারিত হইলে গ্লটিস্ অপরিসর হইয়া পড়ে এবং তখন ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত বাতাসে স্বর-তন্ত্রীদ্বয়ে কম্পন হইতে থাকে। পিয়ানোর তারে কম্পনের মত তখন ইহা বাতাসে শব্দ-তরঙ্গ তুলিয়া ধ্বনির সৃষ্টি করে। মানুষের স্বরে বিভিন্ন সুরের তারতম্য নির্ভর করে স্বরতন্ত্রী দ্বয়ের ঘনত্ব, দৈর্ঘ্য ও প্রসারণের উপর। মুখ-গহ্বর, জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় এবং স্বরযন্ত্র মানুষের বাক্যোচ্চারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।



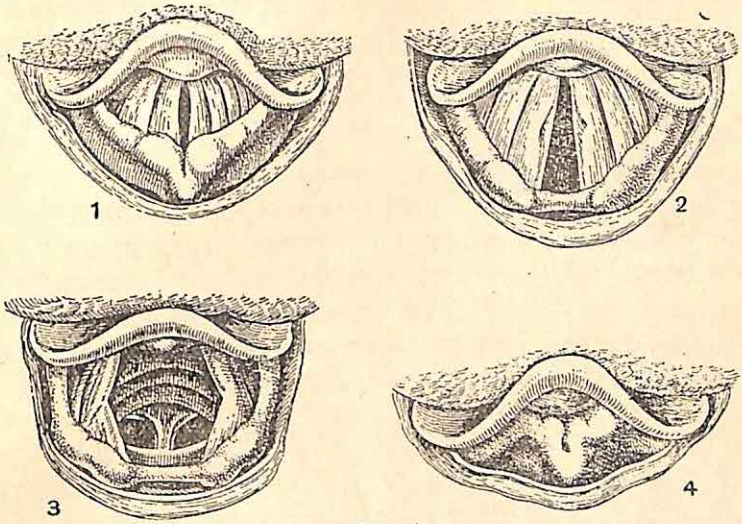
৬৭নং চিত্র—স্বরযন্ত্র

A—সম্মুখ B—পশ্চাৎ C—কর্তিত

1. হায়ড অস্থি; 2. থাইরয়েড তরুণাস্তি; 3. ক্রিকয়েড তরুণাস্থি; 4, শ্বাসনালীর তরুণাস্থি; 5. স্বরযন্ত্রের পেশী; 6. উপজিহ্বা; 7. স্বরতন্ত্রী।

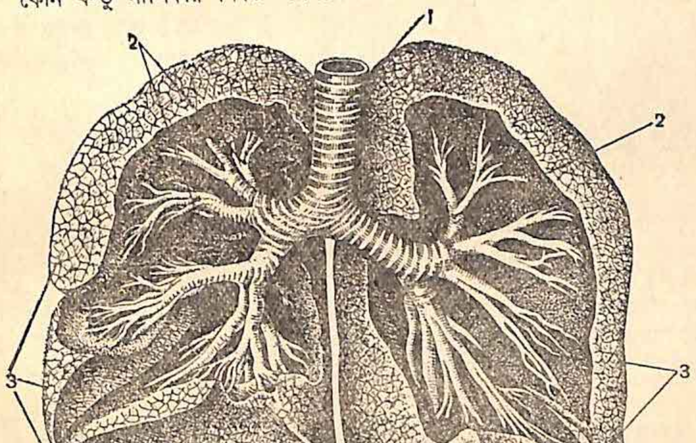
কণ্ঠনালী (trachea) এবং ক্লোমশাখা (Bronchi) ঃ

স্বরযন্ত্রের (larynx) নিম্নভাগ হইতে প্রসারিত শ্বাসনালীর অংশকে কণ্ঠ-



৬৮নং চিত্র—গ্লটিস (উপরের দৃশ্য)

1.শব্দোচ্চারণের সময়; 2. প্রশ্বাস গ্রহণের সময়; 3. গভীরভাবে প্রশ্বাস নেওয়ার সময় (পশ্চাতে শ্বাসনালী দুইটি ক্লোমশাখায় বিভক্ত হওয়া দেখা যাইতেছে); 4. তীব্র গন্ধযুক্ত কোন বস্তু নাসিকার নিকট আনিলে প্রতিবর্তন ক্রিয়ায় গ্লটিস বন্ধ হওয়া।



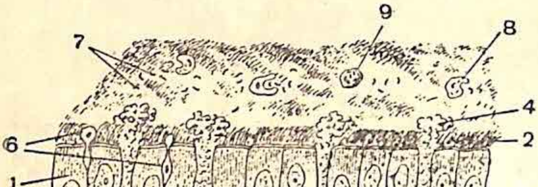
৬৯নং চিত্র—ফুসফুস (ক্লোমশাখাগুলির শাখায়িত হওয়া দেখাইবার জন্য ফুসফুসের কিছু অংশ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে)।

1. শ্বাসনালী; 2. ক্লোমশাখা; 3. ফুসফুস।

নালী (trachea) বলা হয়। ইহা দুইটি ক্লোমশাখায় বিভক্ত হইয়া একটি দক্ষিণ ও অপরটি বাম ফুস ফুসে প্রবেশ করে (৬৯ নং চিত্র)। ক্লোমশাখা দুইটি ফুসফুসের মধ্যে বার বার শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়। কণ্ঠনালী ও ক্লোমশাখায় গাত্রে কতকগুলি অর্ধবৃত্তাকার তরুণাস্থি ইহাদিগকে স্থিতিস্থাপক ও নিভাঁজ রাখে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবাধে বাতাসকে যাইতে দেয়।

শ্লেষ্মা-ঝিল্লী ঃ

শ্বাস-নালীটি শ্লেষ্মা-ঝিল্লী দ্বারা আবৃত থাকে। এই শ্লেষ্মা-ঝিল্লীতে পৃথক পৃথক এবং দলবদ্ধভাবে অবিরাম শ্লেষ্মা-ক্ষরণকারী গ্রন্থি-কোষ সমূহ অবস্থান করে। প্রশ্বাসের বাতাসের সহিত ধূলিকণা বা বীজাণু প্রবেশ করিলে সেগুলি শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর আর্দ্র গাত্রে আটকাইয়া যায়। ফলে শ্বাসনালীর পথে চলমান বাতাস প্রায় সম্পূর্ণ নির্মল থাকে। তাহা ছাড়া শ্লেষ্মা-বীজাণুকে দুর্বল করিয়া ইহাদের বৃদ্ধিক্ষমতা কমাইয়া দেয় এবং বিষক্রিয়াকে নষ্ট করে। শ্লেষ্মা-ঝিল্লীতে ধৃত কিছু কিছু বীজাণু মরিয়াও যায়।



৭০নং চিত্র—শ্বাসপথের শ্লেষ্মা-ঝিল্লী
1. সোঁয়াযুক্ত কোষ; 2. সোঁয়া; 3. শ্লেষ্মা ক্ষরণকারী গ্রন্থি কোষ; 4. শ্লেষ্মা; 5 ও 6. শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর উপরি-দেশে শ্বেতকণিকারা বাহির হইয়া আসিতেছে; 7. বীজানু; 8. একটি শ্বেতকণিকা বীজানুগুলিকে ঘিরিয়া ধরিয়া ফেলিতেছে; 9. একটি ভূজ-কণিকা (মৃত শ্বেত-কণিকা)।

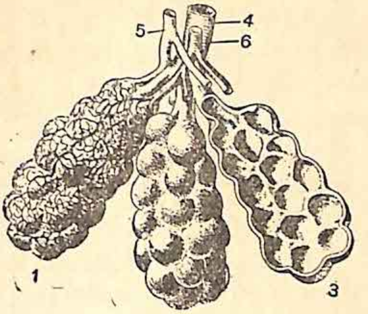
বীজাণু গ্রাসকারী শ্বেত কণিকারা রক্তপ্রণালী সমূহ হইতে আন্তঃ-কোষ-স্থান সমূহের ভিতর দিয়া প্রতিনিয়তই শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর উপরে চলাচল করিতেছে। নাসা-নিঃসৃত শ্লেষ্মাতে সব সময়ই মৃত শ্বেতকণিকা বা "পূঁজ কণিকা" দেখা যাইবে।

শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর অধিকাংশই কোষেই সোঁয়া (cilia) নামক অসংখ্য সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় উদগত অংশ আছে (৭০ নং চিত্র)। ইহারা প্রতিনিয়তই সঞ্চরণশীল। ফলে ঝিল্লীর বহির্ভাগে গমের ক্ষেতে বাতাসের হিল্লোলের মত তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। প্রতিটি সোঁয়া বাতাসের প্রবেশপথাভিমুখে দ্রুত অবনমিত হইয়া আবার ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। এই সঞ্চরণশীলতার দ্বারা সোঁয়াগুলি শ্লেষ্মা ও তাহার সহিত ধূলিকণা ইত্যাদিকে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া দেয়।

ফুসফুসের বাতাসের থলি (alveolar sacs) :

অনধিক অর্ধ মিলিমিটার ব্যাসের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুক্লোম-নলিকাগুলি

কতকগুলি বাতাসের থলিতে আসিয়া শেষ হইয়াছে। বাহির হইতে লক্ষ্য করিলে এই থলিগলিতে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁপা অর্ধবৃত্তাকার স্ফীতি দেখা যাইবে; এইগুলিকে বায়ুকোষ (alveoli) বলে (৭১ নং চিত্র)। বায়ুকোষের গাত্রে একটি চ্যাপ্টা ধরণের কোষ-স্তবক এবং তাহার বহির্ভাগে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তপ্রনালীর একটি ঘন জালি থাকে। ফুসফুসের বাতাস ও রক্তকে পৃথককারী একটি পাতলা ঝিল্লীর মধ্য দিয়া বায়ুথলির অভ্যন্তরে রক্ত ও বাতাসের মধ্যে গ্যাসের আদান প্রদান চলিয়া থাকে; এই ঝিল্লীটি বায়ুথলির গাত্র ও রক্তপ্রণালী সমূহ দ্বারা গঠিত।



৭১নং চিত্র—বাতাসের থলি

1. বাতাসের থলির গাত্রে ঘন রক্তনালীর জালিকা; 2. রক্তনালীগুলি অপসৃত হইয়াছে (স্ফুরিত বায়ুকোষ দেখা যাইতেছে); 3. কর্তিত ও উন্মুক্ত বাতাসের থলি (বায়ু-কোষের গহ্বর দেখা যাইতেছে); 4. একটি অতি ক্ষুদ্র ক্লোমশাখা; 5. একটি শিরা; 6. একটি ধমনী।

বায়ু-কোষ বা থলিগুলির সংখ্যাধিক্য (প্রায় ৩০ লক্ষ) এবং কোষের মত গঠনাকৃতির জন্য ফুস ফুসের আভ্যন্তরীণ পরিধি খুবই ব্যাপক। সমস্ত বায়ুথলিগুলি খুলিয়া পাশাপাশি খুলিয়া পাশাপাশি জোড়া লাগাইলে ইহাদের বিস্তৃতি ১০০ বর্গমাইল পর্যন্ত হইতে পারে। বাতাস ও রক্ত প্রণালী সমূহের মধ্যে যোগাযোগের এই ব্যাপক পরিধির জন্য গ্যাসের আদান প্রদানে যথেষ্ট সুবিধা হয়।

প্লুরা (Pleura) :

বক্ষ-গহ্বরের ভিতরের অংশ এবং উভয় ফুসফুসেরই বহিরাংশ প্লুরা নামক একটি সদা আর্দ্র মসৃণ আবরণিক কলার ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত থাকে। ক্লোমশাখা ও রক্তপ্রণালী সমূহ যে স্থানে ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেইস্থানে ফুসফুসকে আবৃতকারী প্লুরা ফুসফুসের মূল হইতে উঠিয়া বক্ষগহ্বরের ভিতরের আবরণ তৈয়ারী করে। ফলে প্রতিটি ফুসফুস চারিদিকে একটি থলি দ্বারা এমনভাবে আবৃত যে উহারা সর্বত্রই পরস্পরের গাত্রের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে তাহাদের মধ্যে কোন রন্ধ্র থাকে না।

বক্ষগহ্বরে ফুসফুসের অবস্থান ঃ

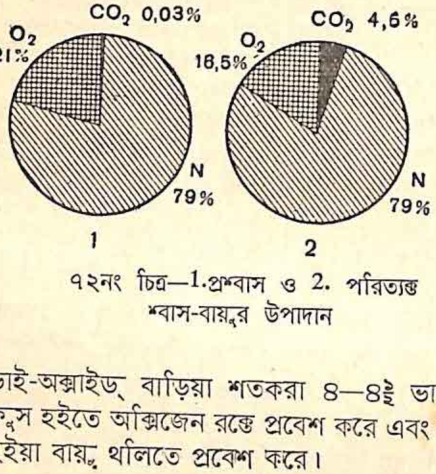
ফুসফুস সমগ্র বক্ষগহ্বর ভরিয়া এবং ইহার গাত্রে নিবিড়ভাবে লাগিয়া থাকে; শুধু হৃৎপিন্ডের স্থানটি খালি থাকে। এইজন্য বাতাসের থলির স্থিতিস্থাপক কলাগুলি স্ফীত অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু বক্ষগহ্বর কাটিয়া উন্মুক্ত করিলে অনেক পরিমাণ বাতাস ফুসফুস হইতে বাহির হইয়া যায়, এবং তাহার ফলে ফুসফুস চুপসাইয়া গিয়া বক্ষগহ্বরের অতিক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে। কিন্তু ভ্রূণ অথবা নবজাত শিশুর ফুসফুস সম্পূর্ণ চুপসান অবস্থায় থাকে।

যে মুহূর্তে শিশু তাহার প্রথম প্রশ্বাস গ্রহণ করে (অর্থাৎ প্রথম কাঁদিয়া ওঠে), সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস বাতাসে পূর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার পর সারাজীবন স্ফীত অবস্থায় বক্ষগহ্বরের গাত্রে নিবিড়ভাবে লাগিয়া থাকে। ফুসফুসের গাত্রে বাতাসের আভ্যন্তরীণ চাপের জন্যই ইহা ঘটিয়া থাকে; কিন্তু ইহার বহিরাংশ বায়ুহীন বদ্ধ থলির দ্বারা আবৃত থাকার জন্য কোন চাপ সৃষ্টি হয় না। এই থলিটি প্লুরার দুইটি স্তবক দ্বারা গঠিত; একটি বক্ষগহ্বরের গাত্রে এবং অপরটি ফুসফুসের বহির্গাত্রে জুড়িয়া থাকে। ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বাতাসের চাপের জন্য প্লুরার উভয় স্তবক পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত।

৩১। ফুসফুস ও কলার মধ্যে গ্যাসের আদান-প্রদান

শ্বাস প্রশ্বাসের বাতাসের উপাদান ঃ

বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সহিত ফুসফুস হইতে নির্গত বাতাসের (অর্থাৎ শ্বাসের) উপাদান তুলনা করিলে (৭২নং চিত্র) অনায়াসেই বোঝা যাইবে যে জীবদেহ ও তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ মাধ্যমের মধ্যে অবিরাম গ্যাসের আদান প্রদান চলিতেছে। বায়ুমণ্ডলের বাতাসে অক্সিজেনের হার শতকরা ২১ ভাগ পর্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইডের হার শতকরা এক ভাগের কয়েক শতাংশ মাত্র। নিঃশ্বাসে নির্গত বায়ুতে অক্সিজেন কমিয়া শতকরা ১৬ ভাগ পর্যন্ত হয়, কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ বাড়িয়া শতকরা ৪—৪½ ভাগ হইতে পারে। ইহার কারণ ফুসফুস হইতে অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্ত হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসৃত হইয়া বায়ু থলিতে প্রবেশ করে।



৭২নং চিত্র—1. প্রশ্বাস ও 2. পরিত্যক্ত শ্বাস-বায়ুর উপাদান

কলার মধ্যে গ্যাসের আদান-প্রদান ঃ

কলার মধ্যে প্রবাহিত রক্ত অক্সিজেনে সংপৃক্ত থাকে; এই রক্ত কৈশিক নালী-গাত্রের মধ্য দিয়া লসিকা ও পরে কোষ মধ্যে প্রবেশ করে। কোষের মধ্যে গাঁজগুলি (ferment) বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া কোষ মধ্যে প্রবেশকারী অক্সিজেন অবিলম্বে গাঁজগুলির প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে অক্সিডাইজ করে। এই অক্সিজেন-ক্রিয়ার ফলে কার্বনিক এ্যাসিড্ সৃষ্টি হয়, তাহা চতুস্পার্শ্বস্থ লসিকায় এবং তথা হইতে রক্তপ্রণালী সমূহের গাত্র দিয়া রক্ত মধ্যে প্রবেশ করে।

গ্যাসের পরিব্যাপ্তি ঃ

গ্যাসের আদান প্রদানের মূলে আছে সমস্ত গ্যাসের এক সাধারণ চরিত্র—অর্থাৎ, চতুস্পার্শ্বস্থ মণ্ডলে সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ার চরিত্র। ইহাকে বলা হয় গ্যাসের পরিব্যাপ্তি। উদাহরণ স্বরূপ কোন গন্ধযুক্ত পদার্থের কথা ধরা যাইতে পারে। পোড়া খাদ্যের গন্ধ শুধু পাকশালার গ্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—ধীরে ধীরে সমগ্র বাড়িতেই ছড়াইয়া পড়ে।

তরল পদার্থের মধ্যেও অথবা তরল পদার্থ ও গ্যাসের মধ্যেও গ্যাসের পরিব্যাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কোন তরল পদার্থের মধ্যে অধিক পরিমাণে গ্যাস থাকিলে এবং বায়ুমণ্ডলে যদি সেই গ্যাসের পরিমাণ কম থাকে, তাহা হইলে গ্যাসটি তরল পদার্থ হইতে ক্রমে ক্রমে বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইবে। গ্যাসযুক্ত পানীয়, যেমন সোডা ওয়াটারের বোতলের মুখ খুলিলে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়; ঐ পানীয়ের মধ্যস্থিত প্রচুর পরিমাণ কার্বনিক এ্যাসিড্ গ্যাস বুদ্‌বুদের আকারে বোতল হইতে বাহির হইয়া যায়। তরল পদার্থের তুলনায় বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাসের আধিক্য ঘটিলে গ্যাসের পরিব্যাপ্তি বিপরীতমুখী হইবে। ঘরের মধ্যে এক গ্লাস চুণের জল রাখিয়া দিলে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড তরল পদার্থে চলিয়া যাইবে, গ্লাসের চুণের জল ক্রমশ ঘোলা হইয়া আসিবে, কারণ, ইহা ধীরে ধীরে প্রায় অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেটে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরস্থিত বাতাসের তুলনায় ফুসফুসগামী রক্তে অধিক পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও কম অক্সিজেন থাকে। সেই কারণে বাতাসের অক্সিজেন ফুসফুসের মধ্যে চলিয়া যায় এবং রক্তের কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে বাহির হইয়া আসে।

পরিব্যাপ্তির নিয়ম অনুযায়ী বাতাসের অক্সিজেন ছাড়া অন্যান্য গ্যাসও রক্তে প্রবেশ করিবে। সেই কারণে রক্তে নাইট্রোজেনও পাওয়া যায় কিন্তু ইহা জীবদেহের মধ্যে কোন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি না করায় এবং ক্ষয়িত বা অবশোষিত না হওয়ায় রক্তে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অপরিবর্তনীয় থাকে।

হিমোগ্লোবিনের তাৎপর্য ঃ

ফুসফুস হইতে আগত ধমনীরক্তে পরিব্যাপ্তির নিয়ম অনুসারে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকা উচিত তাহা অপেক্ষা বেশি অক্সিজেন থাকে। ইহার কারণ রক্তে প্রবিষ্ট সমস্ত অক্সিজেনই মুক্ত অবস্থায় থাকে না; একটি বৃহৎ অংশ অবিলম্বে লোহিত কণিকার অভ্যন্তরস্থ হিমোগ্লোবিনের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। হিমোগ্লোবিনের সহিত যুক্ত এবং রক্তরস হইতে অপসৃত ঘাটতি অক্সিজেন পূর্ণ করিবার জন্য ফুসফুসের বাতাস হইতে নূতন অক্সিজেন রক্তের মধ্যে সরবরাহ হইয়া থাকে। হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতি এবং ফুসফুসের কৈশিক নালীসমূহে রক্তের ধীর গতির জন্য রক্তে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন অবশোষিত হয়। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনে সংযুক্ত হইবে কিনা তাহা চতুস্পার্শ্বস্থ মাধ্যম অর্থাৎ রক্তরসে কি

পরিমাণ অক্সিজেন আছে তাহার উপর নির্ভর করে। অক্সিজেন রক্তরসে গিয়া নিজের পরিমাণ বৃদ্ধি করার পর হিমোগ্লোবিন দ্বারা অবশোষিত হইতে থাকে। সুতরাং রক্তরসে অক্সিজেন যত অধিক পরিমাণে দ্রবণীয় হইবে, লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন সেই পরিমাণে অক্সিজেনসংযুক্ত হইবে। অপর পক্ষে রক্তরসে অক্সিজেনের পরিমাণ যে হারে কমিবে, হিমোগ্লোবিন ও অক্সিজেনের যৌগিক অবস্থা সেই হারে ভাঙিগয়া মুক্ত গ্যাস রক্তরসে প্রবেশ করিবে।

রক্তসংবহনতন্ত্রের দৈহিক চক্রে কৈশিক নালী দিয়া যাত্রাপথে রক্তের বেশ কিছু পরিমাণ অক্সিজেন পরিব্যাপ্তির কারণে রক্তরস হইতে অক্সিজেনহীন কলারসে চলিয়া যায়। ফলে রক্তরসে অক্সিজেনের পরিমাণও কমিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে হিমোগ্লোবিন তাহার সহিত যুক্ত অক্সিজেন ছাড়িতে আরম্ভ করে, এবং তখন ঐ অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসে ও পরে কলারসে চলিয়া যায়।

এইভাবে রক্ত অক্সিজেনের সক্রিয় বাহক হিসাবে কাজ করে। রক্তে অক্সিজেন শুধু দ্রবণীয় অবস্থায় থাকে না, হিমোগ্লোবিনের সহিত অস্থিতিশীল রাসায়নিক যৌগিক রূপেও অবস্থান করে।

রক্তের দ্বারা কার্বনিক এ্যাসিডের পরিবহন ঃ

পরিব্যাপ্তির নিয়মের তুলনায় রক্তে কার্বনিক এ্যাসিডের পরিমাণও বেশি থাকে। অক্সিজেনের মত কার্বনিক এ্যাসিডও রক্তের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগে অবস্থান করায় রক্ত প্রচুর পরিমাণে কার্বনিক এ্যাসিড বহন করিয়া থাকে; কার্বনিক এ্যাসিড রক্তরসে সোডিয়ামের সহিত এবং লোহিত কণিকায় পটাসিয়ামের সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করে।

কয়লার ধোঁয়ার বিষক্রিয়া ঃ

বায়ুমণ্ডলের অন্যতম গ্যাস হইল কার্বন মনোক্সাইড (C O); ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কয়লার জৈবিক পদার্থগুলি সম্পূর্ণরূপে না পুড়িলে ধোঁয়ায় কার্বন মনোক্সাইড প্রধান উপাদান হিসাবে অবস্থান করে। লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন অপেক্ষা কার্বন মনোক্সাইডের সহিত অধিকতর স্থিতিশীল সংযোগ সৃষ্টি করে। কার্বন মনোক্সাইড বাতাস হইতে রক্তে প্রবেশ করিলে অবিলম্বে লোহিত কণিকার দ্বারা অবশোষিত হইয়া রক্তের তরল অংশকে আরও নূতন কার্বন মনোক্সাইড সরবরাহের জন্য মুক্ত করিয়া দেয়। ফলে গ্যাসের পরিব্যাপ্তি বন্ধ হয় না, রক্তের মধ্যে কার্বন মনোক্সাইডের নূতন নূতন সরবরাহ আসিতে থাকে এবং প্রতিবারেই লোহিত কণিকার সেই গ্যাস অবশোষণ করিয়া লয়। এই কারণে বায়ুমণ্ডলে অল্প পরিমাণ কয়লার ধোঁয়া রক্তে ক্রমশ অধিক পরিমাণে জমা হইয়া থাকে।

হিমোগ্লোবিনের যে অংশ কার্বন মনোক্সাইডের সহিত যুক্ত হয় তাহা অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইতে পারে না। সেই জন্য কোন লোক কয়লার ধোঁয়ায়

বিষাক্ত হইলে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং তাহার ফলে শরীরের বিভিন্ন দেহযন্ত্রে স্বাভাবিক অক্সিজেনঘটিত প্রক্রিয়া ভাঙিগয়া পড়ে।

কয়লার ধোঁয়ায় বিষাক্ত হইলে প্রাথমিক পরিচর্যা :

চুলা গরম অবস্থায় কয়লা সম্পূর্ণ পুড়িয়া যাওয়ার পূর্বে ধূমনালী বন্ধ করিয়া দিলে কয়লার ধোঁয়ায় শরীর বিষাক্ত হওয়া প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা। শিরঃপীড়া, নিঃশ্বাসের কষ্ট, বমনোদ্রেক, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি এই বিষক্রিয়ার লক্ষণ। গুরুতর ক্ষেত্রে তড়কা বা স্নায়বিক আক্ষেপ, অজ্ঞান হওয়া, এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় সর্বপ্রথম কাজ হইল রোগীকে মুক্ত বাতাসে লইয়া যাওয়া এবং তাহার পর নাসিকার সম্মুখে স্পিরিট ঘটিত এ্যামোনিয়া ধরিয়া বা নাসিকার মধ্যে সুড়সুড়ি দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করিতে হয়। ইহাতে কাজ না হইলে কৃত্রিম শ্বাস প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হইবে।

৩২। শ্বাস চলাচল

ফুসফুসে বায়ু চলাচল :

ফুসফুসে বায়ু চলাচল হইলে তবেই বায়ুমণ্ডল ও রক্তের মধ্যে গ্যাসের আদানপ্রদান ঘটিতে পারে; প্রথমোক্তটি আবার শ্বাসযন্ত্রসমূহের সচলতার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। শ্বাসযন্ত্রের পেশীগুলি সংকুচিত হইলে বক্ষগহ্বরের আয়তনে পরিবর্তন সাধিত হয়। ইহা আবার ফুসফুসের আয়তনে পরিবর্তন ঘটায়।

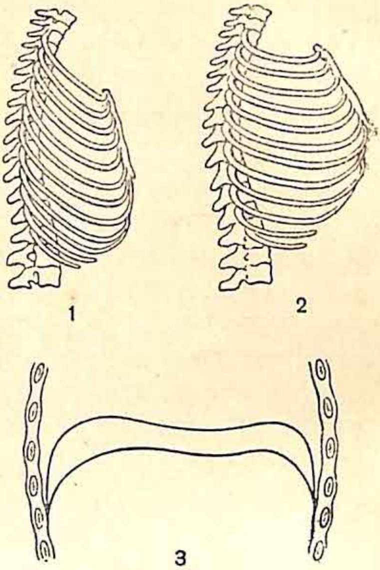
বক্ষগহ্বর প্রসারিত হইলে ফুসফুস ফুলিয়া ওঠে এবং বাহিরের বাতাস ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়া গেলে ফুসফুস দুইটি সঙ্কুচিত হয় এবং ইহাদের মধ্যস্থিত অতিরিক্ত বাতাস বাহির হইয়া আসে। বক্ষগহ্বরের আয়তনের পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি ও হ্রাসের ফলে বাতাস ফুসফুসের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রবেশ করে ও বাহির হইয়া আসে।

বক্ষগহ্বরের আয়তনের পরিবর্তন :

বক্ষগহ্বর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে (উপর হইতে নীচে ও পরিধিতে) উভয় দিকেই বাড়িতে পারে। দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি হয় বক্ষ ও উদর গহ্বরের মধ্যস্থিত প্রাচীর মধ্যচ্ছদার (diaphragm) পৈশীক সংকোচনের দ্বারা। এই পেশীটি সঙ্কুচিত

হইয়া মধ্যচ্ছদার গম্বুজকে নীচের দিকে টানিয়া আনে ও ইহাকে চ্যাপ্টা করিয়া দেয় (৭৩নং চিত্র)।

বক্ষ-গহ্বরের আয়তন শুধু মধ্যচ্ছদার আকৃতির উপর নির্ভর করে না, পঞ্জরাস্থি-গুলির অবস্থানের উপরেও নির্ভরশীল। পঞ্জরাস্থিগুলি মেরুদণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া উপর হইতে নীচের দিকে তির্যক গতিতে প্রথমে পার্শ্বে ও পরে সম্মুখের দিকে প্রসারিত। ইহারা কশেরুকাসমূহের সহিত সচল সংযোজনায় যুক্ত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট পেশীগুলির সংকোচনে কিছু পরিমাণে উঠিতে ও নামিতে পারে। পঞ্জরাস্থিগুলি উপরের দিকে উঠিয়া উরঃফলককে সম্মুখে ও উপরের দিকে টানিয়া তুলিলে বক্ষগহ্বরের ব্যাস বাড়িয়া যায়; পঞ্জরাস্থিগুলি নীচের দিকে নামিলে এই ব্যাস কমিয়া যায় (৭৩নং চিত্র)।



৭৩নং চিত্র—বক্ষের আয়তনের পরিবর্তন

1. পঞ্জরগুলি নামিয়া আসিলে (শ্বাস-ত্যাগের সময়); 2. পঞ্জরাস্থিগুলি উপরে উঠিলে; 3. শ্বাসত্যাগ (উপরের রেখা) ও প্রশ্বাস গ্রহণের সময় (নিম্ন রেখা) মধ্যচ্ছদার উপরিভাগের অবস্থা।

স্বাভাবিক শান্ত শ্বাসপ্রশ্বাস ঃ

কোন লোক শান্তভাবে শুইয়া অথবা বসিয়া থাকিলে মিনিটে ১৫ অথবা ১৬ বার শ্বাস প্রশ্বাস চলে। প্রতিবার শ্বাস ক্রিয়ায় ফুসফুসস্থিত বাতাসের অপেক্ষাকৃত কম অংশ—৫০০ কিউবিক সেন্টিমিটার বা তাহারও কম আদান-প্রদান হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক শান্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় বাতাস টানিয়া লইলে মধ্যচ্ছদার পেশী-গুলি সঙ্কুচিত হইয়া ইহার গম্বুজটি আরও চ্যাপ্টা হইয়া যায়। পঞ্জরাস্থি-সমূহের অন্তর্বর্তী এবং পঞ্জরাস্থি ও কশেরুকাসমূহের মধ্যবর্তী প্রশ্বাসের পেশীগুলি একসঙ্গে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় পঞ্জরাস্থিগুলি উপরের দিকে আকর্ষিত হইয়া উরঃফলক ও পঞ্জরাস্থিসমূহের মধ্যে সংযোগকারী তরুণাস্থিগুলিকে প্রসারিত করে। প্রশ্বাসের পেশীগুলির সংকোচন বন্ধ হওয়া মাত্রই উপরের দিকে আকর্ষিত পঞ্জরের তরুণাস্থিগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে এবং সেই সময় পঞ্জরাস্থিগুলিকে নামাইয়া দেয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে উদরগহ্বরের যন্ত্রগুলির চাপে মধ্যচ্ছদার উপরের অংশ স্ফীত হইয়া ওঠে।

সুতরাং শান্ত নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাস টানিয়া লইবার কালেই (inspiration) পেশীগুলির সংকোচন হয়। শ্বাস ত্যাগের কার্য (expiration) হয় নিষ্ক্রিয়-ভাবে এই সময় পেশীগুলি শিথিল হইয়া পড়ে।

গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস ঃ

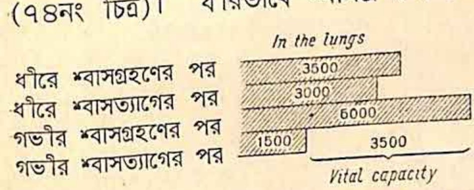
গভীর নিশ্বাসের ফলে ফুসফুসে বায়ু চলাচল বাড়িয়া যায়, শ্বাস এবং প্রশ্বাস উভয়ই গভীরতর হয়।

গভীরভাবে প্রশ্বাস দ্বারা আমরা অতিরিক্ত ১৫০০ হইতে ২০০০ সি.সি. বাতাস ফুসফুসের মধ্যে টানিয়া লইতে পারি। গভীর প্রশ্বাসের সময় পূর্ব-বর্ণিত পেশীগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি পেশীর (যেমন পঞ্জরাস্থি হইতে অংশ ফলক ও প্রগণ্ডাস্থি পর্যন্ত প্রসারিত এবং স্কন্ধের পেশীগুলি) সাহায্য লইতে হয়।

শান্তভাবে শ্বাস ত্যাগের সময় ১০০০ হইতে ১৫০০ সি. সি. বাতাস বাহির করিয়া দেওয়া সম্ভব। এইরূপ শ্বাস ত্যাগের সময় মধ্যচ্ছদাটি আরও উত্তল (convex) হইয়া পঞ্জরাস্থিগুলিকে টান দিয়া নামাইয়া দেয়। পঞ্জরাস্থিসমূহের অন্তর্বর্তী শ্বাস ত্যাগের পেশীগুলি এবং প্রধানত উদরের, বিশেষ করিয়া পাকস্থলী গাত্রের পেশীগুলির জন্যই ইহা ঘটিয়া থাকে। উদরের পেশীগুলির উপরের প্রান্ত বক্ষগহ্বরের নিম্নপ্রান্তে সংযুক্ত; সুতরাং সঙ্কুচিত হইয়া ইহারা বক্ষগহ্বরকে টানিয়া নামাইয়া পাকস্থলীর গহ্বরের উপর চাপিয়া ধরে (পাকস্থলী ভিতরের দিকে "প্রসারিত হয়") এবং মধ্যচ্ছদাকে বক্ষগহ্বরের মধ্যে আরও উত্তল করিয়া তোলে।

ফুসফুসের বায়ুধারক শক্তি (Vital capacity) :

প্রশ্বাসের গভীরতার উপর বক্ষগহ্বরের আয়তনের তারতম্য নির্ভর করে (৭৪নং চিত্র)। ধীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চলিবার সময় এই আয়তনের অল্পই তারতম্য ঘটিয়া থাকে; কিন্তু গভীর প্রশ্বাসের দ্বারা ফুসফুসের মধ্যে কয়েক লিটার বাতাস টানিয়া লওয়া যায়।



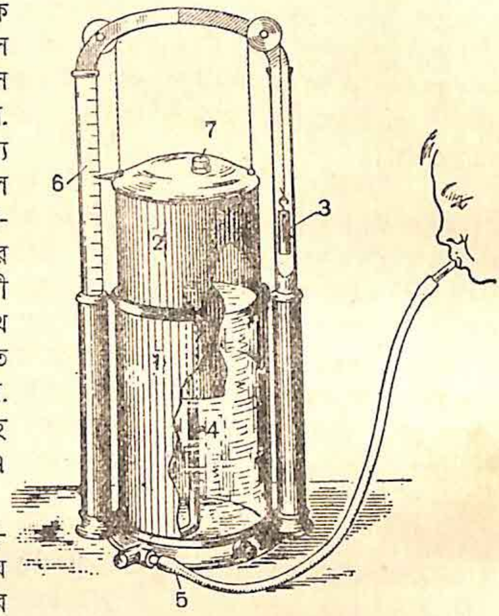
৭৪নং চিত্র—ধীর ও গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ফুসফুসের ধারক শক্তির পরিবর্তন

গভীরতম শ্বাসত্যাগের পর প্রশ্বাসের সহিত যে পরিমাণ বাতাস টানিয়া লওয়া যায় (অথবা গভীরতম প্রশ্বাস টানিবার পর যে পরিমাণ বাতাস শ্বাসের সহিত ত্যাগ করা যায়) তাহাকেই ফুসফুসের বায়ুধারকত্ব বলে। ৭৫নং চিত্রে বর্ণিত স্পিরোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুধারকত্ব নির্ধারণ করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের বায়ুধারকত্ব

বিভিন্ন প্রকার। ইহা ৩০০০ হইতে ৫০০০ কিউবিক সেন্টিমিটার পর্যন্ত হইতে পারে।

গভীর প্রশ্বাসের গুরুত্বঃ

স্বাভাবিক শ্বাস ত্যাগের পর ফুসফুসে প্রায় ২৫০০ কিউবিক সেন্টিমিটার (সি. সি.) বাতাস থাকিয়া যায়। স্বাভাবিক প্রশ্বাস দ্বারা মানুষ আরও ৫০০ সি. সি. বাতাস টানিয়া লয়; ইহার মধ্যে মাত্র ৩০০-৩৫০ সি. সি. বায়ু-থলি সমূহে গিয়া পৌঁছায় এবং কমপক্ষে ১৫০ সি. সি. গলবিলের নাসিকাংশ, স্বরযন্ত্র, কণ্ঠনালী এবং ক্লোমশাখা প্রভৃতি শ্বাস-পথে থাকিয়া যায়। অর্থাৎ শান্ত প্রশ্বাসের সময় প্রায় ৩০০ সি. সি. বাহিরের বাতাস বায়ু-থলি সমূহে অবস্থিত সমগ্র বাতাসের ১/৭ অংশের বেশি নয়।



৭৫নং চিত্র—স্পিরোমিটার

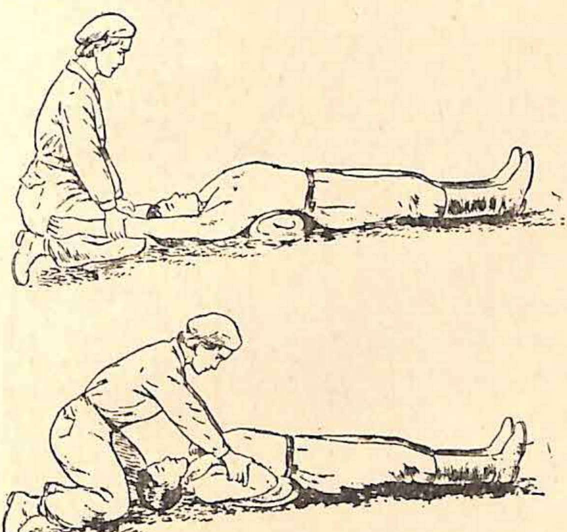
ফুসফুসে এই পরিমাণ বায়ু-চলাচল সব সময় যথেষ্ট নয়। যে সকল কাজে প্রচুর শক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন, তাহাতে জীবদেহে প্রচুর ক্ষয় ও অক্সিজেন ঘটিত প্রক্রিয়া হইয়া থাকে; ফলে অক্সিজেনের ও কার্বনিক এ্যাসিড উৎপাদনের প্রয়োজনও বাড়িয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় ফুসফুসে বায়ু চলাচলও বৃদ্ধি পায়; প্রতি প্রশ্বাসে ফুসফুসের ১/৭এর পরিবর্তে ১/৪ বা ১/২ অংশ বাতাসের আদান প্রদান হইয়া থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর করিয়া এবং প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে গভীরতর করিয়া ফুসফুসের বায়ু চলাচল বাড়াইয়া দেওয়া যায়। অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে, অর্থাৎ মিনিটে ৪০/৫০ বার শ্বাস টানিলে প্রশ্বাস এত অগভীর হইয়া যায় যে খুব সামান্য পরিমাণ বাতাসই বায়ু-থলিতে প্রবেশ করিতে পারে। ফলে ফুসফুসে বায়ু চলাচল অপর্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং ফুসফুসের বাতাস ও রক্তের মধ্যে গ্যাসের আদান-প্রদান স্তিমিত হইয়া আসে। অপর পক্ষে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুসফুসে সব চেয়ে ভালভাবে বায়ুচলাচল হইয়া থাকে এবং গ্যাসের আদান-প্রদানও উন্নততর হয়।

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ

শ্বাস চলাচল বন্ধ হইলে কৃত্রিম উপায়ে তাহা পুনরুজ্জীবিত করা যায়। জলে ডুবিলে বা তড়িতাহত হইলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন হয়। বাহিরের শক্তির সাহায্যে বক্ষগহ্বরকে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সংকুচিত করিয়া কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করা হয় (৭৬নং চিত্র)। প্রাথমিক পরিচর্যাকারী রোগীর মাথার কাছে বসিয়া রোগীর হাত দুইটি যতদূর সম্ভব উপরে ও পিছনের দিকে টানিয়া ধরিবে; ইহার ফলে পঞ্জরাস্থিগুলি উত্তোলিত হইয়া বক্ষগহ্বর প্রসারিত হয় এবং ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করে। ইহার পর রোগীর হাত দুইটি কনুই-এর কাছে তীক্ষ্ন কোণে মুড়িয়া বক্ষের পার্শ্বে অর্থাৎ পঞ্জরাস্থিগুলির উপর সজোরে চাপিয়া ধরিতে হইবে। ইহার ফলে পঞ্জরাস্থিগুলি নামিয়া গিয়া বক্ষগহ্বর সংকুচিত হয় এবং ফুসফুস হইতে বাতাস নির্গত হইয়া যায়। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের লয় স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই—অর্থাৎ মিনিটে ১৬ বার হওয়া উচিত।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার সামান্যতম লক্ষণ থাকা পর্যন্ত কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালাইতে হইবে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শ্বাসকার্য বন্ধ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেও জীবন ফিরান গিয়াছে।



৭৬নং চিত্র—কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালনা
উপরে—প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য রোগীকে এইভাবে শোয়াইতে হয়; নিম্নে—শ্বাসত্যাগের জন্য রোগীকে এই অবস্থায় রাখিতে হইবে

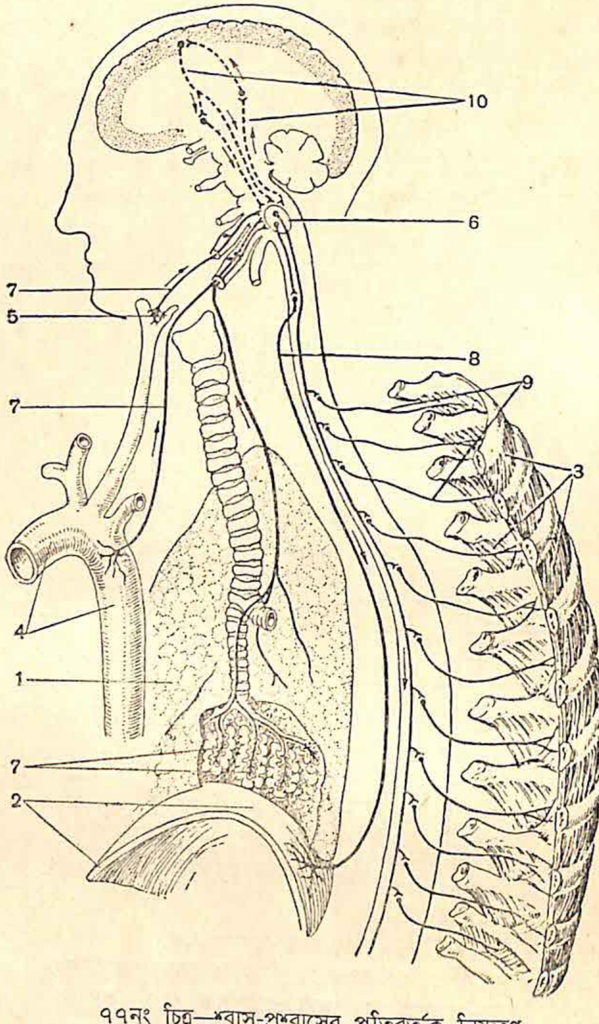
অনুশীলনী ঃ

বুকের উপর হাত রাখিয়া মিনিটে কতবার নিঃশ্বাস পড়ে গণনা কর। প্রতিবার শ্বাস-ত্যাগের সময় কত বায়ু নির্গত হয় এবং তাহাতে কি পরিমানে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে তাহা হিসাব করিয়া দৈনিক প্রতি ঘণ্টায় কি পরিমাণ কার্বনডাই অক্সাইড নিঃসৃত হয় তাহা স্থির কর।

৩৩। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ

শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্র ঃ

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্রটি মস্তিষ্কের নিম্নঅংশে সুষুম্নাশীর্ষকে (Medulla oblongata) অবস্থিত। শ্বাস-কেন্দ্রটি নষ্ট হইলে অবিলম্বে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবে।



৭৭নং চিত্র—শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিবর্তক নিয়ন্ত্রণ

১। ফুসফুস; ২। মধ্যচ্ছদা; ৩। পঞ্জরাস্থির অন্তবর্তী স্থানের পেশী; ৪। মহাধমনীর বক্র অংশ; ৫। ক্যারটিড ধমণীর বিভাগ স্থল; ৬। সুষুম্নাশীর্ষক; ৭। ফুসফুস, মহাধমনী ও ক্যারটিড ধমনীর বিভাগ স্থল হইতে আগত অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্তু; ৮। মধ্যচ্ছদাগামী বহির্মুখী স্নায়ু; ৯। পঞ্জরাস্থির অন্তর্বর্তী স্থানের পেশীর গমনকারী বহির্মুখী স্নায়ু; ১০। শ্বাসকেন্দ্র ও গুরু-মস্তিষ্কের কর্টেক্সের মধ্যে সংযোগকারী অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী স্নায়ুপথ।

শ্বাসকেন্দ্র হইতে তাড়নাগুলি স্নায়ুপথে মেরু রজ্জু বাহিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের পেশীসমূহে উপস্থিত হয়। এই সময় শ্বাস ও প্রশ্বাসের পেশীগুলি সুকঠোর নির্দিষ্ট পন্থায় একের পর এক সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

শ্বাস চলাচলের প্রতিবর্তনমূলক আত্মনিয়ন্ত্রণঃ

অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্তুসমূহে গঠিত ভেগাস স্নায়ুর শাখাগুলি ফুসফুসে প্রবেশ করে (৭৭নং চিত্র)। ফুসফুস প্রসারিত হইলে (অর্থাৎ প্রশ্বাসের সময়) কতকগুলি বহির্মুখী স্নায়ুসূত্র উত্তেজিত হয়। উদ্ভূত এই স্নায়বিক তাড়নাগুলি শ্বাসকেন্দ্রে যাইয়া প্রশ্বাসের পেশীগুলির প্রতিবর্তনমূলক শিথিলতা আনে। ফলে বক্ষগহ্বরের আয়তন হ্রাস পাইয়া শ্বাসত্যাগ ঘটিয়া থাকে।

ভেগাস্ স্নায়ুর অন্যান্য অন্তর্মুখী তন্তুগুলি শ্বাসত্যাগের সময় শ্বাসকেন্দ্র মারফৎ উত্তেজিত হইয়া প্রশ্বাসের পেশীগুলির প্রতিবর্তনমূলক সংকোচন করে।

এইভাবেই শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিবর্তনমূলক আত্মনিয়ন্ত্রণ চলিতে থাকে; প্রশ্বাসের ফলে শ্বাসত্যাগ হয় এবং শ্বাসত্যাগ আবার প্রশ্বাসকার্য ঘটায়।

শ্বাস চলাচলে প্রতিবর্তনমূলক পরিবর্তনঃ

চর্মের এবং শরীরের অন্যান্য অংশের উত্তেজনায় শ্বাস চলাচলের চরিত্রের পরিবর্তন হইয়া থাকে। অকস্মাৎ ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে চর্মের অন্তর্মুখী স্নায়ুসূত্রগুলির উত্তেজনার জন্য সাময়িকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়।

রক্তপ্রণালীসমূহের গাত্রে, বিশেষত ক্যারটিড ধমনী দুইভাগে বিভক্ত হওয়ার মুখে অবস্থিত স্নায়ুসূত্রগুলির উত্তেজনার ফলে শ্বাস চলাচলের যে প্রতিবর্তনমূলক তীব্রতা অথবা দৌর্বল্য ঘটে, তাহা অশেষ গুরুত্বপূর্ণ (৭৭নং চিত্র)। কোন কোন রক্তপ্রণালী প্রসারিত হইলে (অর্থাৎ রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইলে) কতকগুলি স্নায়ুসূত্র উত্তেজিত হয় এবং তাহার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতিবর্তনমূলকভাবে স্তব্ধ হয়। রাসায়নিক উত্তেজনায় সংবেদনশীল অন্য কোন স্নায়ুসূত্র রক্তে কার্বনিক এ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে উত্তেজিত হইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্বাসপ্রশ্বাস তীব্রতর হয় এবং গতিও প্রতিবর্তনমূলকভাবে বাড়িয়া যায়।

সংরক্ষণশীল প্রতিবর্তনঃ

শ্বাসপথের শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর উত্তেজনায় সংরক্ষণশীল প্রতিবর্তন ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। তরল এ্যামোনিয়া-সিক্ত তুলা নাকের কাছে ধরিলে (গন্ধ সম্পর্কিত) অলফ্যাক্টির স্নায়ুর তন্তুগুলি উত্তেজিত শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিবর্তনমূলক সাময়িক স্তব্ধতা আনে; সঙ্গে সঙ্গে গ্লটিস বন্ধ হইয়া (৬৮নং চিত্রের ৪নং ছবি) শ্বাসযন্ত্রসমূহের অভ্যন্তরে অনিষ্টকর পদার্থের প্রবেশ রোধ করে। নাসিকার শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর সামান্য উত্তেজনায় হাঁচি হইয়া থাকে। স্বরযন্ত্র, কণ্ঠনালী ও ক্লোমশাখার শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর মধ্যে উত্তেজক পদার্থ প্রবেশ করিলে প্রতিবর্তনমূলক কাশি হইবে।

হাঁচি এবং কাশির পূর্বে মানুষ প্রাথমিক গভীর প্রশ্বাস লইয়া থাকে; ইহাতে গ্লটিস বন্ধ হইয়া শ্বাসত্যাগের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়; এবং এই সঙ্কোচনের ফলে ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বাতাসের উপর চাপ পড়ে এবং

বাতাস বাহির হইয়া যায়। হাঁচির সময় বাতাস নাসিকার মধ্য দিয়া এবং কাশির সময় মুখ দিয়া বাহির হয়।

হাঁচি এবং কাশি শ্বাসপথে কোন উত্তেজক পদার্থ প্রবেশ করিলে তাহাকে দূর করিতে সাহায্য করে।

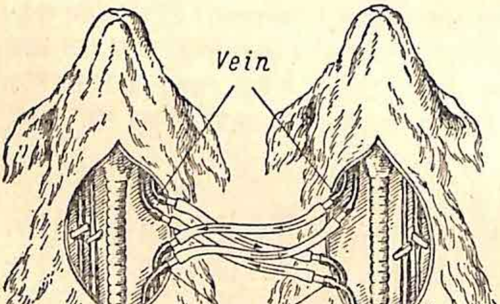
মস্তিষ্কের কর্টেক্সের ভূমিকাঃ

মস্তিষ্কের কর্টেক্সের অংশ গ্রহণ ব্যতীতই শ্বাস চলাচল হইতে পারে। তাহা সত্ত্বেও কর্টেক্স শ্বাসকেন্দ্রে স্নায়বিক তাড়না পাঠাইয়া শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রভাবান্বিত করে। প্রমাণস্বরূপ কথা বলার সময় ইচ্ছামত শ্বাস চলাচলের গতি ও তীব্রতা পরিবর্তিত করার কথা বলা যাইতে পারে।

হাসি এবং কান্নার সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তনও মস্তিষ্কের কর্টেক্সের প্রভাবাধীন। হাসিলে গ্লটিসটি শ্বাসত্যাগের সময় পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত ও বন্ধ হয়; ক্রন্দনের সময়ও গ্লটিসটি একইভাবে উন্মুক্ত ও বন্ধ হয়, তবে এ ক্ষেত্রে ইহা প্রশ্বাস গ্রহণের সময় হইয়া থাকে।

শ্বাসকেন্দ্রের উপর কার্বনিক এ্যাসিডের প্রভাবঃ

শ্বাসকেন্দ্রের উপর রক্তস্থিত রাসায়নিক উত্তেজকসমূহের, বিশেষত কার্বনিক এ্যাসিডের ক্রিয়াকলাপের উপর শ্বাসকেন্দ্রের উত্তেজনা তথা শ্বাস চলাচলের গতি ও তীব্রতা নির্ভর করে। দুইটি কুকুরের গ্রীবাদেশের একদিকে মস্তকে রক্ত-বহনকারী ক্যারটিড্ ধমনী এবং মস্তক হইতে হৃৎপিণ্ডে রক্তবহনকারী যুগোলার শিরাদ্বয় (jugular veins) কাটিয়া উন্মুক্ত করা হইল। উভয় কুকুরের ক্যারটিড্ ধমনীর কর্তিত অংশ একটি নল দ্বারা এমনভাবে যুক্ত করা হইল যে একটি কুকুরের রক্ত অন্য কুকুরের দেহে পরিচালিত হইতে পারে, উভয়ের দেহে রক্তের আদান-প্রদান হইতে পারে (৭৮নং চিত্র)। উভয় কুকুরেরই গ্রীবাদেশের অপর-দিকে অকর্তিত ক্যারটিড্ ধমনী ও যুগোলার শিরার উপর চাপ দিলে প্রত্যেকটি কুকুর তাহার মস্তিষ্কে অপর কুকুরের রক্ত পাইবে, কিন্তু নিজের রক্ত পাইবে না। এই সময় একটি কুকুরের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়া ফুসফুসে বায়ু-চলাচল বন্ধ করিয়া দিলে অপর কুকুরের শ্বাস চলাচলের গতি ও তীব্রতা বাড়িয়া যাইবে।



৭৮নং চিত্র—পরস্পর সংযুক্ত রক্ত-সঞ্চালন

ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, শ্বাসকেন্দ্রের উত্তেজনা ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত রক্তের উপাদানের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

অবিরাম কাজ করার সময় অথবা শ্বাসরোধ অবস্থায় রক্তে কার্বনিক এ্যাসিড জমা হইয়া শ্বাসকেন্দ্রকে উত্তেজিত করে; ফলে শ্বাস চলাচলের গতি ও তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে রক্তে কার্বনিক এ্যাসিডের পরিমাণ কমিয়া যাইলে শ্বাসকেন্দ্রের উত্তেজনা ও তাহার ফলে শ্বাস চলাচলের গতি ও তীব্রতাও হ্রাস পায়। এইভাবে রক্তে কার্বনিক এ্যাসিডের পরিমাণ শ্বাস চলাচল নিয়ন্ত্রণে এক অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রশ্ন ঃ

(১) ডুবুরীরা জলে ডুব দিবার পূর্বে কয়েকটি গভীর প্রশ্বাস লয় কেন? ইহার গুরুত্ব কি-?
(২) নবজাত শিশুর নাড়ী কাটার পর সর্বপ্রথম শ্বাস চলাচল শুরু হয় কেন?

অনুশীলনী ঃ

টেবিলের উপর একটি সেকেণ্ডের কাঁটাযুক্ত ঘড়ি রাখ; গভীরভাবে প্রশ্বাস টানিয়া লইয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখ। কত সেকেণ্ড দম বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে তাহা লক্ষ্য কর। শ্বাস ত্যাগ করার মুহূর্তে শ্বাস চলাচলের প্রকৃতি কি হইল—গভীর না অগভীর? কয়েকবার গভীর ও দ্রুত প্রশ্বাস টানিয়া লও এবং ইহার পর শ্বাস চলাচল বন্ধ হইয়া যায় কি না লক্ষ্য কর।

এই অনুধাবন কার্যের ফলাফল একটি খাতায় বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে লিখিয়া রাখ।

৩৪। শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত স্বাস্থবিধি

সঠিক প্রশ্বাস লওয়ার গুরুত্বঃ

সঠিক শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাস্থ্যকে উন্নত করে, কর্মশক্তিও বাড়াইয়া দেয়। সঠিক শ্বাসপ্রশ্বাসের অন্যতম প্রধান পন্থা হইল বক্ষগহ্বরকে পুষ্ট করার জন্য যত্ন লওয়া; দাঁড়ান, হাঁটা এবং বসার সময় সঠিক দেহ ভঙ্গিমা বজায় রাখিয়া, প্রত্যহ প্রাতে ব্যায়াম করিয়া এবং খেলাধূলা ও শারীরিক কসরৎ ইত্যাদির মারফৎ এই উদ্দেশ্য সফল করা যায়। সাধারণত সুগঠিত বক্ষবিশিষ্ট লোকেরা সমতালে শ্বাসপ্রশ্বাস লইয়া থাকে। ঘন ঘন অসম শ্বাসপ্রশ্বাসে মানসিক কাজে ব্যাঘাত ঘটায়; অপর পক্ষে স্বাভাবিক ধীর শ্বাসপ্রশ্বাস কাজে মনোযোগী হইতে সাহায্য করে।

নাসিকার সাহায্যে নিঃশ্বাস লইয়াই শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক লয় বজায় রাখা সম্ভব। অবশ্য নাসিকার সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের গুরুত্ব শুধু ইহাতেই সীমাবদ্ধ নয়; নাসিকার অপরিসর ফাটলগুলির মধ্য দিয়া যাইবার সময় প্রশ্বাসের বাতাস উষ্ণতা লাভ করে এবং ধূলিকণা বীজাণু হইতে নিষ্কৃতি পায়।

জীবদেহের উপর পারিপার্শ্বিক বাতাসের প্রভাব :

বাহিরের নির্মল বাতাস জীবদেহের পক্ষে উপকারী। বদ্ধ, বায়ু চলাচলহীন ঘরের বাতাস অনিষ্টকর। এইরূপ বাতাসে ধোঁয়া কার্বন-ডাইঅক্সাইড এবং ঘাম পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ থাকে। তাহা ছাড়া ধূলিকণা এবং রন্ধনশালা হইতে আগত বিভিন্ন বাষ্পীয় পদার্থও থাকিতে পারে।

যেসব লোক বায়ু চলাচলহীন ঘরে অধিকাংশ সময় অবস্থান করে

এবং উন্মুক্ত স্থানে অল্পই বাহির হয়, তাহারা রক্তাল্পতায় ভোগে এবং নির্জীব হইয়া পড়ে; এই সব লোক সহজেই শ্রান্ত হয় এবং শিরঃপীড়ায় ভোগে।

বাতাস হইতে সংক্রামক রোগ বিস্তার:

বাতাস কোন কোন রোগ বিস্তারের কারণ হইতে পারে। কোন রুগ্ন মানুষ হাঁচিলে, কাশিলে বা কথা বলিলে অথবা জোরে শ্বাস ত্যাগ করিলেও বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বীজাণুপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠীবনকণা (droplets) বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। এই কণাগুলি সাধারণত বাতাসে বেশ কিছুক্ষণ থাকিতে পারে এবং নিকটস্থ অন্য লোকের শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। হুপিংকাশি, ডিপথিরিয়া, হামজ্বর, স্কার্লেট জ্বর ও অন্যান্য কয়েকটি ব্যাধি এইভাবেই সংক্রামিত হইয়া থাকে। এইরূপ সংক্রমণকে "ড্রপলেট সংক্রমণ" বা নিষ্ঠীবনকণা হইতে সংক্রমণ বলে।

ধূলা সংক্রামক ব্যাধির আর একটি বাহক। ঘর পরিষ্কার করার অথবা ব্রাস দ্বারা কাপড় ঝাড়িবার সময় থুথু কাশি বা পুঁজের শুষ্ক কণাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণারূপে বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ থিতায় না। কোন কোন সংক্রামক রোগ (যেমন যক্ষ্মা) এইরূপ সংক্রামিত ধূলিকণা হইতে উৎপত্তি হয়। এই ধরনের সংক্রমণকে ধূলিকণার সংক্রমণ (dust infection) বলা হয়।

যাহারা অধিকাংশ সময় বদ্ধঘরে অতিবাহিত করে, তাহাদের ধূলিকণা এবং বিশেষ করিয়া নিষ্ঠীবনকণা হইতে সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাহিরের বাতাস অবিরাম সচল বা বহমান থাকার জন্য রোগ বীজানুগুলিকে দ্রুত সরাইয়া ও ছড়াইয়া দেয়।

বাসগৃহে ও কর্মস্থানে বায়ু চলাচল:

উপরিউক্ত অধ্যায় হইতে বোঝা যাইতেছে যে, প্রায়ই শুধু বাহিরের তাজা বাতাসে বেড়াইলে চলিবে না, ঘরেও নির্মল বাতাসের সমধিক গুরুত্ব আছে।

ঘরের মধ্যে বাতাস যত কম থাকিবে, তত দ্রুত দূষিত হইবে; যত বেশী বাতাস থাকিবে, ইহার স্বাভাবিক উপাদানগুলি তত দীর্ঘকাল বজায় থাকিবে। এই কারণে ঘরে বেশী আসবাবপত্র থাকা উচিত নয়।

ঘরের মধ্যে নিরন্তর টাটকা বাতাস আসা চাই। নিরন্তর বাতাসের পরিবর্তনের জন্য থিয়েটার ক্লাব ইত্যাদি যে সকল স্থানে অধিক লোক সমাগম হয় কিংবা কারখানা বা যন্ত্রপাতির ঘর ইত্যাদি যেখানকার বাতাস অনিষ্টকর গ্যাসে বা প্রচুর ধূলিতে পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থানে বিশেষ ধরনের বায়ু চলাচলের যন্ত্র বসান হইয়া থাকে।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর এবং রাত্রে শয়নের পূর্বে ঘরখানিতে নিয়মিতভাবে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা উচিত। ঘুমাইবার সময় জানলা খুলিয়া রাখাই ভাল।

ধূলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম:

নির্মল বাতাস পাইতে হইলে ধূলা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া এবং ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা সমভাবেই প্রয়োজন। ঘরে ঢুকিবার পূর্বে রাস্তার ধূলা

যাহাতে ঘরে না যাইতে পারে তাহার জন্য নিজের জুতার ধুলা সযত্নে ঝাড়িয়া লওয়া উচিত; কখনও কোট গায়ে দিয়া ঘরে প্রবেশ করা অথবা ঘরের মধ্যে কোট বা জুতার ধুলা ঝাড়াও উচিত নয়।

ঘর পরিষ্কার করার সময় যাহাতে ধুলা না ওড়ে সেদিকে নজর দিতে হইবে। ঘরের মেজে ভিজা কাপড় দিয়া অথবা ভিজা কাপড়ে মোড়া ব্রাস দিয়া মুছিয়া ফেলা উচিত। আসবাবপত্রের ধুলাও ভিজা কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলা উচিত।

সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভূমিকাঃ

একজন লোক নিজের ঘরে নিজের চেষ্টায় কতটুকু ব্যবস্থা করিতে পারিল শুধু তাহাতেই নির্মল বাতাসের জন্য সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শহরে এবং শ্রমিক বস্তিতে গাছ বসান, এক একটি বাড়ি বা সমগ্র শহরের চারিদিকে "সবুজ পরিখা" সৃষ্টি, রাস্তায় জল দেওয়া, কারখানার চিমনীতে বিশেষ ধরনের ধোঁয়ার আধার তৈয়ারী করা ইত্যাদি সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

৩৫। *যক্ষ্মা ও তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম*

যক্ষ্মা সংক্রামক ব্যাধি :

সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বিস্তৃত সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে যক্ষ্মা অন্যতম। পুঁজি-বাদী দেশসমূহে প্রধানত শ্রমজীবী জনসাধারণই যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। লণ্ডন নিউইয়র্ক প্যারী প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ শহরগুলিতে যক্ষ্মার প্রকোপ বুর্জোয়া বসতিপূর্ণ এলাকা হইতে ৬।৭ গুণ বেশী। ঔপনিবেশিক দেশগুলির পরাধীন অধিবাসীরা বিশেষ করিয়া এই ব্যাধিতে জর্জরিত। যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতকায়দের অপেক্ষা নিগ্রোদের মধ্যে যক্ষ্মার মৃত্যুহার অনেক বেশী, নিগ্রোদের আধা পরাধীন অবস্থাই ইহার কারণ।

অণুবীক্ষণে দৃষ্ট ক্ষুদ্র ও চিকণ দন্তের ন্যায় বীজাণু হইতে যক্ষ্মার উৎপত্তি। মানবদেহের মধ্যে যক্ষ্মাবীজাণুগুলি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিতে পারে; উষ্ণ এবং আর্দ্র পরিবেশে ইহারা কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাস পর্যন্ত জীবিত ও সক্রিয় থাকিতে পারে। সূর্যালোকে ইহারা কয়েক ঘণ্টায়, কখনও কখনও কয়েক মুহূর্তেই ধ্বংস হইয়া যায়। ফুটাইলেও ইহারা মরিয়া যায়।

যক্ষ্মার বিভিন্ন ধরন (forms) :

মানবদেহে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মাবীজাণু বিভিন্ন দেহযন্ত্রে পরিবর্তন অথবা তাহাদের ক্ষয় সাধনও করিতে পারে। বীজাণুগুলির চারিপাশে "টিউবারক্ল"* বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফীতির আকারে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও পৃথক পৃথক টিউবারক্লগুলি একত্রে মিলিয়া গিয়া বৃহৎ স্ফীতি বা প্রদাহের সৃষ্টি হয়।

শব ব্যবচ্ছেদ ও অনুশীলনে প্রায় প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের দেহে—এমনকি যাহারা কখনও যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় নাই তাহাদের দেহেও এই ধরণের "টিউবারক্ল" দেখা গিয়াছে। এই সব অনুশীলনে প্রমাণিত হইয়াছে যে যক্ষ্মাবীজাণু অতি

* ল্যাটিন শব্দ "Tubercle" হইতে ব্যাধির নাম হইয়াছে "টিউবারকিউলোসিস"।

সহজেই জীবদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু বহুক্ষেত্রেই জীবদেহ ইহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দ্রুত পরাস্ত করিয়া ফেলে, এবং এইভাবে প্রাথমিক অবস্থাতেই ব্যাধি প্রতিরুদ্ধ হইয়া অগোচরে থাকিয়া যায়। সংক্রমণের বিরুদ্ধে জীবদেহের সংগ্রামের এই সাফল্য জীবদেহের সাধারণ অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জীবদেহের এই সাধারণ অবস্থা আবার বহুলাংশে নির্ভর করে স্নায়ুতন্ত্রের উপর। ভুল জীবনযাপন পদ্ধতি, অত্যধিক পরিশ্রম ও অবসাদ, অনাহার এবং অন্যান্য যেসব অবস্থা জীবদেহকে দুর্বল করিয়া দেয়, তাহাতে রোগবীজাণুর অনিষ্টকর ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে জীবদেহের প্রতিরোধশক্তি কমিয়া যায় এবং তাহার ফলে যক্ষ্মার উৎপত্তি হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফুসফুস আক্রান্ত হয়। রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয় দ্রুত অবসাদ প্রবণতা, ক্ষুধামান্দ্য, ওজন হ্রাস, মৃদু কাশি, ঘাম এবং সামান্য দৈহিক উত্তাপবৃদ্ধি। গুরুতর অবস্থায় নিরবিচ্ছিন্ন বেদনাদায়ক কাশি এবং দ্রুত ও স্থিরগতিতে ওজন হ্রাস দেখা যায় (সাধারণভাবে রোগী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তাহা হইতেই ব্যাধির নাম হইয়াছে “ক্ষয়রোগ”)।

শিশুদের প্রায়ই মেরুদণ্ড ও অস্থিসন্ধিতে যক্ষ্মা হইয়া থাকে। মেরুদণ্ড আক্রান্ত হইলে ইহা প্রায়ই বাঁকিয়া যায় এবং যথাযথ চিকিৎসা না হইলে কুব্জ হইয়া যাইতেও পারে। উরুসন্ধি ও জানুসন্ধির যক্ষ্মায় চিকিৎসার ত্রুটি হইলে সারাজীবনের জন্য খোঁড়া হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

শিশুদের মধ্যে মুখচর্মের লুপাস্ এবং অন্যান্য দেহযন্ত্রেরও যক্ষ্মারোগ দেখা যায়।

মস্তিষ্কের ঝিল্লীতে যক্ষ্মা (Tubercular meningitis) অতিশয় মারাত্মক ব্যাধি।

যক্ষ্মার চিকিৎসা ও আরোগ্যলাভ :

যত দুরন্তই হউক না কেন যক্ষ্মায় আরোগ্যলাভ করা সম্ভব। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করা এই ব্যাধির চিকিৎসায় অন্যতম প্রয়োজনীয় সর্ত। সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গেলেই চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। সে লক্ষণ যত সামান্যই হউক না কেন—ক্ষুধামান্দ্য, দুর্বলতা, অবসাদ প্রবণতা, শরীরের তাপবৃদ্ধি, জানুসন্ধি বা শরীরের অন্যান্য অংশে বেদনাবোধ ইত্যাদি কোনমতেই উপেক্ষা করা উচিত নয়।

শিশুদের দেহে যক্ষ্মার উৎপত্তি নির্ধারণ করার একটি প্রকৃষ্ট পন্থা হইল চর্মের নীচে যক্ষ্মাবীজাণুর নির্যাস ইন্‌জেকশন করা; ব্যাধি থাকিলে ইন্‌জেকশনের স্থানটি লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিবে। যক্ষ্মাক্রান্ত বলিয়া সন্দেহ হইলে রোগীকে যক্ষ্মা ক্লীনিকে পাঠাইয়া রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যক্ষ্মা চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য হইল জীবদেহের রোগবীজাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তিশালী এবং জয়ী হইতে সাহায্য করা। সুতরাং স্বাস্থ্যবিধির মৌলিক নিয়মকানুনগুলি পালন করাই প্রথম কর্তব্য; সেগুলি হইল প্রচুর পরিমাণে উন্মুক্ত বাতাস সেবন করা, ঘরের বাহিরে শারীরিক শ্রমের কাজকর্ম করা, বাসগৃহে প্রচুর বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা, জানলা খুলিয়া নিদ্রা যাওয়া, ব্যায়াম

করা ও বেড়ান, নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত খাদ্য খাওয়া ইত্যাদি। যক্ষ্মাক্রান্ত রোগী কোনমতেই ধূম বা মদ্যপান করিবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন বহুসংখ্যক স্বাস্থ্যাবাস তৈয়ারী হইয়াছে যেখানে রোগীরা সুপরিকল্পিত স্বাস্থ্যবিধি পালন করিয়া দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে।

যক্ষ্মা চিকিৎসার আরও দুইটি পদ্ধতি আছে। উদাহরণস্বরূপ ফুসফুসের যক্ষ্মায় প্লুরার অভ্যন্তরে বাতাস ঢুকাইয়া দেওয়ার কথা বলা যাইতে পারে (নিউমোথোরাক্স)। ফলে ফুসফুসের যে অংশে বাতাস ঢুকান হয়, সেই অংশটি চুপসাইয়া গিয়া যক্ষ্মাক্রান্ত এলাকাটি আরোগ্যলাভ করে। একই উদ্দেশ্যে অস্থি ও অস্থিসন্ধির যক্ষ্মায় প্লাস্টার অফ্ প্যারিসের ব্যাণ্ডেজ, জাঙিয়া ও অস্থি-ধারকের (splint) সাহায্যে আক্রান্ত অঙ্গকে যথাসাধ্য বিশ্রাম দেওয়া হয়।

গত কয়েক বৎসরে সোভিয়েত ঔষধশিল্প স্ট্রেপটোমাইসিন উৎপাদন পদ্ধতিতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করিয়াছে; এই ঔষধটি যক্ষ্মাবীজাণুর বৃদ্ধি প্রতিহত করে এবং কয়েক ধরনের যক্ষ্মায় চমৎকার ফল দেয়। বিশেষ করিয়া যে টিউবারকুলার মেনিঞ্জাইটিস ব্যাধি অতীতে দুরারোগ্য বলিয়া গণ্য হইত তাহাতে স্ট্রেপটোমাইসিন সন্তোষজনক কাজ করে।

যক্ষ্মার সংক্রমণ প্রতিষেধের উপায় :

সংক্রমণের উৎস হইতে প্রত্যেক সংস্পর্শ দ্বারা যক্ষ্মার উৎপত্তি হইতে পারে। যক্ষ্মারোগীর থালা, তোয়ালে বা রুমাল ব্যবহার করিয়া অথবা যক্ষ্মারোগীর হাঁচি বা কাশির দ্বারা দূষিত বাতাস প্রশ্বাস লইয়া (নিষ্ঠীবনকণা বা ধূলি হইতে সংক্রমণ) রোগ সংক্রমণ হইতে পারে।

সংক্রমণ বন্ধ করিতে হইলে ধূলা এবং রোগের বাহক মাছির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে হইবে। নিজের দেহ, জামা-কাপড়, বাসগৃহ এবং কর্মস্থল পরিচ্ছন্ন রাখাও অতীব প্রয়োজন। থুতুই যক্ষ্মার প্রধান বাহক; সুতরাং যক্ষ্মারোগীর পক্ষে নিজের থুতু বিশেষ ধরনের বদ্ধ পিকদানীতে ধরিয়া রাখা, হাঁচি ও কাশির সময় রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখা, পৃথক বিছানায় শোওয়া, পৃথক তোয়ালে ও থালা ব্যবহার করা উচিত এবং কখনও শিশুদের চুম্বন করা বা কোলে লওয়া উচিত নয়।

সংক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হইল জীবদেহে সাধারণ শক্তি বৃদ্ধি করা। উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়াম এবং কাজ ও বিশ্রামের উপযুক্ত সমন্বয়ের সাহায্যে এই কর্তব্য সাধন করা যায়।

যক্ষ্মার বিরুদ্ধে সক্রিয় অনাক্রম্যতা অর্জনের জন্যে সোবিয়েত ইউনিয়নে সংরক্ষণীয় টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। টিকাপ্রাপ্ত শিশুদের অপেক্ষা টিকা দেওয়া হয় নাই এইরূপ শিশুদের মধ্যেই যক্ষ্মার প্রকোপ বেশী দেখা যায়। প্রথমোক্তরা যক্ষ্মাক্রান্ত হইলেও সে রোগ অতি মৃদু ধরনের হইয়া থাকে এবং সাধারণত সহজেই সারিয়া যায়। অনাক্রম্যতা বজায় রাখার জন্য সাধারণত দুই তিন বৎসর অন্তর টিকা দেওয়া প্রয়োজন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যক্ষ্মার বিরুদ্ধে সংগ্রাম :

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর প্রথম দশ বৎসরে মস্কো লেনিন-গ্রাদ প্রভৃতি বড় বড় শহরে যক্ষ্মার মৃত্যুহার পূর্বের তুলনায় অর্ধেক কমাইয়া

দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের কাজের ও বাসস্থানের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অবস্থার উন্নতির দ্বারাই এই সাফল্য অর্জিত হয়। শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া এবং প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়ের জন্য সমগ্র জনসমষ্টির নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ব্যাপকভাবে যক্ষ্মাক্লিনিক ও স্বাস্থ্যাবাস স্থাপন, সকলকে টিকা দেওয়া প্রভৃতি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বৎসরের পর বৎসর যক্ষ্মার মৃত্যুহার হ্রাস পাইতেছে।

পুঁজিবাদী শোষণের অবসান এবং কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সাফল্যের ফলে শ্রমজীবী জনসাধারণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের অবিচল উন্নতি হইয়াছে এবং পার্টি ও সরকারের পক্ষে ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা গ্রহণও সম্ভব হইয়াছে। এইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃত রোগ হিসাবে যক্ষ্মাকে নির্মূল করার প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ

(১) জীবাণুর কোন অংশে অক্সিজেন ঘটিত প্রক্রিয়া ঘটিয়া থাকে?
(২) ফুস্‌ফুস্‌ দুইটি স্ফীত অবস্থায় থাকে কেন? কোন অবস্থায় ফুসফুস চুপসাইয়া যায়?
(৩) শ্বাস-পথ ও ফুসফুসের গঠন প্রণালী বর্ণনা কর।
(৪) মুখের পরিবর্তে নাক দিয়া নিঃশ্বাস লইব কেন?
(৫) প্রশ্বাস ও শ্বাস ত্যাগের বাতাসের মধ্যে পার্থক্য কি?
(৬) জীবাণু ও তাহার পরিবেশের মধ্যে গ্যাসের আদান-প্রদান কি ভাবে চলে তাহা বর্ণনা কর।
(৭) কয়লার ধোঁয়ায় শরীর বিষাক্ত হইলে জীবাণুদেহে কি অবস্থা সৃষ্টি হয়?
(৮) কয়লার ধোঁয়ায় শরীর বিষাক্ত হইলে প্রাথমিক পরিচর্যার মূল নীতিগুলি বর্ণনা কর।
(৯) ফুসফুসের বায়ুধারকত্ব কাহাকে বলে? কি করিয়া মাপিতে হয়?
(১০) শ্বাসরোধ হইলে কি ভাবে প্রাথমিক পরিচর্যা করিতে হয়?
(১১) জীবাণুর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের বায়ু চলাচলের পরিবর্তন কি ভাবে হইয়া থাকে?
(১২) শ্বাস চলাচল কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?
(১৩) স্বাভাবিক ও গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় শ্বাস ও প্রশ্বাসের কার্য বর্ণনা কর।
(১৪) শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাস্থ্যবিধির মৌলিক নীতিগুলি বর্ণনা কর।
(১৫) যক্ষ্মার বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার উপায় কি?

। পাচন যন্ত্র

৩৬। খাদ্য ও তাহার উপাদান

পুষ্টির গুরুত্ব :

আমরা জানি যে প্রচুর সংখ্যক লোহিত কণিকা প্রতিদিন ক্ষয় পাইতেছে ও মরিয়া যাইতেছে। দেহের অন্যান্য কোষগুলিও অনুরূপভাবে ক্ষয় পাইতেছে। কিন্তু শরীরের মধ্যে শুধু ইহাই একমাত্র ক্ষয় নয়। জীবদেহের জৈব ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় পরিপাকক্রিয়া ও শক্তির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি কোষের মধ্যে কোষপদার্থের কিছু অংশ নিরন্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

জীবদেহ যাহা হারাইতেছে দৈনিক খাদ্যের মারফৎ তাহা নিরন্তর পূরণ হইয়া থাকে। মৃত কোষগুলির পরিবর্তে নূতন কোষ সৃষ্টির জন্য, কোষের বৃদ্ধির জন্য এবং জৈবিক ক্রিয়াকলাপের ফলে ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ খাদ্য হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। কোন প্রাণী খাদ্য না পাইলে দ্রুত ওজন হারায় এবং শেষ পর্যন্ত মরিয়া যায়।

অর্থাৎ খাদ্যই হইল জীবদেহের গঠন উপাদান এবং শক্তির একমাত্র উৎস।

পুষ্টিকর পদার্থ :

খাদ্যের যে সকল উপাদান জীবদেহের পক্ষে আবশ্যকীয়, সেইগুলিকেই পুষ্টিকর পদার্থ বলে। যে তিনটি জটিল জৈব যৌগিক পদার্থসমষ্টি জীবন্ত পদার্থ সৃষ্টি করে, সেইগুলিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিপদার্থ; সেগুলি হইল, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করা।

খাদ্যে আরও পাওয়া যায় ধাতব পদার্থ (সোডিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও অন্যান্য অজৈব লবণসমূহ) জল এবং সামান্য পরিমাণ ভিটামিন জীবদেহের পরিপাক ক্রিয়ায় ইহাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য :

প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করা দ্বারা বিভিন্ন খাদ্য তৈয়ারী হয়। কোন কোন খাদ্যে বিশেষ একটি পুষ্টি পদার্থই পাওয়া যায়; যেমন চিনিতে শুধু শর্করা থাকে; তেমনি সূর্যমুখীর তেলে সামান্য পরিমাণে অন্যান্য বস্তু থাকিলেও ইহা প্রধানত স্নেহপদার্থ। অবশ্য অধিকাংশ খাদ্য বিভিন্ন পরিমাণে বিভিন্ন পুষ্টিপদার্থে গঠিত।

পুষ্টি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে বিভিন্ন খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ ও শর্করার পরিমাণ জানা প্রয়োজন। উপাদানের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমস্ত খাদ্যই কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত।*

---

* পুস্তকের শেষ অংশে বিভিন্ন খাদ্যের উপাদান তালিকা ভুক্ত করা হইয়াছে।

(১) **মাংস ও মাছ ঃ** মাছ ও মাংস প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস। এগুলিতে সাধারণত শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ প্রোটিন থাকে। কেভিয়ারে প্রোটিনের পরিমাণ খুব বেশী (শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ)। মাছ মাংসে শর্করার পরিমাণ খুবই কম—সাধারণত শতকরা ৫ ভাগের বেশী নয়। কিন্তু চর্বি বা স্নেহপদার্থের পরিমাণে তারতম্য থাকে; কৃশ গরুর মাংসে শতকরা ৩ হইতে ৫ ভাগ এবং খুব মোটা গরুর মাংসে শতকরা ২৫ ভাগ বা আরও বেশী থাকিতে পারে।

বাছুরের মাংস, মুরগীর মাংস, পোনামাছ, পাইক মাছ ইত্যাদি চর্বিহীনের দলভুক্ত; শূকর ও ভেড়ার মাংস, হেরিং মাগুর ও স্যামন মাছ এবং অধিকাংশ মাংসের কাবাবে অধিক পরিমাণে চর্বি বা স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়।

(২) **ডিম ঃ** ডিমে প্রোটিন (১৪%) ও চর্বি (১১%) দুইই বেশী থাকে এবং শর্করা প্রায় নাই বলিলেই চলে। ডিমের কুসুমটি সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর; ইহাতে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ চর্বি এবং জীবদেহের প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদার্থও থাকে।

(৩) **দুধ ও দুধ হইতে উৎপন্নদ্রব্য ঃ** দুধে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে। ইহাতে প্রোটিন ও স্নেহপদার্থের পরিমাণ শতকরা ৩·৫ ভাগ এবং শর্করা শতকরা ৫ ভাগ।

দুধ কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে স্নেহপদার্থটি সরের আকারে উপরে ভাসিয়া ওঠে। সর তোলা দুধে প্রকৃতপক্ষে কোন স্নেহপদার্থ থাকে না। বহুক্ষণ রাখিয়া দিলে এবং অন্যান্য অবস্থায় (যেমন টক হইয়া গেলে) দুধ জমিয়া প্রোটিনের কঠিন পিণ্ডে পরিণত হয়; ইহাকে কেজিন (বা ছানা) বলা হয়। জমাট দুধ হইতে দধি বা ছানা ও চীজ্‌জাতীয় প্রোটিনবহুল খাদ্য তৈয়ারী হয়। এইসব খাদ্যের চর্বির পরিমাণ ইহাদের প্রস্তুত প্রণালীর উপর নির্ভর করে; চর্বিবিহীন খাদ্যগুলি সর তোলা দুধ হইতে তৈয়ারী হয়; ক্রীম হইতে প্রস্তুত খাদ্যে চর্বির পরিমাণ বেশী থাকে।

(৪) **জান্তব ও উদ্ভিজ্জ চর্বি এবং তৈল ঃ** এই দলভুক্ত খাদ্যে শর্করা ও প্রোটিন প্রায় থাকে না। জান্তব ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে বিশেষ পদ্ধতিতে বহু-প্রকার চর্বি প্রস্তুত হয়; সর বা টক সর মন্থন করিয়া মাখন প্রস্তুত হয়, বীজ পিষিয়া তৈল নিষ্কাশন করা হয়, চর্বির বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা মার্গারিন প্রস্তুত হয়।

(৫) **শব্জী, ফল, জাম, ছত্রাক ঃ** দুধের মত এইসব খাদ্যেও প্রচুর জল থাকে। শর্করার পরিমাণ শতকরা ২০ (আলু) হইতে ১ বা ২ ভাগ (লেটুস্, শশা) পর্যন্ত থাকিতে পারে। এই দলের খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ১ হইতে ২ ভাগের বেশী থাকে না। চর্বির পরিমাণও খুব কম।

(৬) **শস্য ও গম ঃ** শস্য ও গমে জলের পরিমাণ খুব অল্প। সাধারণ-খাদ্যে আমরা এইগুলি হইতেই অধিকাংশ শর্করা পাইয়া থাকি, কারণ এই-গুলিতে শতকরা ৫০ হইতে ৭০ ভাগ শ্বেতসার বর্তমান। এইসব শস্য এবং মাংস ও মাছ হইতে আমরা প্রচুর প্রোটিন পাই (গড়পড়তা প্রায় শতকরা ১০ ভাগ)। এইগুলিতে চর্বির অংশ খুব কম।

শস্য ও গম হইতে খাদ্য প্রস্তুত করার সময় প্রচুর পরিমাণ জল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। রুটিতে যে পরিমাণ গম ব্যবহার করা হয় রুটির ওজন তাহা

অপেক্ষা শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ বেশী; খিচুড়ি রান্না করিতে শস্য অপেক্ষা ৩, ৫ এমনকি ১০ গুণ বেশী জল ব্যবহার করা হয়।

(৭) **বিভক্ত বীজ হইতে উদ্ভূত গাছের ফল :** মটরশুঁটি, বীন, সয়াবীন, মসুর ইত্যাদিতে প্রচুর প্রোটিন (শতকরা ২৮ হইতে ৩০ ভাগ) এবং শর্করা থাকে। কোন কোন অঞ্চলের প্রধান খাদ্য সয়াবীনে যথেষ্ট স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়।

(৮) **বাদাম :** সমস্ত প্রকার বাদামে একই হারে পুষ্টিপদার্থ থাকে না। কিন্তু ইহাদের সবগুলিতেই যথেষ্ট স্নেহপদার্থ আছে; কতকগুলি বাদামে শতকরা ৬০ ভাগ বা আরও বেশী স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া বাদামে যথেষ্ট প্রোটিনও আছে (শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ)। শর্করার পরিমাণ কিন্তু কম।

সূর্যমুখী বীজের উপাদান প্রায় বাদামেরই মত—ইহাতে স্নেহপদার্থের পরিমাণ শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ।

(৯) **চিনি :** চিনি খাঁটি শর্করা। মধু, ফল, জামের মোরব্বা, মিছরি বা আঠাল মিছরি আসলে খাঁটি শর্করার অন্তর্ভুক্ত।

আলু অথবা গমের শ্বেতসারও এই দলভুক্ত; চিনির মত শ্বেতসারও একটি খাঁটি শর্করা।

(১০) **চকোলেট, কোকো :** এই খাদ্যগুলিতে প্রচুর পরিমাণে শর্করা (শতকরা ৫০ হইতে ৭০ ভাগ) ও স্নেহপদার্থ (শতকরা প্রায় ২০ ভাগ) এবং কিছুটা (শতকরা ৫ ভাগ) প্রোটিনও আছে।

অনুশীলনী :

তোমার দৈনিক খাদ্য হইতে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করার অন্তর্ভুক্ত তিন প্রকার পুষ্টিপদার্থযুক্ত খাদ্যের নাম লিখ। এই খাদ্যগুলি কেন এই পুষ্টিপদার্থগুলির প্রধান উৎস হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। তালিকাভুক্ত এই খাদ্যগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টিতে একসঙ্গে দুই প্রকার পুষ্টি পদার্থ বর্তমান? সে পুষ্টি পদার্থগুলি কি কি?

৩৭। *পাচন*

পাচন বা হজমের গুরুত্ব :

কোন কোন প্রাণী তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ মাধ্যম হইতে প্রস্তুত পুষ্টিপদার্থ পাইয়া থাকে, ইহাদের খাদ্য তৈয়ারী করার প্রয়োজন হয় না। অন্ত্রের মধ্যে কীট (worms) ও পরজীবীগুলি (parasites) এই ধরনের প্রাণী। ইহারা ইহাদের 'মালিকের' অন্ত্রে অথবা অন্য কোন দেহযন্ত্রে বসবাস করে এবং সেখানে পূর্ব হইতে প্রস্তুত ও জীর্ণ করা পুষ্টিপদার্থ পাইয়া থাকে।

কিন্তু অধিকাংশ প্রাণীকেই এমন পুষ্টিপদার্থ খাইয়া বাঁচিতে হয় যেগুলি কোষঝিল্লী ভেদ করিয়া যাইতে পারে না বলিয়া জীবদেহ কর্তৃক পোষিত (assimilated) হইতে পারে না। পোষিত হইবার জন্য পুষ্টি পদার্থগুলিকে প্রথমে সহজতররূপে ভাঙিয়া লইতে হয়। এই পদ্ধতি চলিবার সময় খাদ্যের রূপগত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

রূপগত পরিবর্তনে খাদ্য দাঁতের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং আর্দ্র হইয়া থাকে। সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত ও দ্রবীভূত অবস্থায় খাদ্য সহজেই

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আওতায় আসিয়া পড়ে এবং তাহার ফলে প্রোটিন, চর্বি ও শর্করার জটিল কণাগুলি বিভক্ত হইয়া যায়। এইভাবে বিভক্ত বা পৃথক হইয়া অর্থাৎ পাচনের কিন্বপদার্থগুলির (digestive ferments) সাহায্যে জীর্ণ হইয়া পুষ্টিপদার্থটি কম জটিল পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং তখন অন্ত্রের গাত্র দিয়া সহজেই চলিয়া যাইতে পারে।

শর্করার রূপান্তর ঃ

পাচন ক্রিয়া চলার সময় শ্বেতসারের প্রতিটি অণু গ্রেপ্‌সুগার বা গ্লুকোজ-জাতীয় সাধারণ শর্করার কয়েকটি অণুতে বিভক্ত হইয়া যায়। ইক্ষু অথবা বীটের এক অণু চিনি ভাঙিগয়া দুই অণু সাধারণ শর্করা অর্থাৎ গ্লুকোজ ও ফলের চিনিতে রূপান্তরিত হয়। অনুরূপভাবে দুধের চিনি দুই কণা সাধারণ চিনিতে বিভক্ত হইয়া যায়।

প্রোটিনের রূপান্তর ঃ

প্রোটিন দেহাভ্যন্তরে সঙ্গে সঙ্গেই বিভক্ত হয় না। প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হওয়া পদ্ধতির প্রথম অবস্থায় এমন কয়েকটি পদার্থের সৃষ্টি হয় যেগুলি তখনও জটিল অবস্থায় থাকে। এইগুলি বারে বারে বিভক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত এ্যামাইনো এ্যাসিডরূপী সরল যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

এখন পর্যন্ত প্রোটিন গঠনকারী ২০টির বেশী এ্যামাইনো এ্যাসিড জানা গিয়াছে। বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের এবং বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও কলার প্রোটিনে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পরিমাণের এ্যামাইনো এ্যাসিড আছে।

স্নেহপদার্থের রূপান্তর :

এক অণুস্নেহপদার্থ ভাঙিগয়া এক অণু গ্লিসারল ও তিন অণু স্নেহজাতীয় এ্যাসিডে (fatty acids) পরিণত হয়। স্নেহজাতীয় এ্যাসিডগুলি ক্ষারের (alkalis) সহিত যুক্ত হইয়া যে লবণ তৈয়ারী করে, তাহাকে সাবান বলা হয়। সাধারণত যে সাবান (soaps) ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হইল সোডিয়াম লবণঘটিত স্নেহজাতীয় এ্যাসিড এবং ইহা স্নেহজাতীয় এ্যাসিডের উপর কষ্টিক সোডার প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত।

কোষের মধ্যে পাচনক্রিয়া ঃ

একটি কোষবিশিষ্ট প্রাণীদেহে কোষের মধ্যেই পাচনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অণুবীক্ষণের সাহায্যে এ্যামিবার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে ইহা শরীরের এক বা অপর স্থান হইতে "সিউডোপোড" (pseudopod) নামক ক্ষুদ্র উদ্গত অংশ ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। এ্যামিবার দেহ কোন কঠিন বস্তুকণার সংস্পর্শে আসিলে সিউডোপোড সেটিকে ধরিয়া তাহার উপর এবং চারিপাশ দিয়া প্রবাহিত হয় এবং শীঘ্রই সেই কণাটি এ্যামিবার দেহাভ্যন্তরে চলিয়া যাইবে। কণাটির চারিপাশে জীবোপাদানে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর (বা খাদ্য-গহ্বর) তৈয়ারী হয়। ধৃত বস্তুর মধ্যস্থিত পুষ্টিপদার্থটি জীবোপাদান হইতে গহ্বরে আগত পাচনের কিন্বপদার্থ দ্বারা জীর্ণ হইয়া থাকে। জীর্ণ হওয়ার অনুপযুক্ত অবশিষ্টাংশ বাহিরে নিঃসৃত হয়; এ্যামিবার সচলতার জন্য খাদ্য-

গহ্বরটি যে মুহূর্তে ইহার উপরিভাগে চলিয়া আসে ঠিক সেই মুহূর্তেই নিঃসরণক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

কোষের বাহিরে পাচনক্রিয়া ঃ

নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি কয়েকটি বড় বড় সামুদ্রিক জীবের (Coelentereta—Sea anemones) উপর চালান হইয়াছিল। কয়েকটি রক্ত প্রোটিনের (ফাইব্রিন) টুকরা ফিল্টার কাগজে মুড়িয়া এই জন্তুগুলির পাচনযন্ত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে ফাইব্রিনটি বাহির করিয়া দেখা গেল যে, উহা সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সামুদ্রিক এ্যানিমোন্সের পাচনক্রিয়া কোষের মধ্যে না হইয়া পাচনযন্ত্রের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে; এখানে খাদ্যকণাগুলি নির্দিষ্ট গ্রন্থিকোষ হইতে ক্ষরিত শ্লেষ্মার সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করে; এই শ্লেষ্মায় যে কিন্বপদার্থ থাকে তাহা দ্বারাই পাচনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অর্ধজীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি অন্য কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে পারে; এই কোষগুলির মধ্যে এ্যামিবা দেহের মত খাদ্য-গহ্বর থাকে।

দেখা যাইতেছে সামুদ্রিক এ্যানিমোন্সের দেহে কোষের মধ্যে এবং বাহিরেও খাদ্যের পাচন হইয়া থাকে। অন্যান্য বহু মেরুদণ্ডহীন জীবদেহেও একই সঙ্গে পাচন-গহ্বরে ও কোষ মধ্যে খাদ্য জীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণীটি যত উচ্চ-স্তরের হইবে কোষের বাহিরে পাচনক্রিয়ার গুরুত্ব তত বেশী হইবে।

মেরুদণ্ডী জীবদের ক্ষেত্রে কোষের বাহিরে অন্ত্রগহ্বরে পাচনক্রিয়া সম্পন্ন হয়; এখানে প্রচুরসংখ্যক পাচন গ্রন্থি দ্বারা প্রয়োজনীয় কিন্বপদার্থ সহ জারক রস ক্ষরিত হয়।

ফেগোসাইট ঃ

প্রাণীজগতের বহু শতাব্দীব্যাপী বৃদ্ধির ফলে কোষের মধ্যে পাচনক্রিয়ার মৌলিক তাৎপর্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং কোষের বাহিরে পৌষ্টিক নালীর মধ্যে পাচনক্রিয়া শুরু হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোষের মধ্যে পাচনক্রিয়া সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নাই। জীবাণুদেহে ইহা এক নূতন গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

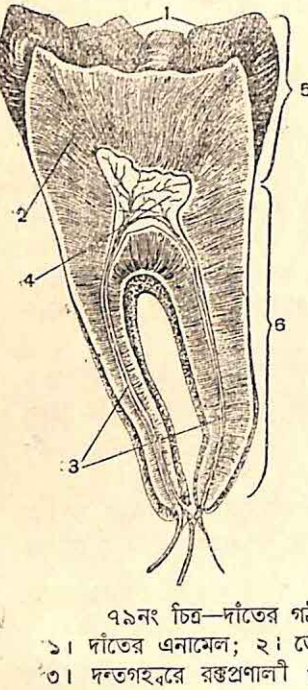
প্রখ্যাত রুশ-বিজ্ঞানী মেচ্নিকভ্ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফেগোসাইট সমূহ জীবদেহ হইতে রোগ-বীজাণু এবং কোষদেহের পচনশীল অংশগুলি কোষ-মধ্যে পাচনক্রিয়া মারফৎ দূরীভূত করিয়া থাকে। ফেগোসাইটদের এই বিশেষ কার্যকলাপ (phagocyposis) কিন্তু পাচনক্রিয়ার অংশ নয়; দেহের অন্যান্য কোষের ন্যায় ফেগোসাইটদেরও পূর্ব হইতে প্রস্তুত ও জীর্ণ পুষ্টিপদার্থের প্রয়োজন।

৩৮। *মুখ বিবর*

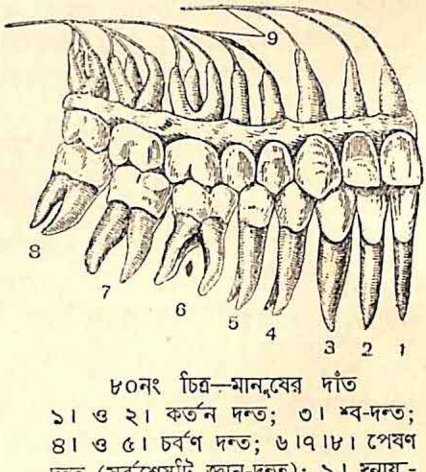
দাঁতের গঠন ঃ

মুখবিবর হইতেই পৌষ্টিক নালী শুরু হইয়াছে। মুখবিবরে খাদ্য লালার দ্বারা পিচ্ছিল এবং দাঁতের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। দাঁতগুলি

"ডেনটিন" নামক একপ্রকার অস্থিসংশ্লিষ্ট নিবিড় পেশী দ্বারা গঠিত। ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন চোয়ালের বিশেষ বিশেষ গহ্বরের মধ্যে দাঁতগুলি প্রোথিত হইয়া থাকে। চোয়ালের গহ্বরের মধ্যে প্রোথিত অংশকে দন্তমূল এবং উপরের অংশকে চূড়া বলা হয় (৭৯নং চিত্র)। দাঁতের অভ্যন্তরস্ত গহ্বরটি রক্তপ্রণালী ও স্নায়ু-কলায় পূর্ণ থাকে; এইগুলি খুব সূক্ষ্ম-প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া দন্তমূল পর্যন্ত চলিয়া যায়। চূড়াটি খুব কঠিন এনামেলের আস্তরণে ঢাকা থাকে। গঠন প্রকৃতির জন্য দাঁতের স্থায়িত্ব খুব বেশী।



৭৯নং চিত্র—দাঁতের গঠন
১। দাঁতের এনামেল; ২। ডেন্‌টাইন; ৩। দন্তগহ্বরে রক্তপ্রণালী ও স্নায়ু প্রবেশের নালিকা; ৪। দন্তগহ্বর; ৫। দন্ত-মুকুট; ৬। দন্তমূল



৮০নং চিত্র—মানুষের দাঁত
১। ও ২। কর্তন দন্ত; ৩। শ্ব-দন্ত; ৪। ও ৫। চর্বণ দন্ত; ৬।৭।৮। পেষণ দন্ত (সর্বশেষটি জ্ঞান-দন্ত); ৯। স্নায়ু-শাখাগুলি দন্তমূলে প্রবেশ করিতেছে।

দাঁতের সংখ্যা ও আকৃতি ঃ

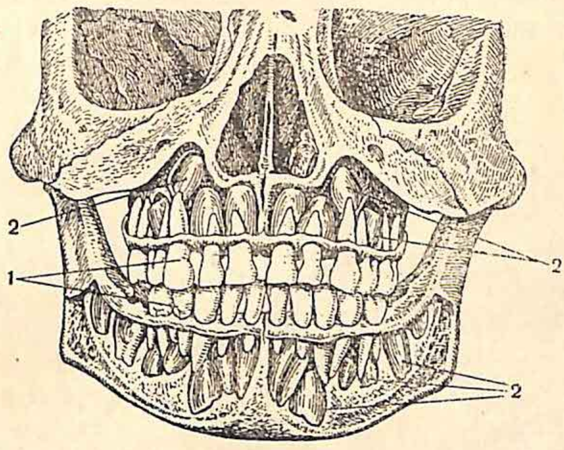
মানুষের উপরের ও নীচের চোয়ালে ১৬টি করিয়া মোট ৩২টি দাঁত আছে (৮০নং চিত্র)। সম্মুখের ৪টি দাঁতকে কর্তন-দন্ত (incisors) বলে; তাহার উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া শ্ব-দন্ত (canine), দুইটি করিয়া চর্বণ-দন্ত (premolar) ও তিনটি করিয়া পেষণ-দন্ত (molar) আছে।

চর্বণ ও পেষণ দন্তগুলি দ্বারা খাদ্য চর্বিত ও পেষিত হইয়া থাকে। বৃহৎ খাদ্যখণ্ডগুলি শ্ব-দন্ত দ্বারা কর্তিত ও ছিন্ন করা হয়। কর্তন দন্ত দ্বারা প্রধানত খাদ্য কর্তনের কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দুধ-দাঁত ঃ

শিশুদের প্রথমে অস্থায়ী বা দুধ দাঁত উঠিয়া থাকে। ২২ বৎসর বয়সে ২০টি দাঁত দেখা দেয়। তাহার মধ্যে ৮টি কর্তন-দন্ত, ৪টি শ্ব-দন্ত এবং ৮টি চর্বণ-দন্ত (৮১নং চিত্র)। ৬ হইতে ৮ বৎসর বয়সে প্রথম স্থায়ী পেষণ-দন্ত উঠিতে আরম্ভ করে। এই বয়সে দাঁতের পরিবর্তনও শুরু হয়—দুধ-দাঁতগুলি

ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়িয়া যায় এবং তাহাদের স্থলে স্থায়ী দাঁতগুলি উঠিতে থাকে। ১২ হইতে ১৪ বৎসর বয়সে দাঁতের পরিবর্তন সম্পূর্ণ হইয়া যায় এবং এই সময় দ্বিতীয় পেষণ-দন্ত উঠিতে শুরু করে। সর্বশেষ পেষণ-দন্তটি



৮১নং চিত্র—দুধ-দাঁত
১। দুধ-দাঁত; ২। স্থায়ী দাঁতের ক্ষীণ চিহ্ন

(উভয় দিকের) সাধারণত ১৮ বৎসরের পূর্বে দেখা যায় না; কখনও কখনও ২৫ বৎসরও লাগিয়া যাইতে পারে; এগুলিকে বলা হয় আক্কেল-দাঁত বা জ্ঞান-দন্ত।

দাঁতের যত্ন ঃ

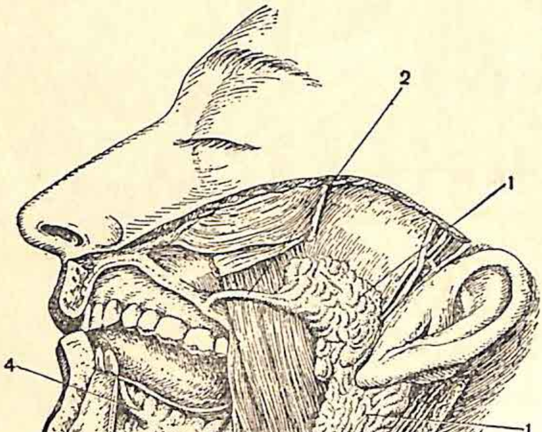
দাঁতের এনামেল যথেষ্ট কঠিন হওয়া সত্ত্বেও সময় সময় ইহাতে ফাটল দেখা দেয়। দাঁত দিয়া বাদাম ভাঙিগতে বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ কামড়াইবার সময়, পর পর ঠাণ্ডা ও গরম পানীয় পান করিলে (আইসক্রীম ও গরম চা) এনামেল ফাটিয়া যাইতে পারে। শিশু ও কিশোরদের দাঁতের এনামেল প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা পাতলা, সেইজন্য অল্পবয়স্কদের দাঁত সহজেই আহত হইতে পারে। দুধ-দাঁতগুলি বিশেষ করিয়া ভঙ্গুর।

এনামেল নষ্ট হইলে দাঁতটি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। একটি দাঁতের ক্ষয় যথাযথভাবে চিকিৎসা না করাইলে পাশের দাঁতগুলি আক্রান্ত হইতে পারে। সুতরাং দাঁতের ক্ষয় রোধ করার জন্য অথবা ক্ষয়িষ্ণু দাঁত তুলিয়া ফেলিবার জন্য বৎসরে অন্তত দুইবার দন্তচিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত।

খাদ্যকণাগুলি দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়া পচিতে আরম্ভ করে এবং তাহা হইতেই দাঁতের ক্ষয় শুরু হয়। সুতরাং খাদ্যকণাগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দাঁতের ক্ষয় রোধ করিবার জন্য প্রতিদিন রাত্রে শয়নের পূর্বে মাজনের সাহায্যে দাঁত ঘসিয়া ফেলা কর্তব্য। প্রথমে দাঁতের বাহিরের দিক উপর হইতে নীচে এবং নীচু হইতে উপরের দিকে ঘসিয়া পরে ভিতরের দিকে ঘসিতে হইবে। প্রত্যেকবার খাওয়ার পর পানীয় জলে মুখ ধোওয়া উচিত।

লালা-গ্রন্থি ঃ

মুখবিবর সব সময়েই আর্দ্র থাকে। মুখবিবরের গাত্রে অবস্থিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত শ্লেষ্মা এবং কর্ণপূরঃ (বা parotid), অধোহনু (বা submaxillary) এবং অধোরসনা (বা sublingual) গ্রন্থিত্রয় হইতে ক্ষরিত লালা দ্বারা মুখগহবরের আর্দ্রতা সৃষ্টি হয় (৮২নং চিত্র)। এই গ্রন্থি-গুলির গড়ন অনেকটা আঙ্গুরগুচ্ছের মত। ইহাতে অনেকগুলি গোলাকার বা থলির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি থাকে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থি-সমূহের নল বা ডাক্ট-গুলি সম্মিলিতভাবে একটি সাধারণ নল বা ডাক্টে পরিণত হইয়া মুখবিবরে যাইয়া উন্মুক্ত হয় এবং তথায় লালা নিঃসৃত করে।



৮২নং চিত্র লালা গ্রন্থি
১। প্যারটিড গ্রন্থি; ২। প্যারটিড গ্রন্থির ডাক্ট; ৩। অধোজিহবা বা সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি; ৪। অধোজিহবা গ্রন্থির ডাক্ট; ৫। অধোহনু গ্রন্থি; ৬। অধোহনু গ্রন্থির ডাক্ট

একজন লোক দৈনিক ৬০০ হইতে ৭০০ সি.সি. লালা ক্ষরণ করে। লালা খাদ্যকে আর্দ্র করে এবং মুখ-বিবরের শ্লেষ্মা-ঝিল্লীতে অনিষ্টকর বা বহিরাগত কোন পদার্থ আসিলে তাহা ধোয়াইয়া বাহির করিয়া দেয়।

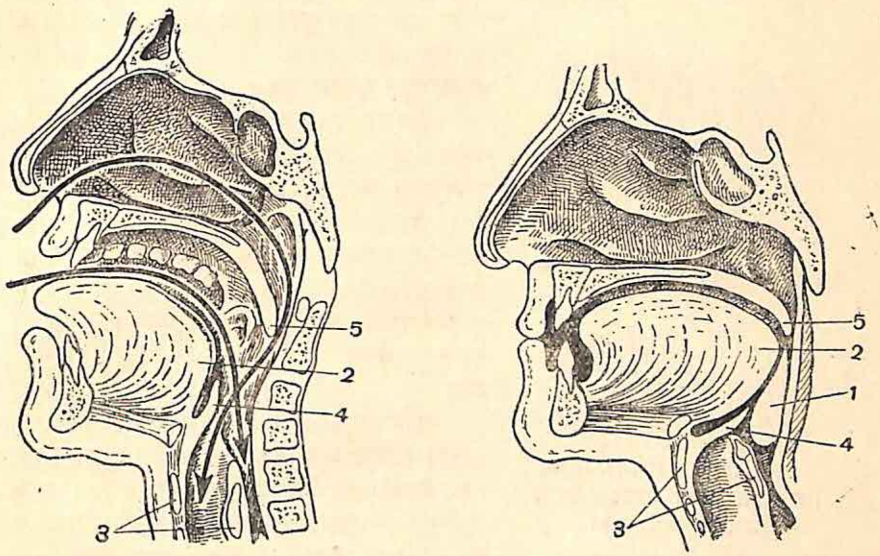
মানুষের লালায় টায়া-লিন নামক একটি কিন্ব-পদার্থ থাকে; ইহা শ্বেতসারকে মলটোজ রূপান্তরিত করে। লালার আর একটি কিন্বপদার্থ পচন-ক্রিয়াকে চালু রাখে এবং মলটোজকে গ্লুকোজ বা আঙ্গুর চিনিতে (grape sugar) পরিণত করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, লালার দ্বারা খাদ্যের শর্করাজাতীয় অংশ জীর্ণ হইয়া থাকে।

গলাধঃকরণ ঃ

লালার দ্বারা আর্দ্র ও পিষ্ট হইবার পর খাদ্য জিহবার সঞ্চালনে গলবিলের মধ্যে পরিচালিত হয়। গলবিলে পেঁছাইলে কোমল তালুটি উপরে উঠিয়া গলবিলের নাসিকাংশের প্রবেশ পথটি বন্ধ করিয়া দেয়; এই সময় স্বরযন্ত্রটি উপরের দিকে টানে উঠিয়া পড়ে এবং উপজিহবা বন্ধ হইয়া যায়। উপজিহবাটি খাদ্যকে গলবিলের নাসিকাংশে এবং স্বরযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়।

জিহ্বার চাপের ফলে খাদ্যমণ্ডটি শ্লেষ্মাঝিল্লী দ্বারা আবৃত এবং পেশী-গঠিত গ্রাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করে (৮৩নং চিত্র)।

গ্রাসনালীর উপরের অংশের পেশীগুলি ডোরাকাটা জাতীয়। অবশিষ্টাংশ মসৃণ পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত; এই পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া সমগ্র নালীটিতে



৮৩নং চিত্র—গলাধঃকরণ

বামে—শ্বাস বায়ুর ও খাদ্যমণ্ড গলাধঃকরণের পথ; দক্ষিণে—খাদ্যমণ্ড গলাধঃকরণের পূর্ব মুহূর্তে

১। খাদ্যমণ্ড; ২। জিহ্বা; ৩। স্বরযন্ত্র; ৪। উপজিহ্বা; ৫। নরম তালু

চক্রাকার তরঙ্গস্রোতের মত সঙ্কোচন সৃষ্টি করে। এই সঙ্কোচন তরঙ্গ প্রথমে গ্রাসনালীর উপরের অংশকে সঞ্চালিত করিয়া পরে পাকস্থলীতে যাইয়া পৌঁছায়। এই ক্রিমিজাতীয় সঙ্কোচনের ফলেই খাদ্য পাকস্থলীতে পরিচালিত হয়।

অনুশীলনী ঃ

দাঁতের গঠনের একটি ছবি আঁক।

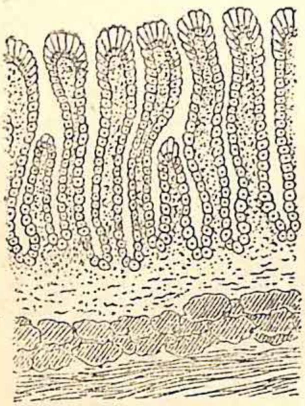
৩১। *পাকস্থলী*

পাকস্থলীর গঠন :

পৌষ্টিক নালীর প্রশস্ততম অংশ হইল পাকস্থলী। পৌষ্টিক নালীর অন্যান্য অংশের মত পাকস্থলীর গাত্রেও একটি পুরু পৈশীক স্তবক এবং ভিতরের অংশে এক শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর স্তবক আছে। উপরে গ্রাসনালী যেখানে পাকস্থলীতে আসিয়া মিশিয়াছে এবং নিম্নে পাকস্থলী হইতে যেখানে অন্ত্র

শুরু হইয়াছে তথাকার চক্রাকৃতি পেশীগুলির সংকোচনের ফলে পাকস্থলীর প্রবেশ ও নির্গমনের মুখ দুইটি সাধারণত বন্ধ থাকে। খাদ্যপিণ্ড চলাচলের সময় পেশীগুলি শিথিল হয়।

পাকস্থলীর শ্লেষ্মা-ঝিল্লীতে শাখাপ্রশাখাযুক্ত নলের ন্যায় প্রায় ৫০ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে (৮৪নং চিত্র)। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থিগুলি দৈনিক প্রায় ২ লিটার জারক রস ক্ষরণ করে এবং তাহা দ্বারা খাদ্যের প্রোটিন জীর্ণ হয়।



৮৪নং চিত্র—পাকস্থলীর গ্রন্থি নিম্নে পাকস্থলী গাত্রের পেশীক স্তবক দেখা যাইতেছে।

পাকস্থলীর জারক রস :

পাকস্থলীর রসে পেপ্‌সিন নামক কিণ্ব-পদার্থ এবং হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড থাকে। পেপ্‌সিন খাদ্যের প্রোটিনের উপর কাজ করে এবং পাচন ক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু কিণ্ব-পদার্থটি অম্লমাধ্যম (acid medium) ছাড়া কাজ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া অম্লটি পাকস্থলীতে খাদ্যের সহিত আগত বীজাণু ধ্বংস করিয়া প্রতিরক্ষার ভূমিকা পালন করে।

লালার দ্বারা আর্দ্র খাদ্যপিণ্ড পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া সঙ্কুচিত পাকস্থলী গাত্রের চাপে বেশ কিছুকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। ক্রমে অসংখ্য পাকস্থলী গ্রন্থি দ্বারা ক্ষরিত অম্লরস ইহার উপর কাজ করিতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে খাদ্যপিণ্ডের মধ্যস্থলে ঢুকিয়া পড়ে। সেই কারণে খাদ্য যেখানে পাকস্থলী গাত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই অংশেই প্রোটিনের পাচন ক্রিয়া শুরু হয়।

লালার যে অংশ খাদ্যের সহিত পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তাহা দ্বারা পাকস্থলীর মধ্যে শর্করাও জীর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের উপস্থিতিতে লালার কিণ্বপদার্থ কাজ করিতে পারে না। সেই কারণে খাদ্যের যে অংশে পাকস্থলীর অম্লরস প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই অংশে শর্করা জীর্ণ হইয়া থাকে।

অন্ত্র মধ্যে খাদ্য চলাচল :

পাচন ক্রিয়া চলিতে থাকা কালে খাদ্য পাকস্থলীর নিম্নাংশে চলিয়া আসিলে ইহা খাদ্যকে পাকস্থলীর বাহিরে ঠেলিয়া দেয়। এই স্থানে পাকস্থলীর তরঙ্গ সঙ্কোচন খাদ্যপিণ্ডকে মন্থন করিতে শুরু করে এবং তখন ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে।

৪০। পৌষ্টিক নালী

অন্ত্র :

পাকস্থলী হইতে খাদ্য অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে ক্ষুদ্র অন্ত্র এবং পরে বৃহৎ অন্ত্রের মধ্য দিয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করে (৮৫নং চিত্র)। এই মন্থর

চলমান অবস্থাতেই খাদ্য জীর্ণ হইতে থাকে। জীর্ণ হওয়ার পর ইহা পৌষ্টিক নালী হইতে রক্তে অবশোষিত হয়।

মানুষের পৌষ্টিক নালী মাংসাশী জীবদের অপেক্ষা দীর্ঘ, কিন্তু নিরামিষাশী জীবদের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র। কুকুরের পৌষ্টিক নালী ইহার দেহ অপেক্ষা ৪ই গুণ দীর্ঘ; ভেড়ার ক্ষেত্রে ইহা ২৪ গুণ এবং মানুষের দেহ অপেক্ষা ৯ গুণ দীর্ঘ। পৌষ্টিক নালীর দৈর্ঘ্য খাদ্যের চরিত্রের উপর নির্ভর করে। সব্জী জাতীয় খাদ্যে মাংস অপেক্ষা কম পুষ্টি পদার্থ থাকে; তাহা ছাড়া উদ্ভিদ কোষের সেলুলোজগঠিত ঝিল্লীটি খুব ধীরে ধীরে জীর্ণ হয়। কাজেই উদ্ভিজ্জ খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়া যায় এবং দীর্ঘকাল পৌষ্টিক নালীতে অবস্থান করে।

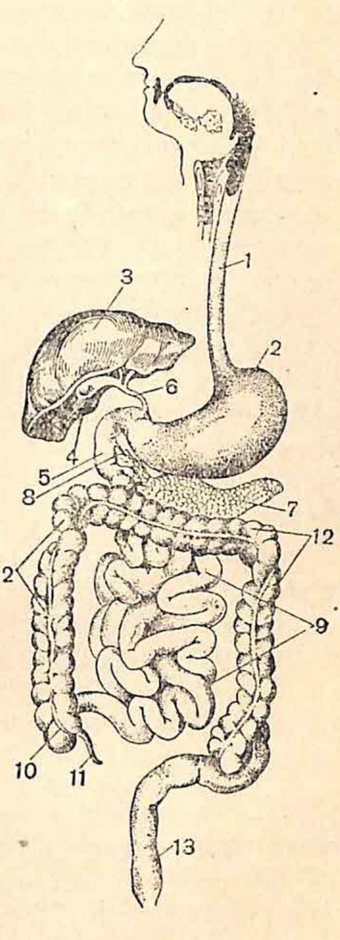
গ্রহণী বা ডিয়োডিনাম :

ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশটির নাম ডিয়োডিনাম। অগ্ন্যাশয় ও যকৃতের ডাক্টগুলির মুখ ডিয়োডিনামে আসিয়া উন্মুক্ত হইয়াছে। লালাগ্রন্থিসমূহের ন্যায় যকৃত ও অগ্ন্যাশয় পৌষ্টিক নালীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হওয়ার কারণ শুধু পাচন ক্রিয়ায় সাহায্য করা নয়, ইহাদের গঠনও এই সংযোগের অন্যতম কারণ; ভ্রূণদেহে উভয়েই পৌষ্টিক নালীর পার্শ্বের বৃদ্ধি হিসাবে (lateral growths) প্রথম দেখা দেয়।

অগ্ন্যাশয় :

লালাগ্রন্থিসমূহের ন্যায় অগ্ন্যাশয়ও একটি জটিল শাখা প্রশাখাযুক্ত গ্রন্থি। অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরিত রসে যে কিণ্বপদার্থ থাকে, তাহা খাদ্যের প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করা এই তিনটি প্রধান উপাদানের উপরই কাজ করে।

পাকস্থলীর মধ্যে প্রোটিন যে পরিমাণে বিভক্ত হয়, অগ্ন্যাশয়ের রস কর্তৃক তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিভক্ত হইয়া হইয়া থাকে; এখানে প্রোটিনগুলি পৃথক পৃথক এ্যামাইনো-এ্যাসিডে বিভক্ত হয়। অগ্ন্যাশয় রসের অপর একটি



৮৫নং চিত্র—পাচনযন্ত্র

১। গলনালী; ২। পাকস্থলী; ৩। যকৃত; ৪। পিত্তাশয়; ৫। ডিয়োডিনাম; ৬। পিত্তাশয়ের ডাক্ট; ৭। অগ্ন্যাশয়; ৮। অগ্ন্যাশয়ের ডাক্ট; ৯। ক্ষুদ্রান্ত্র; ১০। সিকাম বা বন্ধনালী; ১১। উদর-উপাঙ্গ বা এ্যাপেনডিক্স; ১২। বৃহদান্ত্র; ১৩। মলনালী।

কিন্বপদার্থ টায়ালিনের মত শ্বেতসারকে চিনিতে র‍ূপান্তরিত করে এবং একটি স্নেহজাতীয় কিন্বপদার্থ দ্বারা স্নেহপদার্থ গ্লিসারল ও স্নেহজাতীয় অম্লে র‍ূপান্তরিত হয়।

যকৃত :

উদরগহ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বের উপরের অংশে মধ্যচ্ছদার ঠিক নীচে যকৃতের অবস্থান। প‍ূর্ণবয়স্ক লোকের যকৃতের ওজন প্রায় এক কিলোগ্রাম। অন্যান্য দেহযন্ত্রের মত যকৃতও একটি ধমনী দ্বারা অক্সিজেনে সম‍ৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ পাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া পাকস্থলী, অন্ত্র, অগ্ন্যাশয় ও প্লীহা হইতে প্রবাহিত রক্তসহ একটি শিরাও যকৃতে আসিয়া উন্ম‍ুক্ত হয় (রঙিন চিত্র ২)। যকৃতের মধ্যে এই শিরাটি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া প‍ুনরায় কৈশিক নালী স‍ৃষ্টি করে। ফলে পৌষ্টিক নালীতে প্রবাহিত রক্ত দ‍ুইবার কৈশিক নালীসম‍ূহের মধ্য দিয়া চলাচল করে। পরিপাক ক্রিয়ায় এবং বিশেষ করিয়া জীর্ণ ও অবশোধিত প‍ুষ্টি-পদার্থের তৎপরবর্তী প্রক্রিয়াসম‍ূহে যকৃত যে ভূমিকা গ্রহণ করে তাহার সহিত উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক আছে।

যকৃতের অন্যতম কাজ হইল পিত্তক্ষরণ; পিত্ত পিত্ত-নলের (bileduct) মধ্য দিয়া ডিয়োডিনামে প্রবেশ করে। পিত্তের নিজস্ব কোন কিণ্বপদার্থ না থাকিলেও ইহা অন্যান্য কিণ্বপদার্থের কাজে সাহায্য করিয়া প‍ুষ্টিপদার্থ জীর্ণ করিতে সহায়ক হয়। যকৃতে অবিরাম পিত্ত ক্ষরণ হইলেও খাদ্যপিণ্ড পাকস্থলী হইতে ডিয়োডিনামে যাইবার সময় ইহা পৌষ্টিক নালীতে প্রবেশ করে। অন্য সময়ে পিত্ত পিত্তাশয়ে (gall bladder) যাইয়া প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত সেইখানে জমা থাকে।

ক্ষ‍ুদ্রান্ত্র :

ক্ষ‍ুদ্রান্ত্র পৌষ্টিক নালীর দীর্ঘতম অংশ। ইহার শ্লেষ্মা-ঝিল্লীতে সন্নিবিষ্ট অসংখ্য আন্ত্রিক গ্রন্থি হইতে প্রতিদিন প্রায় দ‍ুই লিটার জারক রস ক্ষরিত হয়। এই জারক রসে যে কিণ্বপদার্থ থাকে তাহা প্রোটিন, স্নেহপদার্থ এবং শর্করার উপর কাজ করে এবং ইহাদের পাচন-ক্রিয়ার শেষ পর্যায় সম্পন্ন করে।

অন্ত্রের তরঙ্গায়িত সঞ্চালন (peristalsis) :

ক্লোরোফর্ম দ্বারা অচেতনকৃত কোন জন্তুর উদরগহ্বর কাটিয়া উন্ম‍ুক্ত করিলে কুণ্ডলীকৃত ভাঁজ বিশিষ্ট ক্ষ‍ুদ্রান্ত্রে ক্রিমিস‍ুলভ সঞ্চালন দেখা যাইবে। অন্ত্রগাত্রে অবস্থিত মস‍ৃণ পেশীগ‍ুলির পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন ও শ্লথ হওয়ার জন্যই এই সঞ্চালন স‍ৃষ্টি হয়। প্রতিটি সঙ্কোচন সেই ম‍ুহ‍ূর্তেই সমগ্র অন্ত্রে পরিব্যাপ্ত না হইয়া একবার একটি অংশে সঞ্চারিত হয় এবং এইভাবে সঙ্কোচন তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে সমগ্র অন্ত্রে ছড়াইয়া পড়ে। অন্ত্রগাত্রের এই তরঙ্গায়িত অথবা ক্রিমিস‍ুলভ সঞ্চালনকে peristalsis বলা হয়। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন অন্ত্রের একটি অংশকে "শারীর ব‍ৃত্তিক দ্রবে" ডুবাইয়া রাখিলেও এই সঞ্চালন দেখা যাইবে।

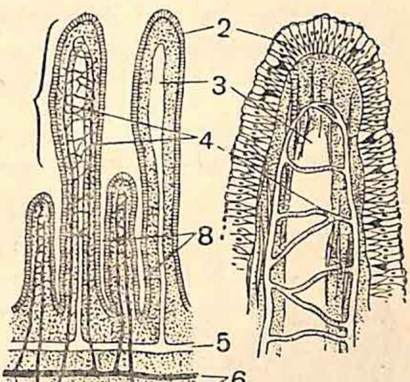
অন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সঞ্চালনের জন্য অর্ধজীর্ণ খাদ্যপিন্ড মথিত ও মিশ্রিত হইতে হইতে ধীরে ধীরে অন্ত্র-পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

অন্ত্রের কোরক (Villi) :

কোন পদার্থ বাহির হইতে চর্মের মধ্য দিয়া অথবা পাচনপথের শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর মধ্য দিয়া রক্তে অথবা লসিকায় প্রবেশ করিবার প্রক্রিয়াকে অবশোষণ ক্রিয়া বলে। পাচনক্রিয়া প্রসূত পদার্থগুলি প্রধানত ক্ষুদ্রান্ত্র হইতেই অবশোষিত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর একটি টুকরা জলে ফেলিয়া আতস কাঁচ (magnifying glass) দিয়া পরীক্ষা করিলে মখমলের মত অঙ্গুলি সদৃশ সূক্ষ্ম উদ্গত অংশে নিবিড়ভাবে ঢাকা অসংখ্য ভাঁজ দেখা যাইবে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্গত অংশগুলিকে "অন্ত্রকোরক" (villi) বলা হয় (৮৬নং চিত্র)। ভাঁজ ও উদ্গত অংশগুলির জন্য অন্ত্রগাত্র বিস্তৃতি খুব বেশি এবং তাহার ফলে পুষ্টিপদার্থের অবশোষণও ত্বরান্বিত হয়।

প্রত্যেক ভিলাসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তপ্রণালীর জালিকা থাকে; তাহা ছাড়া একটি করিয়া লসিকাপ্রণালী এই স্থানে উৎপত্তি হইয়া সমগ্র অন্ত্রকোরককে ছড়াইয়া পড়ে। অন্ত্রকোরকগুলির সমস্ত লসিকাপ্রণালী অন্ত্রগাত্রের লসিকাপ্রণালীতে যাইয়া উন্মুক্ত হয়।



৮৬নং চিত্র—অন্ত্র-কোরকের গঠন (একটি কোরকের কিছু অংশ বিবর্ধিত করা হইয়াছে)

১। কোরক; ২। এই কোষ স্তবকের মধ্য দিয়া অবশোষণ ক্রিয়া সংঘটিত হয়; ৩। কোরকে লসিকা নালীর উৎপত্তি স্থল; ৪। কোরকের রক্তপ্রণালী; ৫। অন্ত্রগাত্রে লসিকাপ্রণালী; ৬। অন্ত্রগাত্রে রক্তপ্রণালী; ৭। অন্ত্রগাত্রে পৈশীক স্তবকের একটি অংশ; ৮। অন্ত্রগ্রন্থি

অবশোষণ একটি শারীর বৃত্তিক পদ্ধতি :

অতীতে ধারণা ছিল যে, অবশোষণ ক্রিয়া হইল অন্ত্রকোরক গাত্রের মধ্য দিয়া পাচনপ্রসূত পদার্থগুলির নিছক অনুপ্রবেশ। কিন্তু বিশদ অনুশীলন দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সমস্ত পদার্থ অন্ত্রকোরক গাত্র দিয়া প্রবেশ করে না। অন্ত্রকোরক গাত্রের উভয় পার্শ্বে তরল পদার্থের প্রচন্ড চাপ এবং ঘন সন্নিবেশ সত্ত্বেও পদার্থগুলি মাত্র একদিকে অর্থাৎ অন্ত্র হইতে অন্ত্রকোরকসমূহের দিকে যাইতে পারে। ইহা দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে, অবশোষণ-ক্রিয়া এমন একটি শারীরবৃত্তিক পদ্ধতি যাহা "পরিস্রবণ ও অস্‌মোসিস" (laws of filtration and osmosis) তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। অন্ত্রকোরকের পৃষ্ঠদেশে যে সকল কোষ অবস্থান করে, সেই কোষের ক্রিয়াকলাপের ফলেই অবশোষণ ঘটিয়া থাকে।

যকৃতের প্রতিরোধক ভূমিকা :

অন্ত্রনালী হইতে রক্ত প্রথমে যকৃতে এবং পরে হৃৎপিণ্ডে যায় বলিয়া পাচন-প্রসূত পদার্থগুলি রক্তে অবশোষিত হইয়া সর্বপ্রথম যকৃতে যায়। রক্তের এই গতিপথের প্রচুর গুরুত্ব আছে।

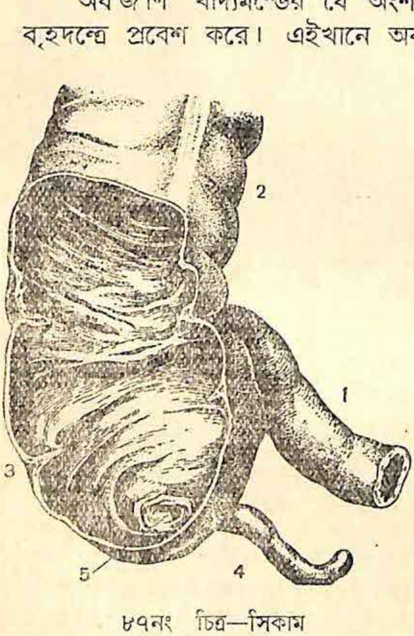
টিনবিহীন তাম্রপাত্রে রন্ধন করা খাদ্য খাইলে অদৃশ্য তাম্রকণাসমূহ পাচন-পথে প্রবেশ করিয়া পাকস্থলী রসের এ্যাসিডের প্রক্রিয়ায় দ্রবনীয়রূপে পরিণত হয় এবং এইরূপে রক্তে প্রবেশ করিতে পারে। কারখানার ধূলির সহিত সিসা, জিঙ্ক, আরসেনিক এবং দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক অন্যান্য বস্তুও রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে সব সময়েই প্রচুর পরিমাণে এইসব পদার্থ পাওয়া যায়।

অন্ত্র হইতে রক্তে আগত এইসব বিষক্রিয় বস্তুকে যকৃত হয় নির্দোষ অথবা অদ্রবনীয় করিয়া ফেলে নতুবা পিত্তের সহিত নিঃসৃত করিয়া দেয়। পুনরায় অন্ত্রে প্রবেশ করার সময় ইহারা অদ্রবনীয় অবস্থায় থাকে এবং সেইভাবেই মলের সহিত নিঃসৃত হইয়া যায়। এইভাবে যকৃত জীবদেহের বহিস্থ ও অন্তস্থ মাধ্যমের মধ্যে অন্যতম প্রাচীর হিসাবে কাজ করে।

বৃহদন্ত্র :

অর্ধজীর্ণ খাদ্যমণ্ডের যে অংশ ক্ষুদ্রান্তে অবশোষিত হয় না, সেইগুলি বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। এইখানে অবশোষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। তাহা ছাড়া বৃহদন্ত্রে অধিকাংশ জল অবশোষিত হইয়া থাকে।

বৃহদন্ত্রের যে সর্বশেষ অংশ দিয়া পরিত্যাজ্য অংশ নিঃসৃত হইয়া যায়, তাহার নাম মলাধার (rectum)।



৮৭নং চিত্র—সিকাম
১। ক্ষুদ্রান্ত্র; ২। বৃহদন্ত্র; ৩। সিকাম; ৪। এ্যাপেনডিক্স; ৫। এ্যাপেনডিক্সের মুখ

সিকাম (caecum) :

বৃহদন্ত্রের প্রথম অংশকে বলা হয় সিকাম (৮৭নং চিত্র)।

তৃণভোজী প্রাণীদের সিকাম প্রচুর দীর্ঘ ; ঘোড়ার এক কিউবিক সিকামের আধার প্রায় ৩০ লিটার। বৃহদন্ত্রের মধ্যে বীজাণুসমূহের কার্যকলাপের দ্বারা উদ্ভিদের সেলুলোজগুলি বিভক্ত ও জীর্ণ হয় বলিয়াই ইহার দৈর্ঘ্য এত বেশি।

তৃণভোজীদের তুলনায় মানুষের সিকাম অপেক্ষাকৃত ছোট।

এ্যাপেনডিক্স (Appendix) :

সিকাম হইতে উদ্গত একটি ক্রিমির ন্যায় অংশকে এ্যাপেনডিক্স বলা হয় (৮০নং চিত্র)।

মধ্যবয়সী লোকদের এ্যাপেনডিক্সের মুখটি কোন কোন সময় সম্পূর্ণ জোড়া লাগিয়া যায়। মানবদেহের জৈবিক ক্রিয়াকলাপে এ্যাপেনডিক্সের কোন গুরুত্ব

নাই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা গুরুতররূপে ক্ষতিকারক হইয়া ওঠে। খাদ্য জমা হইয়া ও পচিয়া এবং আন্ত্রিক ক্রিমিসমূহের অবস্থানের জন্য ইহার প্রদাহ বা এ্যাপেনডিসাইটিস্ সৃষ্টি হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করিয়া এ্যাপেনডিক্সটি সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া ফেলিতে হয়।

৪১। পাচন-ক্রিয়ার শারীর-বৃত্ত সম্পর্কে প্যাভলভের গবেষণা

পাচন-ক্রিয়ার শারীরবৃত্তিক অগ্রগতিতে প্যাভলভের ভূমিকা :

পাচন-ক্রিয়ার অনুশীলন প্রায় সমগ্রভাবেই রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সহিত সংশ্লিষ্ট। একথা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, রুশ বিজ্ঞানীরা এবং তাঁহাদের পুরোধা আই. পি. প্যাভলভ্ পাচন-ক্রিয়ার অনুশীলনে এক প্রকৃত বিপ্লবসাধন করেন এবং সেইজন্যই বিদেশে ইহাকে "শরীর বিজ্ঞানের রুশীয় শাখা" বলা হয়।

প্যাভলভের জীবনী :

ইভান পেত্রোভিচ্ প্যাভলভ্ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এক পুরোহিতের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একটি ধর্মীয় শিক্ষালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট হইলেও তদানীন্তন প্রগতিমূলক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ইভান পেত্রোভিচ্ প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃত বিজ্ঞানের ফ্যাকাল্টিতে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই তিনি একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় ছিল অগ্ন্যাশয়ের স্নায়ু সরবরাহ সম্পর্কে অনুশীলন এবং ইহার জন্য তিনি একটি স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া প্যাভলভ্ মেডিকো-সার্জিক্যাল একাডেমীতে যোগদান করেন এবং ১৮৭৯ সালে তথা হইতে গ্র্যাজুয়েট হন। তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় চিকিৎসকরা জানিতেন যে, রোগীকে সাফল্যের সাহিত চিকিৎসা ও আরোগ্য করিতে হইলে শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিখ্যাত চিকিৎসক এবং মেডিকো-সার্জিক্যাল একাডেমীর অন্যতম অধ্যাপক এস. পি. বোর্টকিন (S. P. Botkin) শারীরবৃত্ত এবং প্রাণী-দেহে পাচনক্রিয়া অনুশীলনের জন্য একটি বিশেষ ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেন। তরুণ বিজ্ঞানী প্যাভলভ্কে তিনি তাঁহার ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতে আমন্ত্রণ জানান; প্যাভলভ্ ইতিমধ্যেই একজন অধ্যবসায়ী ও উৎসাহী গবেষক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

প্রচুর উৎসাহে প্যাভলভ তাঁহার গবেষণা শুরু করিলেন। সমস্ত ল্যাবরেটরীটিতে একখানি মাত্র ঘর ছিল। কিন্তু তাহার জন্য প্যাভলভের ব্যাপক সৃজনশীল কাজের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এইখানেই তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত হৃৎপিণ্ডের স্নায়ু সরবরাহ সংক্রান্ত গবেষণা করেন। পাচন যন্ত্রসমূহের

অনুশীলনে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর যে আবিষ্কার তিনি করেন, সে সম্পর্কে অপূর্ব পরীক্ষাগুলিও এই ল্যাবরেটরী হইতেই শুরু হয়।

কিছুকাল পরে প্যাভলভ বিদেশে যাইয়া তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ শারীরবৃত্ত-বিদদের সহিত সাক্ষাৎ করেন; কিন্তু দেখা গেল যে, সেই সব বিদেশীদের নিকট শিক্ষালাভ করিবার মত কিছুই নাই; বরং তিনিই তাঁহাদের যথেষ্ট শিক্ষা দিতে পারিতেন। প্রকৃতপক্ষে অনতিকাল মধ্যেই বিদেশী বিজ্ঞানীরা রাশিয়ায় আসিয়া প্যাভলভের নিকট নব নব পদ্ধতিতে কাজ শিখিতে আসিলেন।

এমন কোন সময় যায় নাই যখন প্যাভলভের শিষ্য ছিল না। শারীরবৃত্তে আগ্রহী চিকিৎসকরা প্যাভলভের ঐ ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরীতে আসিতেন এবং প্রত্যেকেই কাজ পাইতেন। সেখানে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার আবহাওয়া বিরাজ করিত। চারিপাশের সকলকেই প্যাভলভ নিজ কর্মোৎসাহ ও বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় সংক্রামিত করিতেন। ফলে তাঁহার বহু শিষ্যই প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ অথবা চিকিৎসক হইয়াছিলেন।

১৮৯১ সালে ইনস্টিটিউট অফ্ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন (বা পরীক্ষা-মূলক চিকিৎসা পীঠ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯১ সাল হইতেই প্যাভলভ্ ইনস্টিটিউটের শারীরবৃত্ত বিভাগের অধিকর্তা হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এইখানেই তিনি পাচন-পথের প্রতিটি গ্রন্থির বিশেষ ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করিয়া পাচনক্রিয়ার শারীরবৃত্ত সম্পর্কে গবেষণা চালাইয়া যান। বিভিন্ন জটিল ও উদ্ভাবনশীল পরীক্ষা দ্বারা প্যাভলভ পাচনযন্ত্রগুলির ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ এবং জীবদেহের পরিবর্তিত প্রয়োজনে ও খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান অনুসারে যন্ত্রগুলির উপযোগী হওয়া সম্পর্কে বিশদ অনুশীলন করেন।

কিছুকাল পরে প্যাভলভ অধ্যাপক উপাধি পান এবং মেডিকো-সার্জিকাল একাডেমীর শারীরবৃত্ত বিভাগের অধিকর্তা নির্বাচিত হন। ১৯০৬ সালে তিনি বিজ্ঞান পরিষদের (Academy of Science) সভ্য নির্বাচিত হন।

দেশ বিদেশে প্যাভলভের নাম ছড়াইয়া পড়িল এবং ১৯০৬ সালে পাচন-পথের শারীরবৃত্ত সম্পর্কে বিরাট অবদানের জন্য তাঁহাকে আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে পাচনক্রিয়া সংক্রান্ত প্রশ্নে প্যাভলভের আগ্রহ কমিয়া যায়। কুকুরের লালা-গ্রন্থির ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কুকুরের লালা-গ্রন্থিগুলি শুধু যে মুখে খাদ্য দিলেই উত্তেজিত হয় তাহা নয় দূর হইতে মাধ্যমের দ্বারা, যেমন খাদ্য দেখিয়া বা খাদ্যের গন্ধ পাইয়াও গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া যে লোক নিয়মিত খাদ্য আনে তাহার পদশব্দ অথবা কণ্ঠস্বর শুনিলেও লালাক্ষরণ বাড়িয়া যাইবে।

এই সমস্ত ঘটনা বিচার করিয়া প্যাভলভ এগুলিকে মস্তিষ্কের উচ্চস্তর অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স (চূড়া বা উপরের অংশ) অনুশীলনে ববহার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হয়। ৩৫ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি উচ্চস্তরের স্নায়বিক কার্যকলাপ অনুশীলন করেন এবং এই কাজে লালা-গ্রন্থি সম্পর্কে তাঁহার গবেষণাকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করেন। এইভাবে প্যাভলভ এবং তাঁহার অসংখ্য সহকর্মীদের গবেষণার

ফলে "সপ্রতিবন্ধক-প্রতিবর্তন" নামক শারীরবৃত্তের এক সম্পূর্ণ নূতন শাখার উদ্ভব হয়।

এই মহান বিজ্ঞানী সম্পর্কে জার সরকারের কোন আগ্রহই ছিল না। নিজের সীমাবদ্ধ আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করিয়া প্যাভলভের কাজকর্মের ব্যাপক প্রসার সম্ভব ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় প্যাভলভের ল্যাবরেটরীর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ অচল হইয়া যায়।

মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর হইতেই প্যাভলভ ও তাঁহার সহকর্মীদের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। গৃহযুদ্ধের সময় সোভিয়েত সরকার তদানীন্তন অত্যন্ত দুরূহ অবস্থা সত্ত্বেও প্যাভলভের জীবনধারণ ও কাজের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। লেনিন এক নির্দেশনামা জারি করিয়া প্যাভলভের ল্যাবরেটরীর কুকুরগুলির জন্য নিয়মিতভাবে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে জন্তুগুলির উপর প্যাভলভ্ তাঁহার সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সম্পর্কিত পরীক্ষা চালাইয়াছিলেন তাহাদের জীবনরক্ষা হয়।

প্যাভলভ আমাদের দেশের নূতন জীবন গড়িয়া তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নিজের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপকে দেশবাসী এবং সমগ্র মানবসমাজের সর্বোত্তম মঙ্গলসাধনে ব্যবহারের জন্য তিনি আরও বেশি উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া যান।

এক সময়ে প্যাভলভ বলিয়াছিলেন, "যাহাই করি না কেন, সব সময়ই আমি মনে রাখি যে, প্রথমত আমি আমার দেশকে যথাসাধ্য সেবা করিতেছি।"

১৯৩৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে আন্তর্জাতিক শারীরবৃত্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা যোগ দিয়াছিলেন। এই সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে প্যাভলভকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শারীরবৃত্তবিদ হিসাবে ঘোষণা করে।

১৯৩৬ সালে প্যাভলভের মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের দশম কংগ্রেসে এই মহান দেশপ্রেমিক সোবিয়েত বিজ্ঞানী সোবিয়েতের তরুণদের নিকট একখানি প্রকাশ্য চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিতে বিজ্ঞানী ও মানুষ হিসাবে প্যাভলভের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় সেই অপূর্ব দলিলখানির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

পাচনক্রিয়া অনুশীলনের নূতন পদ্ধতি :

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বাসভ নামে একজন রুশ বিজ্ঞানী কুকুরের উপর এমন এক অস্ত্রোপচার করেন যাহাতে পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ সামগ্রী যে কোন সময় পরীক্ষা করা যাইত। অস্ত্রোপচারটি নিম্নরূপ : উদরগহ্বরটি কাটিয়া উন্মুক্ত করা হইল; ইহার পর পাকস্থলীতে একটি ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ধাতবনল এমনভাবে প্রবিষ্ট করান হইল যাহার একটি মুখ উদরগহ্বরের মধ্যে এবং অপর মুখটি দেহের বাহিরে রহিল। বাহিরের মুখটি একটি ছিপি (plug) দিয়া বন্ধ করা হইল। ইহার পর নলটির চারিপাশে ক্ষত সেলাই করিয়া দেওয়া হইল। এই অস্ত্রোপচারে কুকুরটির কোন অনিষ্ট হয় নাই।

এই অস্ত্রোপচারের ফলে একটি নালী সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্য দিয়া পাকস্থলীর অভ্যন্তরে যে কোন সময় পরীক্ষা করা সম্ভব হইল।

অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও পাচনপথে এই ধরনের নালী সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কিন্তু শুধু প্যাভলভ্ এবং তাঁহার সহকর্মীরাই উন্নত ও নিপুণ ধরনের এমন এক নালী সৃষ্টিতে সফল হন যাহার মধ্য দিয়া পাচনযন্ত্রসমূহের কার্যকলাপ গভীর ও বিশদভাবে অনুশীলন করা সম্ভব হয়। অবশ্য সমস্যাটি শুধু পাচন-পথে একটি নালী সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; সমস্যাটা ছিল আরও গভীর—অর্থাৎ এই নালীপথে পাকস্থলীর জারক-রসকে যাহাতে খাদ্য ও অন্যান্য রস হইতে অমিশ্র পৃথক অবস্থায় সংগ্রহ করা যায় এবং এই নালীটি যাহাতে পৌষ্টিক নালীর কোন ক্ষতি অথবা স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপকে ব্যাহত না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখাও অশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বহু চেষ্টার ফলে প্যাভলভ অগ্ন্যাশয়ের সহিত সংযুক্ত একটি স্থায়ী নালী সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। অগ্ন্যাশয়ের রস দুইটি ডাক্ট বাহিয়া ডিয়োডিনামে আসিয়া পড়ে। একটি ডাক্টকে প্যাভলভ কুকুরের দেহের বাহিরে চালিত করিয়া চর্মের সহিত সেলাই করিয়া দেন। এই অবস্থায় অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরিত রস একটি ডাক্ট দিয়া দেহের বাহিরে নিঃসৃত হইতে লাগিল। কিন্তু দেখা গেল যে, অস্ত্র-চিকিৎসার পর চারিপার্শ্বে দূরপনেয় ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার ফলে অধিকাংশ কুকুরই মরিয়া যাইতে লাগিল। অবশ্য অসাধারণ অনুধাবন শক্তির সাহায্যে পাভলভ এই অসুবিধা দূর করিতে সক্ষম হন।

একদিন প্যাভলভ্ দেখিলেন যে, একটি কুকুর অস্ত্রোপচারের পর নখ দিয়া দেয়ালের পলেস্তারা খসাইয়া সেই চূণের স্তূপের উপর শুইয়া পড়িল; এই কুকুরটির নালীর চারিদিকে কোন ক্ষত সৃষ্টি হয় নাই। অগ্ন্যাশয়ের রসের জ্বালাময় ক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পদ্ধতির এই ঘটনাটি প্যাভলভের জীবনে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকে। ১৯৩৫ সালে প্যাভলভের অনুপ্রেরণায় লেনিনগ্রাদে "পরীক্ষামূলক চিকিৎসা শাস্ত্র পীঠে"র অঙ্গনে স্থাপিত কুকুরের স্মৃতিস্তম্ভে নিম্নলিখিত অনুলিপিটি খোদিত হয়; "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পলেস্তারা ভাঙ্গিয়া এবং তাহা দ্বারা সছিদ্র শয্যা নির্মাণ করিয়া কুকুরটি গবেষককে কৃত্রিম নালীপথে প্রবাহিত অগ্ন্যাশয় রস দ্বারা পাকস্থলীর ক্ষত প্রতিষেধের পন্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়াছে।"

কুকুরের দেহে—সময় সময় একই কুকুরের দেহে বিভিন্ন ধরনের নালী সৃষ্টি করিয়া প্যাভলভ্ সমগ্র পাচনপথ সম্পর্কে এবং তাহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেও অনুশীলন করেন।

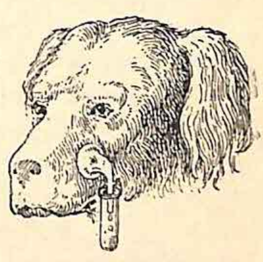
স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে দেহযন্ত্রের অনুশীলন করার ভিতর দিয়া পাচন-ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণার গুরুত্ব যেভাবে প্যাভলভ দেখাইয়াছেন তাহা শারীর-বৃত্তের ক্ষেত্রে এক প্রকৃত বিপ্লব সাধিত করে।

মানবদেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বুঝিবার জন্য প্যাভলভ ও তাঁহার সহ-কর্মীদের গবেষণা অসীম গুরুত্বপূর্ণ; তাঁহাদের গবেষণা পুষ্টি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধিগুলি নির্ধারণ করে—পাচনযন্ত্র-সমূহের বিভিন্ন রোগনির্ণয় ও নিরাময়ের সঠিক পদ্ধতি নির্বাচনেও সাহায্য করে।

৪২। পাচন গ্রন্থিগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ

লালাক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ :

লালা-গ্রন্থিগুলির ক্রিয়াকলাপ অনুশীলনের জন্য প্যাভলভ্ কৃত্রিম নালী সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থির ডাক্টটিকে দেহের বাহিরে পরিচালিত করিয়া দেন (৮৮নং চিত্র)। মানুষের লালাক্ষরণ পরীক্ষা করার জন্য তিনি মুখবিবরের মধ্যে লালাগ্রন্থির ডাক্টের মুখোমুখি এক বিশেষ ধরনের শোষকযন্ত্র (suckers) জুড়িয়া দেন (৮৯নং চিত্র)।



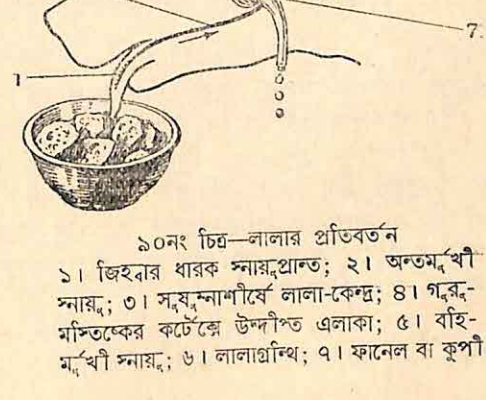
৮৮নং চিত্র—কুকুরের লালা সংগ্রহের জন্য মুখে নালী সৃষ্টি করা হইয়াছে

মানুষ এবং জন্তুদের প্রধান লালা গ্রন্থিগুলি প্রতিবর্তন-ক্রিয়া মারফৎ লালাক্ষরণ করে। মুখবিবরের মধ্যে খাদ্যস্বাদ সংক্রান্ত স্নায়ুসূত্রগুলিকে উত্তেজিত করিলে সেই তাড়নাগুলি সুষুম্নাশীর্ষকে পরিচালিত হয় এবং তথা হইতে অন্যান্য (বহির্মুখী) স্নায়ু বাহিয়া গ্রন্থিসমূহে পেঁছায় ও ইহাদিগকে সক্রিয় করিয়া তোলে (৯০নং চিত্র)।

খাদ্য দর্শন বা খাদ্যের গন্ধ, এমনকি খাদ্য সম্পর্কে আলোচনাও সংশ্লিষ্ট (অপটিক বা চোখের অলফ্যাক্টরি বা গন্ধ সংক্রান্ত এবং অডিটারি বা শ্রবণের) স্নায়ুতন্তুসমূহকে উত্তেজিত করিয়া সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন মারফৎ লালা ক্ষরণের অবস্থা সৃষ্টি করে; গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের সহায়তায় লালা ক্ষরিত হইতে থাকে। কেবলমাত্র সুস্বাদু খাদ্যের চিন্তাই "মুখে জল আসিবার" (লালাক্ষরণের) পক্ষে যথেষ্ট। খাদ্য দেখিয়া অথবা খাদ্যের কথা শুনিয়া যে ধরনের



৮৯নং চিত্র—মানুষের লালাক্ষরণ সম্পর্কিত পরীক্ষা। নিম্নে—লালা সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত শোষক



৯০নং চিত্র—লালার প্রতিবর্তন
১। জিহ্বার ধারক স্নায়ুপ্রান্ত; ২। অন্তর্মুখী স্নায়ু; ৩। সুষুম্নাশীর্ষে লালা-কেন্দ্র; ৪। গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সে উদ্দীপ্ত এলাকা; ৫। বহির্মুখী স্নায়ু; ৬। লালাগ্রন্থি; ৭। ফানেল বা কুপী

লালা নিঃসৃত হয়, তাহা মুখের মধ্যে খাদ্য দেওয়ার ফলে নিঃসৃত লালারই অনুরূপ।

পাকস্থলীর গ্রন্থিসমূহের কার্য নিয়ন্ত্রণ:

মুখের মধ্যে খাদ্য লইলে অথবা খাদ্য দর্শনে খাদ্যের আঘ্রাণে লালার সংগে সংগে পাকস্থলীর রসও ক্ষরিত হইতে থাকে।

একটি কুকুরের উপর দ্বৈত অস্ত্রোপচার করিয়া প্যাভলভ্ প্রমাণ করেন যে, পাকস্থলীর রসও প্রতিবর্তন ক্রিয়া মারফৎ ক্ষরিত হইয়া থাকে। অস্ত্রোপচারটি নিম্নরূপ: প্রথমে কুকুরটির পাকস্থলীতে একটি নালী সৃষ্টি করা হইল; ইহার পর গ্রাসনালীটি কাটিয়া বিভক্ত করিয়া ইহার দুইটি মুখ গ্রীবাদেশের চর্মের সহিত সেলাই করিয়া দেওয়া হইল। এই অস্ত্রোপচারের ফলে মুখ দিয়া গৃহীত খাদ্য পাকস্থলীতে যাইতে পারিল না (৯১নং চিত্র)। কুকুরটি যাহাতে অনাহারে মরিয়া না যায় সেজন্য নালীপথে সরাসরি পাকস্থলীর মধ্যে খাদ্য দেওয়া হইল।

এই পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে, "তথাকথিত খাদ্য খাওয়ান"র ফলে খাদ্যগুলি গ্রাসনালীর কর্তিত মুখ দিয়া পড়িয়া যাওয়ার কয়েক মিনিট পরে শূন্য



৯১নং চিত্র—পাকস্থলীতে পাচন-ক্রিয়া অনুশীলনের জন্য কয়েক ধরনের অস্ত্রচিকিৎসার রূপরেখা

১। পাকস্থলীতে সৃষ্ট নালী ও কর্তিত গলবিল; ২। ক্ষুদ্র পৃথক পাকস্থলী; ৩। পৃথক পাকস্থলী হইতে পাচকরস সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত নল

পাকস্থলীতে রস ক্ষরণ হইতেছে। এক হইতে দুই ঘণ্টা যাবৎ এই ক্ষরণ চলিতে থাকে। অপর দিকে দেখা গেল যে পাকস্থলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেগাস স্নায়ুর শাখাপ্রশাখাগুলি কাটিয়া দিলে এই "তথাকথিত খাওয়ান"র ফলে পাকস্থলীর রসক্ষরণ হয় না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইলে যে, পাকস্থলীর রসক্ষরণ স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিবর্তনক্রিয়া মারফৎ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রতিবর্তনক্রিয়াপ্রসূত পাকস্থলীর রসক্ষরণ সপ্রতিবন্ধ অথবা অপ্রতিবন্ধ দুই ধরনেরই হইতে পারে—অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের সহায়তাতেই এই ক্ষরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

খাদ্যের সহিত অমিশ্র অবস্থায় অকৃত্রিম পাকস্থলীরস সংগ্রহ ও পরীক্ষা করার জন্য প্যাভলভ এক জটিল অস্ত্রোপচার করেন। পাকস্থলীটিকে দুইটি

অসম ভাগে কাটিয়া তিনি একটি বৃহৎ পাকস্থলী ও একটি ক্ষুদ্র অথবা বিচ্ছিন্ন পাকস্থলী তৈরি করেন। গ্রাসনালী হইতে খাদ্য শুধু বৃহৎ পাকস্থলীতে প্রবেশ করিতে পারিল এবং তথা হইতে অন্ত্রের মধ্যে চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র অথবা বিচ্ছিন্ন পাকস্থলীটি হইল একটি বন্ধ থলির মত, এবং ইহার গাত্রে একটি ছিদ্র করিয়া দেহের বাহিরে পরিচালিত করা হইল। এই অস্ত্রোপচারটি ছিল অত্যন্ত জটিল ধরনের, কারণ ঐ বিচ্ছিন্ন পাকস্থলীর রক্তপ্রণালী ও স্নায়ুগুলি যাহাতে কোনরূপে আহত না হয় সে সম্পর্কে বিশেষ যত্ন লইতে হয়। এইরূপ অবস্থায় খাদ্য-বিহীন হইয়াও বিচ্ছিন্ন পাকস্থলীতে বৃহৎ পাকস্থলীর মতই রস ক্ষরণ হইতে থাকে।

লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে, "তথাকথিত খাওয়ানতে" এক বা দুইঘণ্টা রসক্ষরণ হইলেও স্বাভাবিক আহারে খাদ্য পাকস্থলীতে পেঁছানর পর চার হইতে ছয় ঘণ্টা—এমনকি আট ঘণ্টা ধরিয়াও রসক্ষরণ হইয়া থাকে।

এইরূপ ক্ষেত্রে রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের জন্য পাকস্থলীর রসক্ষরণ দীর্ঘস্থায়ী হয়। পাচনক্রিয়ার সময় পাকস্থলীর গাত্র হইতে কোন কোন পদার্থ রক্তে অব-শোষিত হইয়া থাকে। রক্তে এই পদার্থগুলির উপস্থিতির ফলে পাকস্থলীর গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হইয়া রসপ্রবাহ চলিতে থাকে।

আই. পি. রাজেনকভ্ নামক একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, মাংসের রস অথবা পাচিত প্রোটিনজাতীয় পদার্থ কুকুরের রক্তে অথবা চর্মের নীচে ঢুকাইয়া দিলে কুকুরটি কোন খাদ্য না পাইলেও ইহার পাকস্থলীর রসক্ষরণ হইতে থাকিবে।

বিচ্ছিন্ন পাকস্থলী এবং নালীসহ বৃহৎ পাকস্থলীযুক্ত কোন কুকুরের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ইহার পাকস্থলীতে সরাসরি খাদ্য প্রবিষ্ট করাইলে প্রতিবর্তন ক্রিয়া-প্রসূত রসক্ষরণ পরিহার করা সম্ভব। এইভাবে খাদ্য দেওয়ার ফলে পাকস্থলীর রসক্ষরণ তৎক্ষণাৎ শুরু না হইয়া ১৫ হইতে ৩০ মিনিট বিলম্বিত হয়। কোন কোন খাদ্য প্রয়োগে রসক্ষরণ হয় না। এইভাবে জারক রসের অভাবে রুটি পাকস্থলীর মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অজীর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যায়।

কিন্তু একটুকরা রুটি কুকুরটিকে দেখাইয়া অথবা আঘ্রাণ করিতে দিয়া তাহার পর নালী পথে ঢুকাইয়া দিলে অবিলম্বে প্রচুর পরিমাণে প্রতিবর্তন ক্রিয়াপ্রসূত পাকস্থলী রস প্রবাহিত হইবে। কিছুক্ষণ পরে জীর্ণ খাদ্য রক্তে অবশোষিত হইয়া পাকস্থলীর গ্রন্থিগুলির দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা সৃষ্টি করিবে।

এই পরীক্ষাগুলির দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রতিবর্তন ক্রিয়াপ্রসূত প্রাথমিক ক্ষরণের উপর রাসায়নিক রসক্ষরণ বহুলাংশে নির্ভর করে। স্বভাবতই খাদ্যের স্বাভাবিক পরিপাকের জন্য রাসায়নিক এবং প্রতিবর্তক উভয় ধরনের নিয়ন্ত্রণই সমভাবে প্রয়োজন।

মানুষের পাকস্থলীর গ্রন্থিগুলির কার্যকলাপ অনুশীলন করিবার জন্য সাধারণত একটি রবারের নল মুখের মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করাইয়া তাহার সাহায্যে পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বস্তু বাহির করিয়া আনা হয়। কোন কোন রোগীর পাকস্থলীতে আঘাতজনিত নালী সৃষ্টি তাহাদের পাকস্থলী পরীক্ষা ও অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

অন্ত্র মধ্যে পাচনক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ :

ডিয়োডিনামের মধ্যে অগ্ন্যাশয়ের রস ও পিত্তের প্রবেশও প্রতিবর্তক এবং

রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। প্রতিবর্তন ক্রিয়াপ্রসূত নিয়ন্ত্রণ গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের সহায়তায় হইতেও পারে (সপ্রতিবন্ধ), আবার না হইতেও পারে (অপ্রতিবন্ধ)। কাজেই খাদ্যদর্শন বা আঘ্রাণই আন্ত্রিক রসক্ষরণের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু রাসায়নিক উত্তেজনাপ্রসূত ক্ষরণের তুলনায় প্রতিবর্তনক্রিয়াপ্রসূত ক্ষরণ অনেক কম হইয়া থাকে।

প্যাভলভ প্রমাণ করেন যে, অর্ধজীর্ণ খাদ্যমণ্ড পাকস্থলীর অম্লরসে সংপৃক্ত হইয়া পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে যাইবার সময় প্রচুর পরিমাণে অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরিত হয়। ডিয়োডিনামের মধ্যে অকৃত্রিম পাকস্থলী রস বা হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড প্রবিষ্ট করাইলেও একই ফল দেখা যাইবে।

এই এ্যাসিড অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর সংস্পর্শে আসিলে অন্ত্রগাত্রে সিক্রিটিন (secretin) নামক একটি বিশেষ পদার্থ সৃষ্টি হয়। এই সিক্রিটিন রক্তপ্রবাহ মারফৎ সারা দেহে ছড়াইয়া পড়িয়া অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ইহাকে উত্তেজিত করিয়া রসক্ষরণ করায়।

একাডেমী সভ্য কে. এম. বাইকভ্ মনুষ্য-দেহে অগ্ন্যাশয়ের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ অনুশীলনে সক্ষম হয়। একটি রোগীর অগ্ন্যাশয়ের ডাক্টে আঘাতজনিত নালী সৃষ্টি হওয়ায় তিনি তাহার উপর কয়েকটি পরীক্ষা চালাইয়াছিলেন।

আহারের সময় অথবা খাদ্যস্পর্শনে আন্ত্রিক রসের অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্র-স্থিত গ্রন্থিগুলি হইতে রসক্ষরণ হয় না। বিশেষ মুহূর্তে অর্ধজীর্ণ খাদ্যমণ্ড অন্ত্রগাত্রের কোন অংশের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলে সেই স্থানের শ্লেষ্মা-ঝিল্লী উত্তেজিত হইয়া স্থানীয়ভাবেই রসক্ষরণ করায়।

পাচনযন্ত্রসমূহের কার্যকলাপে সমন্বয় সাধন :

মুখবিবরের যন্ত্রসমূহ হইতে শুরু করিয়া বৃহদন্ত্র পর্যন্ত পাচনযন্ত্রের সমস্ত যন্ত্রের কার্যকলাপের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে।

খাদ্যদর্শন করিলেই বা তাহার ঘ্রাণ লইলেই লালা এবং পাকস্থলী ও অগ্ন্যাশয়ের রসক্ষরণ হইতে থাকিবে। মুখ মধ্যে খাদ্য লইলে রসক্ষরণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। পাচক গ্রন্থিসমূহের দ্বারা ক্ষরিত রসের পরিমাণ ও উপাদান গৃহীত খাদ্যের চরিত্র ও উপাদানের উপর নির্ভর করে।

মুখের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের পাতলা দ্রব দিলে প্রচুর পরিমাণে লালা নিঃসৃত হইবে বটে, কিন্তু সে লালা অত্যন্ত জলীয় এবং স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষারধর্মী হইয়া থাকে। শুষ্ক সেঁকা রুটি (টোষ্ট) খাইলেও প্রচুর পরিমাণে জলীয় লালা নিঃসৃত হয়। কিন্তু নরম রুটি খাইলে লালার পরিমাণ অনেক কম এবং ঘন হইয়া থাকে। সিদ্ধ আলু বা অধিক সিদ্ধ ডিমের কুসুম খাইলে লালা আরও বেশি ঘনীভূত হইবে।

লালার পাচনক্রিয়াও সব সময় সমান থাকে না। আলু খাওয়ার সময় মানুষের লালায় প্রচুর টায়ালিন নামক কিণ্বপদার্থ থাকে; ফল বা মিষ্টি খাওয়ার সময় লালায় কিণ্বপদার্থের পরিমাণ কমিয়া যায়।

চর্বিযুক্ত মাংসের তুলনায় চর্বিহীন মাংস খাইলে প্রোটিন বিভক্তকারী কিণ্ব-পদার্থপুষ্ট প্রচুর অগ্ন্যাশয়রস ক্ষরিত হয়। অত্যধিক চর্বিযুক্ত খাদ্য খাইলে অগ্ন্যাশয় রসে চর্বিবিশ্লিষ্টকারী কিণ্বপদার্থ বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য কিণ্ব-পদার্থের পরিমাণ কমিয়া যায়।

অন্যান্য পাচক রসের পরিমাণ ও উপাদানও খাদ্যের চরিত্রের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

পাচক গ্রন্থিগুলির স্নায়বিক ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্ত্রনালীর প্রতি অংশে যতক্ষণ খাদ্য থাকে, ততক্ষণই পাচক রসের ক্ষরণ হইয়া থাকে।

জন্তু এবং মানুষের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে খাদ্য পরিবর্তন করিলে সমগ্র পাচন-পথের ক্রিয়াকলাপেরও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সুতরাং আমিষখাদ্য ছাড়িয়া শর্করা জাতীয় (রুটি, শব্জী, খিচুড়ি) খাদ্য খাইলে পাকস্থলী-রসের পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়া যায় এবং অন্যান্য গ্রন্থির কার্যকলাপেও পরিবর্তন ঘটে।

কিন্তু অন্ত্র-নালীর কার্যকলাপ সব সময়ই প্রয়োজনের তুলনায় যথোপযোগী একথা মনে করার কারণ নাই। বহুক্ষেত্রেই গৃহীত খাদ্যের চরিত্রের তুলনায় পাচকরসের পরিমাণ ও উপাদান যথোপযুক্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ দুধ অথবা ডিমের কুসুম খাইবার সময় প্রচুর পরিমাণ টায়ালিনযুক্ত লালা ক্ষরিত হয়; কিন্তু এই খাদ্যগুলিতে শ্বেতসার না থাকায় গ্রন্থিনিঃসৃত কিণ্বপদার্থ এই ক্ষেত্রে বাহুল্যের পর্যায়ে পড়িয়া যায়। গ্রন্থির কার্যকলাপের অনুপযোগিতার আরও বহু নিদর্শন আছে।

আদর্শবাদীরা "যথোপযোগিতার" (adequateness) কথা বলিবার সময় মনের মধ্যে এই ধারণা পোষণ করে যে, প্রত্যেকটি যন্ত্রের অবস্থান এবং প্রতিটি ঘটমান ক্রিয়াকলাপ বুঝি "বিশেষ কোন কারণে" এবং "পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই" সংঘটিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরই এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, এই ধর্মবিশ্বাসই এইরূপ ধারণার মূলকথা। প্রকৃতপক্ষে দেহের এমন কিছু কিছু যন্ত্র ও কার্য-কলাপ আছে যেগুলি "অনুপযোগী"। উদাহরণস্বরূপ মানুষের কানের নিষ্ক্রিয় পেশীগুলি, এ্যাপেনডিক্স ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যাইতে পারে: এইগুলি আমাদের সুদূর অতীতের পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে আসিয়াছে। বহুপুরুষ ব্যাপিয়া জীবনধারণের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা অর্জনের ফলেই জীবদেহের কার্যকলাপে উপযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে।

স্বাভাবিক পাচনক্রিয়া :

অধিকাংশ পাচকরসের প্রাথমিক প্রতিবর্তনমূলক ক্ষরণের উপর খাদ্যের স্বাভাবিক পাচন নির্ভর করে।

খাদ্যের উপাদান, স্বাদ, রন্ধনপ্রণালী এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা গ্রন্থিসমূহের কার্যকলাপ এবং ক্ষুধার উপর প্রভাব সৃষ্টি করিয়া থাকে। নোংরা খাবার টেবিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অথবা দ্রুত গপ্ গপ্ করিয়া খাওয়া, কিংবা পড়িতে পড়িতে খাইলে পাচকরসের প্রতিবর্তনমূলক ক্ষরণ তথা ক্ষুধা কমিয়া যায়।

মানসিক অবস্থা বা মেজাজের উপরও পাচকরসের কার্যকলাপ বিশেষভাবে নির্ভর করে। দুঃশ্চিন্তা, দুঃখবোধ, ক্রোধ অথবা উত্তেজনায় পাচকরসের ক্ষরণ শুরু হইয়াও সম্পূর্ণ বন্ধ হইতে পারে এবং তাহার ফলে ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যায়।

গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সই পাচনযন্ত্রসমূহের সহিত বাইরের বিভিন্ন পারি-পার্শ্বিক অবস্থা এবং জীবদেহের সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া থাকে।

অনুশীলনী ঃ

পাচনের কিন্ব-পদার্থগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া কোথায় কোন্ কিন্ব-পদার্থটির উৎপত্তি হয় এবং পাচন-ক্রিয়ায় ইহারা কিভাবে অংশ গ্রহণ করে তাহা বর্ণনা কর।

প্রশ্ন ঃ

(১) জীবাণুর পক্ষে পুষ্টির গুরুত্ব কি?
(২) কোন্ কোন্ পুষ্টিপদার্থ দ্বারা খাদ্যের উপাদান গঠিত হয়?
(৩) খাদ্যের প্রধান প্রধান বিভাগগুলির নাম কর; প্রত্যেকটি বিভাগের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর এবং প্রত্যেকটিতে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করার পরিমাণ দেখাও।
(৪) পাচন-ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। জীবাণুর পক্ষে ইহার গুরুত্ব কি?
(৫) পাচন-পথের বিভিন্ন অংশের এবং তাহাদের সহিত যুক্ত গ্রন্থিসমূহের ক্রমানুগতিক বর্ণনা লিখ।
(৬) পাচন-পথে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করার রূপান্তর বর্ণনা কর।
(৭) দাঁতের যত্ন লওয়া সম্পর্কে প্রধান বিধিগুলি কি কি?
(৮) পাচন-ক্রিয়ার অনুশীলনকে "শরীর বিজ্ঞানের রুশীয় শাখা" বলা হয় কেন?
(৯) লালা-গ্রন্থির ক্রিয়াকলাপ কিভাবে অনুশীলন করা হয়?
(১০) পাকস্থলীর পাচক-রস কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?
(১১) একাডেমী সভ্য আই, পি, প্যাভলভ্ কোন্ অস্ত্রোপচার মারফৎ পাকস্থলীর ক্রিয়াকলাপের সামগ্রিক অনুশীলন করিতে সক্ষম হন?
(১২) যকৃতের প্রধান ক্রিয়া কি?
(১৩) কোন দেহযন্ত্র হইতে রক্ত যকৃত-শিরা মারফৎ যকৃতে প্রবেশ করে? ইহার গুরুত্ব কি?
(১৪) অবশোষণ কাহাকে বলে? কোথায় এবং কিরূপে ইহা সংঘটিত হয়

৬। পরিপাক ও শক্তির রূপান্তর

৪৩। *পরিপাক ও শক্তির রূপান্তরই প্রধান জৈব-ক্রিয়া*

পরিপাক (পদার্থের আদান-প্রদান) একটি জৈবিক প্রয়োজন :

পরিপাক ক্রিয়া শুধু জীবদেহের মধ্যে পুষ্টি পদার্থ ও অক্সিজেনের প্রবেশ এবং জীব হইতে পরিত্যক্ত বস্তুগুলির নিঃসরণ নয়; জীবদেহের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যে-সব পরিবর্তন সাধিত হয়, সমগ্রভাবে তাহারই নাম পরিপাক-ক্রিয়া। পরিপাক-ক্রিয়া সমস্ত জৈবিক লক্ষণের ভিত্তি এবং জীবদেহে ইহা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে; অর্থাৎ জীবের অস্তিত্বের জন্যই পরিপাক-ক্রিয়ার প্রয়োজন। পরিপাক-ক্রিয়া বন্ধ হইলে জৈব-ক্রিয়াও থামিয়া যাইবে এবং জীবের মৃত্যু ঘটিবে।

পদার্থের পরিবর্তনের সংগে সংগে শক্তিরও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কোন জটিল জৈব-পদার্থের পচন হইলে উহার মধ্যস্থিত প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত রাসায়নিক শক্তি বিমুক্ত হইয়া তাপ বা শারীরিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পরিপাক- (পদার্থের বিনিময়) ক্রিয়াকে শক্তির রূপান্তর হইতে পৃথক করা অসম্ভব—ইহারা পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য।

শুধু জীবন্ত জীবদেহের মধ্যে নয়, আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতিতেও পরিপাক-ক্রিয়া চলিয়া থাকে। "কিন্তু" এঙ্গেল্‌সের মতে "ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে অজৈব পদার্থের ক্ষেত্রে পরিপাক-ক্রিয়া পদার্থটির ক্ষয় সাধন করে, আর জৈব পদার্থের অস্তিত্বের জন্যই পরিপাক-ক্রিয়ার প্রয়োজন।"

পোষণ ও বিপোষণ (Assimilation & dissimilation)

কোষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া পদার্থগুলি সেইখানে শুধু সংগৃহীত ও সঞ্চিতই হয় না, জটিল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহারা কোষ-পদার্থের অংশরূপে পরিণত হইয়া যায়। পদার্থকে এইভাবে নিজের গঠন প্রয়োজনে ব্যবহার করার ক্ষমতাকে কোষের পোষণ-ক্রিয়া বলে। এই পোষণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ জৈব-পদার্থ গঠন দ্বারা কোষগুলি শুধু নিজদিগকে পুষ্ট ও পুনরুজ্জীবিত করে না, নূতন পদার্থস্থিত প্রচ্ছন্ন শক্তিও অর্জন করিয়া লয়।

জৈব-পদার্থ গঠন প্রক্রিয়ার সংগে সংগে অবিরাম এক আংশিক ক্ষয়সাধনও চলিতেছে। জীবন্ত কোষের উপাদান গঠনকারী পদার্থগুলির ক্ষয় বা পচনকে বিপোষণ (dissimilation) বলা হয়। বিপোষণ প্রক্রিয়াতেও প্রচ্ছন্ন রাসায়নিক শক্তি বিমুক্ত হইয়া অপর এক ধরনের—প্রধানত শারীরিক ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ অস্থি সংশ্লিষ্ট পেশীর কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে; উত্তেজিত হইলে পৈশীককলায় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, এবং এই সময় সুপ্ত শক্তি শারীরিক ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় (পেশীটি সঙ্কুচিত হইয়া ভার উত্তোলন করে)।

পোষণ-ক্রিয়ার ফলে পদার্থ ও শক্তি জীবদেহের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে বিপোষণে পদার্থ ও শক্তি হ্রাস পায় ও ব্যয়িত হয়। উভয় প্রক্রিয়াই অবিরাম পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হইয়া সংঘটিত হইতেছে। পদার্থের পরিবর্তন ও শক্তির রূপান্তরের মত ইহারাও পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংযুক্ত। একটি পদার্থের পোষণ সবসময়ই অপর একটি পদার্থের বিপোষণের সহগামী। একটি প্রক্রিয়ার তীব্রতার ফলে অপরটির তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। জীবদেহের বৃদ্ধির সময় এবং ইহার মধ্যে জৈব-পদার্থের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে পোষণের তীব্রতার অনুপাতে ক্ষয় প্রক্রিয়াও তীব্রতর হইবে।

পোষণ ও বিপোষণ এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং পরস্পরের উপর এতই নির্ভরশীল যে, মনে হয় ইহারা জীবদেহের পরিপাক ও শক্তির রূপান্তর—এই একই প্রক্রিয়ার দুইটি স্তর মাত্র।

পদার্থ ও শক্তির নিত্যতা :

সমগ্র প্রকৃতির মত জীবন্ত জীবদেহেও শূন্য হইতে পদার্থ ও শক্তি সৃষ্টি হইতে পারে না—ইহাদের ধ্বংস সাধনও সম্ভব নয়; শুধু অসংখ্য পরিবর্তন হইতে পারে। খাদ্য এবং খাদ্যে অন্তর্লীন শক্তিই জীবদেহের মধ্যে পদার্থ ও শক্তি সঞ্চারের উৎস।

জীবদেহের মধ্যে প্রবিষ্ট পুষ্টি-পদার্থ এবং তন্মধ্যস্থিত প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিমাণ যথাযথভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। একইভাবে জীবদেহ কর্তৃক ব্যয়িত পুষ্টি-পদার্থ ও শক্তির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

পশু এবং মানবদেহের উপর অসংখ্য পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, দেহের ওজন অপরিবর্তিত থাকার অর্থ ব্যয়িত-পদার্থ ও শক্তি, প্রবিষ্ট অর্থাৎ খাদ্যের সহিত গৃহীত পদার্থ ও শক্তির সমপরিমাণ হইতেছে।

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বস্তু ও শক্তির নিত্যতা ও রূপান্তর সম্পর্কিত নিয়মাবলী অজৈব ও জৈব জগতে সমভাবে প্রযোজ্য।

পরিপাক-ক্রিয়ার জটিলতা :

জীবদেহের মধ্যে পদার্থের প্রবেশ এবং জীবদেহের বাহিরে তাহার নিঃসরণ বা রেচন (elimination) পরিপাক-ক্রিয়ার প্রথম ও শেষ স্তর মাত্র। জীবদেহের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পদার্থগুলি পোষণ ও বিপোষণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বহু দীর্ঘস্থায়ী জটিল পরিবর্তনের আওতায় পড়ে। এই পরিবর্তনগুলিই পরিপাক প্রক্রিয়ার মূল সূত্র।

বিভিন্ন দেহযন্ত্রে পরিপাক-ক্রিয়ার ধরন ভিন্ন ভিন্ন। এই পার্থক্যকে ইহাদের কোষ মধ্যস্থিত জীবোপাদানের ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিশেষ করিয়া দেহযন্ত্রগুলির প্রোটিনের প্রচুর পার্থক্য আছে। পোষণ-ক্রিয়া মারফৎ এ্যামাইনো এ্যাসিডসমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রোটিন উদ্ভূত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রতিটি প্রোটিনই সেই দেহযন্ত্রের বা সেই কোষের বৈশিষ্ট্য।

সমস্ত দেহযন্ত্রেরই পচন-ক্রিয়ার শেষ স্তর সমান হইলেও (যেমন কার্বনিক এ্যাসিড, জল, এ্যামোনিয়া ইত্যাদি) বিভিন্ন দেহযন্ত্রের বিপোষণ-ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত অন্তর্বর্তীকালীন বস্তুগুলি সর্বক্ষেত্রে সমান নয়।

পরিপাক-ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত কতকগুলি পদার্থ রক্ত হইতে অন্য দেহযন্ত্রে প্রবেশ করিয়া সেই যন্ত্রের কার্যকলাপকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ কায়িক শ্রমের ফলে ক্ষুধা এবং জৈবিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার অত্যাধিক শ্রমসাধ্য কাজ করিলে পেশীর পরিপাক-ক্রিয়া প্রসূত পদার্থগুলি অত্যাধিক পরিমাণে রক্তে আসিয়া সঞ্চিত হয়; ফলে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে—অর্থাৎ দেহযন্ত্রের, বিশেষ করিয়া পাচন-গ্রন্থিগুলির উত্তেজনা প্রবণতা প্রচুর কমিয়া যায় এবং ক্ষুধামান্দ্য হইয়া থাকে।

পরিপাক-ক্রিয়ায় কিণ্ব-পদার্থ বা এন্‌জাইমের ভূমিকা :

কিণ্ব-পদার্থের সংখ্যা অনেক; ইহাদের প্রত্যেকটিই নির্দিষ্ট এবং বিশিষ্ট ধরনের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই কিণ্ব-পদার্থগুলি জীবদেহের দেহ মধ্যে ঘটমান বিভিন্ন ধরনের জটিল পরিপাক-ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। জীবন্ত কোষসমূহের ক্রিয়াকলাপের ফলেই কিণ্ব-পদার্থের উৎপত্তি; অর্থাৎ পরিপাক-ক্রিয়া হইতে ইহাদের সৃষ্টি। অপরপক্ষে পরিপাক-ক্রিয়ার জন্য কিণ্ব-পদার্থগুলির উপস্থিতিও অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিণ্ব-পদার্থ ভিন্ন জীবন অসম্ভব।

সোবিয়েত একাদেমী সভ্য এ, ন, বাচ্ ও এ, আই, ওপারিন সহ বহু বিজ্ঞানী জীবদেহের মধ্যে অক্সিজেন ঘটিত এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ায় কিণ্ব-পদার্থের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে যে, কিণ্ব-পদার্থগুলির কার্যকলাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইলেও পরিপাক-ক্রিয়া গুরুতর-রূপে ব্যাহত হয়, এমনকি জীবদেহের মৃত্যুও ঘটিতে পারে।

৪৪। *প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ, শর্করা ও লবণ জাতীয় পদার্থগুলির* (Salts) *পরিপাক*

স্নেহ-পদার্থের পরিপাক :

স্নেহ-পদার্থগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া গ্লিসারল ও ফ্যাটি-এ্যাসিডরূপে অব-শোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্ত্র-কোরকের কোষগুলিতে স্নেহ-পদার্থের অণুগুলির পুনরুদ্ভব হয়।

খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের স্নেহ-পদার্থ পাওয়া যায়। ভেড়ার মাংসের চর্বি, গরু অথবা শূকরের মাংসের চর্বি হইতে ভিন্ন। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের চর্বিও আছে। কিন্তু পাচন-ক্রিয়াপ্রসূত যে চর্বি অন্ত্র-কোরক গাত্রে উদ্ভূত হয় সেগুলির চরিত্র সবসময়ই মানুষের চর্বির সমগোত্রীয়।

অবশোষিত হওয়ার পর চর্বি বা স্নেহ-পদার্থগুলি লসিকা প্রবাহে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে লসিকাপ্রণালী মারফৎ রক্তপ্রণালীতে চলিয়া যায়। রক্তের সহিত ইহা বিভিন্ন কলা ও দেহযন্ত্রে ছড়াইয়া পড়ে। অতিরিক্ত চর্বিগুলি স্নেহ-জাতীয় কলার কোষসমূহে—যেমন চর্মের নীচে, সঞ্চিত হয়।

শর্করার পরিপাক :

শর্করাগুলি রক্তের মধ্যে সাধারণ চিনি—প্রধানত গ্লুকোজ বা আঙগুরের চিনিরূপে অবশোষিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত চিনি যকৃতের মধ্যে এবং গ্লাইকোজেনরূপে পেশীতে সঞ্চিত থাকে। জীবদেহে সঞ্চিত শর্করার পরিমাণ ৫০০ হইতে ৬০০ গ্রামের অধিক হইতে পারে না। প্রয়োজন হইলে গ্লাইকোজেন পুনরায় চিনিতে রূপান্তরিত হইয়া রক্তে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও কলাসমূহের পুষ্টির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পেশীর সঙ্কোচন শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস শর্করা। স্নায়ু-তন্ত্রের কার্যকলাপের জন্যও শর্করার প্রয়োজন।

শর্করা পরিপাকে অংশ গ্রহণকারী অগ্ন্যাশয় হইতে ক্ষরিত ইনসুলিন চিনিকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। ইনসুলিন অগ্ন্যাশয়ের নিঃসরণকারী ডাক্টে (excretory duct) প্রবেশ না করিয়া সরাসরি রক্তে চলিয়া যায়। অগ্ন্যাশয় হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইনসুলিন নিঃসৃত না হইলে যকৃত ও পেশীগুলির চিনি সঞ্চয় করার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায় এবং ইহার ফলে রক্তে চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এরূপ ক্ষেত্রে বৃক্ক দুইটি (kidneys) প্রস্রাবের সহিত অতিরিক্ত চিনি নিঃসৃত করে।

অগ্ন্যাশয়ের ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন ঘটিলে খাদ্যের সমস্ত চিনিই যকৃতে সঞ্চিত না হইয়া প্রস্রাবের সহিত নিঃসৃত হইয়া যায়। ডায়াবিটিস রোগে এইরূপ ঘটিয়া থাকে এবং ইহাতে প্রায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। ডায়াবিটিস রোগাক্রান্তদের রক্তের মধ্যে ইনসুলিন ইন্‌জেকশন করিয়া চিকিৎসা করা হয়।

এ্যাড্রিনালিন গ্লাইকোজেনকে পুনরায় চিনিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করিয়া থাকে।

প্রোটিনের পরিপাক :

প্রোটিনের পাচন-ক্রিয়ার শেষ স্তর এ্যামাইনো এ্যাসিড; এগুলি অপরিবর্তিত অবস্থাতেই অন্ত্র-নালী হইতে অবশোষিত হইয়া রক্তে প্রবেশ করে। প্রতিটি জীবন্ত কলা প্রোটিনের কিয়দংশ নিজের জন্য ব্যবহার করে। রক্তে অবশোষিত এ্যামাইনো এ্যাসিড হইতে অবিকল একই প্রকার প্রোটিনের পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রোটিন জীবদেহে সঞ্চিত হয় না। অন্ত্র-নালী হইতে অতিরিক্ত পরিমাণ এ্যামাইনো এ্যাসিড সরবরাহ হইলে তাহার কিয়দংশ শর্করায় পরিণত হয়। এ্যামাইনো এ্যাসিডের অন্যতম উপাদান নাইট্রোজেন শর্করায় পাওয়া যায় না এবং জীবদেহ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় না; ইহা এ্যামোনিয়ারূপে নিঃসৃত হইয়া যায়। মানব অথবা পশুদেহে শর্করা হইতে প্রোটিনের পুনরুৎপত্তি হয় না।

পরিপাক-ক্রিয়ায় যকৃতের ভূমিকা :

অবশোষিত প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ ও শর্করার পরিমাণ এবং জীবদেহের প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় সাধনে যকৃতের দায়িত্ব প্রচুর। এই কারণেই যকৃতকে দেহের "কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটারি" বলা হয়।

কোন লোকের খাদ্য প্রোটিন-প্রধান হইলে যকৃতেই এ্যামাইনো এ্যাসিডগুলি শর্করায় রূপান্তরিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া যকৃতেই স্নেহ-পদার্থ শর্করায়

এবং শর্করা স্নেহ-পদার্থে পরিণত হয়। এই কারণে কোন লোকের খাদ্য চর্বিবিহীন ও শর্করা-প্রধান হওয়া সত্ত্বেও দেহে চর্বি সঞ্চিত হইতে পারে।

পরিপাক-ক্রিয়া চলিবার সময় দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক কোন কোন পদার্থও সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইগুলি যকৃতের মধ্যে পরিবর্তিত ও দোষমুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিষক্রিয় এ্যামোনিয়া যকৃতের মধ্যে নির্দোষ ইউরিয়ায় রূপান্তরিত হইয়া রক্তে প্রবেশ করে এবং পরে প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

অত্যধিক আহার ও পরিপাক-ক্রিয়া :

সাধারণ ও স্বাভাবিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণে দেহের ওজন অপরিবর্তিত থাকে; অর্থাৎ গৃহীত ও নিঃসৃত পদার্থের পরিমাণ একই রকম থাকে।

অধিক পরিমাণ খাদ্য খাইলে অতিরিক্ত অবশোষিত পুষ্টি-পদার্থের কিছু অংশ দ্রুত ধ্বংস হইয়া দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যায় এবং কিছু অংশ চর্বিরূপে সঞ্চিত হয়। এইভাবে দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অধিক আহারের ফলে মেদবাহুল্য দেহের পক্ষে অনিষ্টকর। মেদবাহুল্যের ফলে জীবদেহের ক্রিয়াকলাপ দুর্বল হইয়া পড়ে, হৃৎপিণ্ড ও অন্যান্য দেহযন্ত্রের কার্যকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, সঠিক এবং নিয়মিত পরিপাক-ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং কখনও কখনও গুরুতর ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অনাহার ও পরিপাক-ক্রিয়া :

খাদ্যের পরিমাণ অপ্রতুল হইলে পারিপার্শ্বিক মাধ্যম হইতে গৃহীত পুষ্টি-পদার্থ অপেক্ষা নিঃসৃত পদার্থের পরিমাণ অধিক হইতে পারে। অপ্রতুল খাদ্যের ফলে ওজন হ্রাস পাইলে বুঝিতে হইবে যে জীবদেহ তাহার সঞ্চয় ব্যয় করিয়া বাঁচিয়া আছে। কোন লোকের পূর্বেকার ওজনের শতকরা ৩০-৪০ ভাগ হ্রাস পাইলে অনাহারে মৃত্যু হইবে।

একজন বিজ্ঞানী একই ওজন, বয়স ও লিঙ্গের দুইটি বিড়ালের উপর এক পরীক্ষা চালান। বিড়াল দুইটিকে কিছুকাল ধরিয়া সমপরিমাণ খাদ্য দেওয়ার পর একটিকে মারিয়া ফেলা হইল এবং অপরটির সমস্ত খাদ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ১৩ দিন পরে দ্বিতীয় বিড়ালটিরও মৃত্যু হয়। উভয় বিড়ালের বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও কলা ওজন করিয়া দেখা গেল যে, অনাহারে মৃত বিড়ালটির কোন কোন দেহযন্ত্র ও কলার ওজন অপর বিড়ালের অপেক্ষা অনেক কম; পেশীর ওজন প্রায় এক তৃতীয়াংশ এবং যকৃতের ওজন প্রায় অর্ধেক কমিয়াছে, আর স্নেহজাতীয় কলা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু জৈবিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রসমূহ—বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডের ওজনে কোন তারতম্য হয় নাই।

এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলে জীবদেহ ইহার হৃৎপিণ্ড ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্রের কার্যকলাপ চালু রাখার জন্য নিজের দেহ খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে, এবং বিশেষ করিয়া যেসব পদার্থ কম গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্রের কোষের উপাদান গঠন করে (যেমন পেশী) সেইগুলির উপরেই নির্ভর করে।

জল ও লবণজাতীয় পদার্থের পরিপাক :

প্রোটিন, চর্বি ও শর্করার ন্যায় জল ও ধাতব পদার্থগুলিও (অজৈব লবণ জাতীয়) খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদান।

কোষের জৈবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য জীবদেহে স্বাভাবিক পরিমাণ জলের উপস্থিতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পায়রার উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ১১ ভাগ জল কম হইলে কোন কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখা যাইবে এবং শতকরা ২২ ভাগ কম হইলে মৃত্যু ঘটিবে।

একজন লোক চর্ম ও ফুসফুসের দ্বারা এবং মল ও মূত্রের সহিত দৈনিক কমপক্ষে দুই লিটার জল নিঃসৃত করে।

সাধারণ খাদ্যে জীবদেহের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থগুলি (সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লৌহঘটিত যৌগিক পদার্থ) যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ করিয়া উদ্ভিদজাতীয় খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের অভাব ঘটে।

কোন কোন ব্যাধিতে লবণজাতীয় পদার্থের পরিপাক-ক্রিয়া ব্যাহত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতায় লোহিত কণিকার উপাদান গঠনকারী লৌহ কমিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা লৌহমিশ্রিত বড়ি এবং গাজর, আপেল, কপি ইত্যাদি লৌহ-প্রধান খাদ্য খাইতে দেন।

পরিপাক-ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ :

পরিপাক-ক্রিয়ার উপর স্নায়ুতন্ত্রের অভাব সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য প্যাভলভের পূর্বেও জানা ছিল। কিন্তু প্যাভলভই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেন যে, পরিপাক সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। প্যাভলভ এই নিয়ন্ত্রণের নাম দেন "ট্রোফিক্"* অর্থাৎ পুষ্টি, জৈবিক ক্রিয়াকলাপ এবং দেহযন্ত্রের পরিপাক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ।

কোন কুকুরের সমস্ত বহির্মুখী স্নায়ুতন্ত্র অস্ত্রোপচার মারফৎ কাটিয়া ফেলিলে দেহের প্রান্তীয় অংশের (হাত-পা) চর্মে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তাহাই ট্রোফিক-নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হওয়ার লক্ষণ। মানবদেহে ট্রোফিক্-নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হইলে পরিপাক-ক্রিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পরিপাক-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের ভূমিকা :

পশু ও মানবদেহ পরীক্ষা করিয়া কে, এম, বাইকভ্ ও তাঁহার সহকর্মীরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন-ক্রিয়া—অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের প্রভাবে পরিপাক-ক্রিয়ায় পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। কর্টেক্সের প্রভাবেই শারীরিক শ্রমের শুধু চিন্তাই পরিপাক-ক্রিয়াকে তীব্রতর করিয়া তোলে।

* গ্রীক্ শব্দ "ট্রোফি"র (trophi) অর্থ পুষ্টি

মানব জীবদেহের দ্বারা ব্যয়িত শক্তির হিসাব :

পুষ্টির মান নির্ধারণ করিতে হইলে জীব কর্তৃক ব্যয়িত শক্তির দৈনিক পরিমাণ জানা প্রয়োজন। বিভিন্নভাবে এই কাজ করা সম্ভব।

একটি পদ্ধতির নীতিগত ভিত্তি হইল এই যে, জীব কর্তৃক ব্যয়িত সমস্ত শক্তি শেষপর্যন্ত তাপে পরিণত হয় এবং তাপরূপেই ইহাকে ক্যালরিতে* মাপা যাইতে পারে।

শক্তি ব্যয়ের পরিমাপ নির্ধারণের আর একটি পদ্ধতি হইল জীব কর্তৃক অবশোষিত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ধারণ করা। ১ লিটার অক্সিজেন অবশোষিত হইতে অক্সিজেনঘটিত প্রক্রিয়ার ফলে ৫ ক্যালরির প্রয়োজন হয়; সুতরাং কোন লোক ঘণ্টায় ২০ লিটার অক্সিজেন অবশোষণ করিলে ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ ১০০ ক্যালরির সমান। অতএব দৈনিক শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ১০০ × ২৪ = ২৪০০ ক্যালরি।

দৈনিক ব্যয়িত শক্তি :

জীবনধারণের অবস্থা, কাজের চরিত্র ও দেহের ওজন, স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং অন্যান্য বহু জিনিসের উপর মানব জীব কর্তৃক ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভর করে।

কোন লোক অঙ্গপরিচালনা না করিয়া শান্তভাবে শুইয়া থাকিলে তাহার দৈহিক ওজনের প্রতি কিলোগ্রামে ঘণ্টায় ১ ক্যালরি শক্তি ব্যয় হয়। গড়পড়তা দৈহিক ওজন ৬০-৬৫ কিলোগ্রাম হইলে দৈনিক ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ হইবে ১৫০০ ক্যালরি। যে লোক খুব কম পরিশ্রম করে এবং শুইয়া বসিয়া দিন কাটায় তাহার ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ ১½ গুণ বেশি।

মানসিক শ্রম করিলে খুব সামান্য পরিমাণ অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্রে যত অধিকসংখ্যক পেশী অঙ্গ সঞ্চালনে অংশ গ্রহণ করিবে ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ সাধারণত ততই বৃদ্ধি পাইবে। গড়পড়তা পরিশ্রম এবং সক্রিয় জীবনযাপন করিলে ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ ২—২½ গুণ বৃদ্ধি পায় এবং দৈনিক ৩০০০—৩৭০০ ক্যালরির প্রয়োজন হয়। কঠিন পরিশ্রম করিলে ইহা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।

ব্যয়িত শক্তির ভিত্তিতে কাজের মূল্য নিরূপণ অসম্ভব :

বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা বহুবার ব্যয়িত শক্তির ভিত্তিতে কাজের মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু মূল্য নিরূপণের এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভুল। এঙ্গেল্স্ লিখিয়াছিলেন "যে-কোন দক্ষ শ্রমকে কিলোগ্রাম মিটারে প্রকাশ করার এবং তাহারই ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণের চেষ্টা করুক ওরা!" এঙ্গেল্সের মতে সে-প্রচেষ্টা "নিতান্তই বুদ্ধিহীনতা"।

সত্যসত্যই শক্তি-ব্যয় আসলে পেশীর ক্রিয়াকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং

---

* ১ কিলোগ্রাম জলের তাপ ১ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তুলিতে হইলে যে তাপের প্রয়োজন তাহাকে বলা হয় ১ বৃহৎ-ক্যালরি বা ১ কিলোগ্রাম ক্যালরি।

শ্রমের একটি অংশ মাত্র—অর্থাৎ একজন লোকের শ্রেণী-সচেতন ও সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ মাত্র। শেষোক্তটিকে ক্যালরিতে প্রকাশ করা অসম্ভব।

প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করার ক্যালরি :

দেহের কোষগুলি প্রোটিন, চর্বি ও শর্করা পোষণ করিয়া ঐগুলিতে সঞ্চিত অন্তর্লীন শক্তি অর্জন করে এবং বিপোষণ-ক্রিয়া মারফৎ সেই শক্তি উন্মুক্ত হয়। কোন পুষ্টি-পদার্থের প্রচ্ছন্ন শক্তি নির্ধারণ করিতে হইলে তাহার অক্সিজেন প্রক্রিয়ার সময় উন্মুক্ত শক্তির পরিমাপ জানা প্রয়োজন।

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এক গ্রাম চর্বির অক্সিজেন প্রক্রিয়ার ফলে আনুমানিক ৯ ক্যালরি উন্মুক্ত হয়। এক গ্রাম প্রোটিন বা শর্করা হইতে উন্মুক্ত হয় প্রায় ৪ ক্যালরি।

খাদ্যের ক্যালরি :

কোন লোকের খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ তাহার ব্যয়িত শক্তির আনুপাতিক হওয়া উচিত। যত শক্তি ব্যয় হইবে তত অধিক ক্যালরি পাওয়া প্রয়োজন। প্রাপ্তবয়স্ক কোন লোক যথেষ্ট দৈহিক শ্রম না করিলে তাহার খাদ্যে গড়পড়তা দৈনিক ৩০০০—৩৫০০ ক্যালরি থাকা উচিত।

খাদ্যের বিন্যাস :

স্বাভাবিক পুষ্টি বজায় রাখিতে হইলে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করা—এই তিনটি পুষ্টি-পদার্থই যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া উচিত। কোন লোক প্রোটিন-বিহীন শুদ্ধ শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্য খাইলে তাহার মৃত্যু অবধারিত। প্রোটিন হইল দেহগঠনের উপাদান; ইহার অভাবে জৈব-পদার্থ তাহার দৈনিক ক্ষয়কে পূরণ করিতে পারে না।

শিশুরা যেহেতু বৃদ্ধিশীল এবং ইহাদের ওজনও অবিরাম বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা শিশুদের খাদ্যে দৈহিক ওজনের প্রতি কিলোগ্রামে অধিকতর প্রোটিন থাকা প্রয়োজন।

খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করার হার মোটামুটি গড়পড়তাভাবে অপরিবর্তিত থাকা উচিত। এই হারে খুব বেশি পার্থক্য হইলে গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে। শুধু প্রোটিন বা অত্যধিক প্রোটিন এবং শুধু চর্বিজাতীয় খাদ্যও জীবদেহের পক্ষে অবিসংবাদীভাবে অনিষ্টকর। সাধারণ অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ৩০০০ ক্যালরি বিশিষ্ট খাদ্যে নিম্নলিখিত হার বজায় থাকা উচিত;

প্রোটিন	...	১০০ গ্রাম
চর্বি	...	৬০ ,,
শর্করা	...	৫০০ ,,

অত্যধিক শক্তি ব্যয়কারী শ্রমসাধ্য কাজ করিলে খাদ্যের পরিমাণ এবং আনুপাতিক হারে প্রোটিন, চর্বি ও শর্করা—অর্থাৎ প্রতিটি পুষ্টি-পদার্থ বাড়াইয়া দিতে হইবে।

কোন কোন অবস্থায় খাদ্যে প্রধান তিনটি পুষ্টি-পদার্থের কোন একটির হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা তুষারপাতের সময় খাদ্যে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন বোধ করে।

কত সহজে খাদ্য পোষণ করা যায় :

খাদ্যের পুষ্টি-মূল্য শুধু ইহার উপাদানের উপর নির্ভরশীল নয়—জীবদেহ কত সহজে সেই পুষ্টি-পদার্থ পোষণ করিতে পারিতেছে তাহার উপরেও নির্ভর করে। বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনগুলি সমানভাবে পোষিত হয় না। সাধারণত উদ্ভিদের প্রোটিন অপেক্ষা জান্তব প্রোটিনগুলি অধিকতর সম্পূর্ণতার সহিত পোষিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদের প্রোটিনগুলি দুষ্পাচ্য হওয়ার কারণ এই যে, যে-কোষ মধ্যে ইহারা অবস্থান করে, সেই কোষের পুরু সেলুলোজের আবরণের উপর কিণ্ব-পদার্থগুলি কাজ করিতে পারে না; দ্বিতীয়ত, জান্তব প্রোটিনের উপাদান মানবদেহস্থিত প্রোটিনের অনুরূপ। সেইজন্য খাদ্যে গৃহীত প্রোটিনের অর্ধ পরিমাণ জান্তব প্রোটিন হইতে সংগৃহীত হওয়া উচিত।

রন্ধন-প্রণালীর উপরেও খাদ্য সহজ-পাচ্য হওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ সিদ্ধ আলু অপেক্ষা পিষ্ট আলু এবং ভাজা আলু অপেক্ষা সিদ্ধ আলু অধিকতর সহজ-পাচ্য।

গৃহীত খাদ্যের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ পোষিত হইয়া থাকে। খাদ্য নির্ধারণের সময় এই কথা মনে রাখা উচিত এবং ক্যালরির পরিমাণ যাহাতে শতকরা ১০ ভাগ বেশী থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

৪৬। *খাদ্যপ্রাণ* (Vitamins)

খাদ্যপ্রাণসমূহের গুরুত্ব :

প্রোটিন, চর্বি, শর্করা ও ধাতব পদার্থ ছাড়াও জীবদেহের খাদ্যপ্রাণ নামক অপর একটি বস্তুর প্রয়োজন। খাদ্যপ্রাণ ছাড়া মানুষ বা পশু কেহই বাঁচিতে পারে না।

খাদ্যপ্রাণ অপ্রতুল হইলে জীবদেহের কার্যকলাপ প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হইবে—পরিপাক-ক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে, শ্রম শক্তি কমিয়া যাইবে, দ্রুত অবসাদ আসিবে, সাধারণ দুর্বলতা সৃষ্টি হইবে এবং রিকেট, স্কার্ভি এবং অন্যান্য গুরুতর ব্যাধির উৎপত্তি হইবে।

খাদ্যপ্রাণের উপাদান :

বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যপ্রাণের রাসায়নিক গঠন অজ্ঞাত ছিল, কারণ, প্রচুর খাদ্যপ্রাণ বিশিষ্ট খাদ্যেও ইহার পরিমাণ অতি সামান্য। অধিকন্তু অধিকাংশ খাদ্যপ্রাণের স্থিতিশীলতা অত্যন্ত কম। উচ্চ মাত্রার তাপে কিংবা সূর্যরশ্মিতে, এমনকি বেশিদিন রাখিয়া দিলেও বহু খাদ্যপ্রাণ আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায়।

অবশ্য বিগত কয়েক বৎসরে বৈজ্ঞানিকরা অকৃত্রিম অবস্থায় বহু খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়ায় ইহাদের উপাদান ও চরিত্র অনুশীলন করা সম্ভব হইয়াছে। প্রমাণ হইয়াছে যে, স্বাভাবিক পরিপাক-ক্রিয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় বহু কিণ্ব-পদার্থ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ খাদ্যপ্রাণগুলির সহায়তায় সৃষ্টি হইয়া থাকে।

খাদ্যপ্রাণগুলির জন্ম উদ্ভিদে। উদ্ভিদখাদ্য খাইয়াই জীবদেহের বিভিন্ন যন্ত্রে খাদ্যপ্রাণগুলি সঞ্চিত হয়। জান্তব খাদ্যের খাদ্য-প্রাণ সেই জন্তুটির খাদ্যের উপর বহুপরিমাণে নির্ভর করে। শীতের দুধ অপেক্ষা গ্রীষ্মকালীন দুধে অধিক পরিমাণ খাদ্য-প্রাণ থাকে, কারণ, গ্রীষ্মকালে গরুগুলি তাজা ঘাস খাইতে পায়, আর শীতকালে খায় অত্যন্ত কম পরিমাণ খাদ্যপ্রাণযুক্ত শুষ্ক খড়।

বিভিন্ন ল্যাটিন অক্ষর দ্বারা বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হইয়া থাকে।

খাদ্যপ্রাণ 'সি' (C) :

বহু শতাব্দী পূর্বেই একথা জানা ছিল যে দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের সময় বিশেষ করিয়া অবরুদ্ধ জনসমষ্টির মধ্যে স্কার্ভির মহামারী দেখা দিত। স্কার্ভি অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। ইহার লক্ষণ হইল—প্রথমে সাধারণ দুর্বলতা, অবসাদ ও পায়ে ব্যথা; পরে আরও গুরুতর লক্ষণগুলি দেখা দেয়; মাড়ি হইতে রক্তপাত আরম্ভ হয়; চর্মের নীচে, পেশীতে ও আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলিতে প্রথমে মৃদু রক্তপাত শুরু হয়, পরে রক্তপাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; অস্থিমজ্জার রক্ত উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায় এবং গুরুতর রক্তাল্পতা বা এ্যানিমিয়া দেখা যায়। অবশ্য এইরূপ অবস্থায় খাদ্যে টাট্‌কা শব্জী ও ফল যোগ করিলে রোগী দ্রুত আরোগ্যলাভ করে।

তাজা শব্জী ও ফলের আরোগ্যকারী গুণাবলী ইহাদের মধ্যে কি পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ 'সি' আছে তাহার উপর নির্ভর করে। খাদ্যপ্রাণ 'সি' প্রধানত জীবন্ত উদ্ভিদকোষেই পাওয়া যায়। টমাটো, জাম, কপি, স্পাইন্যাক, কিসমিস, কমলা ও পাতিলেবু এবং আপেলে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ 'সি' আছে।

সমস্ত জানা খাদ্যপ্রাণের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ 'সি' সর্বাপেক্ষা কম স্থিতিশীল।

শুষ্ক অথবা টিনে আবদ্ধ এবং অধিক দিন রাখা খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ 'সি' সাধারণত আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায়।

মানবদেহে দৈনিক ০·১ গ্রাম খাদ্যপ্রাণ 'সি' প্রয়োজন।

খাদ্যপ্রাণ 'এ' (A) :

খাদ্যপ্রাণ 'এ' না থাকিলে অথবা ইহার অভাব ঘটিলে চক্ষুর ব্যাধি হইতে পারে এবং মানুষ অন্ধ হইয়া যাইতে পারে। আবরণিক কলায়—কেমন চর্মে বা শ্লেষ্মা-ঝিল্লীতেও পরিবর্তন ঘটিয়া জীবদেহকে সংক্রামক রোগে এবং যে-কোন রকম আঘাতে সংবেদনশীল করিয়া তোলে। খাদ্যপ্রাণ 'এ'-র অভাবে শিশুদের বৃদ্ধির গতি স্তব্ধ হইয়া যায়।

কড্ মাছের যকৃত নিঃসৃত তৈলে সর্বাধিক পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ 'এ' পাওয়া যায়। যকৃত, মাখন, ডিমের কুসুমে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ 'এ' আছে। নিম্নলিখিত উদ্ভিজ্জ খাদ্যেও খাদ্যপ্রাণ 'এ' পাওয়া যায় : গাজর, স্পাইন্যাক্, পালংশাক,

লঙ্কা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদে কোন খাদ্যপ্রাণ 'এ' থাকে না; যে-বস্তুটি থাকে, তাহা খাদ্যপ্রাণ 'এ'-র সমতুল্য এবং ইহা দ্বারা জীবদেহের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ 'এ' সৃষ্টি হয়।

একজন প্রাপ্তবয়স্কের খাদ্যে দৈনিক ৫ মিলিগ্রাম খাদ্যপ্রাণ 'এ' থাকা উচিত।

বি (B)-দলীয় খাদ্যপ্রাণ :

অতীতে যাহাকে খাদ্যপ্রাণ 'বি' বলা হইত, আসলে তাহা কতকগুলি খাদ্য-প্রাণের সমষ্টি। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির বিশদ অনুশীলন হইয়াছে। শস্যের বীজ, বিভক্ত বীজ হইতে উদ্ভূত উদ্ভিদের ফল, বাদাম, কপি, আলু, স্পাইন্যাক, গাজর, শুষ্ক কুল, কিসমিস ইত্যাদিতে 'বি'-দলীয় খাদ্যপ্রাণ আছে। মদ ও তাড়ি প্রভৃতিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জান্তব খাদ্যের মধ্যে ডিমের কুসুম, কেভিয়ার, মাছ, যকৃত, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড, শূকরের মাংস, দুধ প্রভৃতি বি-দলীয় খাদ্যপ্রাণে পরিপুষ্ট।

কয়েকটি বি-দলীয় খাদ্যপ্রাণ জীবদেহে জটিল পরিপাক-ক্রিয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় কিণ্ব-পদার্থ সৃষ্টি করে। সুতরাং এই খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটিলে পরিপাক-ক্রিয়া ব্যাহত হয়।

যেসব দেশের প্রধান খাদ্য চাল, সেইসব এলাকায় বহুকাল হইতে "বেরিবেরি" নামক রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। এই ব্যাধিতে পেশীর দুর্বলতা, পক্ষাঘাত এবং শেষ পর্যন্ত নিদারুণ অবসন্নতা হইতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ শস্য-বীজের ভ্রূণাংশে অবস্থিত 'বি'-দলীয় খাদ্যপ্রাণের একটির অভাবই এই ব্যাধির কারণ। মাজা চালে খোসার সহিত এই ভ্রূণাংশও চলিয়া যাওয়ায় যে বস্তুটি পাওয়া যায় তাহা খুব পরিচ্ছন্ন হইলেও খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের (সোবিয়েত) দেশে বেরিবেরি খুব কমই দেখা যায়। তাহা সত্ত্বেও অবসাদ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রবণতা এবং পেশীর দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিলে বুঝিতে হইবে যে খাদ্যে 'বি'-দলীয় খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটিয়াছে।

দেহের বৃদ্ধি স্তিমিত অথবা স্তব্ধ হওয়া, চক্ষুরোগ কিংবা ঘন ঘন চর্মচ্ছেদ দেখা দেওয়া কিংবা স্নায়বিক গোলযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি উপসর্গ সাধারণত বি-দলীয় খাদ্যপ্রাণের অভাব হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অনুশীলনী :

(১) পুস্তকের শেষাংশে তালিকা দেখিয়া নিজের খাদ্য হইতে তিনটি করিয়া খাদ্যপ্রাণ এ, বি ও সি জাতীয় খাদ্যের নাম লিখ।

(২) পুস্তকের শেষাংশে খাদ্যের উপাদান-সংক্রান্ত যে তালিকা আছে তাহা হইতে নিজের অথবা কোন বৃত্তিধারী লোকের খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত কর। ঐ তালিকাভুক্ত খাদ্যে প্রোটিন, চর্বি ও শর্করার পরিমাণ নির্ধারণ কর এবং উদ্ভিদজাতীয় খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ পৃথকভাবে নির্ধারণ কর। তোমার তালিকাভুক্ত খাদ্যের গুণাগুণ বিশদভাবে বর্ণনা কর এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব দাও :

(ক) ঐ খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালরি আছে কি (ইহার জবাব দিবার সময় লোকটির জীবনধারণের অবস্থা ও কাজের চরিত্র বিচার করিতে হইবে)।

(খ) ঐ খাদ্যে যথেষ্ট হারে প্রোটিন, চর্বি ও শর্করা আছে কি?

(গ) ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ জান্তব প্রোটিন আছে কি?

(ঘ) ঐ খাদ্যে কোন্ কোন্‌টিতে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ আছে? কোন খাদ্যে কোন খাদ্যপ্রাণের অপ্রতুলতা আছে কি?

৪৭। পুষ্টি-সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি

খাদ্যের বিভিন্নতার গুরুত্ব :

খাদ্য যত ক্ষুধা উদ্রেককারী ও আকর্ষণীয় হইবে তত সহজে পাচ্য ও পোষিত হইবে। সেইজন্য নানা ধরনের খাদ্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। একঘেয়ে খাদ্য উৎসাহ নষ্ট করে এবং ক্ষুধার উদ্রেক করিতে পারে না। ফলে খাদ্য সহজে পাচ্য হয় না। নানা ধরনের খাদ্য খাইতে আনন্দ হয়—সুতরাং সুপাচ্য খাদ্যও দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

তাহাছাড়া খাদ্য একঘেয়ে হইলে তাহাতে সমস্ত পুষ্টি-পদার্থের বিশেষ করিয়া খাদ্যপ্রাণের সুষম হার বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

আহারের নিয়মাবলী :

নির্দিষ্ট সময়ে আহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিনের খাদ্য একবারে আহার করা অতি খারাপ অভ্যাস; দিনে কয়েকবার—সম্ভব হইলে প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর আহার করা উচিত। অন্তবর্তীকালে খাদ্য পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে যাইতে থাকে এবং পাকস্থলীটি খালি হইয়া যায় এবং পুনরায় গৃহীত খাদ্য দ্রুত এবং সহজেই হজম হইয়া যায়।

প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের দৈনিক চার বার আহার করা উচিত। দুইভাবে আহার করা যাইতে পারে; (১) সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে অথবা (২) সকালে, বিকালে, খুব অল্প পরিমাণে সন্ধ্যায় ও রাত্রে। কাজের অবস্থা অনুযায়ী আহারের সময় স্থির করা যাইতে পারে; কিন্তু একবার স্থির করার পর কঠোরভাবে তাহা অনুসরণ করা উচিত। রাত্রের আহার শয়নের দুই এক ঘণ্টা পূর্বে শেষ করা উচিত।

সন্ধ্যার আহারটি সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক হওয়া উচিত এবং তাহাতে দৈনিক খাদ্যের অর্ধেক থাকাই ভাল। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর কাজ শুরু করিবার পূর্বে দৈনিক খাদ্যের এক-চতুর্থাংশ আহার করা উচিত। অবশিষ্ট চতুর্থাংশ বাকী দুইটি আহার্যে ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

পরিচ্ছন্নতা :

আহারের সময় পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া উচিত; অন্যথায় ধুলা এবং রোগবীজাণু খাদ্যের সহিত পাচন পথে প্রবেশ করিয়া টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করে।

প্রত্যেকবার আহারের পূর্বে হাত ধোয়া এবং ভোজনের পাত্রগুলি যাহাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ফল ও তরি-তরকারিগুলিও ধুইয়া ফেলিতে হইবে। পানীয় জল সবসময় ফুটাইয়া অথবা শোধন করিয়া লওয়া উচিত।

প্রশ্ন :

(১) মানবদেহে পরিপাক-ক্রিয়া ও শক্তির রূপান্তর পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(২) পরিপাক-ক্রিয়ায় যকৃতের ভূমিকা কি?
(৩) অত্যাধিক ভোজনে ও অনাহারে পরিপাকের পরিবর্তন কিভাবে হয়?

(৪) পরিপাক-ক্রিয়া কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?

(৫) ক্যালরি কাহাকে বলে? আমাদের দেহে এক গ্রাম প্রোটিন, চর্বি ও শর্করার অক্সিজেন ঘটিত প্রক্রিয়ায় কত ক্যালরির প্রয়োজন?

(৬) বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত লোকের দৈনিক কি পরিমাণ শক্তিব্যয় হয়?

(৭) দৈনিক গড়পড়তা কতটা প্রোটিন, চর্বি ও শর্করার প্রয়োজন?

(৮) খাদ্যপ্রাণ কাহাকে বলে? জীবাণুর পক্ষে ইহাদের গুরুত্ব কি? খাদ্যে এ, বি ও সি জাতীয় খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটিলে কি প্রতিক্রিয়া হয়?

(৯) পরিপাক-ক্রিয়ায় কিন্ব-পদার্থগুলির ভূমিকা কি?

(১০) পুষ্টি-সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলি বর্ণনা কর।

৭। রেচন যন্ত্র

৪৮। রেচন বা নিষ্কাষণ তন্ত্রের গুরুত্ব

পরিপাক-ক্রিয়ার শেষফল :

প্রতিটি কোষে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিপাক-ক্রিয়া চলিয়া থাকে। পরিপাক ক্রিয়াপ্রসূত বিভিন্ন পদার্থগুলি শেষ পর্যন্ত যে রূপ নেয়, জীবদেহে তাহার আর কোন পরিবর্তন হয় না।

শর্করা এবং চর্বিতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে। ইহাদের অক্সিজেন ঘটিত প্রক্রিয়ার ফলে জীবদেহে কার্বন-ডাইঅকসাইড্ ও জল তৈয়ারী হয়; বাতাসে শর্করা ও চর্বির সাধারণ দহনের ফলেও ঐ একই পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রোটিনের গঠন অতি জটিল। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়াও প্রোটিনে নাইট্রোজেন, সালফার এবং প্রায়শই ফস্ফরাস ও অন্যান্য পদার্থ থাকে। জীবদেহে প্রোটিনের পচন ও অক্সিজেন ঘটিত প্রক্রিয়ার পর কার্বন ডাই-অকসাইড ও জল ছাড়া নাইট্রোজেন মিশ্রিত পদার্থ (প্রধানত ইউরিয়া ও ইউরিক এ্যাসিড), সালফিউরিক ও ফস্ফরিক এ্যাসিড ঘটিত লবণ এবং অন্যান্য যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হইয়া থাকে।

কোষের মধ্যে সঞ্চিত পরিত্যক্ত পদার্থগুলি কোষের উপর অনিষ্টকর প্রভাব সৃষ্টি করে। জীবদেহের স্বাভাবিক জৈব-ক্রিয়ার জন্য এই পদার্থগুলির সময়মত রেচন বা নিঃসরণ হওয়া প্রয়োজন। কোষগুলি তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ মাধ্যমে অর্থাৎ কলার লসিকায় এই সব পরিত্যক্ত পদার্থ নিঃসৃত করে। লসিকা হইতে ইহারা রক্তে চলিয়া যায়।

পরিপাক ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত পদার্থের রেচন-পদ্ধতি :

রক্তে সঞ্চিত পরিপাক ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত পদার্থগুলি ক্রমে ক্রমে জীবদেহের বাহিরে রেচিত বা নিঃসৃত হইয়া যায়।

মানব দেহে বিশেষ রেচন যন্ত্র—অর্থাৎ প্রধানত মূত্র-যন্ত্র দ্বারা এই কার্য সাধিত হয়।

অবশ্য অন্যান্য যন্ত্র দ্বারাও রেচন কার্য চলে। যেমন, ফুসফুসের দ্বারা কার্বন ডাই অকসাইড নিঃসৃত হয়; তাহা ছাড়া নিঃশ্বাসের পরিত্যক্ত বাতাস সবসময়ই জলীয় বাষ্প দ্বারা সংপৃক্ত থাকে; প্রতিদিন প্রায় ৪০০ গ্রাম জল ফুসফুসের দ্বারা নিঃসৃত হয়।

স্বেদের সহিত প্রচুর পরিমাণ জল চর্মের মধ্য দিয়াও নিঃসৃত হইয়া থাকে; এই জলের সহিত ধাতব লবণ এবং প্রোটিন পরিপাক প্রসূত সামান্য পরিমাণ জৈব পদার্থও বাহির হইয়া যায়।

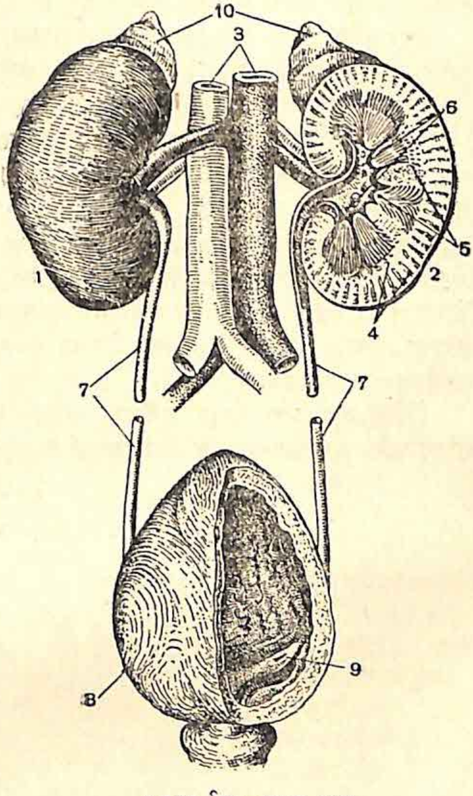
রেচন কার্য দ্বারা পরিপাক ক্রিয়া প্রসূত পদার্থগুলি জীবদেহে সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারেনা এবং রক্তের উপাদান স্থায়িত্ব লাভ করিতেও সাহায্য হয়।

৪৯। মূত্র-যন্ত্র সমূহের গঠন ও কার্য্য প্রণালী

বৃক্কের (Kidney) গঠনঃ

মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে উদর গহ্বরের পিছনের দিকে বৃক্ক দুইটি অবস্থিত (৯২নং চিত্র)। ইহাদের দ্বারাই মূত্রের উৎপত্তি হয়।

বৃক্কের দুইটি স্তবক আছে—**বাহিরের গাঢ় স্তবক** এবং **ভিতরের হাল্কা স্তবক**। বাহিরের স্তবকটি আতস কাঁচ দ্বারা পরীক্ষা করিলে ইহাতে প্রচুর সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঢ় রংএর বিন্দু দেখা যাইবে। এইগুলি আসলে **গ্লোমেরুলাস্** (glomerulus) নামক কৈশিক নালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছ—**ক্যাপসিউল্** (capsule) নামক ছোট ছোট গহ্বরে অবস্থিত। বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম **নালীকা** (tubules) ক্যাপ্সিউল সমূহ হইতে উদ্ভূত হইয়া ভিতরের স্তবকে প্রসারিত হয় এবং তথা হইতে পুনরায় বাহিরের স্তবকে ফিরিয়া আসে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীকা বা **টিবিউলগুলি** পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া প্রশস্ততর ডাক্‌ট্ তৈয়ারি করে; এইগুলি বৃক্কের ভিতরের স্তবকের মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়া **বৃক্কের শ্রোণিচক্র বা পেলভিস্** (pelvis) নামক একটি গহ্বরে আসিয়া শেষ হয় (রঙীন চিত্র ৪)।



৯২নং চিত্র—রেচন যন্ত্র
১। দক্ষিণ বৃক্ক; ২। বাম বৃক্ক (লম্বালম্বি-ভাবে কর্তিত); ৩। রক্তপ্রণালী; ৪। বৃক্কের বহিস্তবক; ৫। বৃক্কের আভ্যন্তরীণ স্তবক; ৬। বৃক্কের পেলভিস; ৭। মূত্রনালী; ৮। মূত্রাশয়—ইহার গাত্রের এক অংশ কাটিয়া মূত্রনালীর মুখ দেখান হইয়াছে; ৯। সুপ্রা-রেনাল গ্রন্থি

মূত্রের উপাদানঃ

মূত্রে জল ও জলে দ্রব অজৈব পদার্থ, ইউরিয়া, ইউরিক এ্যাসিড এবং পরিপাক ক্রিয়া প্রসূত অন্যান্য পদার্থও থাকে।

কোন কোন বিজ্ঞানী বৃক্ককে সাধারণ পরিস্রবক হিসাবে এবং মূত্র সৃষ্টিকে পরিস্রবণ ক্রিয়ার সহিত তুলনা করিতেন। কিন্তু মূত্রের উৎপত্তি অনেক বেশী জটিল কারণ ইহা জীবন্ত কোষসমূহের কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট।

২নং তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে প্রোটিন ও শর্করা ইত্যাদি রক্তের কোন কোন উপাদান মূত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। রক্ত ও মূত্রের সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ প্রায় এক, কিন্তু অন্যান্য পদার্থগুলি রক্ত অপেক্ষা মূত্রেই বেশী পরিমাণ পাওয়া যায়; তাহা হইলেও রক্তে ও মূত্রে ইহাদের একটি নির্দিষ্ট হার বজায় থাকে।

আরও দেখা গিয়াছে যে কোন কোন পদার্থ (যেমন মিথিলিন ব্লু) রক্তে প্রবিষ্ট করাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহারা সম্পূর্ণরূপে মূত্রে চলিয়া যায়।

ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে বৃক্কের কার্যকলাপ অত্যন্ত জটিল এবং আজও পর্যন্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুশীলন করা হয় নাই।

মূত্রের উৎপত্তি গ্লোমেরুলাস সমূহে শুরু হয়। এখানে রক্তের তরল অংশ কৈশিকনালীগুলি হইতে ক্যাপসিউলের মধ্যে পরিস্রবিত হয়। ক্যাপসিউল হইতে তরল পদার্থটি ক্ষুদ্র টিবিউলগুলিতে যায় এবং তথায় যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। শর্করার সমস্ত অংশই টিবিউলসমূহের আবরণিক কোষ দ্বারা অবশোষিত হইয়া পুনরায় রক্তে ফিরিয়া যায়। অন্যান্য পদার্থ—বিশেষত জলীয় ভাগও আংশিকভাবে পুনরায় অবশোষিত হয় এবং ইহার ফলে টিবিউল মধ্যস্থিত তরল পদার্থের ঘনত্ব বাড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটি বিপরীত প্রক্রিয়া—অর্থাৎ রক্ত হইতে কিছু কিছু পদার্থের টিবিউল বা নালীকা মধ্যে নিঃসরণও দেখা যায়।

টিবিউলের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তরল পদার্থটির উপাদান ও ঘনত্ব পরিবর্তিত হইয়া শেষ পর্যন্ত মূত্রে পরিণত হইয়া থাকে।

২নং তালিকা

রক্তের উপাদান	মূত্রে সেই পদার্থের অবস্থান
প্রোটিন	নাই
চিনি	নাই
সোডিয়াম	সম পরিমাণ
পটাসিয়াম	৭ গুণ বেশী
ইউরিক এ্যাসিড	১২ গুণ বেশী
ইউরিয়া	৬৫ গুণ বেশী
সাল্ফেট	৯০ গুণ বেশী

মূত্রের উৎপত্তির নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিঃ

বহুকাল পূর্বেই জানা গিয়াছে যে রক্তে কতকগুলি পদার্থের উপস্থিতি মূত্রের উৎপত্তিকে প্রভাবান্বিত করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পদার্থ মূত্রের উৎপত্তিকে তীব্রতর এবং কতকগুলি আবার দুর্বল করিয়া থাকে। রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও বৃক্কের ক্রিয়াকলাপে স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণও লক্ষ্য করা যায়। প্যাভলভ্ কর্তৃক আবিষ্কৃত নালী সৃষ্টি পদ্ধতি দ্বারা (মূত্রনল বা ইউরেটারটি দেহের বাহিরে পরিচালিত করিয়া) সহজেই স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

কুকুরের মূত্রনলে নালী সৃষ্টি করিয়া বাইকভ্ (Bykov) যে অনুশীলন করেন, তাহা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, বৃক্কের ক্রিয়াকলাপ গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মূত্র উৎপাদনে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনমূলক পরিবর্তন

আনা সম্ভব। একথা সর্বজনবিদিত যে পাকস্থলীর মধ্যে জল প্রবিষ্ট করাইয়া প্রতিবর্তন প্রক্রিয়া মারফৎ মূত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়া (অর্থাৎ পাকস্থলীর মধ্যে জল প্রবিষ্ট করান) বারবার ঘটাইলে দেখা যাইবে যে জল দেওয়ার পূর্বেই, শুধু প্রক্রিয়ার আয়োজনেই বৃক্কের কার্যকলাপ সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পাইবে। বিভিন্ন ধরণের সপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা দ্বারা বাইকভ্ মূত্র নিঃসরণের প্রতিবর্তন-ক্রিয়া সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন।

মূত্র নিঃসরণঃ

বৃক্কের পেলভিস হইতে মূত্র বৃক্ক ও মূত্রাশয়কে সংযোগকারী দীর্ঘ মূত্রনল বা ইউরেটারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। মূত্রনলগাত্রের মসৃণ পেশীতন্তুগুলির সঙ্কোচনের ফলে মূত্র সঞ্চালনে সাহায্য হইয়া থাকে।

মূত্রাশয়টি (urinary bladder) উদর গহ্বরের নিম্নদেশে অবস্থিত ইহার গাত্র পুরু পেশী দ্বারা গঠিত; এই পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইলে মূত্রাশয়টি চাপ পিষ্ট হয়, অপরপক্ষে মূত্রে পূর্ণ হইলে ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রসারিত হইয়া থাকে। মূত্রাশয়ের নিম্নভাগে যে চক্রাকার পেশী আছে, তাহা মূত্রাশয়ের নির্গম পথটি বন্ধ করিয়া রাখে। দেহ হইতে **মূত্রপথ** (urethra) মারফৎ মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। প্রস্রাব করিবার সময় চক্রাকার পেশীগুলি শিথিল হইয়া যায়, কিন্তু মূত্রাশয়ের গাত্রস্থিত পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং এইভাবে মূত্র দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়।

মূত্রের নিঃসরণ এবং বিশেষ করিয়া প্রস্রাব করা স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের প্রভাবেই ইচ্ছামত প্রস্রাব করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ

(১) চর্বি, শর্করা এবং প্রোটিনের পচন ও অক্সিজেনঘটিত প্রক্রিয়া-প্রসূত পদার্থগুলির নাম কর। ইহাদের রেচন বা নিঃসরণের গুরুত্ব কি? কিভাবে নিঃসৃত হয়?
(২) বৃক্কের গঠন বর্ণনা কর।
(৩) মূত্র কিভাবে উৎপত্তি হয় বর্ণনা কর।
(৪) বৃক্কের কার্যকলাপ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?

৮। চর্ম

৫০। চর্মের গঠন

বহিস্তবক (Epidermis)ঃ

চর্ম দেহের বহিরাংশকে ঢাকিয়া রাখে এবং জীবাণুকে বাহিরের প্রভাব হইতে রক্ষা করে (৯৩নং চিত্র)।



৯৩নং চিত্র—চর্মের গঠন

ক। বহিস্তবক; খ। প্রকৃত চর্ম; গ। চর্ম
গ। চর্ম নিম্নস্থ স্নেহজাতীয় কলা

১। বহিস্তবকের শৃঙ্গরূপী স্তবক; ২। বহিস্তবকের সর্বনিম্ন কোষ স্তবক; ৩। শিরা; ৪। ধমনী; ৫। সংবেদীয় স্নায়ুপ্রান্ত; ৬। স্বেদ-গ্রন্থি; ৭। কেশ বা লোম; ৮। তৈলগ্রন্থি; ৯। কেশ বা লোম উৎক্ষেপক মসৃণ পেশী; ১০। চর্বিকোষ সমষ্টি

চর্মের উপরের স্তবককে **বহিস্তবক** বলা হয়; ইহা বহু-স্তবক বিশিষ্ট স্তরীভূত (stratified) আবরণিক কলা দ্বারা গঠিত। বহিস্তবকের গভীরতম **মূল স্তবকে** (basal layer) পরস্পর ঘন সন্নিবিষ্ট চ্যাপ্টা ধরণের এক-সারি কোষ আছে; এই কোষগুলি নিরন্তর আকারে ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিভাগ প্রসূত তরুণ কোষগুলি ক্রমশ পুরাতন স্তবকের উপর বিস্তৃত হয় এবং পুরাতন কোষগুলিকে উপরের দিকে সরাইয়া নিজেরা সেই স্থান অধিকার করে।

বহিস্তবকের উপরের অংশে কোন রক্ত প্রণালী নাই। রক্তপ্রণালীগুলি শুধু মূল-স্তবক পর্যন্ত পৌঁছায় এবং সেইজন্য তথাকার কোষগুলি রক্ত হইতে সহজেই অক্সিজেন ও পুষ্টি পদার্থ পাইয়া থাকে। বহিস্তবকের অন্যান্য স্তবক, বিশেষ করিয়া সর্বোচ্চ স্তবকের কোষগুলি ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও মরিয়া যায়। ক্ষয়ের সময় কোষগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইয়া একটি নিবিড় শৃঙ্গবৎ বা অনুভূতিহীন পদার্থে পরিণত হয় এবং সাদা আঁশের আকারে চর্ম হইতে অবিরাম ঝরিয়া পড়ে। এই আঁশগুলি লোমের সহিত আটকাইয়া থাকিলে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়; সাধারণভাবে এইগুলিকেই খুস্কি বা মরামাস বলে।

বহিস্তবকের কোষসমূহে **পিগ্মেণ্ট্** (pigment) নামক একটি বিশেষ রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতির দ্বারা চর্মের রং নির্ধারিত হয়।

প্রকৃত চর্ম বা (dermis)

পুরু কেন্দ্রীয় স্তবককে প্রকৃত চর্ম বা (dermis) বলা হয়। ইহা প্রচুর সংখ্যক স্থিতিস্থাপক তন্তু সমৃদ্ধ সংযোজক কলা দ্বারা গঠিত; এই তন্তুগুলি চর্মকে দৃঢ়তা ও নমনীয়তা দান করে এবং তাহারই জন্য দেহ সঞ্চালনের সময় চর্ম অনায়াসে প্রসারিত হইতে পারে এবং সমগ্র দেহকে সমান মসৃণভাবে ঢাকিয়া রাখিতে পারে।

চর্ম প্রচুর সংখ্যক রক্ত ও লসিকা প্রণালীতে সমৃদ্ধ। এইখানেই স্নায়ুসূত্র, লোমমূল, তৈল গ্রন্থি (বা sebaceous glands) ও স্বেদ গ্রন্থি ইত্যাদি অবস্থিত।

চর্বিনিঃসরণকারী (Sebaceous) বা তৈল গ্রন্থিঃ

চর্বি বা তৈল-গ্রন্থিগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র, কখনো কখনো শাখাযুক্ত থলির মত; ইহারা তৈল ক্ষরণ করে। এই ক্ষরিত তৈল চর্ম ও লোমের উপর একটি পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করিয়া ইহাদিগকে নরম ও তরল পদার্থ দ্বারা অভেদ্য করিয়া তোলে। ৯৩নং চিত্রে দেখা যাইবে যে তৈল-গ্রন্থির ডাকট্গুলি **লোমকূপে** (hair follicles) আসিয়া উন্মুক্ত হয়। তৈল-গ্রন্থি ও লোমকূপের নিকটে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতলা মসৃণ পেশীগুচ্ছ সংকুচিত হইয়া তৈল-নিষ্কাশন করে এবং তাহার ফলে লোমগুলি খাড়া হইয়া ওঠে।

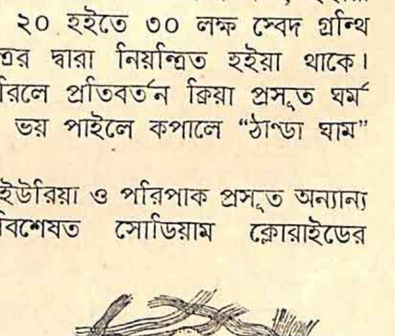
স্বেদ গ্রন্থিঃ

স্বেদ-গ্রন্থিগুলি দেখিতে ছোট ছোট গিঁট পাকান নালিকার মত; ইহারা স্বেদ বা ঘর্ম ক্ষরিত করে। মানুষের চর্মে ২০ হইতে ৩০ লক্ষ স্বেদ গ্রন্থি আছে। নিঃসৃত ঘর্মের পরিমাণ স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ গরমের দিনে জল পান করিলে প্রতিবর্তন ক্রিয়া প্রসূত ঘর্ম নিঃসরণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভয় পাইলে কপালে "ঠাণ্ডা ঘাম" নিঃসৃত হওয়া আর একটি উদাহরণ।

ঘর্মে জল এবং জলে দ্রব সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া ও পরিপাক প্রসূত অন্যান্য পদার্থ পাওয়া যায়; অজৈব লবণ, বিশেষত সোডিয়াম ক্লোরাইডের জন্য ঘর্মের স্বাদ লবণাক্ত।

চর্ম-নিম্নস্থ স্নেহ বা চর্বি জাতীয় কলাঃ

চর্মাবরণের নিম্ন-স্তবককে চর্ম-নিম্নস্থ (subcutanous) স্নেহ জাতীয় কলা বলে। দেহের কোন কোন অংশে ইহা কয়েক সেণ্টিমিটার পুরু হইয়া আছে। চর্ম-নিম্নস্থ স্নেহ জাতীয় কলা কতকগুলি কোষ দ্বারা গঠিত; ইহারা চর্বিবিন্দু-গুলিকে ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে এমনভাবে জমা করিয়া রাখে যে ক্রমে নিজেরাই সম্পূর্ণভাবে **চর্বিপূর্ণ হইয়া যায় (৯৪নং** চিত্র)। চর্মের এই স্তবকটি আভ্যন্তরীণ



৯৪নং চিত্র—স্নেহজাতীয় কলা
১। চর্বিকোষ; ২। কোষ মধ্যে চর্বি সঞ্চয়ন

দেহযন্ত্রগুলিকে আঘাতের বিরুদ্ধে রক্ষা করে এবং দেহের তাপক্ষয় কমাইয়া দেয়। তাহা ছাড়া এই বিশেষ স্থানটিতেই চর্বি সঞ্চিত হইয়া থাকে।

৫১। চর্মের গুরুত্ব

বহিস্ত্বকের নিবিড় শৃঙ্গধর্মী অনুভূতিহীন স্তবকটি চর্মতৈলে সংপৃক্ত হইয়া থাকায় ইহা জল এবং জলে দ্রব অন্যান্য পদার্থের দ্বারা দুর্ভেদ্য। শুধু চর্ম-তৈলকে দ্রব করিতে পারে এইরূপ কয়েকটি পদার্থ চর্মের মধ্য দিয়া সামান্য পরিমাণে অবশোষিত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বস্ত্র এবং অন্যান্য কোন কোন শিল্পে ব্যবহৃত **এনিলিনের** (aniline) কথা উল্লেখযোগ্য। এ্যানিলিন চর্মের সংস্পর্শে আসিয়া অবশোষিত হয় এবং গুরুতর বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। সেই কারণে সোবিয়েত ইউনিয়নে এ্যানিলিন ব্যবহারের সমগ্র পদ্ধতিটি যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয় এবং ইহার বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য বিশদ ব্যবস্থাও গৃহীত হইয়া থাকে।

আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

বহিস্ত্বকের ঘন সন্নিবিষ্ট শৃঙ্গধর্মী কোষ স্তবকটি ইহার নিম্নস্থ জীবন্ত কোষ স্তবককে রক্ষা করে; জীবন্ত কোষগুলি উপরে থাকিলে স্পর্শমাত্রই আহত হইত। দেহ-চর্মের যে সমস্ত অংশ—যেমন পায়ের পাতা—প্রবল ঘর্ষণ বা উত্তেজনার অধীন, সেইস্থানের শৃঙ্গধর্মী-স্তবক যথেষ্ট পুরু হইয়া থাকে।

নিরন্তর ঘর্ষণের ফলে চর্মের যে-সমস্ত অংশ, বিশেষ করিয়া শৃঙ্গ-ধর্মী স্তবক পুরু হইয়া যায়, তাহাকে **কড়া** (callosities) বলে। শারীরিক শ্রমের ফলে প্রবল ঘর্ষণের জন্য তালুতে এইরূপ কড়া সৃষ্টি হইয়া থাকে। আঁট অথবা বেমাপের জুতা পরিলে নিরন্তর ঘর্ষণ ও উত্তেজনার ফলে পায়ের অঙ্গুলিতেও কড়া পড়িতে পারে।

আঘাত লাগিলে তাহার প্রথম ধাক্কা বা 'শক্' চর্ম এবং তন্নিম্নস্থ চর্বির উপরেই আসিয়া পড়ে এবং এইভাবে ইহারা দেহযন্ত্রগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে।

সূর্যরশ্মির বিরুদ্ধে প্রতিরোধঃ

সূর্যরশ্মি হইতে উদ্ভূত শক্তি জীবন্ত কোষকে উত্তেজিত এবং অধিকতর সক্রিয় করিয়া তোলে। কিন্তু সূর্যরশ্মিতে অত্যধিক উন্মুক্ত থাকিলে ইহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপ ব্যাহত হইতে পারে, এমনকি মরিয়া যাইতেও পারে। অদৃশ্য আলট্রা-ভাইওলেট্ বা অতি বেগুনি রশ্মি অত্যন্ত শক্তিশালী; ইহা সহজেই চর্মকে পোড়াইয়া দিতে পারে।

সূর্যরশ্মি বহিস্ত্বকের মূল স্তবকের কোষগুলিতে পৌঁছাইলে ইহারা উত্তেজিত হইয়া আকারে ও সংখ্যায় দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ফলে, বহিস্ত্বকটি

অধিকতর পুরু হইয়া সূর্যরশ্মিকে, বিশেষ করিয়া শৃঙ্গধর্মী-কোষ-স্তবকের মধ্যে দুর্গম অতি-বেগুনি-রশ্মিকে, সহজে ধরিয়া রাখিতে পারে; তাহা ছাড়া বহিস্তকের কোষগুলি পিগমেণ্ট-পুষ্ট হইয়া ওঠে এবং ঐ লোকটির দেহে "তামাটে রং-এর প্রলেপ" পড়িয়া সূর্যরশ্মিকে চর্মভেদ করিতে বাধা দেয়—অর্থাৎ এইভাবে জীবদেহকে সূর্যের প্রচণ্ড শক্তি হইতে রক্ষা করে।

চর্মের উপর সূর্যরশ্মি যত বেশী শক্তিশালী এবং যত দীর্ঘস্থায়ী হইবে, চর্ম ততই তাম্রাভ হয় এবং বহিস্ত্বকের শৃঙ্গধর্মী কোষগুলি ততই পুরু হইয়া থাকে।

এইভাবে সূর্যে ঝলসান পুরু বহিস্ত্বক অত্যধিক সূর্যরশ্মির প্রক্রিয়া জাত প্রতিরোধমূলক প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রকাশ পায়।

পরিপাক-ক্রিয়াপ্রসূত পদার্থের নিঃসরণ :

কোন কোন প্রাণীদেহে—যেমন ব্যাঙের পরিপাক-ক্রিয়াপ্রসূত পদার্থের অধিকাংশই চর্ম হইতে নিঃসৃত হয়। মানবদেহে চর্ম হইতে নিঃসরণ-ক্রিয়া খুব অল্পই হইয়া থাকে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শতকরা ৯৫ ভাগ নাইট্রোজেন ইউরিয়া, ইউরিক এ্যাসিড ও অন্যান্য পরিত্যক্ত পদার্থরূপে বৃক্ক দ্বারা নিঃসৃত হয় এবং বাকী মাত্র ৫ ভাগ নিঃসৃত হয় চর্মের স্বেদ-গ্রন্থি দ্বারা।

অবশ্য কোন কোন অবস্থায়—বিশেষত বৃক্কের কার্যকলাপ ব্যাহত হইলে ঘর্মে অধিকতর পরিমাণে পরিপাকপ্রসূত পদার্থ পাওয়া যায়—অর্থাৎ বৃক্ক সঠিকভাবে কাজ না করিলে ঘর্মকে সেই কাজ সম্পন্ন করিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ঘর্মে মূত্রের গন্ধ পাওয়া যায় এবং ঘর্ম বাষ্পীভূত হইবার ফলে চর্মের উপর ইউরিয়া ও ইউরিক এ্যাসিডের কেলাস্ (crystals) সঞ্চিত হয়।

দৈহিক তাপের অপরিবর্তনীয়তা :

সুস্থ মানুষের দৈহিক তাপ বৎসরের সব সময় এবং সব রকম আবহাওয়াতেই ৩৭° ডিগ্রি (সেণ্টিগ্রেড) থাকে।

দেহে নিরন্তর তাপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। পেশীর শ্রমসাধ্য কাজে এই তাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তাপ সৃষ্টির মত নিরন্তর তাপ-ক্ষয় হওয়ার জন্য দেহ অত্যধিক উত্তপ্ত হয় না। উত্তপ্ত ষ্টোভ্ যেমন বাতাসে ছাড়িয়া দেয়, ঠিক সেইরূপ চতুষ্পার্শস্থ বাতাসের সংস্পর্শে থাকিয়া চর্মও পরিবহন ও বিকিরণ-ক্রিয়া মারফৎ (conduction and radiation) তাপ ছাড়িয়া থাকে।

চর্মের কৈশিক নালীসমূহের সঙ্কোচন ও প্রসারণের গুরুত্ব :

চর্মে প্রচুরসংখ্যক রক্তপ্রণালী আছে। বাতাসের তাপ বৃদ্ধি পাইলে এই রক্ত-প্রণালীগুলি প্রসারিত হইয়া অধিকতর রক্তে পূর্ণ হয়। চর্মে আগত এই অতিরিক্ত রক্ত চর্মের তাপ বৃদ্ধি করে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় অ-প্রসারিত রক্তপ্রণালীর তুলনায় এই সময় বহিস্তবক হইতে অপেক্ষাকৃত দ্রুত বেগে তাপ পরিবহন ও বিকিরণ হইয়া থাকে।

পেশীর সক্রিয় অবস্থায় অধিকতর তাপ ছাড়িবার প্রয়োজন ঠিক একই অবস্থা ঘটিয়া থাকে—অর্থাৎ, চর্মের রক্তপ্রণালীগুলি প্রসারিত ও অধিকতর রক্ত-পূর্ণ হয় এবং অধিকতর তাপও মুক্ত হইয়া থাকে।

অপরপক্ষে চতুষ্পার্শ্বস্থ বাতাসের তাপ কমিয়া যাইলে রক্তপ্রণালীগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং চর্ম হইতে তাপক্ষয় কমিয়া যায়।

শুষ্ক বাতাস অপেক্ষা আর্দ্র বাতাস অধিকতর তাপ-পরিবাহী। সেইজন্য ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় দেহের তাপক্ষয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং চর্মের রক্তপ্রণালীসমূহ সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও অত্যধিক শৈত্যবোধ জাগিতে পারে।

রক্তপ্রণালীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এ্যাল্‌কহল ব্যবহারে সঙ্কোচনকারী স্নায়ুগুলি নিষ্ক্রিয় হওয়ার বাতাসের তাপ কমিলেও রক্তপ্রণালীগুলি প্রসারিত অবস্থাতেই থাকিয়া যায় এবং চর্মও গরম থাকে; অর্থাৎ তাপক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া যায়। মদ্যপদের শৈত্যবোধ না হওয়ার কারণ ইহা দ্বারাই বোঝা যাইবে; শীতের দিনেও জামার বোতাম খুলিয়া ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তুষারপাতের মধ্যেই অবিচলিতভাবে ঘুমাইতে থাকে। তপ্ত চর্ম হইতে তাপ মুক্তি তীব্রতর হওয়ার ফলে মদ্যপের দৈহিক তাপ কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত কমিয়া যায় এবং মৃত্যুও ঘটিতে পারে। সুতরাং মদ্যপানে শরীর গরম হওয়ার কথা আত্মবঞ্চনা মাত্র।

স্বেদ নিঃসরণের গুরুত্ব :

গ্রীষ্মের আবহাওয়ায় এবং উত্তপ্ত কারখানা ঘরে কাজের সময় বাতাসের উত্তাপ দৈহিক তাপ অপেক্ষা বেশী হওয়া সত্ত্বেও চর্মের রক্তপ্রণালীসমূহের প্রসারণ দৈহিক তাপ-ক্ষয় বাড়াইতে পারে না; অত্যধিক উত্তপ্ত বাতাস চর্মকে ঠাণ্ডা না করিয়া বরং তাপ আরও বৃদ্ধি করে। এরূপ ক্ষেত্রে ঘর্মস্রোত বাড়িয়া গিয়া সেই ঘর্ম বাষ্পীভূত হইতে থাকে এবং এইভাবে জীবদেহকে অত্যধিক উত্তপ্ত হওয়ার বিপদ হইতে রক্ষা করে।

বাষ্পীভবনের প্রচ্ছন্ন তাপ খুবই বেশী। সেইজন্য বাষ্পীভূত হইয়া স্বেদ চর্ম গাত্র হইতে প্রচুর পরিমাণ তাপ অবশোষণ করিয়া লয়। ফলে, বাতাসের তাপ ৪০° অথবা ৫০° ডিগ্রি হইলেও দেহের তাপ বৃদ্ধি পায় না।

শীতের আবহাওয়ায় এবং শান্ত দেহে স্বেদ নিঃসরণ প্রচুর কমিয়া যায়।

চর্মের উপর তাপ অথবা ঠাণ্ডার প্রভাবে কিংবা জল পান করিলে স্বেদ নিঃসরণের যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন-ক্রিয়ার ফল। গুরু-মস্তিষ্কের কর্টেক্সের প্রভাব সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ ভয়ে প্রচুর স্বেদ নিঃসরণের কথা (ঠাণ্ডা ঘাম) উল্লেখ করা যাইতে পারে; মুখের কাছে জল আনিলে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন-ক্রিয়াপ্রসূত স্বেদ নিঃসরণ বাড়িয়া যাওয়া ইহার আর একটি উদাহরণ।

বাতাসের তাপ, গতি এবং আর্দ্রতার উপর স্বেদ বাষ্পীভূত হওয়ার হার, তথা তাপ-ক্ষয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। বাতাস যত শুষ্ক ও তপ্ত হইবে স্বেদও তত দ্রুত বাষ্পীভূত হইবে। হাওয়া বেশী থাকিলে বাতাসের আর্দ্রতা সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণ স্বেদ বাষ্পীভূত হইয়া থাকে। হাওয়া না থাকিলে এবং বায়ু জলীয় বাষ্পে সংপৃক্ত হইলে ঘর্ম বাষ্পীভূত হইতে পারে না। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে কেন গরম স্নান-ঘরে অধিকক্ষণ থাকা যায় না।

জীবাণুর অত্যধিক গরম বা ঠাণ্ডা হাওয়া :

জীবাণুর তাপ-ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

হাওয়া না থাকিলে এবং বায়ু অত্যধিক তপ্ত ও আর্দ্র হইলে তাপ-ক্ষয় যথেষ্ট

কমিয়া যায়। ফলে, দেহ অতি-তপ্ত হইয়া পড়ে এবং তাপাহত হইয়া মৃত্যুও ঘটিতে পারে।

তাপাহত (সর্দিগর্মি) হওয়ার প্রধান লক্ষণগুলি হইল,—দুরন্ত শিরঃপীড়া, বমনোদ্রেক এবং গুরুতর ক্ষেত্রে চেতনালোপ ও স্নায়বিক আক্ষেপ। তাপাহত রোগীকে অবিলম্বে কোন ঠাণ্ডা পরিবেশে লইয়া যাইতে হইবে এবং মাথায় বরফ বা ঠাণ্ডা জলে সিক্ত তোয়ালে প্রয়োগ করিতে হইবে; দেহের উপর পাখার বাতাস করিয়া স্বেদ বাষ্পীভূত হইতে দেওয়া উচিত; তাহা ছাড়া দ্রুত স্বেদ নিঃসরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ঠাণ্ডা অথবা উষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

কঠিন শৈত্যপূর্ণ আবহাওয়ায় দেহ এমনি ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে যে জীবদেহটি দুর্বল হইয়া ব্যাধিপ্রবণ হইতে পারে। দেহের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করিয়া পদদ্বয় ঠাণ্ডা হইয়া এবং দীর্ঘকাল ঠাণ্ডা থাকিয়াও জীবদেহকে দুর্বল করিয়া ফেলিতে পারে। অনভ্যস্ত অবস্থায় ভিজা জুতা পরিয়া থাকা অথবা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় নগ্নপদে ঘুরিয়া বেড়ান অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ ইহার ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জা, টনসিল ও গলার প্রদাহ, এমনকি নিউমোনিয়া পর্যন্ত হইতে পারে।

শীতে জমিয়া যাওয়া :

দেহযন্ত্রগুলি বিশেষ করিয়া হৃৎপিণ্ড হইতে দূরতম স্থলে অবস্থিত এবং স্বভাবতই ন্যূনতম রক্ত সরবরাহ প্রাপ্ত যন্ত্রগুলি ঠাণ্ডা হইয়া গেলে দেহ ঠাণ্ডায় জমিয়া যায়।

ঠাণ্ডায় জমিয়া যাওয়ার তিনটি স্তর আছে; প্রথম স্তরে দেহের জমিয়া যাওয়া অংশটি প্রথমে মৃতের মত সাদা এবং পরে রক্তিম হইয়া ফুলিয়া ওঠে। দ্বিতীয় স্তরে ফোস্কা সৃষ্টি হয় এবং তৃতীয় স্তরে রক্ত সংবহন বন্ধ হইয়া কলাগুলি মরিয়া যায়; এরূপ ক্ষেত্রে চর্ম কাল হইয়া যায়।

ঠাণ্ডায় জমিয়া যাওয়ার প্রথম স্তরে প্রাথমিক কাজ হইল রক্ত সংবহনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া আক্রান্ত দেহযন্ত্রে রক্তস্রোত ফিরাইয়া আনা; ঘর্ষণের দ্বারা (বরফের দ্বারা) এই উদ্দেশ্য সফল হইবে। গুরুতর ক্ষেত্রে, যেমন, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হইবে।

দগ্ধ হওয়া :

সামান্য দগ্ধ হইলে সেই অংশের চর্ম লাল হইয়া ওঠে। গুরুতর দগ্ধ হইলে চর্ম উঠিয়া গিয়া হাল্কা রঙের তরল পদার্থপূর্ণ ফোস্কা সৃষ্টি হয়। অত্যন্ত গুরুতর (তৃতীয় স্তরের) দাহে কলাগুলি বিনষ্ট হইতে পারে।

চর্মের ব্যাপকাংশ যেকোনরূপে দগ্ধ হইলে বিপদের আশঙ্কা থাকে; কারণ প্রথমত সেই ব্যাপক অংশের প্রয়োজনীয় জৈবিক-ক্রিয়াকলাপ নষ্ট হইয়া যায় এবং দ্বিতীয়ত, আহত কোষসমূহের ক্ষয় ও পচনপ্রসূত পদার্থ দ্বারা জীবদেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হইয়া থাকে।

শুধু তাপ নয় (সাল্‌ফিউরিক, হাইড্রোক্লোরিক,নাইট্রিক ও অন্যান্য কড়া এ্যাসিড ও কষ্টিক এ্যাল্‌ক্যালি জাতীয়) রাসায়নিক পদার্থ এবং মাষ্টার্ড বাষ্প ও যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত অন্যান্য বাষ্প দ্বারাও চর্ম দগ্ধ হইতে পারে।

প্রশ্ন ঃ

(১) দেহের তাপক্ষয় কি করিয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে—

(ক) চতুষ্পার্শ্বস্থ বাতাস শুষ্ক এবং দেহ অপেক্ষা কম তাপ-বিশিষ্ট হইলে?

(খ) বায়ু জলীয় বাষ্পে সংপৃক্ত এবং পূর্বের ন্যায় দেহ অপেক্ষা কম তাপ-বিশিষ্ট হইলে?

(গ) বায়ু শুষ্ক এবং দেহ অপেক্ষা অধিকতর তাপ-বিশিষ্ট হইলে?

(ঘ) বায়ু জলীয় বাষ্পে সংপৃক্ত এবং দেহ অপেক্ষা অধিকতর তাপ-বিশিষ্ট হইলে?

(২) উপরিউক্ত কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্বেদ বাষ্পীভবন মারফৎ এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাপ পরিবহন মারফৎ তাপক্ষয় অসম্ভব?

৫২। চর্ম সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধি

অপরিষ্কৃত চর্ম ব্যাধি প্রসারের উৎস :

চর্মের তৈল ও স্বেদের উপাদানে অংশগ্রহণকারী জৈব-পদার্থগুলি শীঘ্রই পচিয়া যায়; এই পচন-প্রক্রিয়ার সময় এমন কতকগুলি উদ্বায়ী (volatile) পদার্থ সৃষ্টি হয় যেগুলি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। চর্মের উপরিভাগে, বিশেষ করিয়া অসংখ্য ভাঁজে ভাঁজে সঞ্চিত ময়লা তৈল-গ্রন্থিসমূহের মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং এইভাবে স্বেদ নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে।

ধূলিকণার সহিত অসংখ্য বীজাণুও চর্মের উপর আটকাইয়া থাকে; চর্ম হইতে নিঃসৃত পচন-ক্রিয়াপ্রসূত পদার্থগুলি এইসব বীজাণুর খাদ্য সরবরাহ ও বৃদ্ধির সহায়ক।

অপরিষ্কার দেহবিশিষ্ট লোকের চর্মে বীজাণুর সংখ্যা প্রচণ্ড হারে বাড়িয়া যায়—এমনকি প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে ৪০ হাজার পর্যন্ত হইতে পারে; সমগ্র দেহের বহিরাংশ ১·৫ বর্গ মাইল ধরিলে বীজাণুর সংখ্যা প্রায় ৬০ কোটি হইবে। এই সমস্ত বীজাণুর মধ্যে কতকগুলি অনিষ্টকারী না হইলেও কতকগুলি প্রদাহ ও পুঁজ সৃষ্টিকারী (piogeneous) এবং কতকগুলি আবার মহামারীর সময় কলেরা, টাইফয়েড ও আমাশার বাহকরূপে কাজ করে।

চর্ম ও পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার না রাখিলে বিভিন্ন ধরনের পরজীবী বা (parasites) শরীরে স্থান লইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন ধরনের ব্যাধি সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ itch-mite নামক এক প্রকার মাকড় বহিস্ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া অত্যন্ত অস্বস্তিকর চুলকানি সৃষ্টি করিয়া থাকে। দেহ-উৎকুণ (Body Lice) জাতীয় কাপড়ের ভাঁজে বসবাসকারী বংশবৃদ্ধিকারী একপ্রকার পরজীবী রুগ্নদেহ হইতে সুস্থ দেহে সংক্রমিত হইয়া গুরুতর টাইফাস্ (typhus) রোগ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

অপরিষ্কৃত চর্মে প্রায়ই আন্ত্রিক কীট বা ক্রিমির (intestinal worms) ডিম্ব পাওয়া যাইতে পারে।

নোংরা হাত হইতে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বাহকগুলি খাদ্যে এবং খাদ্যের সহিত জীবদেহের দেহাভ্যন্তরে সংক্রমিত হয়।

অপরিষ্কার লোক অপরের এবং নিজের পক্ষেও বিপজ্জনক।

চর্মের পরিচ্ছন্নতা :

নিজের এবং আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সব সময়ই দেহচর্মকে পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন গরম জল ও সাবান দিয়া সারা শরীর ধুইয়া ফেলা উচিত। অন্তর্বাসগুলি ঘর্মনিঃসৃত পদার্থসমূহ দ্বারা অবশোষিত হয় বলিয়া প্রত্যেকবার স্নান করার পর এগুলি পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

মুখ, গ্রীবা এবং পায়ের পাতা (বিশেষ করিয়া এই অংশগুলি ঘর্ম-প্রবণ হইলে) প্রতিদিন ধুইয়া ফেলিতে হইবে; তাহা ছাড়া প্রতিবার আহারের পূর্বে হাত প্রক্ষালন করা প্রয়োজন; নখের নীচে সহজেই ময়লা জমিয়া যায় বলিয়া প্রায়ই নখ কাটা উচিত।

আহত চর্মের প্রতিক্রিয়া :

আহত হওয়ার ফলে চর্মে ফাটল, ঘা বা ক্ষত সৃষ্টি হইতে পারে এবং এই আক্রান্ত স্থান দিয়া অনিষ্টকারী বা ব্যাধি সৃষ্টিকারী বীজাণু দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

এই সমস্ত ক্ষেত্রেই জীবদেহে প্রদাহ সৃষ্টিকারী প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। রক্তপ্রণালীগুলি প্রসারিত হয়; ইহাদের গাত্র হইতে শ্বেতকণিকারা (ফেগোসাইট) বাহির হইয়া আসে; চর্ম রক্তিমাভ হইয়া কিছুটা ফুলিয়া এবং উষ্ণ হইয়া ওঠে; প্রায়ই স্ফোটক সৃষ্টি হয়।

প্রদাহ অদৃশ্য হইতে শুরু করিলে সঞ্চিত পুঁজও নিঃসৃত হইয়া যায়। ক্ষতের সন্নিহিত অংশের সংযোজক কলাগুলি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ক্ষতটিকে জোড়া লাগাইয়া দেয়। তঞ্চিত রক্ত এবং আহত কোষগুলির অবশিষ্টাংশের পচন শুরু এবং ফেগোসাইটরা সেগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। বহিস্ত্বকের মূল স্তবকের জীবন্ত কোষগুলি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ক্ষতের বহিরাংশকে ক্রমশ জোড়া লাগাইয়া দেয় এবং এই নূতন কোষগুলির উপর শীঘ্রই একটি শৃঙ্গধর্মী কোষ স্তবকের সৃষ্টি হয়।

পরিচ্ছদ :

চর্মের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে পরিচ্ছদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। পরিচ্ছদ দেহের তাপকে স্থায়ী হইতে সাহায্য করে।

শীতের সময় পরিচ্ছদ দ্বারা তাপ-ক্ষয় কমাইয়া দেওয়া উচিত। সুতরাং শীতকালে সচ্ছিদ্র (পশমী বা পশু লোমের) পরিচ্ছদই শ্রেয়ঃ, কারণ, ছিদ্র মধ্যস্থিত বাতাস ভাল তাপ-পরিবাহী নয় এবং চর্ম হইতে তাপ-ক্ষয় হইতে দেয় না। অনেকগুলি পাট বা স্তবকবিশিষ্ট এবং বিভিন্ন স্তবকের মধ্যে বায়ুস্থান সহ পোশাক পরিলে অতি ধীরে ধীরে এবং ক্ষীণভাবে তাপ বিকিরণ হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শীতকালেও স্তূপীকৃত পোশাক পরিধান করা উচিত নয়, কারণ সেরূপ ক্ষেত্রে পরিচ্ছদের চাপে দেহ সঞ্চালনের গতি ব্যাহত হইতে

পারে; তাহা ছাড়া অধিক পরিচ্ছদ দেহকে অতিরিক্ত উত্তপ্ত করিতে পারে।

অপরপক্ষে বায়ুর তাপ বৃদ্ধি পাইলে পরিচ্ছদ দৈহিক তাপ ছাড়িতে সহায়ক হওয়া উচিত। সুতরাং গ্রীষ্মকালীন পরিচ্ছদ হাল্কা ও যথাসম্ভব পাতলা এবং কমসংখ্যক স্তরবিশিষ্ট হওয়া উচিত।

গ্রীষ্মকালীন সুতিবস্ত্রের মধ্য দিয়া বায়ু ও বাষ্প ভেদ করিতে পারা প্রয়োজন, যাহাতে স্বেদ বাষ্পীভবনের সুবিধা হয় এবং অধিক পরিমাণ তাপ বিকিরণ হইতে পারে।

অন্তর্বাসগুলি দেহচর্মের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে বলিয়া এগুলি যাহাতে চর্ম নিঃসৃত পদার্থ অবশোষণ করিতে এবং বায়ুভেদ্য হইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অন্তর্বাস যথেষ্ট নরম এবং চর্মের পক্ষে অনুত্তেজক হওয়া উচিত।

অন্যান্য পরিচ্ছদ বাতাসের ধুলায় সহজেই মলিন হইয়া যায়। ধূলিকণা পরিচ্ছদের ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া ইহার তাপ পরিবহন শক্তি বাড়াইয়া দেয়। নিয়মিতভাবে ও ব্রাস দিয়া ঝাড়িয়া পরিচ্ছদগুলি পরিষ্কার রাখা যাইতে পারে।

অন্তর্বাস ও অন্যান্য পরিচ্ছদ চর্মনিঃসৃত তৈল ও ঘাম দ্রুত অবশোষণ করিয়া লয় এবং বহিস্ত্বকের শৃঙ্গধর্মী কোষের আঁশে পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। এই কারণে সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন (গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দৈনিক একবার) অন্তর্বাস পরিবর্তন করা উচিত।

জীবদেহকে শক্তিশালী করিতে চর্মের ভূমিকা :

বায়ু, সূর্য ও জল—চর্মের এই প্রাকৃতিক উত্তেজকগুলি চর্মের কোমলতা হ্রাস করে, তাপের তারতম্য সহ্য করিতে সাহায্য করে এবং ইহাকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখে।

এইসব স্বাভাবিক উত্তেজকের প্রক্রিয়ার ফলে সুস্থ চর্মের পরিপাকপ্রসূত কোন কোন পদার্থ পরিমাণে বাড়িয়া যায়। এই পদার্থগুলি রক্তে অবশোষিত হইয়া বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব সৃষ্টি করিয়া থাকে। এবং ইহাদের ক্রিয়াকলাপ বাড়াইয়া দেয়। তাহা ছাড়া এইসব প্রাকৃতিক উত্তেজনা চর্মের ইন্দ্রিয়-সংশ্লিষ্ট (sensory) স্নায়ুসূত্রগুলিকে উত্তেজিত করে এবং প্রতিবর্তন-ক্রিয়ার মাধ্যমেও দেহযন্ত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ বাড়াইয়া দেয়।

সুতরাং জীবদেহের উপর বায়ু, সূর্য ও জলের দ্বৈত হিতকারী প্রভাব আছে—একটি রাসায়নিক এবং অপরটি স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ।

পূর্ণ স্বাস্থ্য অর্জন এবং বিভিন্ন অনিষ্টকারী প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই কষ্টসহিষ্ণু হওয়া এবং চর্মের প্রাকৃতিক উত্তেজকসমূহকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করা উচিত।

গ্রীষ্মকালে সূর্যকিরণ ও বায়ু সেবন করা উচিত। গুরুতর রৌদ্র-দাহ পরিহার করিবার জন্য চর্মকে ক্রমে ক্রমে সূর্য রশ্মিতে অভ্যস্ত করাইতে হইবে। গ্রীষ্মের সময় নগ্নপদে হাঁটা ভাল ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যথাসম্ভব হাল্কা পোষাক পরিধানের অভ্যাস করা উচিত। অত্যন্ত আচ্ছাদনে শরীর দুর্বল ও রোগ-প্রবণ হইয়া পড়ে।

জলের ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা শুধু গ্রীষ্মকালীন স্নানে

সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। সারা বৎসরই প্রতিদিন প্রত্যুষে ঘরের তাপবিশিষ্ট জলে দেহ মর্দন বা সম্ভব হইলে স্নান করা উচিত।

অধিকক্ষণ জলে বা রৌদ্রে থাকিলে বিশেষ করিয়া অনভ্যস্ত লোকের হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর অনিষ্টকর প্রভাব সৃষ্টি হয়। কোন কোন লোকের পক্ষে দেহকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখার জন্য সাধারণ পন্থায় রৌদ্রে শুইয়া থাকা বা ঠাণ্ডা জলে স্নান করা অত্যন্ত ক্ষতিকরক হইতে পারে। সুতরাং দেহকে দৃঢ় বা শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টায় চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্ন

(১) চর্মের গঠন বর্ণনা কর।
(২) চর্মের প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা কি?
(৩) জীবাণুকে দৃঢ় করিবার কাজে চর্মের ভূমিকা কি?
(৪) চর্ম হইতে তাপক্ষয় কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?
(৫) চর্মের স্বাস্থ্যবিধি-সংক্রান্ত প্রধান নিয়মগুলি বর্ণনা কর।
(৬) পরিচ্ছদ সম্পর্কে প্রধান কোন্ কোন্ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন?

৯। আভ্যন্তরীণ ক্ষরণ

৫৩। *অন্তঃক্ষরা* (Endocrine) *বা ডাক্টহীন গ্রন্থি*

রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ :

প্রত্যেক দেহযন্ত্র রক্তের মধ্যে এমন সব পদার্থ ক্ষরণ করে যেগুলি অন্যান্য যন্ত্রের কার্যকলাপকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। সমস্ত দেহযন্ত্রই তাহাদের কাজের অনুপাতে রক্তের মধ্যে কম অথবা বেশী পরিমাণে কার্বনিক এ্যাসিড ক্ষরণ করে। রক্তে কার্বনিক এ্যাসিডের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিলে জীবদেহে তাহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়—অবিলম্বে শ্বাস-কেন্দ্রের উত্তেজনা-প্রবণতা বাড়িয়া যায়। এই ভাবেই শ্বাস-প্রশ্বাসের রাসায়নিক ও স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ ঘটিয়া থাকে।

বিভিন্ন দেহযন্ত্রে পরিপাক প্রক্রিয়ার প্রভেদ আছে; সুতরাং দেহযন্ত্রগুলি রক্তে যে পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ বিমুক্ত করে, তাহারও পার্থক্য আছে। সেই কারণে রাসায়নিক পারস্পরিক প্রক্রিয়ায় (interaction) বিভিন্ন দেহযন্ত্রের ভূমিকাও ভিন্ন ভিন্ন। যে-সকল পদার্থ পাচন প্রক্রিয়ার রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করে, সেগুলি পাকস্থলীর গাত্র হইতে রক্তে অবশোষিত হইয়া থাকে; চর্ম-কোষগুলি রক্তের মধ্যে এমন কিছু পদার্থ ক্ষরণ করে যেগুলি স্নায়ুতন্ত্র ও অন্যান্য দেহযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের উপর অধিকতর প্রভাব সৃষ্টি করিয়া থাকে।

হরমোন (Hormones) **:**

পরিপাক প্রসূত পদার্থগুলি বিভিন্ন মাত্রায় রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জীবদেহে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে এমনি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে যে রক্তে ইহাদের উপস্থিতি জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। এই বস্তুগুলিকে হরমোন বলা হয়।†

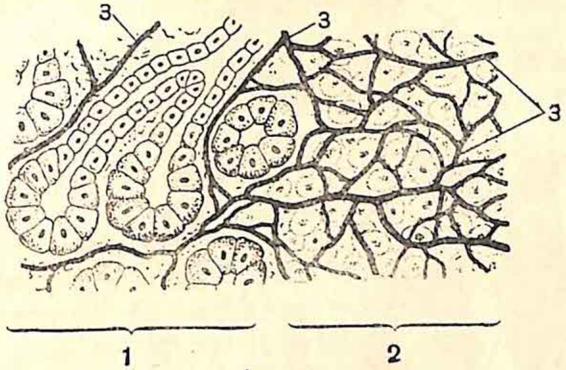
সাধারণত হরমোনগুলি অতীব সক্রিয় পদার্থ। রক্তে ইহাদের পরিমাণ নগণ্য এবং প্রায় অতীন্দ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও জীবদেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপর ইহাদের প্রভাব অসামান্য। এই ব্যাপারে হরমোনগুলি খাদ্যপ্রাণের সমতুল্য। অবশ্য মৌলিক পার্থক্যও আছে: খাদ্যপ্রাণ খাদ্যের সহিত জীবদেহে প্রবেশ করে, আর হরমোনগুলি জীবদেহেই জন্ম লয়। কতকগুলি খাদ্যপ্রাণ হরমোনের উপাদান গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

এ্যাড্রিনালিন ও এ্যাসিটিল-কোলিন নামক হরমোন দুইটি রক্ত সংবহনের রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করে। এই দুইটি হরমোনই বিশদভাবে অনুশীলন করা হইয়াছে: শুধু যে ইহাদের রাসায়নিক গঠন জানা গিয়াছে তাহা নয়, নানা বস্তুর সংমিশ্রণে (synthesis) ল্যাবরেটারির মধ্যে ইহাদের প্রস্তুত করা গিয়াছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্যান্য হরমোনও উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও কতকগুলি হরমোনের উপাদান ও গঠন সম্পর্কে এযাবৎ প্রায় কিছুই জানা যায় নাই। উদাহরণ স্বরূপ ডিয়োডিনের গাত্র হইতে ক্ষরিত অগ্ন্যাশয়ের রস ক্ষরণে সাহায্যকারী সিক্রেটিনের (secretin) নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

† গ্রীক্ শব্দ "হরমাও" (hormao) হইতে উদ্ভুত। ইহার অর্থ "আমি উত্তেজনা সৃষ্টি করি" বা "আমি জাগ্রত করি।"

বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা (বা ডাক্‌ট্‌হীন) গ্রন্থিঃ

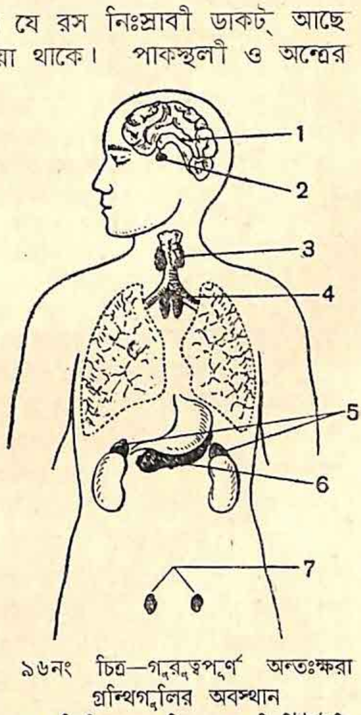


৯৫নং চিত্র—অগ্ন্যাশয়
১। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশ; ২। অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা অংশ; ৩। রক্তপ্রণালী

লালা, পাকস্থলী এবং স্বেদ গ্রন্থিসমূহের যে রস নিঃস্রাবী ডাকট্ আছে তাহা দ্বারাই ইহাদের ক্ষরিত রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের রস অন্ত্রনালী মধ্যেই নিঃসৃত হয়; স্বেদ এবং চর্ম-তৈল দেহ গাত্রের উপরিভাগে নিঃসৃত হইয়া থাকে। যে সকল গ্রন্থির রসনিঃস্রাবী ডাক্ট থাকে, তাহাদেরকে বহিঃক্ষরা (বহির্দেশে রস ক্ষরণকারী) গ্রন্থি বলা হয় (exocrine glands)।

যে-সকল গ্রন্থিতে হরমোন সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে বলা হয় (endocrine) বা ডাক্টহীন গ্রন্থি। এই গ্রন্থিগুলির রসনিঃস্রাবী ডাক্ট নাই; ইহাদের ক্ষরিত রস সরাসরি রক্তে ও লসিকায় নিঃসৃত হয়।

অনুবীক্ষণের সাহায্যে অগ্ন্যাশয়টি পরীক্ষা করিলে অবিলম্বেই অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির গঠনের তারতম্য বোঝা যাইবে (৯৫নং চিত্র)। এই যন্ত্রটির কোন কোন নিঃসরণকারী ডাক্ট আছে এবং এই স্থানে অগ্ন্যাশয় রস উৎপন্ন হইয়া ডিয়োডিনামে চলিয়া যায়। দ্বৈপিক (islets) নামক অন্য অংশটি অন্তঃক্ষরা। দ্বৈপিক অংশে কোন ডাক্ট নাই, কিন্তু প্রচুর সংখ্যক রক্ত প্রণালীতে ভরা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের কোষসমূহ হইতে ক্ষরিত ইনসুলিন নামক হরমোন চিনিকে জান্তব শর্করা বা গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হইতে সাহায্য করে এবং ইহা সরাসরি রক্তে চলিয়া যায়।



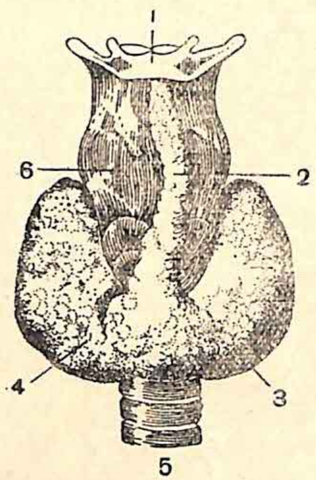
৯৬নং চিত্র—গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির অবস্থান
১। পিনিয়াল বডি; ২। পিটিউটারি গ্রন্থি; ৩। থাইরয়েড গ্রন্থি; ৫। সুপ্রারিনাল গ্রন্থি; ৬। অগ্ন্যাশয়; যৌন গ্রন্থি।

৯৬নং চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির অবস্থান দেখান হইয়াছে।

৫৪। গলগ্রন্থি বা থাইরয়েড (Thyroid)

গলগ্রন্থির অবস্থান ও গঠনঃ

যে-সমস্ত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির বিশদ অনুশীলন হইয়াছে, গলগ্রন্থি বা থাইরয়েড তাহাদের অন্যতম। ইহা গ্রীবাদেশে স্বর-যন্ত্রের থাইরয়েড তরুণাস্থির কিছু নীচে অবস্থিত (৯৭নং চিত্র)। এই গ্রন্থির দলবদ্ধ কোষ সমষ্টি থলির (alveoli) আকারে সজ্জিত থাকে; কিন্তু লালা গ্রন্থির থলিগুলির ন্যায় ইহাদের কোন রস-নিঃস্রাবী ডাক্ট নাই। এই থলিগুলির মধ্যে আঠাল শ্লেষ্মা জাতীয় যে তরল পদার্থ থাকে তাহাতেই থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন পাওয়া যায়। বিভিন্ন লোকের থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণে তারতম্য থাকে; কোন কোন লোকের থাইরয়েড গ্রন্থি অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার কার্যকলাপ অপ্রতুল। যে সমস্ত রোগীর থাইরয়েড গ্রন্থি যথোপযুক্ত-ভাবে ক্রিয়াশীল নয়, তাহাদের উপর অনুশীলন চালাইয়া, এবং পশুদের থাইরয়েড অপসারণ করিয়া বা জোড়া লাগাইয়া (grafting) জীবদেহে এই গ্রন্থির ভূমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে।



৯৭নং চিত্র—মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থি
১। হাওয়েড অস্থি; ২। থাইরয়েড গ্রন্থির মধ্যাংশ; ৩-৪। দক্ষিণ ও বাম অংশ; ৫। শ্বাসনালী; ৬। থাইরয়েড তরুণাস্থি

অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল থাইরয়েডঃ

কোন কোন লোকের থাইরয়েড গ্রন্থি অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়া অত্যধিক পরিমাণে হরমোন উৎপন্ন করে। সঞ্চিত তরল পদার্থে পূর্ণ হওয়ায় থলিগুলি অত্যন্ত প্রসারিত হয় এবং ফলে গ্রন্থিটি আকারেও বড় হইয়া যায়। থাইরয়েড গ্রন্থির অতিরিক্ত ক্রিয়ার ফলে **'বাসেদোর ব্যাধি'** (Basedow's disease) নামক অতি গুরুতর ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বাসেদোর ব্যাধিতে পরিপাক ক্রিয়ার তীব্রতা প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায়। রোগী শান্তভাবে শুইয়া থাকিলেও অক্সিজেনের প্রয়োজন পরিমাণে বাড়িয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন তীব্র এবং অত্যন্ত দ্রুত হইয়া পড়ে। রোগী সর্বদাই উত্তেজিত হইয়া থাকে, সব ব্যাপারেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়, সহজেই মেজাজ খারাপ হয় এবং সাধারণত অনিদ্রায় ভুগিতে থাকে; চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিকভাবে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে, পেশীগুলি ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়ে, দ্রুত ওজন হ্রাস পায় এবং ফলে সম্পূর্ণ অশক্ত অবস্থা সৃষ্টি হইয়া থাকে।

থাইরয়েড গ্রন্থির অপ্রতুল কার্যকলাপঃ

থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোনের একটি উপাদান হইল আয়োডিন। পানীয় জলে এবং খাদ্যে যে সামান্য পরিমাণ আয়োডিন থাকে, তাহা থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যকলাপের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া

উরাল, ককেশাস ও মধ্য এসিয়ার পার্বত্য এলাকায় মাটি ও জলে—এবং স্বভাবতই উদ্ভিদে আয়োডিন নাই বলিলেই চলে; ফলে এই সব এলাকার অধিবাসীদের দেহে আয়োডিনের অভাব দেখা যায়।

আয়োডিনের অভাব ঘটিলে থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকলাপ বাড়িয়া যায়। গ্রন্থি কোষগুলি আকারে বৃদ্ধি পায় এবং কোষ নিঃসৃত শ্লেষ্মা সদৃশ তরল পদার্থের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া থলিগুলি প্রসারিত হইয়া পড়ে। ফলে গলগণ্ড (goitre) সৃষ্টি হয় এবং গ্রন্থির ওজন বাড়িয়া কোন কোন সময় ৪।৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হইতে পারে।

গ্রন্থিটি প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাইলেও ইহা হইতে নিঃসৃত হরমোনের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি না পাইয়া বরং কিছুটা কমিয়া যায়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গলগণ্ডের সহিত অন্য কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখা যায়না।

কখনও কখনও গ্রন্থিটি সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। ইহার ফলে শ্লেষ্মা-স্ফীতি বা **মিকস-ঈডিমা** (mucus oedema or myxoedima) নামক ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুরা বৃদ্ধিহীন হয়। চর্ম নিম্নস্থ সংযোজক কলাসমূহ স্ফীত হইয়া ক্ষয় পাইতে থাকে এবং চর্ম স্ফীতাকার দেখায়। চক্ষু দুইটি অতি সামান্যই উন্মীলিত থাকে, মুখ বিবর বড় হইয়া যায় এবং জিহ্বাটি প্রায়ই বাহির হইয়া আসে। সমগ্র দেহের কার্যকলাপ অস্বাভাবিকভাবে মন্থর হইয়া যায়; হৃৎস্পন্দনও সুস্থ মানুষের তুলনায় মন্থর হয়, দেহের তাপ কমিয়া আসে, পাচন ক্রিয়া শ্লথ হইয়া পড়ে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি বিকলাঙ্গ ও বুদ্ধিহীন এবং অকর্মণ্য হইয়া থাকে। ইহারা অধিক দিন জীবিত থাকে না, অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্রাপ্ত বয়স্ক কোন লোকের শ্লেষ্মা-স্ফীতি (mucus oedema) হইলে দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত না হইলেও আক্রান্ত শিশুদেহে দৃষ্ট অন্য লক্ষণগুলি প্রায় একই রকম হইয়া থাকে। অস্বাভাবিক মেদ বাহুল্য হইতে পারে, মুখ ও শরীর স্ফীত হইয়া উঠিতে পারে, উচ্চ স্তরের স্নায়বিক ক্রিয়া কলাপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতে পারে; রোগী সব ব্যাপারে আকর্ষণ হারাইয়া ফেলে, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং মানসিক ক্রিয়া কলাপ যথেষ্ট হ্রাস পায়।

থাইরয়েড গ্রন্থির অপসারণ ও পুনঃস্থাপন (grafting) ঃ

পশুদের—যেমন কুকুরের থাইরয়েড গ্রন্থি অপসারণ করিলে প্রাপ্তবয়স্কদের মিকস-ঈডিমা বা শ্লেষ্মা-স্ফীতির অনুরূপ লক্ষণ দেখা যায়। পশুটি নিস্তেজ ও শ্লথগতিসম্পন্ন হইয়া পড়ে, দেহ স্ফীত হইয়া ওঠে, ক্ষুধা-মান্দ্য হয়, এ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা সুরু হইয়া যায় এবং সমগ্র জীবদেহটি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অল্পবয়স্ক পশুর থাইরয়েড অপসারণ করিলে উপরিউক্ত উপসর্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হয় (৯৮নং চিত্র)।



৯৮নং চিত্র—একই প্রসবে জন্ম দুইটি প্রাপ্তবয়স্ক কুকুর
বামদিকের কুকুরটির তিনমাস বয়সে থাইরয়েড গ্রন্থি অপসারণ করা হইয়াছে

কিন্তু থাইরয়েড অপসারণের সময় ইহার কিছু অংশ রাখিয়া দিলে, সে অংশ যত সামান্যই হউক না কেন, উপরে বর্ণিত লক্ষণগুলি দেখা দিবে না, অথবা দেখা দিলেও অত্যন্ত মৃদু ধরণের হইবে।

অপসারণের পর সমজাতীয় অথবা প্রায় সমজাতীয় কোন পশুর থাইরয়েড হইতে কিছু অংশ পুনরায় জোড়া লাগাইয়া দিলে (graft) উপরিউক্ত লক্ষণগুলি অদৃশ্য হইবে। পুনঃস্থাপিত থাইরয়েডের অংশটুকু সংযোজিত হইয়া স্বাভাবিক ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিতে থাকে। এই পুনঃস্থাপিত অংশটি অপসৃত অথবা অন্য কোন স্থানে জোড়া লাগান হইবে তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না; অনেক সময় উদর গহ্বরেও থাইরয়েড জোড়া লাগান হইয়া থাকে।

দৈহিক বৃদ্ধিতে থাইরয়েডের প্রভাবঃ

দৈহিক বৃদ্ধিতে থাইরয়েড নিঃসৃত হরমোন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে। ব্যাঙাচির থাইরয়েড অপসারণ করিলে ইহার রূপান্তর অর্থাৎ ব্যাঙের দেহে পরিণত হওয়া যথেষ্ট ব্যাহত হয়। অপর পক্ষে ব্যাঙাচি অধ্যুষিত জলে থাইরয়েড মিশ্রিত করিলে এই রূপান্তর প্রচুর ত্বরান্বিত হইয়া থাকে।

কোন কোন ঋতুতে কোন কোন জীবদেহে যে পরিবর্তন দেখা যায় (যেমন সরীসৃপের খোলস ছাড়া বা পাখীর পালক পড়া ইত্যাদি), সেগুলি থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোনের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল।

থাইরয়েড গ্রন্থির ব্যাধির চিকিৎসাঃ

থাইরয়েডের কার্যকলাপ অপ্রতুল হইলে দেহমধ্যে হরমোন প্রয়োগ করা হয়। পশুদের থাইরয়েড গ্রন্থি চূর্ণ করিয়া গুঁড়া অথবা বটিকা রূপে ইহা খাইবার জন্য





৯৯নং চিত্র—"বাসদেও ব্যাধি"গ্রস্তা মহিলা ১০০নং চিত্র—ঐ মহিলাটির থাইরয়েড গ্রন্থি আংশিকভাবে অপসারণ করার পরবর্তী অবস্থা

দেওয়া হয়। কিন্তু ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে যেমন সর্বদাই চশমা পরিতে হয়, খঞ্জকে যেরূপ ক্রাচ্ ব্যবহার করিতে হয়, ঠিক অনুরূপভাবে থাইরয়েড ব্যাধিগ্রস্ত লোককেও জীবনভোর ঔষধ সেবন করিতে হইবে।

কখনও কখনও সদ্যমৃত মানুষের কিংবা মানুষের প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত বানরের থাইরয়েড অথবা ইহার অংশ বিশেষ রোগীর দেহে জোড়া লাগাইয়া অস্থায়ী সুফল

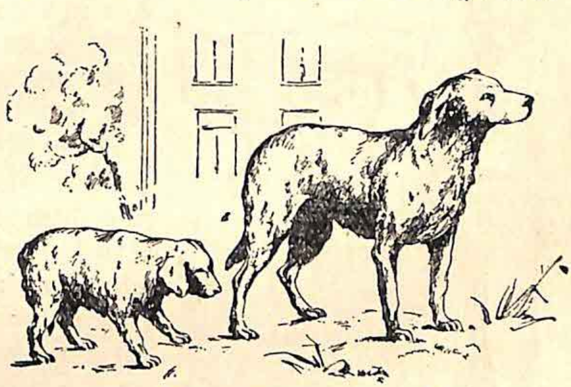
পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনঃস্থাপিত গ্রন্থিটি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং কয়েক মাসের মধ্যেই ব্যাধির লক্ষণগুলির পুনরাবির্ভাব হয়।

থাইরয়েড অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হইলে গ্রন্থিটি অথবা ইহার অংশবিশেষ অপসারিত করিলে অত্যধিক হরমোন প্রসূত উপসর্গগুলি দূর হইয়া যায় (৯৯ ও ১০০নং চিত্র)।

৫৫। *পিটুইটারি গ্রন্থি* (বা Hypophysis)

পিটুইটারি গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের নিম্নদেশে অপটিক্ স্নায়ুর (চক্ষুর) নির্গমন পথের অনতিদূরে অবস্থিত। পরিপাক সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি হরমোন পিটুইটারি গ্রন্থিতে উৎপন্ন হয়।

ইহাদের মধ্যে একটি হরমোন তরুণ জীবদেহের বৃদ্ধি, বিশেষ করিয়া অস্থির বৃদ্ধিকে প্রভাবান্বিত করে (১০১নং চিত্র)। পিটুইটারি গ্রন্থির অপ্রতুল ক্রিয়া-কলাপের ফলে শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হইয়া থাকে। এই প্রতিবন্ধক এত বেশী হইতে পারে যে প্রাপ্ত বয়সেও দেহের উচ্চতা স্বাভাবিক উচ্চতার অর্ধেক—অর্থাৎ ৭০ বা ৮০ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত হইতে পারে। এইরূপ অস্বাভাবিক খর্ব লোককে **বামন** বলা হয় (১০২নং চিত্র)।



১০১নং চিত্র—একই প্রসবে জন্ম দুইটি কুকুর; বামদিকের কুকুরটির পিটিউটারি গ্রন্থি অপসারিত হইয়াছে

পিটুইটারি গ্রন্থি অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হইলে ঠিক বিপরীত লক্ষণ দেখা যাইবে। শিশুটি অস্বাভাবিক দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বিশাল-দেহী—এমনকি দুই মিটার বা ততোধিক দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই ধরণের বিশালাকৃতি লোক ২৬৫ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত দেখা গিয়াছে (১০২নং চিত্র)। কিন্তু এই অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও ইহারা সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশী শক্তিশালী হয় না—বরং দুর্বলই হইয়া থাকে।

প্রাপ্ত-বয়স্কদের পিটুইটারি গ্রন্থির অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে এ্যাক্রোমেগালি (acromegaly) নামক মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। দেহের বিভিন্ন অংশের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে হাত ও পা অস্বাভাবিক দীর্ঘ হয়, বক্ষ গহ্বর ফুলিয়া ওঠে, এবং মুখমণ্ডলের অস্থিগুলি, বিশেষত চোয়াল ও নাসিকা বড় হইয়া যায়। কখনও বা জিহ্বাটি এত বড় হইয়া যায় যে মুখের মধ্যে ধরিয়া রাখা যায় না।

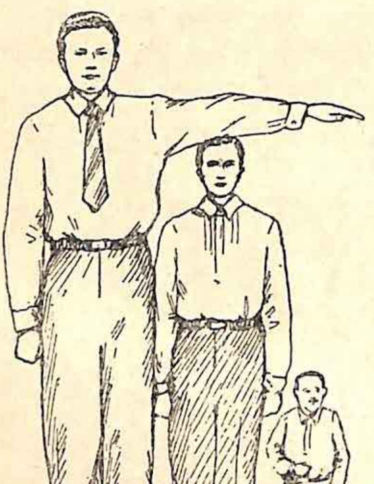
দেহটি বিকৃত হইয়া যায়; আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলিরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং প্রায়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

এই ব্যাধিতে আক্রান্ত গ্রন্থিটি অস্ত্রোপচার মারফৎ অপসারণে সুফল পাওয়া যায় নাই; রোগীর অবস্থার বরং অবনতিই ঘটে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যু হয়।

৫৬। যৌন গ্রন্থি

যৌন গ্রন্থির অপসারণ ঃ

পুরুষের যৌনগ্রন্থিকে **অণ্ডাধার** এবং স্ত্রীজাতির যৌনগ্রন্থিকে **ডিম্বাধার** (ovary) বলে। অণ্ডাধার (testes) এবং ডিম্বাধার রক্তের মধ্যে হরমোন ক্ষরণ করে এবং এইজন্য ইহাদিগকে নিশ্চিতরূপে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলা যাইতে পারে।



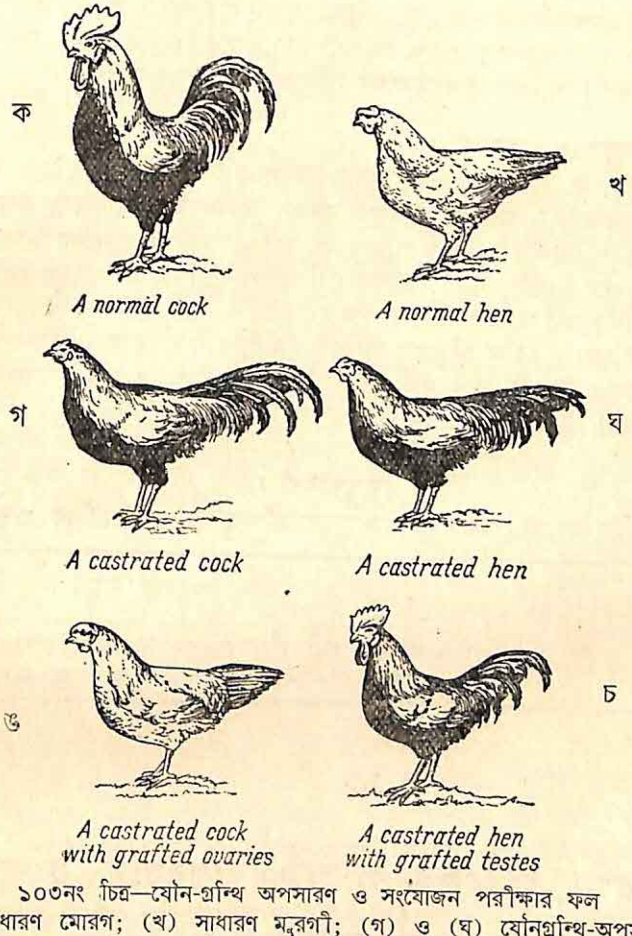
১০২নং চিত্র—বৃদ্ধির উপর পিটুইটারি গ্রন্থির প্রভাব; মধ্যস্থলে—গড়পড়তা উচ্চতা বিশিষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক লোক; বামে—পিটুইটারির অতিবৃদ্ধির ফলে অতিকায় ব্যক্তি; দক্ষিণে—পিটুইটারি গ্রন্থির ব্যাহত কার্যকলাপপ্রসূত বামন

যৌন গ্রন্থি সমগ্র জীবদেহের বৃদ্ধির উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে একথা বহু প্রাচীন কালের লোকেরাও জানিত। যৌনগ্রন্থির অপসারণ (castration) জীবদেহে বিরাট পরিবর্তন আনে।

কোন অপরিণত প্রাণীর যৌনগ্রন্থি অপসারণ করিলে তাহার দ্বিতীয় স্তরের যৌন-চরিত্রগুলি, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীজাতির দৈহিক গঠনের বিশেষত্বগুলি পরিস্ফুট হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কোন মোরগের যৌনগ্রন্থি অপসারণ করা হইলে তাহার স্বভাবসিদ্ধ পাখ্নাগুলির বিকাশ হয় না এবং শিখাও বড় হয় না। তেমনি কোন মুরগীর ডিম্বাধার অপসারণ করিলে মুরগীটি তাহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে এবং যৌনগ্রন্থিহীন মোরগের আকৃতি বিশিষ্ট হয় (১০৩নং চিত্র)। তাহাছাড়া যৌনগ্রন্থির অপসারণ প্রাণীদেহে প্রচুর মেদ বৃদ্ধি করে।

প্রাচীন কালে মানুষ অর্থনৈতিক কারণে জীবজন্তুর যৌনগ্রন্থি অপসারণ করিত। ষাঁড়ের অণ্ডাধার অপসারণ করিলে ষাঁড়টি শান্ত হইয়া যায় এবং তখন হইতে ইহাকে কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। চর্বিযুক্ত মাংস খাইবার জন্য মোরগ ও শূকরের যৌনগ্রন্থি অপসারণ করা হয়।

কোন কোন দেশে ধর্মাচরণের জন্য পুরুষের অণ্ডাধার অপসারণ করা হয় এবং ফলে এইসব লোক সারা জীবন বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। শৈশবে অস্ত্রোপচার করিলে দ্বিতীয় স্তরের যৌন-চরিত্রগুলি বিকশিত হইতে পারে না; শ্মশ্রু বা গুম্ফ প্রকাশ পায়না, কণ্ঠস্বর চিরকালই শিশুদের মত তীক্ষ্ম থাকিয়া যায়; অস্থি-কঙ্কাল—বিশেষত শ্রোণিচক্র শিশুদের মত আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে; চর্মের নীচে প্রচুর মেদ সঞ্চিত হয়। যৌনগ্রন্থির অপসারণ উচ্চস্তরের স্নায়ুতন্ত্রের



১০৩নং চিত্র—যৌন-গ্রন্থি অপসারণ ও সংযোজন পরীক্ষার ফল
(ক) সাধারণ মোরগ; (খ) সাধারণ মুরগী; (গ) ও (ঘ) যৌনগ্রন্থি-অপসারিত মোরগ ও মুরগী; (ঙ) ডিম্বকোষ প্রযুক্ত যৌনগ্রন্থি-অপসারিত মোরগ; (চ) অণ্ডকোষ প্রযুক্ত যৌনগ্রন্থি-অপসারিত মুরগী।

উপরেও প্রচুর প্রভাব সৃষ্টি করে, এবং সমগ্র ব্যবহারেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। শৈথিল্য ও অলসতা এবং নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দেয়। উদ্দীপনা ও সক্রিয় চিন্তাশক্তি চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যায়।

যৌন গ্রন্থি জোড়া লাগানঃ

অপসারিত যৌন গ্রন্থি বিশিষ্ট প্রাণী দেহে বিপরীত লিঙ্গের যৌন-গ্রন্থি

জোড়া লাগাইয়া দ্বিতীয় স্তরের যৌন চরিত্রের বিকাশের উপর এই গ্রন্থিগুলির প্রভাব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা যায় (১০৩নং চিত্র)। যৌনগ্রন্থি অপসারিত মোরগের দেহে ডিম্বাধার জোড়া লাগাইলে মোরগটির স্ত্রীসুলভ দ্বিতীয় স্তরের যৌন চরিত্র প্রকাশ পাইবে এবং দেখিতে মুরগীর মত হইয়া যাইবে; অপরপক্ষে যৌনগ্রন্থিহীন মুরগীর দেহে অণ্ডাধার জোড়া লাগাইলে ইহাকে মোরগের মত দেখাইবে।

অন্যান্য পশুদেহেও এইরূপ কৃত্রিম "যৌন-রূপান্তর" সৃষ্টি করা গিয়াছে। এই পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত রূপে প্রমাণ হইয়াছে যে দ্বিতীয় স্তরের যৌন চরিত্রের বিকাশ যৌনগ্রন্থিগুলির অন্তঃক্ষরণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

যৌন গ্রন্থিসমূহের হরমোন :

অণ্ডাধার ও ডিম্বাধারের হরমোন সম্পর্কে বিশদ অনুশীলন হইয়াছে। উভয়েরই রাসায়নিক গঠন প্রায় একই রকম। অবশ্য পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমাণ হইয়াছে যে, জীবদেহের উপর পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় হরমোনের ক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক এবং প্রত্যেকেই নিজ লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দ্বিতীয় স্তরের যৌন চরিত্রগুলিকেই বিকশিত হইতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় স্তরের যৌন চরিত্রের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও ডিম্বাধার এমন একটি হরমোন উৎপন্ন করে যাহা স্বাভাবিক গর্ভাবস্থা ও স্তন-গ্রন্থির বিকাশেও সাহায্য করিয়া থাকে।

অনুশীলনী :

নীচের চিত্রটির সাহায্যে তোমার জানা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত কর :

গ্রন্থির নাম	জীবদেহে পরিবর্তনের লক্ষণ	
	অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল গ্রন্থিতে	অপ্রতুল ক্রিয়াশীল গ্রন্থিতে অথবা গ্রন্থি অপসারণ করিলে

৫৭। অন্তঃক্ষরা বা ডাক্টহীন গ্রন্থগুলির গুরুত্ব

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক :

প্রতিটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি রক্তের মধ্যে নিজের ক্রিয়াকলাপপ্রসূত পদার্থ ক্ষরণ করিয়া পরিপাক-ক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। এই কাজ করিবার সময় বিভিন্ন গ্রন্থি পরস্পরের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং এইভাবে একটি ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, পিটুইটারি গ্রন্থির একটি হরমোন যৌন গ্রন্থিসমূহের কার্যকলাপ বাড়াইয়া দেয়; পিটুইটারি গ্রন্থি অপসারিত করিলে যৌন-হরমোনের উৎপত্তি দ্রুত কমিয়া যায়। অপরপক্ষে যৌনগ্রন্থিসমূহের হরমোনগুলি পিটুইটারি গ্রন্থির কার্যকলাপকে কমাইয়া দেয়।

ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, যৌন গ্রন্থিগুলি এবং থাইরয়েড পরস্পরের উপর কাজ করিয়া থাকে; তাহা ছাড়া থাইরয়েড় গ্রন্থির কার্যকলাপ পিটুইটারি গ্রন্থির অন্যতম হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

জৈবিক-ক্রিয়াকলাপের রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ যে কত জটিল উপরে বর্ণিত উদাহরণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি তাহাদের হরমোন দ্বারা বিভিন্ন দেহযন্ত্রের কার্যকলাপকে এবং পরস্পরকেও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

কোন গ্রন্থি বিনষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থির কার্যকলাপও ব্যাহত হইবে। ইহার ফলে জীবদেহে কতকগুলি পরিবর্তন আসিবে এবং বিভিন্ন ধরণের জটিল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে।

অন্তঃক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ ঃ

অন্যান্য দেহযন্ত্রের মতন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিও স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগামী কোন স্নায়ু উত্তেজিত হইলে ইহার হরমোন ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ ভেগাস্ স্নায়ু উত্তেজিত হইলে রক্তের মধ্যে অগ্ন্যাশয়প্রসূত ইন্সুলিনের ক্ষরণ তীব্রতর হয়। এই প্রতিক্রিয়াগুলি প্রতিবর্তনপ্রসূত।

সপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা দ্বারা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কার্যকলাপে যে পরিবর্তন হয়, তাহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, এই গ্রন্থিগুলির কার্যকলাপ গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

অপরদিকে মস্তিষ্কের উপর, বিশেষত গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের উপর হরমোনের (যেমন থাইরয়েডের) প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যগুলি বহুকাল আগেই জানা গিয়াছে। অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অবশ্য স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকাই প্রধান। স্নায়ুতন্ত্র, বিশেষ করিয়া গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের নিকট অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির এই অধীনতার ফলে জীবদেহের পক্ষে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লওয়া সহজ হয়।

হরমোনের ব্যবহারিক প্রয়োগ :

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অনুশীলনে বিরাট সাফল্যের ফলে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভবপর হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ থাইরয়েড গ্রন্থির নিষ্ক্রিয়তাপ্রসূত ব্যাধির উপসর্গগুলি নিয়মিতভাবে এই গ্রন্থিচূর্ণ সেবনে সম্পূর্ণ দূর হইতে পারে।

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন হরমোনের ব্যবহার কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কতকগুলি হরমোন জীবদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া অথবা কোন কোন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি অপসারণ করিয়া আমরা বিশেষ কোন প্রাণীর দৈহিক বিকাশকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ যৌনগ্রন্থির অপসারণ পশুদেহে প্রচুর মেদ সৃষ্টি করিতে এবং ইহাকে শান্ত ও অনুগত করিতে পারে। হরমোন প্রয়োগ দ্বারা পশুর বৃদ্ধিকে তীব্রতর করা যায়, চর্বিযুক্ত মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, এবং ডিমপাড়া বা ডিমের গুণ উন্নত করা যায়। হরমোন পশুর গর্ভধারণ ক্ষমতা, এবং পালক ও পশম ইত্যাদির বৃদ্ধিকেও প্রভাবান্বিত করে।

১০। স্নায়ু-তন্ত্র

৫৮। স্নায়ু-তন্ত্রের গুরুত্ব

পরিবেশের প্রতি জীবদেহের প্রতিক্রিয়া :

বাহিরের পরিবেশের সহিত পারস্পরিক সম্পর্ক না থাকিলে জীবদেহের অস্তিত্বই থাকিত না। জীবদেহের চারিপাশে যে সব বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, সেগুলি যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে জীবদেহে সেই সব পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়া যে-সমস্ত দেহযন্ত্র প্রত্যক্ষ-ভাবে নির্দিষ্ট কোন উত্তেজনার অধীন হইয়াছে শুধু সেইগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সমগ্র জীবদেহে ছড়াইয়া পড়ে। অকস্মাৎ কোন মোটরগাড়ীর হর্ণ শুনিলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংবেদনশীল কোষগুলি উত্তেজিত হইয়া পড়ে; কিন্তু এই শব্দের প্রতিক্রিয়া খুব জটিল হইতে পারে; শ্রোতা বিশেষ ধরনের অঙ্গ-সঞ্চালন দ্বারা এই প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছে, লোকটি সেই দিকে ঘুরিতে পারে, হৃৎ-স্পন্দন বাড়িয়া যাইতে পারে, কিংবা পাচন-রসের ক্ষরণে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। পাচন ও শ্বসন তন্ত্র অনুশীলনের সময় সমগ্র জীবদেহে এই ধরনের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

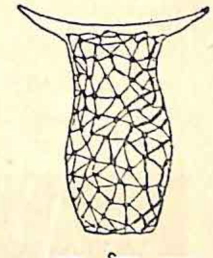
দেহস্থ তরল পদার্থগুলির মাধ্যমে অর্থাৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতেও জীব-দেহে এই ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে। চর্মের উপর অতি-বেগুনী রশ্মির প্রভাবে উদ্ভূত পদার্থগুলি রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন দেহযন্ত্রের পরিপাক-ক্রিয়াকে তীব্রতর করে। অবশ্য বাহিরের পরিবেশের পরিবর্তনে জীবদেহের বিভিন্ন ধরনের এবং ত্বরিত প্রতিক্রিয়া এইভাবে ঘটে না। ইহার জন্য স্নায়ুতন্ত্রের অংশ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। ঐ একই অতি-বেগনি রশ্মি চর্মের স্নায়ুসূত্রগুলিকে উত্তেজিত করিলে উত্তেজনার তাড়নাগুলি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে চলিয়া যায় এবং তথা হইতে বহির্মুখী স্নায়ুতন্তু মারফৎ বিভিন্ন দেহযন্ত্রে ছড়াইয়া পড়িয়া ইহাদের কার্যকলাপে পরিবর্তন আনে।

উচ্চস্তরের জীবদের, বিশেষত মানুষের ক্ষেত্রে বাহিরের পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে স্নায়ুতন্ত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমেই জীব পার্থিব পরিবেশের এবং জীবনধারণের চিরপরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে।

স্নায়ুতন্ত্রের সাধারণ গঠন :

স্পঞ্জ ভিন্ন অন্য সমস্ত একাধিক কোষযুক্ত জীবের স্নায়ুতন্ত্র আছে' কোয়েলেন্‌টেরেটা (coelenterata) জাতীয় প্রাণীর (যেমন জলজ সাপ)

স্নায়ুতন্ত্র সারা দেহে জালিকার ন্যায় পরিব্যাপ্ত এবং উদ্গত অংশের দ্বারা সংযুক্ত কোষসমূহের দ্বারা গঠিত (১০৪নং চিত্র)। এই ধরনের স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনাগুলি চারিদিকে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে; সুতরাং শরীরের যে-কোন অংশে উত্তেজনা দান করিলে একটিমাত্র পেশী-উদ্দীপক (motor) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়—অর্থাৎ সমস্ত পৈশীক কোষগুলি উত্তেজিত হইয়া পড়ে। এই কারণে জলজ শ্বাপদের ব্যবহারও এক এবং সম জাতীয়।



১০৪নং চিত্র—জলজ সাপ 'হাইড্রা'র স্নায়ুতন্ত্র

জীব-জগতের বিকাশের অনুপাতে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের পরিবর্তন এবং জটিলতার বৃদ্ধি হইয়াছে; অপরদিকে স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহের প্রতিক্রিয়াও ক্রমশ বেশী জটিল ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়াছে।

মানুষ এবং অন্যান্য সমস্ত মেরুদণ্ডী জীবদের একটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং একটি প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (peripheral) আছে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র একটি প্রকাণ্ড স্নায়বিক কলার সমষ্টি, এবং মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) ও করোটির অন্তঃস্থিত **মস্তিষ্ক** (brain) দ্বারা গঠিত।

দেহযন্ত্রসমূহের কার্যকলাপের সমন্বয় :

স্নায়ুতন্ত্রের অংশ গ্রহণের জন্যই জীবদেহের সমস্ত প্রতিক্রিয়া সব সময়ই পরস্পর-সংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কতকগুলি মাংসপেশীর সম্মিলিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকলাপের ফলেই বাহু কনুইতে ভাঁজ (flex) হইতে বা বাঁকিতে পারে। ভাঁজ-ক্রিয় (বা flexor) পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়; তাহাছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি পেশী বিশেষ এক নির্দিষ্ট শক্তিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; সঙ্গে সঙ্গে প্রসারণের পেশীগুলি (extensors) শ্লথ অর্থাৎ প্রসারিত হয় এবং প্রত্যেকের প্রসারণও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্ধারিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু প্রতিটি পেশীর অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রক্তপ্রণালীগুলি সঙ্কুচিত অথবা প্রসারিত হইয়া থাকে। ফলে, বাহু ভাঁজ করা বা বাঁকানর মত একটি অতি সহজ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহে একটি সমষ্টিগত এবং পরস্পর সংবদ্ধ ও সমন্বয়পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইবে।

স্নায়ুতন্ত্র সমস্ত দেহযন্ত্রের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং জীবদেহের প্রয়োজন অনুসারে প্রতিনিয়তই মানাইয়া লইতে সাহায্য করে। ফলে, শুধু পেশী সঙ্কোচনের ক্ষেত্রে নয়, আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলির কার্যকলাপেও পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হয়।

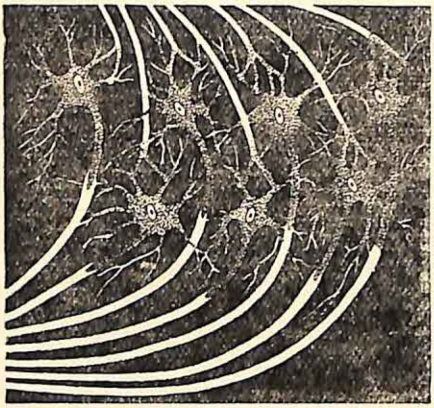
জাগতিক পরিবেশ উপলব্ধি করিতে মস্তিষ্কের ভূমিকা :

স্নায়ুতন্ত্র এবং বোধোদ্দীপক যন্ত্রগুলির মাধ্যমেই মানুষের অনুভূতি এবং বহির্জাগতিক উপলব্ধি বা জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। মানুষের সমস্ত চিন্তাধারা এবং ব্যবহার স্নায়বিক কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট। এঙ্গেল্স্-এর ভাষায় চিন্তা ও সচেতনতা "মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত।"

৫৯। স্নায়ুর গঠন ও উপাদান

স্নায়ুতন্তু :

একটি স্নায়ু বা নিউরণ (neuron) নিম্নলিখিত অংশগুলি দ্বারা গঠিত—**কোষদেহ** (body of the cell), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্গত অংশ বা **ডেনড্রাইট্** এবং সাধারণত একটি দীর্ঘ উদ্গত অংশ বা **এ্যাক্সন** (axon)। শেষোক্ত দীর্ঘ উদ্গত অংশ বা এ্যাক্সন এবং ইহার আবরণীকে স্নায়ুতন্তু বলা হয়।



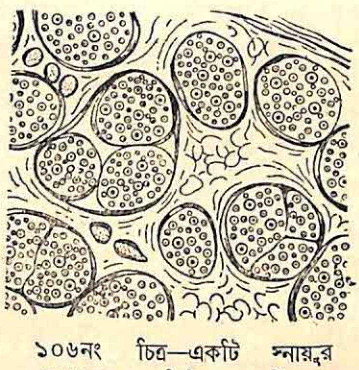
১০৫নং চিত্র—স্নায়ুকোষ (ধূসর-পদার্থ) এবং স্নায়ুতন্ত্র (শ্বেত-পদার্থ)

মস্তিষ্ক ও সুষুম্না-কাণ্ডকে প্রস্থচ্ছেদ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের কোন কোন অংশের রং গাঢ় এবং কোথাও বা অপেক্ষাকৃত হাল্কা ; এই গাঢ় ও হাল্কা রং-এর অংশকে যথাক্রমে **ধূসর-পদার্থ** (white matter) বলা হয়। (grey matter) ও শ্বেত-পদার্থ হয়। ধূসর-পদার্থ প্রধানত স্নায়ুকোষ দ্বারা গঠিত। এইসব কোষ হইতে নির্গত শ্বেতাবরণী দ্বারা আবৃত স্নায়ুতন্তুগুলি সম্মিলিতভাবে একটি নিবিড় পিণ্ড সৃষ্টি করিয়া শ্বেত-পদার্থ গঠন করে (১০৫নং চিত্র)।

স্নায়ুর গঠন :

প্রচুরসংখ্যক স্নায়ুতন্তু মিলিতভাবে একটি স্নায়ু গঠন করে; এই স্নায়ু-তন্তুগুলির শ্বেতকায় আবরণীর ঘনত্বের যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। ভিন্ন ভিন্ন তন্তুগুচ্ছ এবং সমগ্রভাবে স্নায়ুটি সংযোজক কলার একটি আবরণী দ্বারা ঢাকা থাকে (১০৬নং চিত্র)।

স্নায়ুতন্তুর প্রান্তদেশের সামান্য উপরে আবরণীটি শেষে হইয়া যায় এবং সেখান হইতে তন্তুটি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পেশীতন্তু, গ্রন্থি বা অন্যান্য দেহযন্ত্রের কোষ অথবা অপর একটি স্নায়ুর ডেনড্রাইট্ পর্যন্ত চলিয়া যায়।



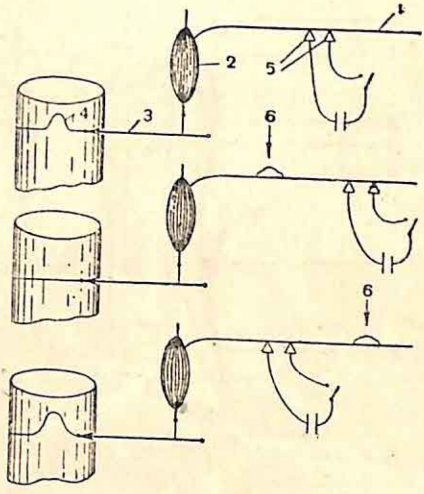
১০৬নং চিত্র—একটি স্নায়ুর প্রস্থচ্ছেদ; বিভিন্ন পরিসরের স্নায়ুতন্তুগুচ্ছ দেখা যাইতেছে।

স্নায়ুপথে উত্তেজনার পরিবহন :

উত্তেজনার পরিবহন করাই (conduction) স্নায়ু-কলার প্রধান চরিত্র।

একটি ব্যাঙের দেহ হইতে স্নায়ু সমেত এক টুকরা পেশী কাটিয়া লইয়া তাহাতে

উত্তেজনা দান করিলে (বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক বা দৈহিক) পেশীটি সঙ্কুচিত হইবে। স্নায়ুতে উদ্ভূত উত্তেজনা সমগ্র স্নায়ুদেহে পরিবাহিত হইয়া স্নায়ুপ্রান্ত হইতে পেশীতে পরিচালিত হয় বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুদেহের কোন অংশ এ্যাল্‌কহল বা ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ দ্বারা অচেতন করিয়া দিলে অথবা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিলে আহত অংশ দিয়া উত্তেজনা প্রবাহিত হইতে পারে না; স্নায়ুর আহত অংশ এবং পেশীর মধ্যবর্তী স্থানে উত্তেজনা দান করিলে তবেই পেশীটি উত্তেজিত হইবে (১০৭নং চিত্র)।



১০৭নং চিত্র—স্নায়ুপথে উত্তেজনার পরিবহন
১। স্নায়ু; ২। পেশী; ৩। কিমোগ্রাফের রেখা চিত্রণের লিভার; ৪। কিমোগ্রাফের পেশী সংকোচন চিত্রিত হইয়াছে; ৫। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা স্নায়ুকে উত্তেজিত করার ইলেক্‌ট্রোড্; ৬। ক্লোরোফর্মে ভিজান তুলা স্নায়ুর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে; স্নায়ুর আহত অংশ দিয়া তাড়না প্রবাহিত হইতে পারিতেছে না।

উত্তেজনা পরিবহন একটি শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়া :

উত্তেজনা পরিবহন একটি অতি জটিল শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়া। পরিবাহক মারফৎ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ চলাচলের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। স্নায়ুপথে তাড়নাগুলি সেকেণ্ডে ২০ হইতে ৩০ বা ততোধিক মিটার পরিবাহিত হইতে পারে এবং মানবদেহে এই পরিবহনের হার ১০০ হইতে ১২০ মিটার পর্যন্ত উঠিতে পারে। কিন্তু বৈদ্যুতিক তরঙ্গ তারের উপর দিয়া আলোর গতিতে, সেকেণ্ডে প্রায় ৩০০০০০ কিলো হারে ছড়াইয়া পড়ে।

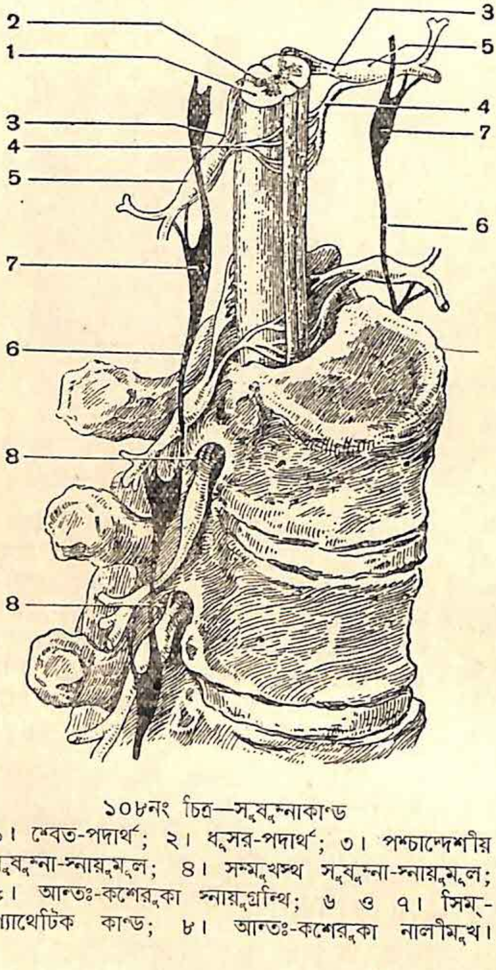
উত্তেজনার প্রক্রিয়া বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অপেক্ষা ধীর গতিতে পরিব্যাপ্ত হইলেও স্নায়বিক তাড়নার গতি এমনভাবে পরিবাহিত হয় যে, জীবদেহে ইহার প্রতিক্রিয়া এক সেকেণ্ডের কয়েক দশমাংশ এমনকি শতাংশ সময়েই অনুভূত হইতে পারে।

৬০। সুষুম্না কাণ্ড

সুষুম্নাকাণ্ডের গঠন :

সুষুম্নাকাণ্ডটি কশেরুকাসমূহের দেহগাত্র এবং অর্ধগোলাকৃতি খিলানগুলি দ্বারা গঠিত কশেরুকা গহ্বরের মধ্যে অবস্থান করে

(১০৮নং চিত্র)। একটি মোটা রজ্জুর ন্যায় ইহা কশেরুকা গহ্বরের মধ্য দিয়া প্রসারিত এবং দুইটি অবনমিত অর্ধনালী (fissure) দ্বারা দক্ষিণ ও বাম অংশে বিভক্ত।



১০৮নং চিত্র—সুষুম্নাকাণ্ড
১। শ্বেত-পদার্থ; ২। ধূসর-পদার্থ; ৩। পশ্চাদ্দেশীয় সুষুম্না-স্নায়ুমূল; ৪। সম্মুখস্থ সুষুম্না-স্নায়ুমূল; ৫। আন্তঃ-কশেরুকা স্নায়ুগ্রন্থি; ৬ ও ৭। সিম্প্যাথেটিক কাণ্ড; ৮। আন্তঃ-কশেরুকা নালীমুখ।

সুষুম্নাকাণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র আছে; ইহা মস্তিষ্ক পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই ছিদ্রটি লসিকার উপাদানের অনুরূপ তরল-পদার্থে পূর্ণ থাকে।

সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর ও শ্বেত-পদার্থ :

প্রচ্ছেদ করিলে দেখা যাইবে যে সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতরের অংশে থাকে ধূসর-পদার্থ এবং তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া আছে শ্বেত-পদার্থ।

ধূসর-পদার্থের যে সকল অংশ উত্তেজিত হইলে বিভিন্ন দেহযন্ত্র সক্রিয় হয়, সেইগুলিকে ঐ সমস্ত দেহযন্ত্রের **স্নায়ুকেন্দ্র** নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যচ্ছদার স্নায়ুকেন্দ্র গ্রীবাদেশে সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত; সুষুম্নাকাণ্ডের এই অংশটি নষ্ট হইলে মধ্যচ্ছদার সংকোচন বন্ধ হইয়া যাইবে। দেহকাণ্ড, উপরের এবং নীচের দেহপ্রান্তের (হাত ও পা) পেশীগুলির এবং বিভিন্ন দেহযন্ত্রে স্নায়ুকেন্দ্র সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর-পদার্থে অবস্থিত।

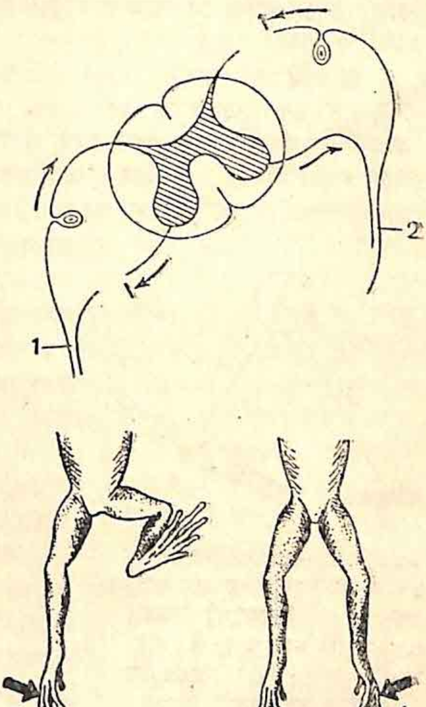
শ্বেত-পদার্থের প্রধান পিণ্ডটি স্নায়ুতন্তুসমূহ দ্বারা গঠিত; ইহারা সুষুম্নাকাণ্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রকে পরস্পরের সহিত যুক্ত করে এবং সুষুম্নাকাণ্ড হইতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরে অথবা মস্তিষ্ক হইতে সুষুম্নাকাণ্ডে পরিব্যাপ্ত। যে-সব স্নায়ুতন্তু মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরকে যুক্ত করে তাহাদিগকে **পরিবহন-পথ** বলা হয়। ইহাদের মাধ্যমেই স্নায়ু ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরের সহিত সংযোগ রক্ষা হয় এবং তাহার ফলে সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের পারস্পরিক সংযোগ ও

সমন্বয় সাধিত হয়। মস্তিষ্কই সুষুম্নাকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ড হইতে তাড়না গ্রহণ করিয়া নিজের ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করে।

সুষুম্না বা মেরু-স্নায়ু :

সুষুম্নাকাণ্ডের দক্ষিণে ও বামে প্রত্যেক জোড়া কশেরুকার অন্তর্বর্তী স্থল হইতে মেরুস্নায়ুগুলি নির্গত হইয়াছে। সর্বসমেত ৩১ জোড়া মেরুস্নায়ু আছে। প্রতিটি স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ড হইতে একটি সম্মুখ ও একটি পশ্চাদ্দেশীয় এই দুইটি মূল লইয়া বাহির হইয়া থাকে।

ধরা যাক মস্তকচ্যুত কোন ব্যাঙের দক্ষিণভাগের সম্মুখের (anterior) স্নায়ুমূল এবং বামভাগের পশ্চাদ্দেশীয় (posterior) স্নায়ুমূল কাটিয়া ফেলা হইল। এরূপ অবস্থায় দক্ষিণ দিকের পিছনের পা উত্তেজিত করিলে শুধু বাম দিকেই প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যাইবে, দক্ষিণ দিকটি অনড় বা নিষ্ক্রিয় থাকিবে। বাম দিকের পিছনের পা উত্তেজিত করিলে কোন প্রতিবর্তন-মূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে না (১০৯নং চিত্র)।



১০৯নং চিত্র—সুষুম্না-স্নায়ুমূলের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা (দক্ষিণ দিকের সম্মুখস্থ এবং বাম দিকের পশ্চাদ্দেশীয় সুষুম্না-স্নায়ুমূল ছেদ করা হইয়াছে)
১। দক্ষিণ দিকের পিছনের পায়ের স্নায়ু; ২। বাম দিকের পিছনের পায়ের স্নায়ু; ৩। দক্ষিণ পায়ের উত্তেজনা; ৪। বাম পায়ের উত্তেজনা

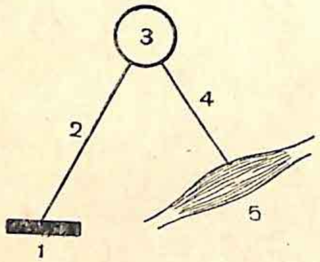
অর্থাৎ সম্মুখের স্নায়ুমূল (anterior roots) কাটিয়া দিলে চর্ম হইতে সুষুম্নাকাণ্ডে তাড়না পরিবহনের ব্যাঘাত হয় না বটে, কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ড হইতে পেশীতে পরিবহন বন্ধ হইয়া যায়। ইহা দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে, বহির্মুখী তাড়নাগুলি শুধু সম্মুখের স্নায়ুমূল দিয়াই প্রবাহিত হইতে পারে। পশ্চাদ্দেশীয় স্নায়ুমূল কাটিয়া দিলে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না-হওয়ার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অন্তর্মুখী তাড়নাগুলি পশ্চাদ্দেশীয় স্নায়ুমূল মারফৎ প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইজন্য সম্মুখের স্নায়ুমূলগুলিকে **চেষ্টিয় বা পেশী উদ্দীপক** বা **মোটর** (motor) মূল এবং পশ্চাদ্দেশীয় স্নায়ুমূলগুলিকে **বোধোদ্দীপক** বা **সংবেদীয়** (sensory) মূল বলা হয়।

সুষুম্নাকাণ্ড হইতে বাহির হইবার পর মূল দুইটি একত্রিত হইয়া স্নায়ু গঠন করে। সুতরাং সুষুম্নাকাণ্ড বা মেরুস্নায়ুগুলি **মিশ্র প্রকৃতির**—অর্থাৎ বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী উভয় ধরনের তন্তু দ্বারা গঠিত।

প্রতিবর্তনের চক্রপথ :

আগেই বলা হইয়াছে যে, কোন উত্তেজনার ফলে স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তাহাকে **প্রতিবর্তন-ক্রিয়া** বলে। প্রতিবর্তন-ক্রিয়া উদ্ভবকারী তাড়নাগুলি যে পথে প্রবাহিত হয় তাহাকে বলা হয় প্রতিবর্তনের চক্রপথ (reflex arc)।

প্রতিটি প্রতিবর্তন পথের পাঁচটি অংশ আছে (১১০নং চিত্র); প্রথমত, বোধোদ্দীপক যন্ত্রসমূহে এবং পেশী, অন্ত্র, ফুসফুস ও অন্যান্য দেহযন্ত্রস্থিত **তাড়না গ্রহণকারী স্নায়ুপ্রান্তসমূহ** (receptive nerve endings); দ্বিতীয় অংশ হইল অন্তর্মুখী স্নায়ু; তৃতীয়ত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অর্থাৎ সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্ক; চতুর্থ অংশে আছে বহির্মুখী স্নায়ু; পঞ্চম অর্থাৎ শেষ অংশ হইল উত্তেজনায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী দেহযন্ত্র—যেমন, কঙ্কালের পেশীসমূহ, হৃৎপিণ্ড, লালাগ্রন্থি ইত্যাদি।



১১০নং চিত্র—প্রতিবর্তনের চক্রপথ
১। ধারক স্নায়ুপ্রান্ত সহ দেহযন্ত্র; ২। অন্তর্মুখী স্নায়ু; ৩। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র; ৪। বহির্মুখী স্নায়ু; ৫। উত্তেজনায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী দেহযন্ত্র

সব থেকে সরল ধরনের প্রতিবর্তন পথেও কমপক্ষে দুইটি নিউরণ থাকিবে—একটি অন্তর্মুখী ও অপরটি বহির্মুখী।

অন্তর্মুখী নিউরণ (সমস্ত উদ্গত অংশসমেত স্নায়ুকোষ) :

অন্তর্মুখী নিউরণের কোষগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের পরিবর্তে পশ্চাদ্দেশীয় সুষুম্না-স্নায়ুমূলে অবস্থিত এবং এইখানে ইহারা আন্তঃকশেরুকা স্নায়ুগ্রন্থি (intervertebral ganglion) নামক স্ফীতি সৃষ্টি করে। এই নিউরণগুলির দুইটি করিয়া দীর্ঘ উদ্গত অংশ থাকে। ইহাদের একটি চর্ম, পেশী ইত্যাদিতে অবস্থিত সংবেদীয় স্নায়ুপ্রান্তসমূহ হইতে তাড়না বহন করিয়া কোষদেহে পরিচালিত করে; অপর উদ্গত অংশটি কোষদেহ হইতে তাড়না বহন করিয়া সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছাইয়া দেয়। সুষুম্নাকাণ্ডে গিয়া এই উদ্গত অংশটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়; একটি অংশ শ্বেত-পদার্থ (white matter) বাহিয়া সুষুম্নাকাণ্ডের নিম্নাংশ পর্যন্ত এবং অপর অংশটি উপরের দিকে চলিয়া যায়। উভয় অংশ হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপ্রশাখা নির্গত হইয়া ধূসর-পদার্থে (gray matter) প্রবেশ করে এবং সেইখানেই শেষ হইয়া যায়।

বহির্মুখী নিউরণঃ

বহির্মুখী নিউরণের একটি দীর্ঘ (axon) এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (dendrites) উদ্গত অংশ থাকে। ইহার কোষ দেহটি ধূসর পদার্থের **সম্মুখস্থ স্ফীত অংশে বা শৃঙ্গে** অবস্থিত (anterior horns)। সেখান হইতে দীর্ঘ উদ্গত অংশটি সম্মুখের সুষুম্না-স্নায়ুমূলের মধ্যে এবং তারপর সুষুম্না-স্নায়ু বাহিয়া কোন সক্রিয় দেহযন্ত্রে—যেমন পেশীতে প্রবেশ করে।

অন্তর্মুখী নিউরণের দীর্ঘ উদ্গত অংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলি ধূসর

পদার্থের সম্মুখস্থ শৃঙ্গের কাছাকাছি গিয়া বহির্মুখী নিউরণের ডেনড্রাইটগুলির সংস্পর্শে আসে। উত্তেজনা এ্যাকসন হইতে ডেনড্রাইটে যাইতে পারে, কিন্তু দিকে অর্থাৎ ডেনড্রাইট হইতে এ্যাক্সনে যাইতে পারেনা। সৌভাগ্যের কথা, এইজন্যই বিপরীত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে একমুখী উত্তেজনা প্রবাহ পাওয়া যায়।

হাঁটুর ঝাঁকানি (Knee-jerk) ঃ

প্রতিবর্তন ক্রিয়ার অন্যতম উদাহরণ হইল হাঁটুর ঝাঁকানি; ইহার প্রতিবর্তন-পথ দুইটি নিউরণ দ্বারা গঠিত। চেয়ারে উপবিষ্ট কোন লোকের পদদ্বয় পরস্পর আড়াআড়িভাবে (cross) রাখিতে বলা হইল; অতঃপর করতলের এক পার্শ্বদেশ দিয়া অথবা একটি ক্ষুদ্র হাতুড়ি দিয়া ঐ লোকটির জানু-কাপালিকের নিম্নস্থ কণ্ডরার উপর তীব্র আঘাত করিলে সেই পায়ে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দেখা যাইবে। আঘাত প্রাপ্ত কণ্ডরাগুলি দাবিয়া গিয়া পেশীগুলিকে টানিয়া ধরে এবং ফলে, পাখানি হাঁটুর কাছে সোজা হইয়া যায়। পেশী প্রসারিত হইবার ফলে উহার তাড়না-গ্রহণকারী স্নায়ুপ্রান্তসমূহ উত্তেজিত হয়। এইভাবে একটি তাড়না স্রোত সৃষ্টি হইয়া অন্তর্মুখী নিউরণ বাহিয়া সুষুম্নাকাণ্ডে চলিয়া যায় এবং তথা হইতে বহির্মুখী নিউরণ বাহিয়া ঐ একই পেশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—পেশীটি সঙ্কুচিত হয় (রঙীন চিত্র ৬)।

স্নায়ুকোষ সংযোগকারী নিউরণ (internuncial neurons) ঃ

দুই নিউরণে গঠিত প্রতিবর্তন-পথ খুব কমই দেখা যায়। অধিকাংশ প্রতিবর্তন-পথই তিন, চার বা ততোধিক নিউরণ দ্বারা গঠিত। ৬নং রঙীন চিত্রে দুইটি ও তিনটি নিউরণ গঠিত প্রতিবর্তন দেখান হইয়াছে। ঐ চিত্রে দেখা যাইবে যে অন্তর্মুখী নিউরণের উদ্গত অংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলি ধূসর পদার্থের শুধু সম্মুখস্থ শৃঙ্গে নয়, **পশ্চাদ্দেশেও** চলিয়া যায়। এইখানেই অন্তর্মুখী নিউরণ হইতে বহির্মুখী নিউরণে তাড়নাবাহী স্নায়ুকোষ-সংযোগকারী নিউরণগুলি অবস্থিত (internuncial neurons)।

স্নায়ুকোষ সংযোগকারী নিউরণসমূহের দীর্ঘ উদ্গত অংশগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের প্রতি অংশে এবং মস্তিষ্কেও ছড়াইয়া থাকে। কাজেই একটি স্নায়ুকোষ সংযোগকারী নিউরণ হইতে অপর স্নায়ুকোষ সংযোগকারী নিউরণে প্রবাহিত হইয়া উত্তেজনা সমগ্র কেন্দ্রীয়-স্নায়ু-তন্ত্রে ছড়াইয়া পড়ে।

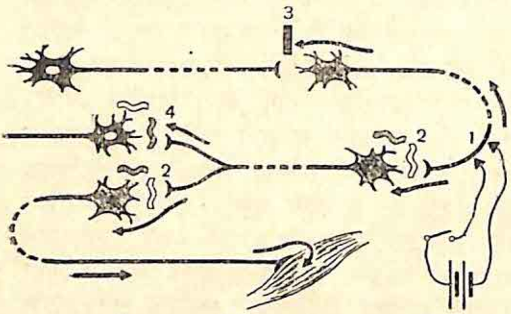
অনুশীলনী ঃ

এমন দুইটি নিউরণ অঙ্কন কর যাহাতে একটির এ্যাক্সন অপরের ডেনড্রাইটে এবং দ্বিতীয়টির এ্যাক্সন পেশীতে পরিচালিত হয়। ছবিটির সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দাও। তীরফলকের সাহায্যে উত্তেজনা প্রবাহের গতিপথ দেখাও।

৬১। সুষুম্নাকাণ্ডের প্রতিবর্তন ক্রিয়া

মস্তকচ্যুত ব্যাঙের দেহে প্রতিবর্তন ক্রিয়াঃ

সুষুম্নাকাণ্ডটি অক্ষত রাখিয়া মস্তকচ্যুত ব্যাঙের দেহে সুষুম্নাকাণ্ডের সহায়তায় প্রতিবর্তন ক্রিয়া অনুধাবন করা খুবই সহজ। ব্যাঙের দেহটি একটি হুক হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।



১১১নং চিত্র—এক নিউরণ হইতে অপর নিউরণে উত্তেজনার পরিবহন

১। স্নায়ুতন্তুতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা উত্তেজনা প্রয়োগ স্থল; ২। এ্যাক্সন হইতে ডেনড্রাইটে উত্তেজনা পরিবহন; ৩। উত্তেজনা ডেনড্রাইট হইতে এ্যাক্সন যাইতে পারে না; ৪। নিরোধ উত্তেজনার প্রসারে বাধা দেয়।

একটি চিমটার দ্বারা মস্তকচ্যুত ঐ ব্যাঙের পায়ে চিমটি দিলে পাটি পিছনের দিকে ঝাঁকিয়া যাইবে। যত জোরে চিমটি কাটা যাইবে, সেই অনুপাতে দুই, তিন বা চারখানি পা সঞ্চালিত হইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে উত্তেজনা সুষুম্না-কাণ্ডের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়িতে বা **বিকীর্ণ** হইতে পারে।

স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনাপ্রবণতাঃ

উত্তেজনার পরিব্যাপ্তি—অর্থাৎ এক নিউরণ হইতে অপর নিউরণে উত্তেজনা চলাচল স্নায়ুকোষগুলির উত্তেজনা-প্রবণতার মাত্রার উপর নির্ভর করে। মস্তক-চ্যুত ব্যাঙের দেহে কোন কোন বিষের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া স্নায়ুকোষের উত্তেজনা-প্রবণতার পরিবর্তন ভালভাবেই অনুধাবন করা যায়। এ্যালকহল প্রথমে সামান্য কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা-প্রবণতা বৃদ্ধি করিয়া পরে যথেষ্ট কমাইয়া দেয়। স্ট্রিক্‌নিন্‌ উত্তেজনা-প্রবণতা এত বাড়াইয়া দেয় যে এই বিষের সামান্যতম সংস্পর্শে আসিলে প্রাণীদেহের সমস্ত পেশীগুলির প্রচণ্ড আলোড়নকারী সঙ্কোচন হইবে।

অন্তর্মুখী তাড়নার তাৎপর্যঃ

দেহের সমস্ত অংশ হইতে বিরামহীন তাড়না-স্রোত অন্তর্মুখী নিউরণ পথে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে; কিন্তু অধিকাংশই প্রতিবর্তন ক্রিয়া সৃষ্টি করার পক্ষে অতীব দুর্বল। তাহা সত্ত্বেও জীবদেহ এই সব তাড়নায় সম্পূর্ণ উদাসীন নয়; ইহারা কেন্দ্রীয় স্নায়ু-তন্ত্রের কোষগুলির উত্তেজনা-প্রবণতা বাড়াইয়া দেয়।

এই ধরণের দুর্বল উত্তেজনা (যেমন, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ) পৃথকভাবে মস্তকচ্যুত ব্যাঙের দেহে কোন প্রতিবর্তন ক্রিয়া সৃষ্টি করিতে না পারিলেও নির্দিষ্ট দ্রুততার সহিত পর পর কয়েকবার প্রয়োগ করিলে প্রতিবর্তন ক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। প্রত্যেকটি উত্তেজনা কোষের উত্তেজনাপ্রবণতা বাড়াইয়া দেয় বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

কোন কোন ব্যাধিতে রোগী সমস্ত অনুভূতি হারাইয়া ফেলিতে পারে। একটি রোগী চর্মের সমস্ত অনুভব শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং এক চক্ষু কানা ও এক কানে বধির হইয়া যায়। এই রোগীটির সুস্থ কানে তুলা গুঁজিয়া এবং দৃষ্টিমান চক্ষুটি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা-প্রবণতা এত কমিয়া গেল যে লোকটি অবিলম্বে নিশ্চল হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তুলা এবং ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

উপরিউক্ত উদাহরণ হইতে সমগ্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপে—এমনকি যেখানে প্রতিবর্তন-ক্রিয়া নিষ্প্রয়োজন, সেক্ষেত্রেও অন্তর্মুখী তাড়নার বিরাট গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

প্রতিবর্তন-ক্রিয়ার নিরোধ (inhibition) :

মস্তকচ্যুত ব্যাঙের পিছনের পায়ের অগ্রাংশ সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিডের পাতলা দ্রবে ডুবাইলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই (সাধারণতঃ ১—৩ সেকেণ্ডে) পরে ঝাঁকিয়া পিছনে যাইবে। পিছনের পাটি এ্যাসিডে ডুবাইয়া রাখিয়া সম্মুখের পা একটি চিমটার দ্বারা নিষ্পেষণ করিলে অনেক পরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াই হইবে না।

এইরূপ ক্ষেত্রে দুইটি তাড়না-স্রোত—একটি চিমটার নিষ্পেষণ প্রসূত সম্মুখের পা হইতে এবং অপরটি এ্যাসিডে নিমজ্জিত পিছনের পা হইতে একত্রে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রবেশ করে। সম্মুখের পা হইতে উদ্ভূত তাড়না-স্রোত পিছনের পায়ে প্রতিবর্তন ক্রিয়া সৃষ্টিকারী স্নায়ুকোষগুলি উত্তেজনা-প্রবণতা বৃদ্ধি করে না—বরং দমন বা নিরোধ করিয়া থাকে। এই ধরণের নিরোধক ক্রিয়া প্রতিবর্তন-ক্রিয়াকে বিলম্বিত করিয়া দেয়।

মহান রুশ শারীর-বৃত্তবিদ সেশেনভ্‌ সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিরোধক ক্রিয়ার গভীর অনুশীলন করেন। বর্তমানে ইহা প্রমাণ হইয়াছে যে প্রত্যেকটি স্নায়ুকোষকে **উত্তেজিত** এবং **নিস্তেজ বা নিরুদ্ধ** অবস্থায় আনা যায়। নিরুদ্ধ অবস্থাকে কোনমতেই বিশ্রাম বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা বলা যায় না; আসলে ইহা কোষের এমন একটি ক্রিয়াশীল অবস্থা যখন কোন তাড়না কোষ হইতে চলাচল করিতে পারে না (১১১নং চিত্র)। এই নিরোধক অবস্থা যতক্ষণ চলিতে থাকে সেই সমগ্র সময়ে নিরোধক অঞ্চল দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত চলমান প্রতিবর্তনগুলি দুর্বল অথবা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার জন্য স্নায়ুকোষগুলির উত্তেজিত এবং নিরুদ্ধ এই উভয় অবস্থারই সমান গুরুত্ব আছে।

প্রতিবর্তন ক্রিয়ার সমন্বয়ঃ

উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় মস্তকচ্যুত ব্যাঙের পা ঝাঁকানি দিয়া পিছনে সঞ্চালিত হইলে ভাঁজ সৃষ্টিকারী (flexors) পেশীসমূহের সমগ্র দলটি সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত ভাঁজসৃষ্টিকারী পেশীসমূহের কেন্দ্রগুলির—অর্থাৎ পেশীগুলির সহিত উদ্গত অংশ দ্বারা সংযুক্ত স্নায়ু-কোষগুলির উত্তেজনার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রসারণকারী পেশীসমূহের কার্যতৎপরতা কমিয়া যায় এবং ইহারা শ্লথ হইয়া যায়—ফলে ব্যাঙের পা বাঁকান

সম্ভব হয়। প্রসারণকারী পেশীসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট স্নায়ুকোষগুলি—অর্থাৎ উহাদের স্নায়ুকেন্দ্রগুলির নিরুদ্ধ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার জন্যই ঐ পেশীগুলি শ্লথ হইয়া পড়ে।

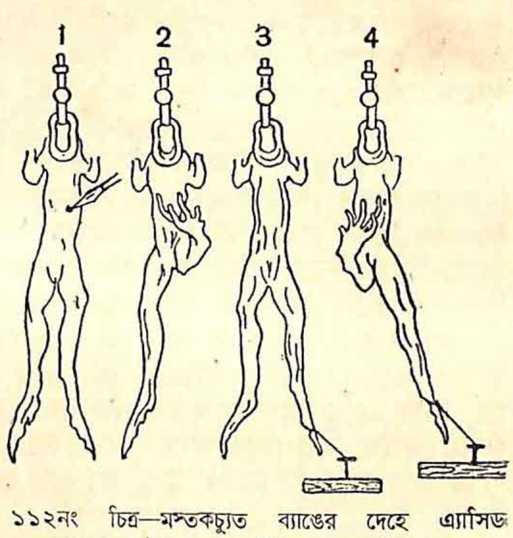
ঠাণ্ডায় (যেমন, ০° ডিগ্রীতে) রাখিলে ব্যাঙের প্রতিক্রিয়া বহুলাংশে ব্যাহত হয়। এরূপ অবস্থায় উত্তেজনা দানের ফলে পা বাঁকিলে বহুক্ষণ পর্যন্ত পাটি ঐ অবস্থায় থাকিয়া যায় এবং কয়েক সেকেণ্ড পরে ধীরে ধীরে সোজা হইতে থাকে। বাম পায়ে উত্তেজনা দানের পরমুহূর্তেই দক্ষিণ পায়ে চিমটি কাটিলে বাম পা বাঁকিবার সময় দক্ষিণ পা সোজা হইতে থাকিবে।

ঠাণ্ডায় রাখা ব্যাঙের দেহে উপরিউক্ত ব্যাহত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি পরীক্ষা করার সময় স্নায়ু-কেন্দ্রগুলির অখণ্ড কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়; দক্ষিণ পায়ের ভাঁজ-সৃষ্টিকারী পেশীসমূহের কেন্দ্রগুলি উত্তেজিত হইলে বাম পায়ের উত্তেজিত পেশীগুলির কেন্দ্রসমূহে নিরুদ্ধ অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে বাম পাটি সঙ্গে সঙ্গেই সোজা হইয়া যায়। দেহের যে-কোন রকম সঞ্চালনে কতকগুলি পেশী সঙ্কুচিত এবং কতকগুলি শ্লথ হইয়া থাকে; কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট অংশে উত্তেজক ও নিরুদ্ধ অঞ্চল সৃষ্টির উপরই এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ নির্ভর করে। বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক এন. ভি. ভেদেনস্কি (Vvedensky) সর্বপ্রথম স্নায়ুকেন্দ্রগুলির এই পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করেন।

উত্তেজিত ও নিরুদ্ধ অঞ্চল কখনও স্থায়ী হয় না; অবিরাম স্থান হইতে স্থানান্তরে, মস্তিষ্কের এক অংশ হইতে অপর অংশে সরিয়া গিয়া ইহারা দেহ সঞ্চালনে যথাযথ সমন্বয় সাধন করিয়া থাকে।

মস্তকচ্যুত ব্যাঙের দেহে জটিল সঞ্চালনঃ

এ্যাসিডে ভিজান এক টুকরা কাগজ মস্তকচ্যুত ব্যাঙের দেহচর্মের উপর রাখিলে উহা পায়ের নির্দিষ্ট সঞ্চালন দ্বারা কাগজটি ফেলিয়া দিবে। দেহের যে অংশে কাগজটি রাখা হইবে সেই অনুসারে উহার দক্ষিণ অথবা বাম পায়ের সঞ্চালন হইবে। অর্থাৎ দেহের দক্ষিণ দিকে কাগজটি রাখিলে ব্যাঙটি দক্ষিণ দিকের পিছনের পা দিয়া উহা সরাইয়া দিবে।



১১২নং চিত্র—মস্তকচ্যুত ব্যাঙের দেহে এ্যাসিড প্রয়োগে উত্তেজনা সৃষ্টি দ্বারা পরীক্ষা ঃ
১ ও ২। ব্যাঙটি দক্ষিণ পা দিয়া পৃষ্ঠদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রযুক্ত এ্যাসিড মুছিয়া ফেলিতেছে; ৩ ও ৪। দক্ষিণ পা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে; ব্যাঙ বাম পা দিয়া ঐ একই স্থান হইতে এ্যাসিড মুছিয়া ফেলিতেছে

এই একই পরীক্ষা কিছুটা ভিন্নভাবে—দক্ষিণ পাটি যাহাতে সঞ্চালন না করা যায় এইরূপ শক্তভাবে বাঁধিয়া দিয়াও লক্ষ্য করা যায় (১১২নং চিত্র)। এইরূপ

অবস্থায় দেহের দক্ষিণ দিক উত্তেজিত করিলে প্রথমে রজ্জুবদ্ধ দক্ষিণ পায়ের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইবে এবং পরে বাম পাটি কাগজের দিকে সঞ্চালিত হইয়া ইহাকে ফেলিয়া দিবে।

এই কৌতুহলোদ্দীপক পরীক্ষা দ্বারা বোঝা যায় যে শুধু সুষুম্নাকাণ্ড দ্বারা সঞ্চালনের সমন্বয় সাধিত হইতে পারে। মস্তিষ্কের সহযোগিতায় প্রতিবর্তন ক্রিয়া আরও জটিল এবং সংখ্যাতীত ধরণের হইয়া থাকে।

সুষুম্নাকাণ্ডের ভূমিকাঃ

অক্ষত স্নায়ুতন্ত্রসমেত সমগ্র জীবদেহটিকে ধরিলে সুষুম্নাকাণ্ডের প্রধান ভূমিকা হইল দেহযন্ত্রসমূহ হইতে মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্ক হইতে পুনরায় দেহযন্ত্রগুলিতে ভ্রমণকারী **তাড়নার পরিবাহক**। সুষুম্নাকাণ্ডের প্রতিবর্তন-ক্রিয়া উচ্চস্তরের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর নির্ভর করে। নিম্ন স্তরের মেরুদণ্ডী জীবদের ক্ষেত্রে এই নির্ভরতার প্রকাশ স্তন্যপায়ীদের অপেক্ষা দুর্বল। মস্তকচ্যুত শুধু সুষুম্নাকাণ্ড বিশিষ্ট জীবদেহের প্রতিবর্তনের তুলনায় অক্ষত জীবদেহে যে অসংখ্য ধরণের প্রতিবর্তন ক্রিয়া দেখা যায় তাহা আসলে মস্তিষ্কের, বিশেষত গুরু মস্তিষ্কের কর্টেক্সের জন্যই হইয়া থাকে। মানব দেহে মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ ব্যতীত হাঁটুর ঝাঁকানির মত সুষুম্নাকাণ্ডের অতি সাধারণ প্রতিক্রিয়াও ঘটিতে পারেনা।

প্রশ্ন ঃ

(১) কোন কোন ব্যাধিতে শুধু সুষুম্নাকাণ্ড হইতে মস্তিষ্কে উত্তেজনার পরিবহন নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু বিপরীত মুখী প্রবাহ (মস্তিষ্ক হইতে সুষুম্নাকাণ্ডে) স্বাভাবিকভাবেই চলিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় হাঁটুর ঝাঁকানি পাওয়া যাইবে কি? সূচের খোঁচা দিলে পায়ে অনুভূতি জাগিবে কি? পায়ের ইচ্ছাধীনে (voluntary) সঞ্চালন কি সম্ভব? এই প্রশ্নগুলির উত্তর কোনক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং কোনক্ষেত্রে নেতিবাচক কেন হইবে তাহা ব্যাখ্যা কর।

(২) যদি (ক) মস্তিষ্ক হইতে সুষুম্নাকাণ্ডে উত্তেজনার পথ আহত হয়, (খ) সুষুম্নাকাণ্ডের পশ্চাদ্দেশীয় মেরু-স্নায়ুগ্রন্থি আহত হয়, (গ) সম্মুখস্থ মেরু-স্নায়ুগ্রন্থি আহত হয়, তাহা হইলে ১নং প্রশ্নের উত্তর কি হইবে? প্রতিটি উত্তরের কারণ দেখাও।

(৩) একটি কুকুরের সম্মুখে একটি বিড়াল আনার সঙ্গে সঙ্গে উহার (কুকুরের) পাকস্থলীর রসক্ষরণ বন্ধ হইয়া যাইবে কেন? এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার অন্য উদাহরণ দাও। প্রতিটি উদাহরণ ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী ঃ

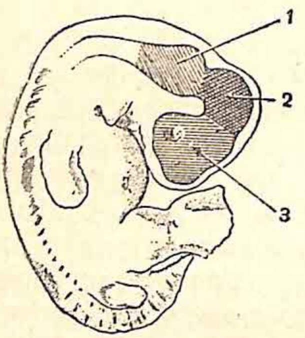
(১) দুইটি নিউরণ বিশিষ্ট প্রতিবর্তন চক্রের চিত্র সহ সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের একটি চিত্র অঙ্কিত কর (চক্রটি একটি পেশী বা কণ্ডরাতে উদ্ভূত হইয়া সেই পেশীতেই শেষ হইবে)। চিত্রের বিশদ ব্যাখ্যা লিখ। তীর-ফলকের দ্বারা উত্তেজনার গতিপথ দেখাও।

(২) চর্ম হইতে উদ্ভূত তিনটি নিউরণ বিশিষ্ট একটি প্রতিবর্তন চক্রের চিত্র অঙ্কিত কর। চিত্রের বিশদ ব্যাখ্যা লিখ। তীর-ফলকের দ্বারা উত্তেজনার গতিপথ দেখাও।

(৩) নিজের বা সহপাঠীর উপর হাঁটুর ঝাঁকানি পরীক্ষা কর। প্রসারণকারী পেশীগুলির সঙ্কোচন হয় কেন এবং কেনই বা পাটি লাফাইয়া ওঠে তাহা ব্যাখ্যা কর।

গুরুমস্তিষ্কের স্ফোটক বা ভেসিক্ল্ (cerebral vesicles) ঃ

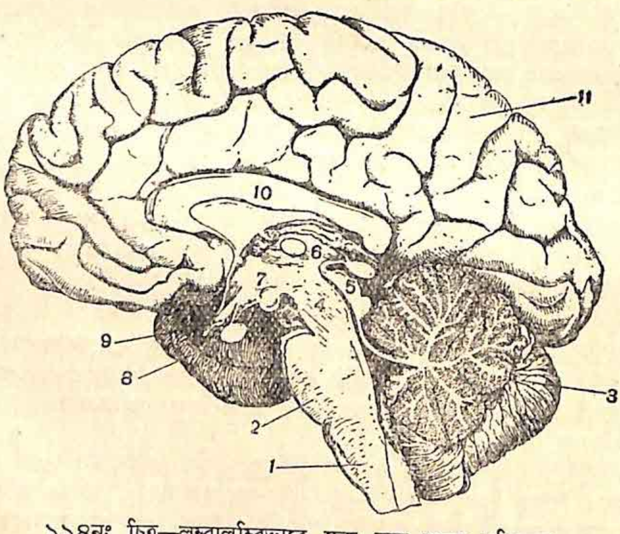
সমস্ত মেরুদণ্ডী জীবের ভ্রূণ সম্মুখের প্রান্তে স্ফীত একটি নলের আকৃতিতে সুরু হয় (১১৩ নং চিত্র)। এই প্রান্তের তিনটি অংশের প্রত্যেকটিতে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত পাটাগুলি (bands) তিনটি স্ফীতির ন্যায় দেখায়; ইহাদেরকে বলা হয় **সম্মুখস্থ** (anterior), **মধ্যস্থ এবং পশ্চাদস্থ স্ফোটক বা ভেসিক্ল্**; প্রত্যেকটি স্ফোটক মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট এক একটি অংশের সূত্রপাতের প্রতিভূ।



১১৩নং চিত্র—মানুষের ভ্রূণের মস্তিষ্ক-নলের সম্মুখ প্রান্তঃ
১। পশ্চাদ্দেশীয়; ২। মধ্য এবং
৩। সম্মুখস্থ গুরুমস্তিষ্কের স্ফোটক

পশ্চাদ্দেশীয় মস্তিষ্ক (Hind-brain) ঃ

মস্তিষ্কের যে অংশ সুষুম্নাকাণ্ড হইতে সরাসরি উঠিয়াছে তাহাকে **সুষুম্নাশীর্ষক** (medulla oblongata) বলে। সুষুম্নাশীর্ষকের সম্মুখে একটি বৃহৎ নলাকৃতি স্ফীতি আড়াআড়িভাবে সেতুর ন্যায় চলিয়া গিয়াছে—ইহার নাম **উষ্ণীষক** (pons)। সুষুম্নাশীর্ষকের পিছনে আছে লঘু মস্তিষ্ক (cerebellum); ইহা দুই গোলার্ধে বিভক্ত হইয়া উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। এই



১১৪নং চিত্র—লম্বালম্বিভাবে ছেদ করা মানব মস্তিষ্ক ঃ
১। সুষুম্নাশীর্ষ; ২। উষ্ণীষক; ৩। সেরিবেলাম; ৪। মধ্য মস্তিষ্ক; ৫। কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনার স্ফীত অংশদ্বয় (মধ্য মস্তিষ্কের পশ্চাদভাগ); ৬। থ্যালামাস; ৭। থ্যালামাসের নিম্নাঞ্চল; ৮। পিটিউটারি গ্রন্থি; ৯। অপ্টিক বা অক্ষি স্নায়ু; ১০। কর্পাস ক্যালোসাম; ১১। গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স

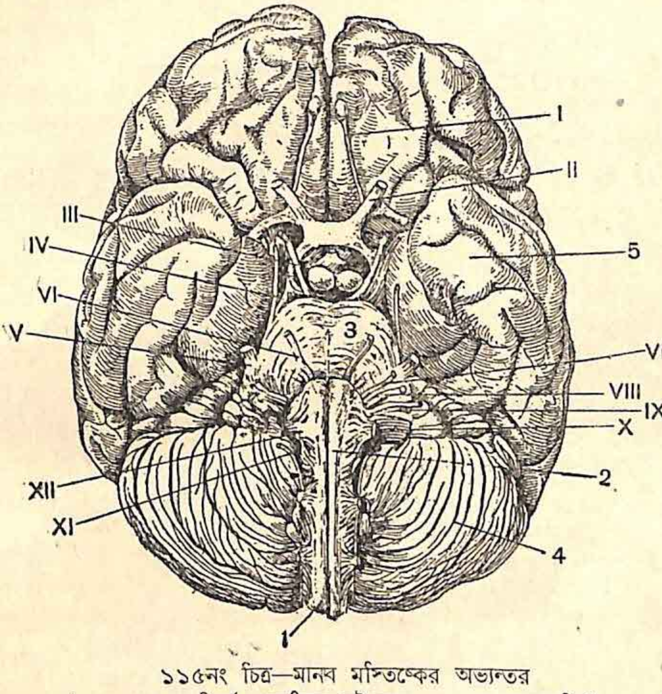
সমস্ত অংশই পশ্চাদ্দেশীয় স্ফোটক বা ভেসিক্ল্ হইতে উদ্ভূত এবং ইহারাই মস্তিষ্কের পশ্চাদাংশ গঠন করে।

মধ্য-মস্তিষ্ক (Mid-brain) ঃ

মধ্য-মস্তিষ্ক পশ্চাদ্দেশীয় মস্তিষ্কেরই ক্রমবিস্তৃতি এবং মধ্য-মস্তিষ্ক স্ফোটক হইতে উদ্ভূত; মানুষের মস্তিষ্কে ইহা একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ। মধ্য-মস্তিষ্ক দুইটি **মস্তিষ্কের ডাঁটা বা পিডাংকল্** (দক্ষিণ এবং বাম গোলার্ধের গভীরে প্রবেশকারী দুইটি অত্যন্ত মোটা তন্তুগুচ্ছ) এবং ইহাদের পশ্চাতে অবস্থিত চারিটি উচ্চস্থান (corpora quadrigemina) দ্বারা গঠিত। মস্তিষ্কের গোলার্ধ দুইটি তুলিয়া ধরিলে ইহাদের এবং লঘু মস্তিষ্কের মধ্যে উচ্চস্থান চারিটি দেখা যাইবে; এইগুলিই কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা (১১৪ নং চিত্রে দুইটি উচ্চস্থান দেখা যাইতেছে)।

মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ ঃ

মস্তিষ্কের অবশিষ্টাংশ সম্মুখস্থ-মস্তিষ্ক-স্ফোটক হইতে উদ্ভূত এবং মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ (বা fore brain) নামে পরিচিত। সম্মুখস্থ-মস্তিষ্ক-স্ফোটকের



১১৫নং চিত্র—মানব মস্তিষ্কের অভ্যন্তর

১। সুষুম্নাকাণ্ড সুষুম্নাশীর্ষে প্রসারিত হইয়াছে; ২। সুষুম্নাশীর্ষ; ৩। উষ্ণীষক; ৪। লঘুমস্তিষ্ক; ৫। গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স; i-xii—১২ জোড়া করোটি স্নায়ু; তাহার মধ্যে আছে আঘ্রাণ স্নায়ু (i), অক্ষি স্নায়ু (ii), মুখমণ্ডলের স্নায়ু (vii), শ্রবণ স্নায়ু (viii), ভেগাস স্নায়ু (x) ইত্যাদি

পশ্চাদাংশ হইতে **অন্তঃ-মস্তিষ্ক** (inter brain) উদ্ভূত হয়। ইহা মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থের দুইটি পিণ্ড দ্বারা গঠিত—একটির নাম **থ্যালামাস্** (thalamus)

এবং তাহার নিম্নদেশে অবস্থিত অপর অংশের নাম **হাইপোথ্যালামাস অঞ্চল** (hypothalamic region)।

ঐ একই স্ফোটকের সম্মুখের অংশ হইতে গুরুমস্তিষ্কের গোলার্ধদুইটির উদ্ভব হইয়াছে এবং ইহার বহিরাংশ গুরুমস্তিষ্কের চূড়া বা কর্টেক্স নামে পরিচিত। গুরু মস্তিষ্কের গভীর অন্তর্দেশে কয়েকটি ধূসর পদার্থের পিণ্ড আছে—ইহাদিগকে **কর্টেক্সের অন্তর্দেশীয় কেন্দ্র** (subcortical region) বলা হয়।

মস্তিষ্কের স্নায়ুঃ

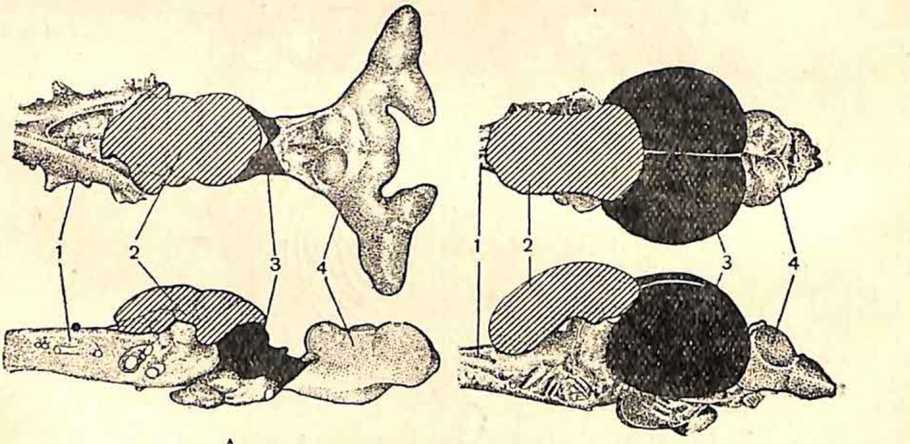
মস্তিষ্কের তলদেশ হইতে ১২ জোড়া **করোটি স্নায়ু** (cranial nerves) বাহির হইয়াছে (১১৫নং চিত্র)। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মস্তিষ্ক ও বোধ-যন্ত্রসমূহকে (শ্রবণ, দৃষ্টি ও ঘ্রাণ যন্ত্র) সংযুক্ত করে, এবং অপর কয়েকটির তন্তু-গুলি করোটির পেশী ও চর্মে, মুখবিবর ও নাসাগহ্বরের শ্লেষ্মা ঝিল্লীতে এবং লালা গ্রন্থিসমূহে চলিয়া গিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে অন্যতম ভ্রাম্যমান বা **ভেগাস্** স্নায়ু বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বক্ষ ও উদর গহ্বরস্থ বিভিন্ন যন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে। সারা দেহে ছড়াইয়া থাকার জন্য ইহাকে ভ্রাম্যমান বলা হয়।

৬৩। *বিভিন্ন মেরুদণ্ডীর মস্তিষ্ক*

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী জীবের মস্তিষ্কের গঠন সাদৃশ্যঃ

মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী জীবের মস্তিষ্ক তুলনা করিলে ইহাদের গঠনে বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত মেরুদণ্ডীদলের মস্তিষ্কই তিনটি প্রাথমিক



১১৬নং চিত্র—মাছের মস্তিষ্ক—উপরের ও পার্শ্বের দৃশ্য ঃ
ক। তরুণাস্থি গঠিত মাছ (হাঙর); খ। অস্থিযুক্ত মাছ (স্যালমন);
১। সুষুম্নাশীর্ষ; ২। লঘু মস্তিষ্ক; ৩। মধ্য মস্তিষ্ক; ৪। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ

মস্তিষ্ক স্ফোটক হইতে উদ্ভূত। সকলের মস্তিষ্কেই প্রধান বিভাগগুলি (সুষুম্না-শীর্ষক, লঘু-মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক, অন্তর্মস্তিষ্ক বা ডাইএনকেফালন এবং গোলার্ধ-দ্বয়) বর্তমান। অবশ্য সাদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট পার্থক্যও আছে।

মস্তিষ্কের ওজন:

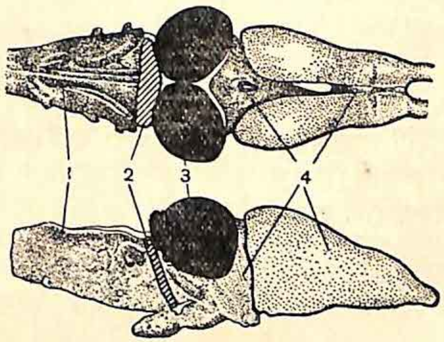
বিভিন্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডীর মস্তিষ্কের বিকাশ সমভাবে হয় নাই। মস্তিষ্কের ওজন তাহার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

অধিকাংশ মাছের মস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ড অপেক্ষা হাল্কা; উভচর ও সরীসৃপ-দের মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের ওজন প্রায় সমান; স্তন্যপায়ী জীবদের মস্তিষ্কের ওজন সুষুম্নাকাণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী—কুকুরের মস্তিষ্ক প্রায় পাঁচগুণ এবং নরাকৃতি বানরের প্রায় ১৫ গুণ বেশী। অবশ্য অন্য কোন জীবের মস্তিষ্কই মানুষের মত এত উচ্চস্তরের বিকাশ লাভ করে নাই—মানুষের মস্তিষ্ক সমগ্র কেন্দ্রীয়-স্নায়ু-তন্ত্রের শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ লইয়া গঠিত।

মাছের মস্তিষ্ক:

মাছের পশ্চাদ্দেশীয় ও মধ্য মস্তিষ্ক যথেষ্ট সুগঠিত (১১৬ নং চিত্র)। ইহাদের মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ যথেষ্ট বিকশিত নয়—শুধু ঘ্রাণ শক্তিতেই সীমাবদ্ধ।

মাছের মস্তিষ্কের সমগ্র সম্মুখভাগ (fore brain) কাটিয়া ফেলিলেও মাছটির স্বাভাবিক ব্যবহার অব্যাহত থাকিবে—জলপাত্রে কোন জিনিষ ফেলিলে মাছটি তাহার কাছে ছুটিয়া যাইবে এবং ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য পদার্থের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারিবে—বিপজ্জনক কোন কিছু দেখিলে দ্রুত পলাইয়া যাইবে। কিন্তু মধ্য-মস্তিষ্ক নষ্ট হইলে মাছটির ব্যবহারে প্রচুর পরিবর্তন আসিবে; তাহাছাড়া গতিবিধির সমন্বয়ও আংশিকভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে।



১১৭নং চিত্র—উভচরদের মস্তিষ্ক (ব্যাঙ)
চিহ্নগুলি ১১৬নং চিত্রের মত

উভচরদের মস্তিষ্ক :

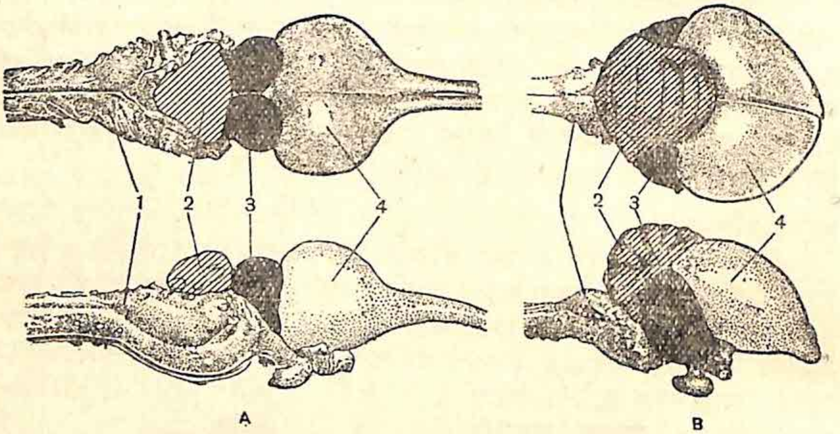
উভচরদের (যেমন ব্যাঙের) মস্তিষ্কের সম্মুখাংশ মাছ অপেক্ষা অধিকতর বিকশিত (১১৭নং চিত্র) এবং এই অংশ অপসারণ করিলে ইহাদের স্বাভাবিক ব্যবহারে কয়েকটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে। অবশ্য এই বিশৃঙ্খলা বেশীদিন স্থায়ী নয় এবং অস্ত্রোপচারের দুই-এক সপ্তাহ পরে এইগুলি আপনা হইতেই অদৃশ্য হয়।

সরীসৃপ ও পাখীর মস্তিষ্ক :

সরীসৃপদের (১১৮-ক নং চিত্র) মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের কিয়দংশ—যেমন অন্তর্মস্তিষ্ক এবং কর্টেক্সের—অন্তর্দেশীয় কেন্দ্রগুলি যথেষ্ট উন্নত। ইহাদের গুরুমস্তিষ্কের গোলার্ধের কর্টেক্সে খুব কম সংখ্যক স্নায়ুকোষ আছে। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ অপসারণ করিলে সামঞ্জস্যপূর্ণ গতি-সঞ্চালন অব্যাহত থাকিলেও জীবটির ব্যবহারে বেশ লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে—অর্থাৎ জীবটি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, খাদ্যান্বেষণ অথবা খাদ্য ধরিবার চেষ্টা করে না এবং মানুষ দেখিলে ভয় পায় না।

পাখীর মস্তিষ্ক-গোলার্ধ দুইটির অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতিটি ইহাদের কর্টেক্সের

অন্তর্দেশীয় কেন্দ্রগুলির শক্তিশালী বিকাশ হইতে উদ্ভূত; কিন্তু ইহাদের কর্টেক্সটি সরীসৃপের মতই অবিকশিত। শুধু কর্টেক্সটি সন্তর্পণে অপসারিত করিলে ইহাদের ব্যবহারে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। গোলার্ধ

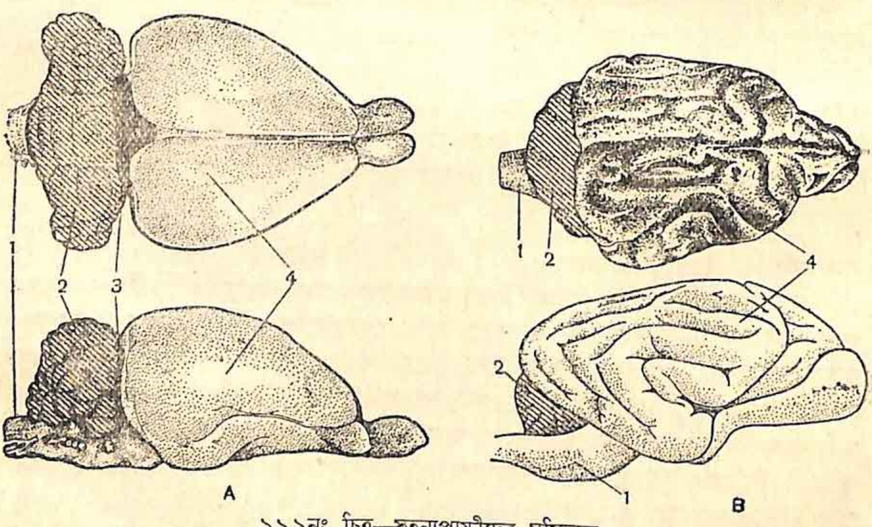


১১৮নং চিত্র—সরীসৃপ ও পাখির মস্তিষ্ক
ক। কুমীর; খ। পায়রা; চিহ্নগুলি ১১৬নং চিত্রের মত

দুইটি সম্পূর্ণরূপে (কর্টেক্স এবং কর্টেক্সের অন্তর্দেশীয় কেন্দ্রগুলি) অপসারিত করিলে সরীসৃপের মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ অপসারণপ্রসূত পরিবর্তনের অনুরূপ লক্ষণগুলি দেখা যাইবে।

স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্ক :

অন্যান্য মেরুদণ্ডীদের তুলনায় স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের



১১৯নং চিত্র—স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্ক
ক। খরগোশ; খ। কুকুর; চিহ্নগুলি ১১৬নং চিত্রের মত

উন্নত বিকাশ ইহাদিগকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে (১১৯নং চিত্র)। কিন্তু ইহাদের মধ্য-মস্তিষ্ক অত্যন্ত অনুন্নত।

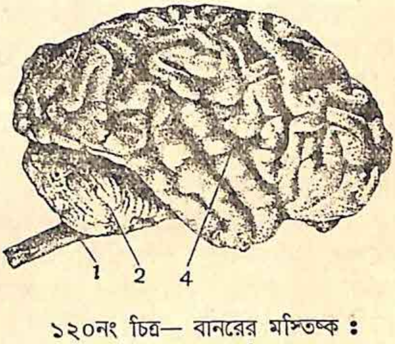
মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ অপসারণ করিলে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় যে, ইহারা সম্পূর্ণ নিশ্চল হইয়া পড়ে এবং অসহায় অবস্থায় শীঘ্রই মরিয়া যায়। এমনকি শুধু কর্টেক্স অপসারণ করিলেও ইহাদের ব্যবহারে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে।

কুকুরের কর্টেক্স অপসারণ করিলে কুকুরটি খাদ্যের নিকট যাইবে না অথবা ইহার মুখ খাদ্যপাত্রে গুঁজিয়া না দিলে খাইবে না। এরূপ অবস্থায় কুকুরটি তাহার প্রভুকে চিনিতে পারে না। যে-কেহ দেহ স্পর্শ করিলে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিবে; আদর ও মিষ্টি কথা কিংবা ধমকানি বা ভয় দেখান কোন কিছুতেই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না; বিড়ালের উপস্থিতিতেও কোন সাড়া জাগিবে না; অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় হইয়া কুকুরটি সম্মুখে অবস্থিত বাধায় হুমড়ি খাইয়া পড়ে এবং অনড় হইয়া বহুক্ষণ সেই বাধার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

বানরের কর্টেক্স সম্পূর্ণ অপসারণ করিলে আরও বেশী বিশৃঙ্খলা দেখা যাইবে (১২০নং চিত্র)। কুকুরের ব্যবহারে যে-সকল বিশৃঙ্খলা হয় তাহা ছাড়াও বানরটি স্বেচ্ছাধীন গতিশক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রায় সর্বক্ষণই ঘুমাইতে থাকে।

মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ

মেরুদণ্ডীদের ঐতিহাসিক বিকাশের পথে মস্তিষ্কের বিশেষ করিয়া ইহার সম্মুখভাগের বৃদ্ধির সহিত ব্যবহারের জটিলতার নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডীদের পশ্চাদ্দেশীয় এবং মধ্য-মস্তিষ্ক যথেষ্ট উন্নত, কিন্তু ক্ষুদ্র সম্মুখভাগ জীব-দেহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কোন তাৎপর্যপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে না। সরীসৃপদের দেহেই সর্বপ্রথম মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট উচ্চস্তরের জটিলতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের আবির্ভাব হয়।



১২০নং চিত্র— বানরের মস্তিষ্ক : চিহ্নগুলি ১১৬নং চিত্রের মত

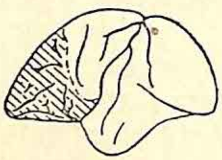
স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ আরও বিকশিত হইল। গুরু-মস্তিষ্কের কর্টেক্স নামক এমন একটি নূতন অংশের আবির্ভাব হইল যাহা অন্য জীবদের মধ্যে নাই। এমন কি মস্তিষ্কের সম্মুখভাগস্থ ঘ্রাণাঞ্চলের পরিবর্তে কর্টেক্স-এর বৃদ্ধি হইল। কিন্তু উচ্চস্তরের জীবদের কর্টেক্স আরও বেশী বৃদ্ধি পাওয়ায় গুরুমস্তিষ্কের গোলার্ধদ্বয়ের সমস্ত অংশ আকারে এত বড় হইয়া পড়ে যে, মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ ঢাকা পড়িয়া গেল; অতঃপর কর্টেক্সের উপর ভাঁজ ও স্ফীতিগুলি (fissures and convolutions) দেখা দিল এবং তাহার ফলে ইহার আকার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল।

স্তন্যপায়ী জীবদের সমস্ত উচ্চস্তরের স্নায়বিক কার্যকলাপ গুরুমস্তিষ্কের

কর্টেক্সের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ইহাদের কর্টেক্স অপসারণ করিলে ব্যবহারে প্রচন্ড বিশৃঙ্খলা ও পরিবর্তন আসিবে।

বানরের উচ্চস্তরের স্নায়বিক কার্যকলাপ ছাড়া সমস্ত প্রকার স্বেচ্ছাধীন গতিশক্তি কর্টেক্স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং ইহাদের কর্টেক্স অপসারণ করিলে সমস্ত স্বেচ্ছাধীন গতিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।

মানুষের মস্তিষ্ক :

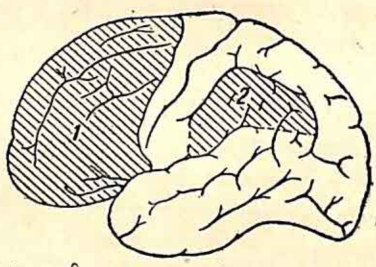


১২১নং চিত্র—বানরের মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ

গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের—বিশেষত ইহার সম্মুখ-ভাগের (frontal lobe) অসাধারণ বৃদ্ধি মানুষের মস্তিষ্ককে নিম্নস্তরের জীবদের তুলনায় এক মৌলিক স্বাতন্ত্র দান করিয়াছে (১২১ ও ১২২নং চিত্র)। প্রচুরসংখ্যক খাঁজ এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলির গভীরতার জন্য গোলার্ধ দুইটির সমগ্র বহিরাংশে অসংখ্য ভাঁজ বা স্ফীতি সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত ভাঁজগুলি খুলিয়া ফেলিলে মানুষের কর্টেক্সের আয়তন প্রায় ২০০০ বর্গ সেণ্টিমিটার হইবে। অথচ আশ্চর্যের কথা, ঘোড়ার ন্যায় বৃহৎ জন্তুর কর্টেক্সের বহিরাংশের আয়তন মাত্র ৩৫০ বর্গ সেণ্টিমিটার!

অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিলে বোঝা যায় যে, মানুষের কর্টেক্সের গঠন অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশী জটিল। অনুমান করা হয়, মানুষের কর্টেক্সে প্রায় ১৪ শত কোটি স্নায়ুকোষ আছে।

গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স না থাকিলে মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব। কর্টেক্স সামান্য আঘাত লাগিলেও গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।



১২২নং চিত্র—মানুষের মস্তিষ্কের সম্মুখ-ভাগ। পেশী উদ্দীপক কেন্দ্রের এবং নিম্ন শিরকণ্ডাণ্ডলের সম্মুখে মস্তিষ্কের ললাট বা ফ্রন্ট্যাল বিভাগের একটি অংশ দেখা যাইতেছে।

৬৪। পশ্চাদ্দেশীয় ও মধ্য মস্তিকের কার্যকলাপ

সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla oblongata) :

অধিকাংশ করোটি স্নায়ুই সুষুম্নাশীর্ষক ও তাহার সম্মুখে অবস্থিত উষ্ণীষকের (pons) সহিত যুক্ত। শ্রবণযন্ত্র, করোটির চর্ম এবং মুখগহ্বরের শ্লেষ্মা-ঝিল্লী হইতে অন্তর্মুখী তাড়নাগুলি এখানে আসে। সুষুম্নাশীর্ষক হইতে বহির্মুখী তাড়না মস্তকের পেশীসমূহে এবং লালাগ্রন্থিতে পরিবাহিত হয়। ভেগাস্ স্নায়ুর অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী তন্তুসমূহ দ্বারা সুষুম্নাশীর্ষক রক্তসংবহন, পাচন ও শ্বসন যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য-কলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিবর্তন চক্রগুলি সুষুম্নাশীর্ষক ও উষ্ণীষকের মধ্য

দিয়া চলাচল করে। এইখানে নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলি অবস্থিত—শ্বসন ও হৃৎপিণ্ড-রক্তপ্রণালী কেন্দ্র, মুখের "ভাব" প্রকাশকারী মুখমণ্ডলের পেশীগুলির কেন্দ্র, চর্বণ, গলাধঃকরণ, বমন, হাঁচি, কাশি, লালা নিঃসরণ ইত্যাদির কেন্দ্র রক্তসংবহন, পচন ও শ্বসন যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিবর্তন চক্রগুলি সুষুম্নাশীর্ষক ও উষ্ণীষকের মধ্য দিয়া চলাচল করে। এইখানে নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলি অবস্থিত—শ্বসন ও হৃৎপিণ্ড-রক্তপ্রণালী কেন্দ্র, মুখের "ভাব" প্রকাশকারী মুখমণ্ডলের পেশীগুলির কেন্দ্র, চর্বণ, গলাধঃকরণ, বমন, হাঁচি, কাশি, লালা নিসঃরণ ইত্যাদির কেন্দ্র।

স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্কের সমগ্র সম্মুখ ও মধ্যভাগ অপসারণ করিলে শ্বসন, পাচন ও রক্তসংবহন ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই চলিতে থাকে। কিন্তু উষ্ণীষক ও সুষুম্নাশীর্ষকের স্বতন্ত্র কেন্দ্রগুলি আহত হইলে এই যন্ত্রগুলি গুরুতররূপে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

সুষুম্নাশীর্ষকের শ্বসন কেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বতন্ত্র পেশীগুলির কাজে সমন্বয় সাধন করে; ইহাদের কেন্দ্রগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর-পদার্থের সম্মুখস্থ শৃঙ্গে অবস্থিত। স্তন্যপায়ীদের সুষুম্নাকাণ্ড কাটিয়া ফেলিলে অর্থাৎ সুষুম্নাশীর্ষক হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে শ্বসন কেন্দ্র এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের বিভিন্ন পেশীর কেন্দ্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ফলে অবিলম্বে শ্বাস-ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সুষুম্নাকাণ্ডের নিম্নস্তরের কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে শ্বাস কেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

একইভাবে সুষুম্নাশীর্ষক সুষুম্নাকাণ্ডের নিম্নস্তরের অন্য কয়েকটি কেন্দ্রের কার্যকলাপের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করে।

পেশীর কর্মতৎপরতার (tone) **বিন্যাস :**

দেহের ভারসাম্য এবং সঠিক অবস্থান বজায় রাখার জন্য অস্থি সংশ্লিষ্ট পেশীগুলির অত্যন্ত জটিল ও ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র পেশীর কর্মতৎপরতা অর্থাৎ প্রসার্যতা (tension) অন্য পেশীগুলির কর্মতৎপরতার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। দেহের নিম্নপ্রান্তের (পায়ের) প্রসারক পেশীগুলির (extensors) কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সময় যদি ভাঁজসৃষ্টিকারী পেশুগুলির (flexors) অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে শেষোক্তদের দিকে ভার-বৃদ্ধি হইবে এবং ফলে পদদ্বয়ে ভাঁজ সৃষ্টি হইয়া লোকটি আর দাঁড়াইতে পারিবে না।

সময় সময় (মুখের) ফেসিয়াল স্নায়ু আহত হইলে অনুভূতি সৃষ্টিকারী মুখের পেশীগুলির কর্মতৎপরতা কমিয়া যায়। দক্ষিণ দিকের স্নায়ুতে আঘাত লাগিলে মুখের দক্ষিণ দিকের পেশীগুলি দুর্বল হইয়া যায়, কিন্তু বাম দিকের পেশীগুলির কর্মতৎপরতা অপরিবর্তিত থাকে। কোন কোন লোকের অক্ষি-গোলকের কোন একটি পেশীর কর্মতৎপরতা হ্রাস পাইলে চোখ ট্যারা হইতে পারে।

অন্তর্মুখী স্নায়বিক তাড়নার প্রবাহের দ্বারাই পেশীর কর্মতৎপরতা ও স্বাভাবিক অবস্থান বজায় থাকে; ইহাদের মধ্যে পেশী ও অস্থি-সন্ধি হইতে আগত তাড়নাগুলিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেহের অবস্থান সম্পর্কে এই

তাড়নাগুলি অবিরাম সঙ্কেত দান করে এবং অনুরূপ প্রতিবর্তন-ক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া দেহের সঠিক অবস্থান বজায় রাখে।

মধ্য-মস্তিষ্ক আহত হইলে কর্মতৎপরতার সঠিক বিন্যাস নষ্ট হইয়া যায়।

অটোলিথের (otolithic) গঠনবিন্যাস ও অর্ধগোলাকৃতি নালী :

অটোলিথ ও অর্ধগোলাকৃতি নালীগুলি রগাস্থির (temporal bone) মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নিকটে অবস্থিত (রঙীন চিত্র ৮)।

অটোলিথ্ যন্ত্রটি দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলির দ্বারা গঠিত; ইহাদের ভিতরের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমবিশিষ্ট কতকগুলি সংবেদনশীল কোষ আছে। এই লোমগুলি হইতে চূণের কেলাস গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি পিণ্ড বা অটোলিথ্গুলি ঝুলিতে থাকে। মস্তকের অবস্থানের যে-কোন পরিবর্তনে অটোলিথ্গুলি লোমে টান দেয় এবং তাহার ফলে লোমের সহিত সংযুক্ত স্নায়ুতন্তুগুলি উত্তেজিত হয়। অটোলিথ্ যন্ত্র হইতে আগত তাড়নাসমূহ প্রতিবর্তন-ক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এইভাবে দেহের সঠিক অবস্থান বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

অটোলিথ্ যন্ত্রের অন্যতম থলি হইতে উদ্ভূত তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী তিনটি লম্বের সমতলে প্রসারিত হইয়া থাকে। মস্তকের যে-কোন সঞ্চালনে নালী মধ্যস্থিত তরলপদার্থ উত্তেজিত হইয়া স্নায়ুতন্তু-যুক্ত সংবেদনশীল কোষগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইহার ফলে যে তাড়না উদ্ভূত হয় তাহা প্রতিবর্তন-ক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া দেহসঞ্চালনের সময় ভারসাম্য বজায় রাখে।

প্রতিবর্তনের গতি নির্ধারণ বা কেন্দ্রীভূতকরণ (orienting or focusing) :

যে-কোন আকস্মিক শব্দে বা আলোতে মানুষের দেহে প্রতিবর্তন-ক্রিয়া সৃষ্টি হইয়া থাকে; লোকটি অবিলম্বে উৎকর্ণ হইয়া যেদিক হইতে শব্দ বা আলো আসিতেছে সেই দিকে মস্তক ঘুরাইবে।

স্তন্যপায়ী জীবদের মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ অপসারিত করিলেও মধ্য-মস্তিষ্ক অক্ষত থাকিলে শব্দ ও আলো হইতে উদ্ভূত প্রতিবর্তনের গতি-নির্ধারণ ও সেইদিকে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতা থাকিবে।

প্রতিরক্ষা চরিত্রের জন্য অসীম গুরুত্বপূর্ণ এই জটিল প্রতিবর্তনের কেন্দ্রগুলি গুরুমস্তিষ্কের ধূসর-পদার্থের দ্বারা গঠিত করপোরা কোয়াড্রি-জেমিনা নামক অংশে অবস্থিত।

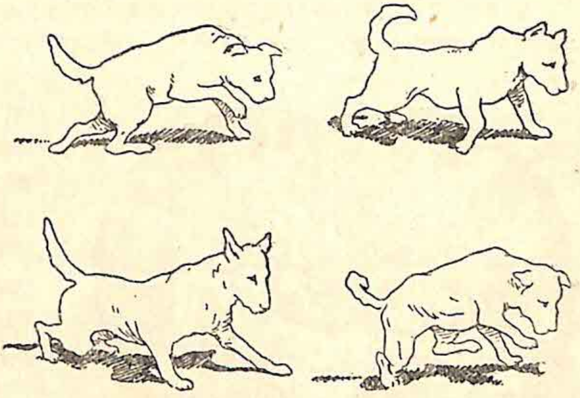
লঘু মস্তিষ্ক (cerebellum) :

ধূসর-পদার্থে গঠিত লঘু-মস্তিষ্কের বহিরাংশে প্রচুর খাঁজ (fissure) থাকার জন্য ইহার আকৃতি ঢেউখেলান। দেহের সমস্ত পেশী এবং মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ, বিশেষত গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স হইতে আগত সমস্ত তাড়না সুষুম্নাকাণ্ড এবং সুষুম্নাশীর্ষকের স্নায়ুকোষ-সংযোগকারী নিউরণগুলির মারফৎ লঘু-মস্তিষ্কে পরিচালিত হয়।

মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের মতই লঘু-মস্তিষ্কও গতি-সঞ্চালনের সমন্বয় সাধনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। লঘু-মস্তিষ্ক আহত হইলে গতি সঞ্চালনের শৃঙ্খলা ও যথার্থতা নষ্ট হইয়া যায়। কুকুরের লঘু-মস্তিষ্ক অপসারণ করিলে ইহার চলনভঙ্গী অস্থির হইয়া পড়ে; সমস্ত দৈহিক সঞ্চালন বিসদৃশ, কোণ-বিশিষ্ট ও কষ্টকৃত হইবে; প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র পেশীর যথাযথ সংকোচন নষ্ট হইয়া যাওয়ার জন্য কুকুরটি সরল রেখায় ইহার গন্তব্যপথে চলিতে পারেনা (১২৩নং চিত্র)।

লঘু-মস্তিষ্ক অপসারিত করা কোন কুকুর মাটিতে রাখা মাংসের টুকরা সঙ্গে সঙ্গে ধরিতে পারেনা, খাদ্যটি ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টায় বারবার মাথা নীচু করিয়া খাদ্যের এদিকে-ওদিকে মুখ ঠুকিতে থাকে এবং এইরূপ বহু ব্যর্থ চেষ্টার পর যেন অকস্মাৎ মিলিয়া গেল এইভাবে শেষপর্যন্ত মাংসখণ্ডটি ধরিয়া ফেলে।

কোন কোন ব্যাধিতে এবং মত্ত অবস্থায় মানুষের লঘু-মস্তিষ্কের কার্যকলাপ ব্যাহত হয়; ইহার ফলে গতি সঞ্চালনে সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়।



১২৩নং চিত্র লঘুমস্তিষ্ক অপসারিত কুকুরের দেহ সঞ্চালন।

লঘু-মস্তিষ্কের প্রধান ভূমিকা হইল স্বতন্ত্র পেশীগুলির সঙ্কোচনের শক্তি, কাল এবং পরস্পরতা (order of succession) সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া—অর্থাৎ গতিসঞ্চালনকে মার্জিত করিয়া তোলা।

৬৫। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের ক্রিয়া-কলাপ

থ্যালামাস ও কর্টেক্স-মধ্যস্থিত কেন্দ্রঃ

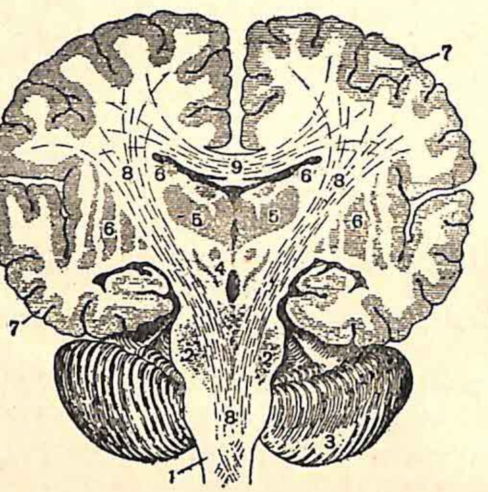
দেহের সমস্ত অংশ হইতে কেন্দ্রীয়-স্নায়ুতন্ত্রে আগত তাড়নাগুলি স্নায়ুকোষ-সংযোগকারী নিউরণগুলির মারফৎ মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে, বিশেষত কর্টেক্সে আসিয়া পৌঁছায়। কিন্তু কর্টেক্সে পৌঁছিবার পূর্বে সমস্ত অন্তর্মুখী তাড়নাকে অন্তর্মস্তিষ্কের থ্যালামাসের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। ধূসর পদার্থ দ্বারা গঠিত থ্যালামাস আসলে একটি স্নায়ুকোষ সমষ্টি। থ্যালামাসের কোষগুলি হইতে স্নায়ুতন্তুসমূহ গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স এবং কর্টেক্সের অন্তর্দেশীয় পেশী-উদ্দীপক বা "মোটর" কেন্দ্রগুলিতে পরিচালিত হয় (১২৪নং চিত্র)।

কর্টেক্স মধ্যস্থিত কেন্দ্রগুলি জটিল দেহ-সঞ্চালন ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কেন্দ্রগুলি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে আনুষঙ্গিক সঞ্চালনগুলিতে—যেমন চলিতে চলিতে হাত দোলান, কথা বলিবার সময় মুখের ভাব পরিবর্তন ইত্যাদিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। রোগীর মুখাবয়ব মুখোসের মত নিশ্চল ও স্থির হইয়া যায়, অথবা বিপরীতভাবে বিভিন্ন ভাব সৃষ্টিকারী পেশীগুলির অত্যাধিক সঙ্কোচনের ফলে একটির পর একটি মুখভঙ্গি সৃষ্টি হইতে থাকে।

ইহা ছাড়া কর্টেক্স-মধ্যস্থিত-কেন্দ্রগুলি ছন্দোবদ্ধ পৌনঃপৌনিক সঞ্চালন (যেমন হাঁটা) এবং সহজাত বৃত্তি সংশ্লিষ্ট জটিল প্রতিবর্তনমূলক সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করিতে সাহায্য করে।

হাইপো-থ্যালামাস-অঞ্চল ঃ

থ্যালামাসের নিম্নস্থিত ধূসর-পদার্থের পিণ্ডগুলি সমগ্র জীবদেহের কার্যকলাপের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। হাইপোথ্যালামাস অঞ্চলের কেন্দ্রগুলি পরিপাক-ক্রিয়া এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। স্নায়ুকোষের উদ্গত অংশগুলি কর্টেক্সের এই অঞ্চলের সহিত কর্টেক্স মধ্যস্থিত কেন্দ্রগুলিকে (subcortical centres) যুক্ত করে এবং ফলে চেষ্টীয় বা পেশী উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া (motor reactions), আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রসমূহ এবং পরিপাক ক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হইয়া থাকে।



১২৪নং চিত্র—মস্তিষ্কের প্রস্থচ্ছেদ

১। সুষুম্নাশীর্ষ; ২। উষ্ণীষক; ৩। লঘু মস্তিষ্ক; ৪। মধ্য মস্তিষ্ক; ৫। থ্যালামাস; ৬। কর্পাস স্ট্রায়েটাম; ৭। গুরু মস্তিষ্কের কর্টেক্স; ৮। গুরু মস্তিষ্কের কর্টেক্স হইতে সুষুম্নাকাণ্ডগামী বহির্মুখী স্নায়ুতন্তুসমূহের পথরেখা (নিম্নে তন্তুগুলি পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে); ৯। গুরু মস্তিষ্কের বাম ও দক্ষিণ অর্ধকে সংযোগকারী।

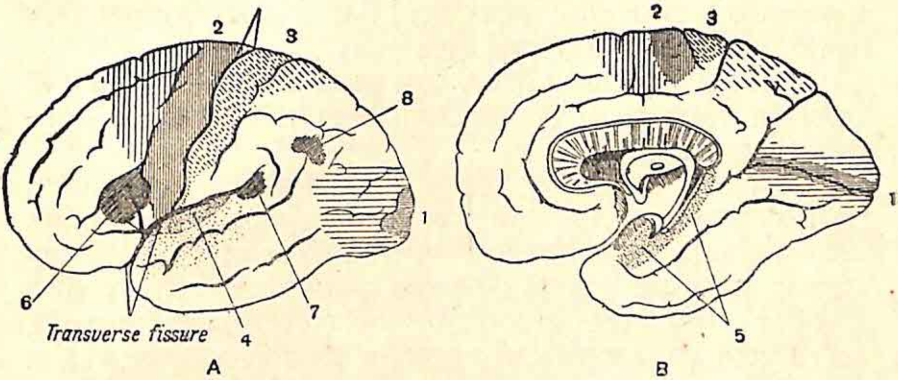
গুরু মস্তিষ্কের কর্টেক্স্ ঃ

গুরু মস্তিষ্কের গোলার্ধদ্বয়ের কর্টেক্স্ উচ্চস্তরের স্নায়বিক কার্যকলাপের যন্ত্র। ইহা চিরপরিবর্তনশীল পরিবেশের প্রতি জীবদেহের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে। বোধ-যন্ত্র, পেশী, কণ্ডরা এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ হইতে অসংখ্য তাড়না নিরন্তর কর্টেক্সের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে। কর্টেক্সগামী স্নায়ুপথগুলি পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে; ফলে, দেহের বাম অর্ধ হইতে আগত তাড়নাগুলি কর্টেক্সের দক্ষিণ গোলার্ধে এবং দক্ষিণ অর্ধ হইতে বাম গোলার্ধে প্রবেশ করে।

গুরু মস্তিষ্কের কর্টেক্স বিভিন্ন অঞ্চলে (lobes) বিভক্ত; যথা—**ললাটাঞ্চল** (frontal), **রগাঞ্চল** (temporal), **শিরকুম্ভাঞ্চল** (parietal) এবং **শিরনিম্নাঞ্চল** (occipital)। ১২৫ (ক) চিত্রে দুইটি বৃহৎ খাঁজ দেখা যাইবে; উহাদের একটি (আড়াআড়ি খাঁজ) রগাঞ্চলকে ললাটাঞ্চল ও শিরকুম্ভাঞ্চল হইতে পৃথক করিয়াছে এবং অপরটি (কেন্দ্রীয় খাঁজ) ললাটাঞ্চল ও শিরকুম্ভাঞ্চলের মধ্যে প্রান্তসীমা নির্ধারণ করে।

কর্টেক্সের বিভিন্ন অংশের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন ভিন্ন। **দর্শনানুভূতি সৃষ্টিকারী** দৃষ্টি-এলাকাটি (visual area) শিরনিম্নাঞ্চলে অবস্থিত।

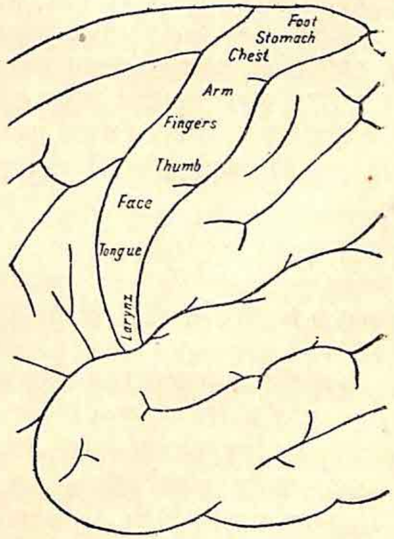
শ্রবণ-এলাকাটি অবস্থিত রগাঞ্চলে। **চর্মের অনুভূতি সংক্রান্ত কেন্দ্রগুলি** কেন্দ্রীয় খাঁজের পিছনে অর্থাৎ শিরকুন্তাঞ্চলের সম্মুখে অবস্থান করে। **চেষ্টীয় বা "মোটর"**



১২৫নং চিত্র—গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের (ক) বাহিরে ও (খ) ভিতরে বিভিন্ন কেন্দ্রের অবস্থান
১। দৃষ্টি কেন্দ্র; ২। পেশী উদ্দীপক কেন্দ্র; ৩। স্পর্শানুভূতির কেন্দ্র; ৪। শ্রবণ কেন্দ্র; ৫। স্বাদ ও ঘ্রাণ কেন্দ্র; ৬। বাচনের পেশী উদ্দীপক কেন্দ্র; ৭। বাচনের শ্রবণ কেন্দ্র; ৮। বাচনের দৃষ্টি কেন্দ্র।

এলাকাটি অবস্থান করে কেন্দ্রীয় খাঁজের সম্মুখে ললাটাঞ্চলের পশ্চাদ্দেশে (১২৬নং চিত্র)। মস্তিষ্কের কোন কোন বিশৃঙ্খলায় কর্টেক্সের স্বতন্ত্র অঞ্চলগুলি আক্রান্ত হয় এবং ফলে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কার্যকলাপে গোলযোগ সৃষ্টি হইয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ চেষ্টীয়-এলাকায় রক্তপাত হইলে দেহের বিপরীত অর্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িবে; কিংবা দৃষ্টি-এলাকায় টিউমার হইলে চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

অস্ত্রোপচারের সময় করোটি কাটিয়া ও মস্তিষ্ক উন্মুক্ত করিয়া বহুবারই কর্টেক্সের বিভিন্ন স্বতন্ত্র অংশের ভূমিকা অনুশীলন করা হইয়াছে। এই ধরনের অস্ত্রোপচারের পূর্বে চেতনা-নাশক ঔষধ ব্যবহার না করিয়া চর্ম ও করোটি কাটিবার সময় রোগী যাহাতে বেদনা বোধ না করে সেই জন্য শুধু স্থানীয় এলাকা অবশকারী বিশেষ ধরণের ঔষধ চর্মের নীচে ইঞ্জেকসন করা হয়। ইহার ফলে মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার করিলেও বেদনা বোধ হয় না। রোগী সারাক্ষণই সম্পূর্ণ সচেতন থাকে; অস্ত্রোপচারক রোগীর সহিত আলাপ করিতে করিতে অস্ত্রোপচার



১২৬নং চিত্র—গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের পেশী উদ্দীপক অঞ্চল

করিতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে যাহাতে অকস্মাৎ ছুরির স্পর্শ না লাগে সেদিকে নজর রাখেন। অস্ত্রোপচারের সময় বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা কর্টেক্সের দৃষ্টি-এলাকা উত্তেজিত হইলে রোগী চোখের সম্মুখ দিয়া অকস্মাৎ এক আলোর দীপ্তি অনুভব করে; চেষ্টীয় এলাকা উত্তেজিত হইলে রোগীর যে-কোন ধরণের দেহসঞ্চালন হইতে পারে।

কর্টেক্সের চেষ্টীয় এলাকার নির্দিষ্ট কোন স্থান উত্তেজিত হইলে সর্বদা একই ধরণের দেহ-সঞ্চালন হইবে; ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে কর্টেক্সে ভিন্ন ভিন্ন পেশী-সমষ্টির নিজস্ব কেন্দ্র আছে।

মিস্‌লাভস্কী, বেখ্‌তেরেভ্‌, বাইকভ ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে কর্টেক্সে এমন কতকগুলি কেন্দ্র আছে যেগুলি উত্তেজিত হইলে আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলির কার্যকলাপ প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। গুরু-মস্তিষ্কের কর্টেক্স এবং মস্তিষ্কের নিম্নাঞ্চলের অন্যান্য অংশের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ক আছে; মস্তিষ্কের নিম্নাংশ হইতে অন্তর্মুখী তাড়নাগুলি কর্টেক্সে প্রবেশ করে এবং বহির্মুখী তাড়নাগুলি কর্টেক্স হইতে নিম্নাংশে চলিয়া যায়। এইভাবে সমস্ত দেহযন্ত্রের কার্যকলাপ কর্টেক্স কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইা থাকে এবং এই নিয়ন্ত্রণকার্য কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অন্যান্য অংশের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়।

পশুদের তুলনায় মানুষের বোধ সংশ্লিষ্ট এবং চেষ্টীয় এলাকা কর্টেক্সের খুব কম অংশ জুড়িয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কর্টেক্সের শতকরা ৩০ ভাগ আয়তন ললাটাঞ্চল কর্তৃক এবং শতকরা ৯ ভাগ নিম্ন-শিরকুম্ভাঞ্চল কর্তৃক অধিকৃত থাকে (১২২নং চিত্র)। এই উভয় অঞ্চলই আকারে ও গঠনে পশুদের অনুরূপ অঞ্চল হইতে যথেষ্ট পৃথক; এই কারণে মানুষের উচ্চস্তরের কার্যকলাপে এই অঞ্চল দুইটি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

মানুষের সুস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ ক্ষমতা মস্তিষ্কের বিশেষ একটি এলাকার সহিত সংশ্লিষ্ট; পশুদের মস্তিষ্কে এই এলাকা নাই। এই বাক-কেন্দ্রটি কর্টেক্সে অবস্থিত। ১২৫ নং চিত্রে বাক্য উচ্চারণের **চেষ্টীয়, শ্রবণ ও দর্শন সংক্রান্ত** কেন্দ্রগুলির অবস্থান দেখান হইয়াছে। এই সমস্ত এলাকায় যে-কোন আঘাত লাগিলে বাক্য উচ্চারণের, কথিত বাক্য শোনার বা লিখিত বাক্য বোঝার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য একথাও বলা প্রয়োজন যে বাক্য উচ্চারণ প্রক্রিয়া কর্টেক্সের শুধু এই এলাকাগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়—অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট।

৬৬। *বর্ধনশীল স্নায়ু-তন্ত্র* (Vegetative Nervous System)

আভ্যন্তীণ দেহযন্ত্রসমূহের স্নায়ু সরবরাহঃ

প্রান্তীয় (peripteral) স্নায়ু-তন্ত্রের যে অংশ মস্তিষ্কের সহিত আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলির সংযোগ সৃষ্টি করে, তাহাকে বর্ধনশীল (vegitative)† স্নায়ু-তন্ত্র বলা হয়। ভেজিটেটিভ্‌ স্নায়ুতন্ত্রের দুইটি বিভাগ আছে—সিম্‌প্যাথেটিক্‌ ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক। আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলির দ্বৈত স্নায়ু সরবরাহ আছে—

† Vegetative শব্দটি ল্যাটিন "Vegetations" হইতে উৎপত্তি হইয়াছে—ইহার অর্থ গাছপালা।

প্রত্যেকেই ভেজিটেটিভ্ স্নায়ু-তন্ত্রের সিমপ্যাথেটিক* ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক অংশের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ু-তন্ত্র হইতে তাড়না পাইয়া থাকে।

ভেজিটেটিভ্ স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের মধ্যে সম্পর্ক:

ভেজিটেটিভ স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ এলাকা হইতে জন্ম লইয়া থাকে।

সিমপ্যাথেটিক তন্ত্রের স্নায়ুগুলি বক্ষ (thoracic) এবং উচ্চ কটিদেশীয় (upper lumbar) কশেরুকাসমূহের সমতলে সুষুম্নাকাণ্ড হইতে উদ্ভূত হয়। আর প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুগুলি বাহির হয় সুষুম্নাশীর্ষক ও মধ্য-মস্তিষ্কের স্বতন্ত্র অংশ এবং সুষুম্নাকাণ্ডের নিম্নাংশ হইতে।

ভেজিটেটিভ্ স্নায়ুতন্ত্রের সহিত মস্তিষ্কের দ্বিমুখী সংযোগ আছে; ইহার স্নায়ুগুলি অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী উভয় ধরণের তন্তু দ্বারা গঠিত।

মস্তিষ্কের যে-সব এলাকা হইতে তাড়নাগুলি ভেজিটেটিভ্ স্নায়ুতন্ত্রে প্রবাহিত হয়, তাহাদেরকে **ভেজিটেটিভ্** কেন্দ্র বলে। উদাহরণস্বরূপ সুষুম্নাশীর্ষকে অবস্থিত হৃৎপিণ্ড-রক্তপ্রণালী, খাদ্য ইত্যাদির কেন্দ্রগুলি ভেজিটেটিভ্ কেন্দ্র। পরিপাক ক্রিয়া এবং আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রসমূহের কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট হাইপোথ্যালামিক অঞ্চলের কেন্দ্রগুলিকে উচ্চস্তরের ভেজিটেটিভ্ কেন্দ্র বলা হয়। অবশ্য এই সমস্ত কেন্দ্রই গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। হৃৎপিণ্ড এবং পেশীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সম্পর্ককে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

সিম্প্যাথেটিক তন্ত্র:

সুষুম্নাকাণ্ডের সম্মুখের মূল (anterior roots) হইতে উদ্ভূত সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুগুচ্ছ মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত **সিম্প্যাথেটিক কাণ্ডে** চলিয়া গিয়াছে; সিম্প্যাথেটিক কাণ্ডের উপর স্নায়ু-কোষ দ্বারা গঠিত কয়েকটি স্ফীতি বা **স্নায়ু-গ্রন্থি** আছে (ganglia)। এখান হইতে অসংখ্য তন্তুগুচ্ছ বিভিন্ন দেহযন্ত্রে চলিয়া গিয়াছে। এই তন্তু-গুচ্ছগুলির উপরেও, বিশেষত বৃহৎ ধমনীগুলি গাত্রে এবং আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলির মধ্যে স্নায়ু-কোষসমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়।

উদর-গহ্বরে মহাধমনীর উপরে একটি সুবৃহৎ স্নায়ুকোষ-সমষ্টি অবস্থান করে—ইহাকে বলা হয় সোলার-প্লেক্সাস্ (solar plexus)। সোলার প্লেক্সাসের সামান্য উত্তেজনাতেই হৃৎপিণ্ড এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের কার্যকলাপে প্রতিবর্তনমূলক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়; প্রচণ্ড উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ইহা হইতেই পাকস্থলীতে কঠিন আঘাত লাগিলে চেতনালোপের কারণ বোঝা যায়। সোলার প্লেক্সাস হইতে সিম্প্যাথেটিক তন্তুগুলি পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃত, প্লীহা, বৃক্ক এবং উদর গহ্বরের অন্যান্য যন্ত্রে চলিয়া যায়।

সুষুম্নাকাণ্ড হইতে যে-কোন দেহযন্ত্র পর্যন্ত সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু-পথ **দুইটি** নিউরণ দ্বারা গঠিত হয়; ইহাদের মধ্যে একটির কাণ্ড সুষুম্নাকাণ্ডে

* Sympathetic শব্দটি গ্রীক্ ভাষার "Sympathes" হইতে উদ্ভূত। **Para** শব্দটির গ্রীক অর্থ "পার্শ্বে"।

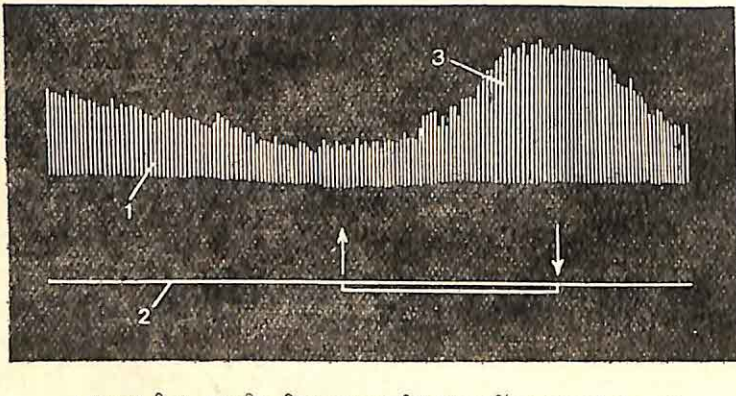
(ধূসর পদার্থের পাশ্বোস্থিত উদ্গত অংশে) এবং অপর কান্ডটি সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুগ্রন্থির (ganglia) উপর অবস্থান করে।

সুষুম্নাকান্ড হইতে উদ্ভূত সিম্প্যাথেটিক তন্তুগুলি সিম্প্যাথেটিক গ্রন্থির (ganglia) স্নায়ু-কোষে যাইয়া শেষ হয়; এই তন্তুগুলি পাতলা আবরণবিশিষ্ট। সিম্প্যাথেটিক গ্রন্থির কোষসমূহ হইতে যে উদ্গত-অংশগুলি সরাসরি দেহযন্ত্র-সমূহে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের কোন শ্বেত আবরণী নাই; ইহাদের বর্ণ ধূসর এবং চেষ্টীয় বা মোটর স্নায়ুতন্তু অপেক্ষা ইহারা অনেক বেশী সূক্ষ্ম।

সিমপ্যাথেটিক্ তন্তুতে উত্তেজনা পরিবহনের হার সাধারণত সেকেন্ডে এক বা দুই মিটারের বেশী হয়না; অপরপক্ষে চেষ্টীয় স্নায়ুতে এই হার সেকেন্ডে প্রায় ১.০০ মিটার।

অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীতে সিম্প্যাথেটিক্ স্নায়ু সরবরাহঃ

কতকগুলি তন্তু সিম্প্যাথেটিক্ কান্ডের কোষসমূহ হইতে পিছন দিকে ফিরিয়া সুষুম্নাকান্ডের সম্মুখের মূলে চলিয়া যায় এবং বহির্মুখী (চেষ্টীয়) তন্তুগুলির সহিত একত্রে অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীসমূহে চলিয়া গিয়াছে। একসময় মনে করা হইত যে এই তন্তুগুলি শুধু রক্তপ্রণালীসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার



১২৭নং চিত্র—পেশীর ক্রিয়াকলাপে সিম্প্যাথেটিক তন্ত্রের প্রভাব।
১। বহুক্ষণ ধরিয়া কর্মরত (অবসাদগ্রস্ত) ব্যাঙের পেশী সঙ্কোচনের রেখাচিত্র; ২। সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর উত্তেজনার নিদর্শন (উর্ধ্বমুখী শরচিহ্নটি উত্তেজনার সূত্রপাত বুঝাইতেছে; নিম্নমুখী শরচিহ্নটি উত্তেজনার শেষ বুঝাইতেছে); ৩। সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর উত্তেজনার ফলে তীব্র সঙ্কোচন।

করে। কিন্তু সোবিয়েত বিজ্ঞানী ওরবেলী (Orbeli) প্রমাণ করেন যে পেশী-তন্তুতেও সিম্প্যাথেটিক্ স্নায়ু সরবরাহ হয়। সিম্প্যাথেটিক্ তন্তুতে প্রবাহিত তাড়নাগুলি পেশীর সঙ্কোচন না করিলেও পেশীর কর্মক্ষমতার উপর প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

একটি পরীক্ষা দ্বারা উপরিউক্ত বক্তব্য প্রমাণ করা সম্ভব। চেষ্টীয় স্নায়ুর উত্তেজনা মারফৎ প্রত্যেকটি পেশীকে বহুক্ষণ যাবৎ ছন্দোবদ্ধভাবে সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য করিয়া অবসন্ন করা যায়। কিন্তু চেষ্টীয় স্নায়ুর ছন্দোবদ্ধ সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে সিম্প্যাথেটিক্ তন্তুগুলিকে উত্তেজিত করিলে অবিলম্বে অবসাদগ্রস্ত পেশীর সঙ্কোচন শক্তিশালী হইবে (১২৭ নং চিত্র)।

প্যারাসিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্র ঃ

প্যারাসিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্র প্রধানত আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রসমূহে স্নায়ু সরবরাহ করিয়া থাকে।

অধিকাংশ আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্র ভেগাস্ স্নায়ু হইতে স্নায়ু সরবরাহ পাইয়া থাকে। সুষুম্নাশীর্ষক হইতে বাহির হইয়া ভেগাস্ স্নায়ু প্রথমে বক্ষ গহ্বর এবং পরে উদর গহ্বরে প্রবেশ করে। এই যাত্রাপথে ভেগাস্ শ্বাস-যন্ত্র-সমূহে (স্বর-যন্ত্র, শ্বাসনালী, ক্লোমশাখা ও ফুসফুসে), হৃৎপিন্ডে এবং পাচন যন্ত্রসমূহে (গল-নালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, অগ্ন্যাশয়, যকৃতে) শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। মূত্রাশয় এবং বৃহদন্ত্রে সুষুম্নাকান্ড হইতে উদ্ভূত প্যারাসিম্প্যাথেটিক্ স্নায়ু সরবরাহ সরবরাহ হইয়া থাকে।

আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রসমূহে দ্বৈত স্নায়ুসরবরাহের তাৎপর্য ঃ

সিম্প্যাথেটিক্ ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক্ স্নায়ুদ্বয় একই দেহযন্ত্রে তাড়না বহন করিয়া বিপরীতধর্মী ক্রিয়া সাধন করে (৩নং তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৩নং তালিকা

বিভিন্ন দেহযন্ত্রের উপর সিমপ্যাথেটিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিকের প্রভাব ঃ

দেহযন্ত্রের নাম	সিমপ্যাথেটিক প্রভাব	প্যারাসিমপ্যাথেটিক প্রভাব
হৃৎপিন্ড ...	নাড়ীর গতি তীব্রতর ও দ্রুততর করে	নাড়ীর গতি মন্থর হয়
চর্মের ও উদর গহ্বরের যন্ত্রগুলির রক্তপ্রণালী ...	সঙ্কোচন	প্রসারণ
হৃদপিন্ডের এবং অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীর রক্ত-প্রণালী ...	প্রসারণ	সঙ্কোচন
অন্ত্রনালী ...	আন্দোলন (peristalsis) হ্রাস	আন্দোলন বৃদ্ধি
মূত্রাশয় ...	শ্লথকরণ	সঙ্কোচন
চক্ষু ...	তারারন্ধ্রের (pupil) প্রসারণ	তারারন্ধ্রের সঙ্কোচন

সিম্প্যাথেটিক্ ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক্ পথবাহী তাড়নার তীব্রতা পরিবর্তিত হইতে পারে। ইহার ফলে দেহযন্ত্রগুলির ক্রিয়াকলাপেও ত্বরিৎ পরিবর্তন সাধিত হইবে। দ্বৈত স্নায়ু সরবরাহের জন্য দেহযন্ত্রগুলির কার্যকলাপ অধিকতর সঠিক এবং বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে জীবদেহ তাহার পরিবর্তিত প্রয়োজনের সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে।

অনুশীলনী ঃ

(১) স্নায়ুতন্ত্রের গুরুত্ব কি?
(২) স্নায়ু-কলার চরিত্রগুলি কি কি?
(৩) প্রতিবর্তন-ক্রিয়া কাহাকে বলে? প্রতিবর্তন-চক্রের অর্থ কি?
(৪) অন্তর্মুখী তাড়নার গুরুত্ব কি?
(৫) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিরোধক-প্রক্রিয়া (inhibition) কোন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়?

(৬) ভ্রূণের গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখ, পশ্চাৎ ও মধ্য স্ফোটক হইতে মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশের বিকাশ হয়?
(৭) সুষুম্নাকাণ্ড ও গুরুমস্তিষ্কের ধূসর ও শ্বেত-পদার্থের বিন্যাস বর্ণনা কর।
(৮) মেরুদণ্ডী জীবদের মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশের প্রধান চরিত্রগুলি কি কি?
(৯) স্তন্যপায়ী জীব ও মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে পার্থক্য কি?
(১০) সুষুম্নাশীর্ষকের ক্রিয়া-কলাপ বর্ণনা কর।
(১১) পেশীর কর্মতৎপরতা এবং দেহের স্বাভাবিক অবস্থান কিভাবে বজায় থাকে?
(১২) লঘু-মস্তিষ্কের ভূমিকা কি?
(১৩) মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের ক্রিয়া-কলাপ বর্ণনা কর।
(১৪) দেহ-সঞ্চালনের সমন্বয় কিভাবে সাধিত হয়?
(১৫) ভেজিটেটিভ্ স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়া-কলাপের বৈশিষ্ট্য কি কি?
(১৬) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন্ কোন্ অংশ হইতে সিমপ্যাথেটিক ও প্যারা-সিমপ্যাথেটিক্ স্নায়ুকলার উৎপত্তি হয়?

৬৭। *বোধোদ্দীপক যন্ত্র* (Sense Organs)

ধারক (Receptors) **:**

প্রত্যেকটি দেহযন্ত্রে কতকগুলি ধারণক্ষম স্নায়ু-প্রান্ত বা ধারক আছে; ইহারা উত্তেজনাকে কেন্দ্রীয়-স্নায়ু-তন্ত্রে বহন করিয়া লইয়া যায়। ধারকসমূহ হইতে প্রবাহিত অন্তর্মুখী তাড়নাগুলি স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ ইহারা স্নায়ু-তন্ত্রের উত্তেজনা-প্রবণতাকে একটি নির্দিষ্ট স্তরে রাখিয়া দেয়। তাহা ছাড়া এই তাড়নাগুলিই জীবদেহের প্রতিবর্তন ক্রিয়ার উৎস হিসাবে কাজ করে।

কতকগুলি ধারক দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্র, পেশী, কণ্ডরা ও অস্থিসন্ধিতে উদ্ভূত উত্তেজনার ধারক হিসাবে কাজ করে; দেহগাত্রের উপরিভাগে অবস্থিত অপর কতকগুলি ধারক বহির্জগৎ হইতে আগত উত্তেজনা গ্রহণ করে।

ধারকসমূহের বৈশিষ্ট্যকরণ:

গঠনের দিক হইতে সরলতম ধারক হইল তথাকথিত মুক্ত-স্নায়ুগুলি (১২৮-ক নং চিত্র)। চাপ বা প্রসারণ, তাপ বা ঠাণ্ডা, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি হইতে উদ্ভূত যে-কোন প্রচণ্ড উত্তেজনায় এই মুক্ত-স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হইয়া থাকে।

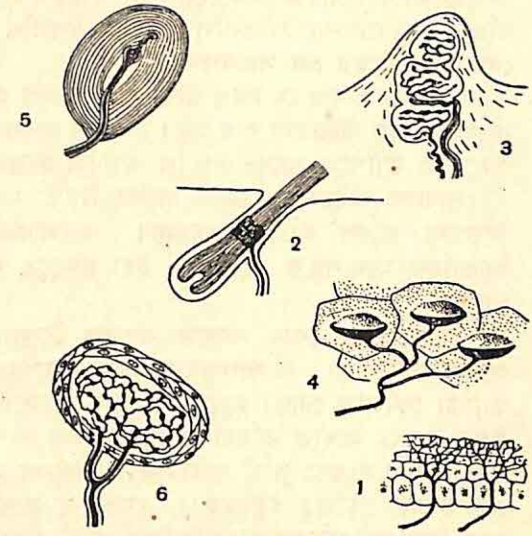
অন্যান্য ধারকগুলি কিছুটা জটিলতর হওয়ার ফলে ইহারা বিশেষ ধরনের উত্তেজনায় সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উত্তেজনার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, চর্মের কতকগুলি স্নায়ু-প্রান্ত লোম-মূলের চারিদিকে আবেষ্টন করিয়া থাকে। (১২৮-খ নং চিত্র)। চর্মের গভীর স্তরে

অবস্থান করার জন্য তাপ বা ঠাণ্ডার ন্যায় বাহিরের উত্তেজনা এই ধারকগুলিতে পৌঁছাইতে পারেনা; কিন্তু লোমের সামান্যতম সঞ্চালনে—যেমন, লোম স্পর্শ করিলে বা মৃদু বাতাসে লোমটি আন্দোলিত হইলে ইহারা সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে।

পুরু আবরণীতে (capsule) ঢাকা চর্মের অন্যান্য ধারকগুলি স্পর্শ বা চাপে খুব বেশী সংবেদনশীল নয়—কিন্তু অপর সামান্যতম তারতম্যেই ইহারা উত্তেজিত হইয়া পড়ে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্য ধারকগুলি অতীব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়া থাকে—অর্থাৎ আপন আপন স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ উত্তেজনা দ্বারা ইহাদিগকে উত্তেজিত করা যাইতে পারে।



১২৮নং চিত্র—চর্মের ধারক।
১। মুক্ত স্নায়ুপ্রান্ত; ২। কেশমূলে স্নায়ুপ্রান্ত; ৩-৪। স্পর্শ-কোষ; ৫-৬। তাপ ও ঠাণ্ডার ধারক স্নায়ুপ্রান্ত।

বোধোদ্দীপক যন্ত্র ঃ

প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারক পারিপার্শ্বিক মাধ্যমে যে সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে, সে-সম্পর্কে সঙ্কেতদানকারী এক একটি অতীব সংবেদনশীল যন্ত্র। ইহার ফলে জীবদেহের পক্ষে উত্তেজনাগুলির যথাযথ চরিত্র অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। সঙ্কেতদানকারী এই যন্ত্রগুলিকেই বোধোদ্দীপক যন্ত্র বলা হয় কারণ ইহাদের সাহায্যেই বহির্জগতকে এবং আমাদের দেহকে আমরা অনুভব করিতে পারি, উপলব্ধি করিতে পারি।

মানুষের চেতনায় বহির্বিশ্বের প্রতিফলন ঃ

বহির্বিশ্বের বস্তু এবং ঘটনাবলী বিভিন্ন বোধ-যন্ত্রের উপর একই সঙ্গে কাজ করিয়া আমাদের মধ্যে বিভিন্ন অনুভূতি জাগায়। হাতে একটি আপেল ধরিলে আমরা ইহাকে দেখিতে পাই, স্পর্শ করি, ইহার গন্ধ পাই এবং ওজন উপলব্ধি করি; কামড়াইলে আমরা ইহার স্বাদও পাইয়া থাকি। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র অনুভূতি আমাদের চেতনায় আপেলটির নির্দিষ্ট চরিত্রের প্রতিফলন জাগায়।

আমাদের চতুস্পার্শ্বস্থ জগতে যে-সব বস্তু ও ঘটনার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে, সেইগুলিই আমাদের সমস্ত অনুভূতির উৎস। বস্তু এবং ঘটনাবলী আমাদের বোধ-যন্ত্রসমূহের উপর কাজ করে। বোধ-যন্ত্রে যে তাড়না জাগ্রত হয়, সেইগুলি গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের নির্দিষ্ট অংশে পরিবাহিত হইয়া এক **মানসিক প্রক্রিয়া** (psychical process) বা অনুভূতির উদ্রেক হইয়া থাকে। কর্টেক্সের জটিল ক্রিয়া-কলাপের ফলে অনুভূতির ভিত্তিতে **উপলব্ধি** (perception) জাগ্রত

হয় এবং ইহা চেতনায় প্রতিফলিত হইয়া থাকে; এই উপলব্ধি ও চেতনার প্রতিফলন বস্তু ও ঘটনার (বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, ওজন ইত্যাদি) স্বতন্ত্র চরিত্রভিত্তিক নয়—সামগ্রিক ভাবেই হইয়া থাকে।

এইভাবে বোধ-যন্ত্রসমূহের ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া-কলাপের ফলে আমরা বহির্বিশ্বকে চেতনায় প্রতিফলিত করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি।

বোধ-যন্ত্রসমূহের ভ্রম সংশোধনঃ

কোন বোধ-যন্ত্র যে-সমস্ত উত্তেজনায় অভ্যস্ত হইয়া যায় সেগুলিকে স্বাভাবিক বা **যথোপযুক্ত উত্তেজনা** বলা হয়। অবশ্য অনভ্যস্ত উত্তেজনাতেও ঐ একই রকম অনুভূতি জাগিতে পারে; এগুলি অপ্রতুল উত্তেজনা নামে পরিচিত।

সাধারণ অবস্থায় আলোর ধারকগুলিতে আলোকরশ্মি ব্যতীত অন্য কোন উত্তেজনা প্রবেশ করিতে পারেনা। আলোকরশ্মি দৃষ্টিযন্ত্রের পক্ষে একটি স্বাভাবিক যথোপযুক্ত উত্তেজনা; ইহা চক্ষুতে যথাযথ অনুভূতি সৃষ্টি করিয়া থাকে।

অবশ্য কোন কোন অবস্থায় অপ্রতুল উত্তেজনা দ্বারাও আলোকের অনুভূতি জাগ্রত করা যায়। অস্ত্রোপচারের সময় চক্ষু অপসারিত করিলে ও দৃষ্টি-স্নায়ু কাটিয়া ফেলিলে রোগী মুহূর্তের জন্য আলোর ঝলক্ অনুভব করে। রগের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিয়া দৃষ্টি-স্নায়ু বা অপ্‌টিক স্নায়ুর দৈহিক উত্তেজনা এবং দৃষ্টির ব্যাঘাত সৃষ্টি করিলেও আলোকের অনুভূতি জাগিবে ("তারা দেখা" এই ভাবেই প্রচলিত হইয়াছে)। যেভাবেই স্নায়ুটিকে উত্তেজিত করা হউক না কেন, ইহা গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সস্থিত দৃষ্টি অঞ্চলে তাড়না প্রেরণ করিয়া আলোর অনুভূতি সৃষ্টি করিবে।

একথা মনে হইতে পারে যে একই বোধ-যন্ত্রের উপর বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনাপ্রসূত একই ধরণের অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার ফলে নিরবিচ্ছিন্ন ভ্রম হইতে পারে—পারিপার্শ্বিক বস্তু ও ঘটনাবলীর সঠিক প্রতিফলনে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে! কিন্তু বাস্তবে সেরূপ কিছু ঘটে না।

প্রথমত, জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ যথোপযুক্ত উত্তেজনা-প্রসূত স্বাভাবিক অনুভূতি এবং অসাধারণ ও অস্বাভাবিক উত্তেজনাপ্রসূত অনির্দিষ্ট অবস্থা অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য সহজেই বুঝিতে পারে। শ্রবণ যন্ত্রের মধ্যে রক্তের চাপবৃদ্ধিজনিত শব্দ বা কান সোঁ সোঁ করাকে আমরা কখনও বাহিরের শব্দ বলিয়া ভুল করি না।

দ্বিতীয়ত, একটি বোধযন্ত্র কর্তৃক প্রাপ্ত অনুভূতি সর্বদাই অন্যান্য বোধযন্ত্র দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

মানুষের বাস্তব কার্যকলাপ, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং বোধযন্ত্রসমূহের পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সম্ভাব্য ভ্রমগুলি সংশোধন করা সহজ হয় এবং ফলে পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু ও ঘটনাবলী আমাদের চেতনায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে।

ধারকসমূহের অনুভূতিপ্রবণতা বা সংবেদনশীলতাঃ

স্বাভাবিক উত্তেজনার অনুপাতে বোধযন্ত্রগুলির অনুভূতিপ্রবণতার মাত্রা এত উচ্চ যে অনেক সময় সর্বাপেক্ষা সঠিক পদার্থ-বিজ্ঞানের যন্ত্রও ইহার তুলনায় নিকৃষ্ট।

আবহাওয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থাকিলে এবং আলোক অবশোষণ না-করিলে

৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাতির আলোক-শক্তি চক্ষুর ধারকগুলিকে উত্তেজিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

বহু জন্তুর তুলনায় মানুষের ঘ্রাণানুভূতি অনুন্নত হইলেও মানুষ এক লিটার বাতাসে এক মিলিগ্রামের কয়েক দশ-সহস্রাংশ বা লক্ষাংশ পরিমাণ গ্যাসের গন্ধে সংবেদনশীল।

উত্তেজনার শক্তিতে অভ্যস্ত হওয়াঃ

উত্তেজনার শক্তির সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অনুভূতিপ্রবণতাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা বোধ-যন্ত্রগুলির অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র।

অন্ধকারের তুলনায় উজ্জ্বল সূর্যালোকে দৃষ্টি-যন্ত্রের অনুভূতি-প্রবণতা বহু হাজার গুণ হ্রাস পাইয়া থাকে। এই জন্যই উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত কক্ষ হইতে আধা-আঁধারি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু ক্রমে দৃষ্টিধারকগুলি স্তিমিত আলোকে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং তখন চারিদিকের বস্তুগুলি পরিস্কারভাবে চেনা যায়। ধারকগুলি অন্ধকারে অভ্যস্ত হইবার পর ইহাদের অনুভূতি-প্রবণতা এত উচ্চমাত্রায় উঠিয়া যায় যে অকস্মাৎ কোন উজ্জ্বল আলোর সম্মুখে চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে।

বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থাহীন জনাকীর্ণ কোন ঘরে প্রথম প্রবেশ করিবার সময় এক রকম কড়া বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে লোকটি ঘরের বাতাসে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং তখন আর কোন দুর্গন্ধ পায়না; অর্থাৎ ঘ্রাণের ধারকগুলির অনুভূতিপ্রবণতা তখন হ্রাস পায়।

উত্তেজনার শক্তির সহিত সামঞ্জস্য বিধানের ফলে পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের (পরিবেশের) সীমাহীন পরিবর্তন সত্বেও জীবদেহের স্বাভাবিক কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হয়।

৬৮। চর্ম্ম, শ্লেষ্মা-ঝিল্লী এবং দেহসঞ্চালনকারী যন্ত্র-সমূহের ধারক

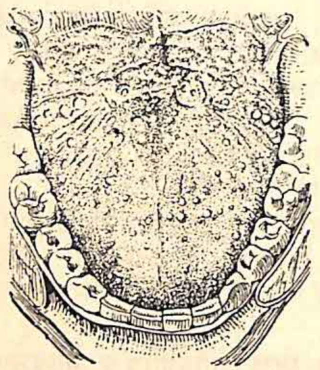
চর্মের ধারকঃ

চর্মের বহিরাংশে উত্তেজনার ফলে স্পর্শ, তাপ, ঠান্ডা, বেদনা ইত্যাদির অনুভূতি জাগ্রত হয়। একটি পেন্সিলের তীক্ষ্ণাগ্র ভাগ চর্মের সংস্পর্শে আনিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেকটি অনুভূতির পৃথক পৃথক ধারক আছে; কোন অংশে স্পর্শানুভূতি, আবার কোন কোন স্থানে তাপ, ঠান্ডা বা বেদনা বোধ জাগিবে।

রুগ্ন দেহে অনুশীলন চালাইয়া বিভিন্ন অনুভূতির স্বতন্ত্র ধারকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। কোন কোন ব্যাধিতে স্পর্শানুভূতি নষ্ট হইলেও বেদনাবোধ থাকিয়া যায়। অপরপক্ষে ক্ষুদ্র অস্ত্রোপচারের সময় স্থানীয়-অংশ-অবশকারী ঔষধ প্রয়োগে চর্মের নির্দিষ্ট কোন অংশে বেদনাবোধ না থাকিলেও রোগী ছুরির স্পর্শ অনুভব করিয়া থাকে।

উত্তেজনা ধারণকারী স্নায়ু-প্রান্তগুলি চর্মে অসমভাবে ছড়াইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ পায়ের চর্মের এক বর্গ সেণ্টিমিটার অংশে ১০ হইতে ১৫ স্পর্শবোধক কেন্দ্র বা বিন্দু আছে, অথচ হাত বা মুখ-চর্মের বিভিন্ন অংশে এই বিন্দুর সংখ্যা ১৫০ হইতে ৩০০ পর্যন্ত হইতে পারে।

পৃথকভাবে অনুভূত একই সঙ্গে দুইটি স্পর্শের ন্যূনতম দূরত্ব মাপিয়া স্পর্শবোধের তীব্রতা নির্ধারণ করা যায়। ৫০ হইতে ৬০ মিলিমিটার দূরত্ব-বিশিষ্ট একটি কম্পাসের দুইটি মুখ পৃষ্ঠ-চর্মের সংস্পর্শে আনিলে একটি মাত্র স্পর্শ অনুভূত হইবে—দুইটি স্পর্শবোধ হইবে না। কম্পাসের মুখ দুইটির দূরত্ব বাড়াইয়া দিলে তবেই দুইটি স্পর্শ অনুভব করা যাইবে। প্রকোষ্ঠের (forearm) চর্মের বিভিন্ন অংশে কম্পাসের অগ্রভাগ দুইটি ৩০ হইতে ৪০ মিলিমিটার দূরে রাখিয়া স্পর্শ করিলে দুইটি স্পর্শের অনুভূতি পাওয়া যায়। অঙ্গুলি এবং জিহ্বার অগ্রভাগে কম্পাসের মুখ দুইটি এক বা দুই মিলিমিটার দূরে রাখিলেও স্পর্শানুভূতি হইয়া থাকে।



১২৯নং চিত্র—জিহ্বার উপরাংশ।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা আঘ্রাণের যন্ত্র :

ঘ্রাণ যন্ত্রটি নাসা গহ্বরের উপরের অংশের শ্লেষ্মা-ঝিল্লীতে অবস্থিত। ইহার ধারক **ঘ্রাণ-কোষগুলি** শুধু বাস্পীয় পদার্থের প্রতি অনুভূতি-প্রবণ; তরল পদার্থ ইহাদের উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারেনা। সুতরাং নাসা-গহ্বরে কোন তরল পদার্থ প্রয়োগ করিলে কোন ঘ্রাণানুভূতি নাও পাওয়া যাইতে পারে; প্রশ্বাসের সহিত জোরে টানিয়া লইলে, অর্থাৎ পদার্থটির বাস্পীয় কণাগুলি তরল অংশ হইতে পৃথক হইলে তবেই ঘ্রাণানুভূতি পাওয়া যায়।

প্রশ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া বাতাস নাসা-গহ্বরের নিম্নাংশ দিয়া চলিয়া যায়। অবশ্য গন্ধযুক্ত পদার্থের অণুগুলি পরিব্যাপ্ত হইয়া নাসিকার যে অংশে **ঘ্রাণ-কোষগুলি** অবস্থিত সেইখানে প্রবেশ করিতে পারে।



১৩০নং চিত্র—জিহ্বার প্যাপিলা বা উমত অংশ।
১। স্বাদ-কোরক; ২। উহা হইতে উদ্গত স্নায়ুপ্রান্ত; ৩। শ্লেষ্মাগ্রন্থি।

জীব-জন্তুরা ঘ্রাণ, দৃষ্টি এবং শ্রবণ যন্ত্রের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেদিগকে মানাইয়া লইতে পারে; শত্রু বা শিকারের উপস্থিতির আঘ্রাণ পাওয়া ইহার অন্যতম উদাহরণ।

স্বাদ-যন্ত্র :

স্বাদ-কোরকগুলি (taste buds) মুখ-গহ্বরের, বিশেষত জিহ্বার শ্লেষ্মা-

ঝিল্লীর উপর অবস্থিত (১২৯ ও ১৩০নং চিত্র)। স্বাদ-কোরক হইতে উদ্ভূত স্নায়ুতন্তুগুলি সুষুম্নাশীর্ষকে তাড়না পরিবহন করে এবং সেখান হইতে এইসব তাড়না গুরু-মস্তিষ্কের কর্টেক্সে অবস্থিত **স্বাদ-কেন্দ্রে** চলিয়া যায়। শুধু দ্রবণীয় পদার্থগুলিই স্বাদধারকসমূহকে উত্তেজিত করিতে পারে; মুখের মধ্যে দ্রবীভূত হইতে শুরু করিবার পর চিনির মিষ্টত্ব উপলব্ধি করা যায়।

কয়েকটি সূক্ষ্ম রং-এর তুলি লইয়া এক একটিকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ-যুক্ত পদার্থে ভিজাইয়া জিহ্বার বিভিন্ন অংশে সাবধানে স্পর্শ করাইলে মিষ্ট, তিক্ত, লবণাক্ত ও অম্ল স্বাদের পৃথক পৃথক ধারকের অস্তিত্ব বোঝা যাইবে।

মানুষের স্বাদ ও ঘ্রাণানুভূতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। উভয় অনুভূতিই মানুষকে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝিতে এবং ইহাদের খাদ্যোপ-যোগিতা নির্ধারণ করিতে সাহায্য করে। পেঁয়াজ, আপেল, রুটি বা অন্য কোন খাদ্য ভক্ষণ করার সময় বিভিন্ন মাত্রার উত্তেজনা ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ-ধারকের উপর কাজ করিয়া থাকে, এবং একই সঙ্গে উত্তেজকের গন্ধে প্রাণ-কোষগুলিও উত্তেজিত হইয়া পড়ে। ফলে, এক জটিল অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং ইহাকেই আমরা বিশেষ কোন খাদ্যের স্বাদ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। মস্তকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘ্রাণ-ধারকগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইলে খাদ্য স্বাদহীন মনে হয়।

দৈহিক অবস্থান সম্পর্কিত অনুভূতিঃ

দৈহিক অবস্থানের প্রতিটি পরিবর্তনে পেশী, কণ্ডরা, অস্থি-সন্ধির আবরণী ও বন্ধনী প্রভৃতি অঙ্গ সঞ্চালনের যন্ত্রসমূহে অবস্থিত ধারকগুলিতে উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়া থাকে।

এই উত্তেজনা হইতে উদ্ভূত তাড়নাগুলি দেহের স্বতন্ত্র অংশসমূহের অবস্থান, ইহাদের সঞ্চালন, পদার্থের ওজন (অর্থাৎ কোন পদার্থ ধরিয়া রাখিতে বা বহন করিতে যে পরিমাণ পেশী-প্রসারণের প্রয়োজন) ইত্যাদি সম্পর্কে অনুভূতির উৎস হিসাবে কাজ করে।

সুষুম্নাকাণ্ডের কোন কোন ব্যাধিতে দেহের নিম্নপ্রান্ত (পা) হইতে মস্তিষ্কে তাড়না বহনকারী অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্তুগুলি আহত হয়। কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ড হইতে পায়ের পেশীতে তাড়না বহনকারী বহির্মুখী স্নায়ুপথ অক্ষুণ্ণ থাকে। রোগী পা বা পায়ের পাতার যে-কোন রকম সঞ্চালন করিতে পারে; কিন্তু পায়ের পেশী এবং অস্থি-সন্ধি হইতে কোন অনুভূতি না পাওয়ায় পা দুইটি কোন অবস্থায় আছে—অর্থাৎ সোজা অথবা বাঁকান আছে, তাহা জানিতে পারেনা। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী হাঁটিবার সময় সর্বদা পা ও পায়ের পাতার দিকে তাকাইয়া থাকে—অন্যথায় পায়ের সঞ্চালনে সমন্বয় সাধন করিতে না পারিয়া সে পড়িয়া যাইবে।

অঙ্গ সঞ্চালন এবং ভারসাম্য বজায় রাখার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুভূতির জন্য অটোলিথ-প্রক্রিয়া ও অর্ধবৃত্তাকারে নালীসমূহের সবিশেষ গুরুত্ব আছে।

অনুশীলনী ঃ

(১) নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি অনুশীলন কর ঃ একটি হাত গরম জলে এবং অপর হাতটি ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া রাখ; ইহার পর দুই হাত একত্রে এক পাত্র স্বাভাবিক তাপযুক্ত (ঘরের তাপ অনুযায়ী) জলে ডুবাও; দক্ষিণ ও বাম হাতে স্বতন্ত্র তাপানুভূতি কি ভাবে ব্যাখ্যা করিবে?

(২) ৩ বা ৪ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ একটি ঘোড়ার বা শূকরের কেশর বা লোম লইয়া এক টুকরা মোমযুক্ত একটি ক্ষুদ্র কাঠিতে বা এক টুকরা নরম রুটিতে আটকাইয়া দাও। এখন এক হাতে কাঠিটি লইয়া অপর হাতের মণিবন্ধের পশ্চাৎভাগের চর্মে সাবধানে স্পর্শ কর। যথেষ্ট ধৈর্য থাকিলে বুঝিতে পারিবে যে ঐ লোমের স্পর্শ কোন কোন স্থানে স্পর্শানুভূতি, কোন স্থানে বিন্ধ হওয়ার অনুভূতি এবং কোন স্থানে উত্তাপ বা ঠাণ্ডা অনুভূতি জাগাইতেছে। ইহাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করিবে?

৬৯। চক্ষু

চক্ষুর গঠনঃ

দৃষ্টি-যন্ত্র বা চক্ষুদ্বয় করোটির অক্ষি-গহ্বরে অবস্থিত (৭নং প্লেট) চক্ষু-গোলক দুইটি (eye-balls) অক্ষি-গহ্বরে অনায়াসে সঞ্চালিত হয় এবং অক্ষি-গোলকের পেশীগুলির সাহায্যে বিভিন্ন দিকে ঘুরিতে পারে। সম্মুখ-ভাগে ইহারা অক্ষিপুট (eye lids) দ্বারা সংরক্ষিত থাকে। অক্ষি-গহ্বরের মধ্যে চক্ষুর বহিঃস্থ কোনে অশ্রুক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলি (lachrymal glands) অবস্থিত; এই গ্রন্থিগুলি হইতে নিঃসৃত তরলপদার্থ বা অশ্রু চক্ষুগোলককে আর্দ্র রাখে ও ইহাকে শুষ্ক হইতে দেয়না। অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ অশ্রুবাহী ডাকট্ দ্বারা নাসাগহ্বরে চলিয়া যায়।

চক্ষুগোলকের অন্তর্ভাগ স্বচ্ছ, জেলির ন্যায় গাঢ় তরল পদার্থে (vitreous body) পূর্ণ থাকে।

চক্ষু-গোলকের গাত্র তিনটি স্তবকে গঠিত।

বাহিরে, ঘন অস্বচ্ছ **শ্বেত স্তবক** (বা sclera); সম্মুখে শ্বেত-স্তবক বা শ্বেত-মণ্ডলটি অচ্ছোদ পটলের (cornea) সহিত মিলিত হইয়াছে।

শ্বেত-মণ্ডলের নীচে রক্তবহাপ্রণালী পূর্ণ স্তবক (vascular coat)। এই স্তবকের ভিতরের গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ রঞ্জকপূর্ণ কোষগুলি অক্ষিগাত্রকে আলোকে অভেদ্য করিয়া থাকে।

অচ্ছোদপটলের (cornea) পশ্চাতে অবস্থিত **কনীনিকা** (iris) রক্তবহা প্রণালী পূর্ণ স্তবকের সহিত সংযুক্ত। কনীনিকাতে প্রচুর পরিমাণ রঞ্জক পদার্থ আছে; ইহারা চক্ষুকে বিভিন্ন বর্ণ দান করিয়া থাকে। কনীনিকার মধ্যস্থলে একটি গোলাকার ছিদ্র আছে; ইহার নাম **তারারন্ধ্র** (বা pupil)। কনীনিকার মসৃণ পেশীতন্তুগুলির সঙ্কোচনের ফলে তারারন্ধ্রের সঙ্কোচন ও প্রসারণ হইয়া থাকে। তারারন্ধ্রটি সম্প্রসারিত ও ক্ষুদ্র হইয়া চক্ষুতে আগত আলোকের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

তারারন্ধ্রের ঠিক পশ্চাতে স্বচ্ছ ও উভয় পার্শ্বে উত্তল (convex) অক্ষি-মুকুরটি অবস্থিত। সিলিয়ারি পেশীদের সহায়তায় অক্ষিমুকুরটি প্রসারিত বা শ্লথ—অর্থাৎ আরও চ্যাপ্টা অথবা আরও উত্তল হইতে পারে। অচ্ছোদপটল ও অক্ষিমুকুরের অন্তর্বর্তী স্থানটি জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে।

অক্ষিগোলকের তৃতীয় বা আভ্যন্তরিক স্তবকটিকে **অক্ষিপট** (retina) বলা হয়। অক্ষিপট হইতে অক্ষিবহ বা অপ্টিক স্নায়ুর তন্তুগুলি প্রসারিত হইয়াছে; ইহা অক্ষিগোলকের পশ্চাৎ ভাগ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

দণ্ড ও শঙ্কু (Rods and Cones) ঃ

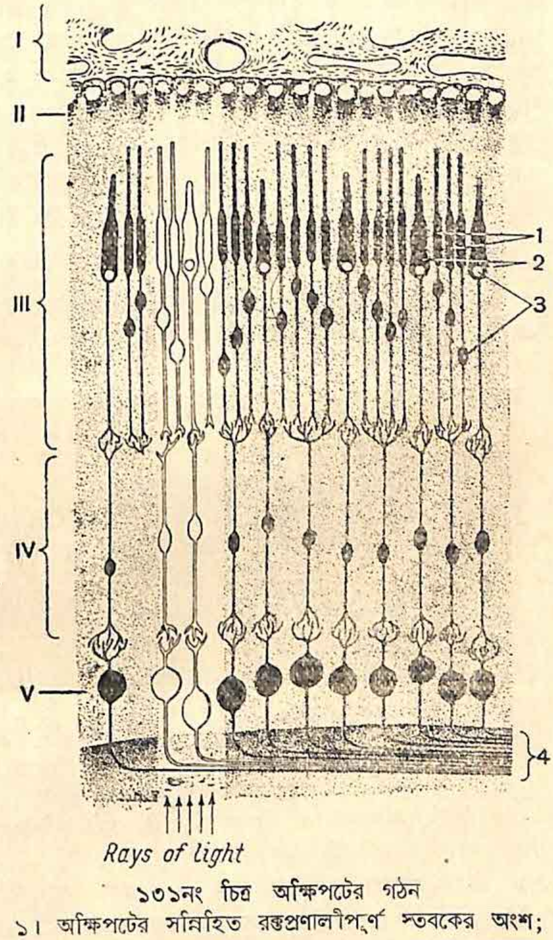
অক্ষিপটে প্রচুরসংখ্যক ঘনসন্নিবিষ্ট এবং আলোক রশ্মিতে সংবেদনশীল কোষ বা **দণ্ড ও শঙ্কু** (বা কোন) আছে। অনুমান করা হয়, মানব চক্ষুতে প্রায় ৭০ লক্ষ শঙ্কু বা কোন এবং কয়েক কোটি দণ্ড আছে।

আলোক-রশ্মি অক্ষিপটে পড়িয়া দণ্ড ও শঙ্কুগুলির রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় এবং তাহার ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনা প্রথমে প্রথম সারির স্নায়ুকোষগুলিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পরে দ্বিতীয় সারিতে ছড়াইয়া পড়ে; এইখানে অক্ষিপটের সমস্ত স্নায়ুকোষের উদ্গত অংশগুলি মিলিত হইয়া অক্ষির দৃষ্টিবহ বা অপ্টিক স্নায়ু গঠন করে (১৩১ নং চিত্র)। এই স্নায়ু মারফৎ উত্তেজনা মস্তিষ্কে পরিবাহিত হয়।

দিনের আলো এবং ঊষা বা গোধূলির আলো দেখা ঃ

মানব চক্ষুর কোন্ বা শঙ্কুগুলি বর্ণানুভূতির সহিত এবং দণ্ডগুলি শুধু আলোকানুভূতির সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন্ বা শঙ্কুগুলির অনুভূতিপ্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম; সেইজন্য গোধূলিতে ইহাদের ক্রিয়াকলাপ থাকেনা এবং তখন মানুষ বর্ণের পার্থক্য নির্ধারণ করিতে পারেনা। অপরপক্ষে দণ্ডগুলি উচ্চ মাত্রায় অনুভূতি-প্রবণ।

খাদ্যে কোন কোন ভিটামিন ইত্যাদি কম পড়িলে রাত-কানা নামক এক ধরণের ব্যাধি হইয়া



১৩১নং চিত্র অক্ষিপটের গঠন

১। অক্ষিপটের সন্নিহিত রক্তপ্রণালীপূর্ণ স্তবকের অংশ; ২। রঞ্জন-কোষের স্তবক; ৩। দণ্ড ও শঙ্কুর স্তবক; ৪। দণ্ড ও শঙ্কু হইতে আগত তাড়না গ্রহণকারী পর পর দুইটি স্নায়ু-কোষের স্তবক; ৫। স্নায়ু-তন্তু। পরিষ্কার সাদা অংশটি আলোকরশ্মির দ্বারা অক্ষিপটের স্নায়ু-কোষগুলির উত্তেজিত অবস্থা বুঝাইতেছে।

থাকে। এই ব্যাধিতে দণ্ডগুলির ক্রিয়াকলাপ নষ্ট হইয়া যায়। উজ্জ্বল দিবালোকে রোগীর দৃষ্টি স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু অন্ধকার হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সে কিছুই দেখিতে পায় না।

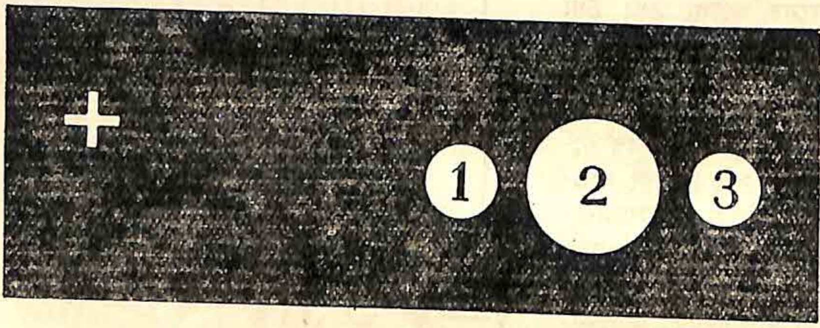
অক্ষিপটে শঙ্কু (অর্থাৎ দিবালোক দর্শন ও বর্ণানুভূতি) অথবা দণ্ডের (ঊষা বা গোধূলির আলোক ও বর্ণহীন দৃষ্টি) তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন জীবজন্তুর দৃষ্টিবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায়। বহু রাত্রিচর জীবের (বাদুড়, প্যাঁচা ইত্যাদি) চক্ষুতে আদৌ কোন শঙ্কু বা কোন্ নাই; অপর পক্ষে মুরগী বা অন্যান্য যে-সমস্ত পাখী দিবালোকে দেখিতে পায়, তাহাদের অক্ষিপটে দণ্ড নাই।

পীতাভ বিন্দু:

অক্ষিপটের ঠিক কেন্দ্রস্থলে তারারন্ধ্রের ঠিক উল্টাদিকে একটি পীতাভ বিন্দু আছে। ইহার কেন্দ্রস্থলে কোন দণ্ড নাই, পরস্পর ঘন সন্নিবিষ্ট প্রচুর কোন্ আছে। চক্ষুর এই অংশটি দিবালোকে অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় যেসমস্ত বস্তুর প্রতিচ্ছবি সরাসরি পীতাভ বিন্দুর উপর আসিয়া পড়ে সেগুলি অন্য বস্তু হইতে আরো পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। কোন একটি বস্তুর দিকে তাকাইলে চক্ষুর দৃষ্টি ইহার পেশীগুলির সাহায্যে এমনভাবে পরিচালিত হয় যে লক্ষ্যণীয় বস্তুটির প্রতিচ্ছবি উভয় চক্ষুর পীতাভ বিন্দুতে আসিয়া পড়ে।

দৃষ্টিহীন বিন্দু:

দৃষ্টিবহ অপ্টিক স্নায়ু অক্ষিপটের যেস্থান হইতে বাহির হইয়াছে, সেখানে আলোকানুভূতিপ্রবণ কোন কোষ নাই। এই বিন্দুকে দৃষ্টিহীন বিন্দু বলা



১৩২নং চিত্র—চক্ষুর দৃষ্টিহীন কেন্দ্রটি লক্ষ্য করার পরীক্ষা।
বাম চক্ষু বন্ধ করিয়া দক্ষিণ চক্ষু দ্বারা চিত্রের ক্রস চিহ্নটি লক্ষ্য কর। বইখানি চক্ষুর ১৫ সে, মি, দূরত্বে রাখ। ধীরে ধীরে বইটিকে দূরে সরাইলে তিনটি বৃত্তের যে-কোনো একটি দৃষ্টিহীন কেন্দ্রের উপর পড়িবে; ফলে ঐ বৃত্তটি দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

হয়; ইহা আলোকে উত্তেজিত হয় না। সুতরাং এই বিন্দুতে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি পড়িলে আমরা সে-বস্তুটি দেখিতে পাই না।

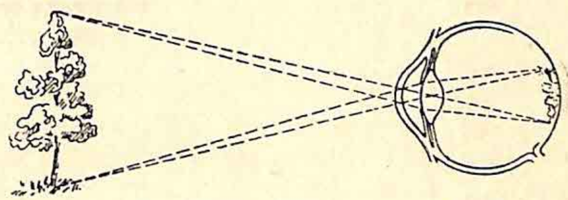
একটি অতি সহজ পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্টিহীন-বিন্দুটির অবস্থান জানা যায়। বাম চক্ষুটি বন্ধ কর; অতঃপর বইখানি চক্ষু হইতে ১৫ সেণ্টিমিটার দূরে ধরিয়া দক্ষিণ চক্ষু দ্বারা ১৩২ নং চিত্রের বাম দিকে অবস্থিত ক্রস চিহ্নটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাও; এইবার বইটি ধীরে ধীরে সরাইয়া লও; দেখিবে, প্রথমে ক্রসের

নিকটতম বৃত্তটি অদৃশ্য হইয়াছে; পরে বৃহৎ বৃত্তটি এবং সর্বশেষে তৃতীয় বৃত্তটি আর দেখা যাইবে না। লক্ষ্য করিলে বুঝিবে যে একটি বৃত্ত দৃশ্যপট হইতে অদৃশ্য হওয়ার সময় অপর দুইটি দৃষ্টিগোচরে থাকে।

অক্ষিপটের উপর বস্তুর প্রতিচ্ছবিঃ

আলোকরশ্মি স্বচ্ছ অচ্ছোদপটলের মধ্য দিয়া চক্ষুতে প্রবেশ করে; অতঃপর জলীয় পদার্থ, অক্ষিমুকুরে এবং গাঢ় তরল পদার্থ বা "ভিট্রিয়স বডির" মধ্য দিয়া যাইয়া রশ্মিগুলি অক্ষিপটের উপর পতিত হয়। যে বস্তুটির দিকে আমরা লক্ষ্য করি তাহার প্রতিটি বিন্দু হইতে আলোক রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। চক্ষুর স্বচ্ছ মাধ্যমগুলির ভিতর দিয়া যাইবার সময় রশ্মিগুলি প্রথমে **প্রতিসারিত** (refracted) এবং পরে অক্ষিপটের উপর একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। রক্তপ্রণালী গঠিত স্তবকের আভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠে রঞ্জক পদার্থ থাকার জন্য রশ্মিগুলি অবশোষিত হইয়া যায়; ফলে চক্ষুতে আলোর প্রতিফলন বা বিচ্ছুরণ হয় না।

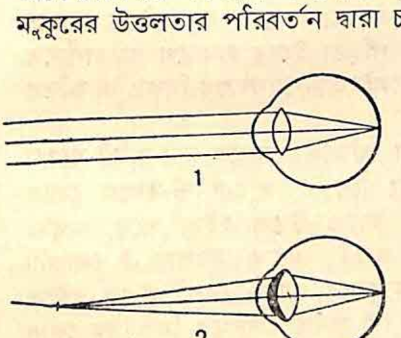
বস্তুর বিভিন্ন বিন্দু হইতে আলোক রশ্মিগুলি অক্ষিপটের বিভিন্ন বিন্দুতে পড়ে বলিয়া বস্তুর প্রতিচ্ছবিটি উল্টা এবং ক্ষুদ্রাকার হইয়া থাকে (১৩৩ নং চিত্র)।



১৩৩নং চিত্র অক্ষিপটের উপর বস্তুর প্রতিচ্ছবি।

উপযোজন (accomodation):

স্বাভাবিক মানব চক্ষু কাছের অথবা দূরের বস্তু পরিস্কার দেখিতে পায়। ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুকে পরিস্কারভাবে দেখিবার ক্ষমতাকে উপযোজন (চক্ষুকে মানাইয়া লওয়া) বলা হয়। অক্ষিমুকুরের উত্তলতার পরিবর্তন দ্বারা চক্ষুর উপযোজন ক্রিয়া সাধিত হয়।

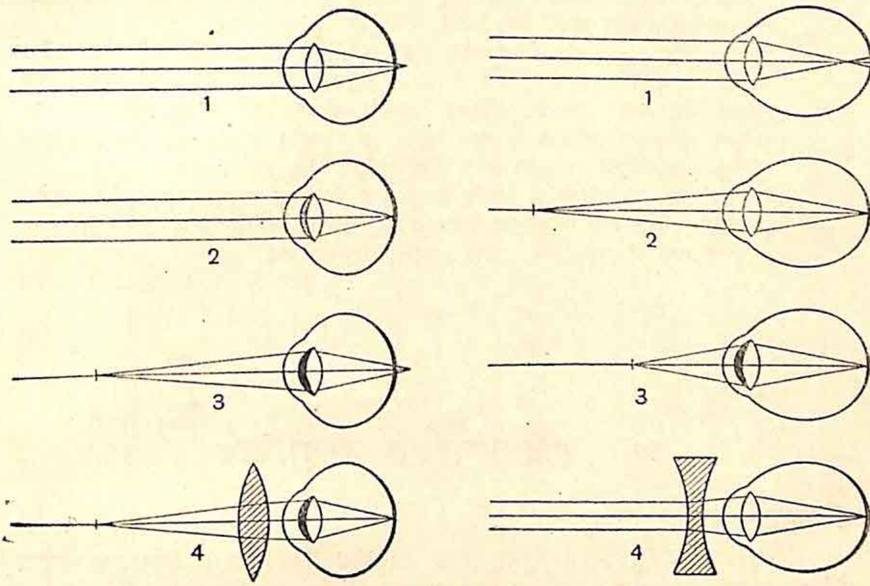


১৩৪নং চিত্র—স্বাভাবিক চক্ষুর উপযোজন ১। দূর হইতে দৃষ্ট বস্তু হইতে বিচ্ছুরিত আলোক (উপযোজনহীন) রশ্মি পথ; ২। সর্বাধিক উপযোজনে আলোক-রশ্মিপথ; লেন্সের কৃষ্ণবর্ণ অংশটি ইহার উত্তলতা বৃদ্ধির নিদর্শন।

চক্ষুর সূক্ষ্ম পেশী বন্ধনীগুলি (ligaments) অক্ষিমুকুরে প্রচণ্ড টান দিয়া ইহাকে চ্যাপ্টা করিয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় সমান্তরাল আলোকরশ্মিগুলি অর্থাৎ দূরবর্তী বস্তু হইতে আগত রশ্মিগুলি অক্ষিপটের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে।

অক্ষির সিলিয়ারি পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইলে অক্ষিমুকুরটি শ্লথ হইয়া পড়ে। পেশী সংকোচন যত শক্তিশালী হইবে অক্ষিমুকুরের প্রসারণ তত শিথিল এবং অক্ষিমুকুরটি ততই উত্তল হইবে। আলোকরশ্মির প্রতিসরণও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় সমান্তরাল রশ্মির পরিবর্তে নিকটবর্তী

দৃষ্টি-সম্পন্ন (short sightedness) বলা হয় (১৩৬নং চিত্র)। নিকটের দৃষ্টি-সম্পন্ন অবস্থায় নিকটস্থ বস্তু হইতে শুধু বিকীর্ণ রশ্মিগুলি অক্ষিপটের উপর



বাম পার্শ্বে ১৩৫নং চিত্র—দূরদৃষ্টিবিশিষ্ট লোকের উপযোজন-ক্রিয়া
১। উপযোজনবিহীন অবস্থা (সমান্তরাল রশ্মিগুলি অক্ষিপটের পশ্চাতে যাইয়া ছেদ করে); ২। বহু দূরের বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আংশিক উপযোজন; ৩। সর্বাধিক উপযোজনের সময় রশ্মিপথ; ৪। উত্তল লেন্সের (চশমা) সাহায্যে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া আনা। করিয়া); ৫। অবতল লেন্সের সাহায্যে (চশমা) স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া আনা।
দক্ষিণ পার্শ্বে ১৩৬নং চিত্র—নিকট-দৃষ্টিবিশিষ্ট লোকের উপযোজন-ক্রিয়া
১। উপযোজনবিহীন অবস্থা (সমান্তরাল রশ্মিগুলি অক্ষিপটের সম্মুখে আসিয়া ছেদ করে); ২। সর্বাধিক দূরের যে বিন্দুতে কোন বস্তু পরিষ্কারভাবে দেখা যায় (উপযোজন না হইয়া); ৩। সর্বাধিক নিকটস্থ যে বিন্দুতে কোন বস্তু পরিষ্কারভাবে দেখা যায় (সর্বাধিক উপযোজন); ৫। উত্তল লেন্সের সাহায্যে (চশমা) স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া আনা।

পড়িতে পারে। দূরের বস্তুগুলি অস্পষ্ট ও নিস্প্রভ দেখায়। এই ব্যাধি গুরুতর হইলে স্পষ্ট করিয়া দেখা দূরতম বস্তুর ব্যবধান মাত্র ১৫ হইতে ২০ সেণ্টিমিটার —সময় সময় আরও কম। সুতরাং উপযোজনের ফলে নিকটের দৃষ্টি-সম্পন্ন কোন লোক শুধু চক্ষুর সন্নিকটে অবস্থিত বস্তুই দেখিতে পায়। এই ব্যাধি সারাইবার জন্য অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়; ইহার দ্বারা প্রতিসরণ হ্রাস পায় এবং তাহার ফলে দূরাগত সমান্তরাল রশ্মিগুলি অক্ষিপটের উপরই কেন্দ্রীভূত হয়।

প্রশ্ন ঃ

তোমার জানিত কোন জন্তুর দৃষ্টি "দড"-প্রধান এবং জন্তুর দৃষ্টি শঙ্কু-প্রধান?

অনুশীলনী ঃ

(১) এই বইতে অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া তোমার চক্ষুর দৃষ্টিহীন বিন্দুটি বাহির কর। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ দৃষ্টিহীন ও পীতাভ বিন্দুর পারস্পরিক অবস্থান কি? কোনটি নাসিকার নিকটতর?

বস্তু হইতে বিকীর্ণ রশ্মিগুলি অক্ষিপটের উপর কেন্দ্রীভূত হয় (১৩৪নং চিত্র)।

শিশুদের অক্ষিমুকুর অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক এবং ইহার উত্তলতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে পারে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষিমুকুরের স্থিতিস্থাপকতা ক্রমশ কমিতে থাকে; অর্থাৎ, উপযোজন শক্তিও ক্রমশ দুর্বল হইয়া আসে এবং ফলে নিকটের বস্তু দেখা যায় না। শিশুরা চক্ষুর ৬ হইতে ৮ সেন্টিমিটার দূরের বস্তুও পরিস্কার দেখিতে পায়; কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক লোককে নিকটতম বস্তু দেখিতে হইলে আরও দূরে রাখিতে হইবে (৪নং তালিকা)।

মধ্যবয়স্ক লোকদের এবং বৃদ্ধদের অক্ষিমুকুরের স্থিতিস্থাপকতা এত কমিয়া যায় যে উপযোজন শক্তির অপ্রাতুল্য ঘটে। এরূপ অবস্থায় নিকটস্থ বস্তু দেখিতে হইলে উভয় পার্শ্বে উত্তল কাঁচের চশমা ব্যবহার করিয়া কৃত্রিম উপায়ে আলোক রশ্মির প্রতিসরণ বাড়াইয়া দিতে হয়।

৪নং তালিকা

বয়সের অনুপাতে উপযোজন শক্তির পরিবর্তন

বয়স	পরিষ্কারভাবে দেখা যায় এরূপ কোন বস্তুর চক্ষু হইতে নিকটতম দূরত্ব
১০	৭ সেণ্টিমিটার
২০	১০ ,,
৩০	১৫ ,,
৪০	২৫ ,,
৫০	৪০
৬০	১ মিটার
৭০	৪ ,,

নিকটের ও দূরের দৃষ্টিঃ

কোন কোন লোকের চক্ষুর বিশ্রামরত অবস্থায় দূরের বস্তু হইতে আগত সমান্তরাল রশ্মিগুলি অক্ষিপটের উপরে না পড়িয়া ইহার সম্মুখে বা পশ্চাতে কোন বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। অধিকাংশ স্থলেই অক্ষিগোলকের বিকৃত আকৃতির জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে।

সমান্তরাল রশ্মিগুলি অক্ষিপটের **পিছনে** পড়িলে তাহাকে দূর-দৃষ্টি-সম্পন্ন (long sightedness) বলা হয় (১৩৫নং চিত্র)। দূর-দৃষ্টি-সম্পন্ন লোক দূরের বস্তুর দিকে তাকাইলে অক্ষিমুকুরটি আরও উত্তল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ উপযোজন শক্তি আংশিকভাবে ব্যয়িত হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় ঐ লোকটি নিকটের বস্তু দেখিতে পাইবার পূর্বে অক্ষিমুকুরকে আরও বেশী উত্তল হইতে হইবে। অবশ্য স্পষ্টই বোঝা যায় যে দূর-দৃষ্টি-সম্পন্ন লোককে নিকটতম কোন বস্তু পরিস্কার দেখিতে হইলে পূর্ণ উপযোজন সত্ত্বেও বস্তুটি স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় চক্ষু হইতে অনেক দূরে রাখিতে হইবে।

উভয় পার্শ্বে উত্তল লেন্স বিশিষ্ট চশমা ব্যবহার করিয়া দূর-দৃষ্টি সারিয়া যাইতে পারে; বয়সের জন্য উপযোজন শক্তি দুর্বল হইলেও এইরূপ চশমা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়।

সমান্তরাল রশ্মিগুলি অক্ষিপটের **সম্মুখে** কেন্দ্রীভূত হইলে তাহাকে নিকটের

(২) একজন সহপাঠীকে আলোর দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতে বল; উহার উভয় তারারন্ধ্রের প্রস্থ লক্ষ্য কর; এইবার উহাকে চক্ষু মুদিয়া হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে বল; ৩০—৬০ সেকেন্ড পরে চক্ষু উন্মীলন করিতে বল; এইবার উহার তারারন্ধ্রের পরিবর্তন লক্ষ্য কর। এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর।

(৩) একটি কাগজের টুকরা পিন দ্বারা ছিদ্র কর; এইবার একখানি বই চক্ষু হইতে ২।৩ সেন্টিমিটার দূরে রাখিয়া ঐ কাগজের ছিদ্র দিয়া বই-এর ছাপা ক্ষুদ্র অক্ষরগুলি লক্ষ্য কর। উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে এই পরীক্ষা করিতে হইবে। অক্ষরগুলি পরিষ্কার দেখিতে পাওয়ার কারণ কি? ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা কোন বস্তু ভাল করিয়া দেখিবার সময় চক্ষু কুঞ্চিত করে কেন?

(৪) দূরাবস্থিত কোন বস্তুতে নিবদ্ধ চক্ষু দ্রুত নিকটস্থ কোন বস্তুর প্রতি সরাইয়া আনিয়া তারারন্ধ্রের পরিবর্তন লক্ষ্য কর। নিকটস্থ বস্তুর দিকে তাকাইলে তারারন্ধ্রের যে সংকোচন হয় তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৭০। দৃষ্টি সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধি

আলোকিত করণঃ

পড়ার এবং বহু প্রকার সূক্ষ্ম কাজ করিবার সময় চক্ষুর অত্যধিক আয়াস করিতে হয়। সুতরাং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই বোধযন্ত্রটির স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রাখিতে হইলে দৃষ্টি সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধির প্রাথমিক নিয়মকানুনগুলি পালন করা প্রয়োজন।

প্রথমত, যে ঘরে কাজ করা হয়, সেই ঘরখানি যথেষ্ট আলোকিত হওয়া দরকার। ৫০ সেন্টিমিটার দূর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাপা অক্ষর স্পষ্টভাবে পড়িতে পারিলে ঘরটি উপযুক্তভাবে আলোকিত মনে করা যাইতে পারে। আলো কম হইলে কাজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে হয় এবং চক্ষুর আয়াস করিতে হয়। সময় সময় জানালার কাঁচ, বৈদ্যুতিক বাল্ব বা আলোর আবরণের উপর ধূলা পড়িলে আলো কমিয়া যাইতে পারে; সুতরাং এগুলি সব সময় পরিস্কার রাখিতে হইবে।

অত্যধিক উজ্জ্বল আলো চক্ষুর পক্ষে অনিষ্টকর; এইরূপ আলোতে চক্ষু ধাঁধিয়া যায় এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করে; এই উত্তেজনা অধিকদিন চলিলে দৃষ্টিহানি হইয়া থাকে।

আলোক রশ্মি সমভাবে বিচ্ছুরিত হওয়া এবং ইহার উৎসের সঠিক অবস্থান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম আলোর ক্ষেত্রে প্রতিফলিত আলোই সর্বোৎকৃষ্ট; এই আলোতে রশ্মিগুলি উপরের দিকে ঘরের ছাদে পরিচালিত হয় এবং সেখান হইতে প্রতিফলিত হইয়া ঘরের মধ্যে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে। আলোর উৎসের অবস্থানটি এমন হওয়া উচিত যাহাতে চক্ষু ধাঁধিয়া না যায় অথচ কাজের স্থানটি যথেষ্ট আলোকিত হয়। লিখিবার সময় হাতের ছায়া যাহাতে লেখার উপর না পড়ে সেইজন্য আলোটি দক্ষিণ দিকে রাখা উচিত নয়।

সঠিকভাবে আলোকিত করিলে কর্মক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং অবসাদ কম হয়। দৃষ্টিযন্ত্রের আয়াসজনিত দৃষ্টির অবসাদ সম্পর্কে এই বক্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

পড়া ও লেখা সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধিঃ

পড়া ও লেখার সময় উপযোজন বাড়িয়া যাওয়ার ফলে চক্ষুর আয়াস যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়; কখনও কখনও মস্তকের ভ্রান্ত অবস্থানের জন্যও চক্ষুর আয়াস বৃদ্ধি পাইতে পারে। চক্ষুর অত্যধিক আয়াস এড়াইবার জন্য মস্তক না নোয়াইয়া সঠিকভাবে বসিতে হইবে—বই বা খাতা চক্ষু হইতে ৩৫ সেণ্টিমিটার দূরে সমতল ভূমির ২০ হইতে ৩০ ডিগ্রী কোনে কিছুটা বাঁকাইয়া ধরিতে হইবে।

শায়িত অবস্থায়, বিশেষত এক পার্শ্বে কাত হইয়া পড়া অনিষ্টকর।

অধিকক্ষণ পড়িবার সময় চক্ষুকে বিশ্রাম দিবার জন্য মাঝে মাঝে এমনকি কয়েক মিনিটের জন্যও পড়া বন্ধ করা উচিত; এই সময় উপযোজন ক্রিয়াকে শিথিল হইতে দেওয়ার জন্য দূরের বস্তুর প্রতি চক্ষু নিবদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ।

পড়িবার সময় চক্ষু দ্রুত শ্রান্ত হইয়া পড়িলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া এবং দূর-দৃষ্টিক্ষীণতা হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য চক্ষু পরীক্ষা করান একান্ত প্রয়োজন।

দূর বা নিকটের দৃষ্টি-ক্ষীণতায় চিকিৎসকের উপদেশমত চশমা ব্যবহার করিতে হইবে।

৭১। শ্রবণ যন্ত্র

শব্দ-কম্পনের অনুভূতিঃ

শ্রবণ যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর কম্পন হইতে আমরা শব্দের অনুভূতি পাইয়া থাকি।

শব্দ-তরঙ্গগুলি বাতাসের পর্যায়ক্রমিক ঘনীভবন (condensation) ও লঘূকরণের (rarefaction) আকারে শব্দের উৎস অর্থাৎ কম্পমান বস্তুটি হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কম্পনের গতিবেগের উপর শব্দের উচ্চগ্রাম (pitch) নির্ভর করে। মানুষের কর্ণে সেকেণ্ডে ২০ হইতে ২০,০০০ গতি-বিশিষ্ট শব্দ তরঙ্গ অনুভূত হইতে পারে।

বহিষ্কর্ণ ও মধ্যকর্ণঃ

শ্রবণ যন্ত্রটি বহিষ্কর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ—এই তিন ভাগে বিভক্ত (২নং রঙীন চিত্র)।

বহিষ্কর্ণ একটি অলিন্দ (auricle) ও বহিষ্কর্ণ পথ (external auditory meatus) দ্বারা গঠিত; রগাস্থির পুরু অংশে যেখানে মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ অবস্থিত, বহিষ্কর্ণ পথটি সেই পর্যন্ত প্রসারিত। একটি পাতলা কিন্তু অত্যন্ত নিবিড় **কর্ণপটহ** বহিষ্কর্ণপথকে মধ্যকর্ণ গহবর হইতে পৃথক করিয়াছে; এইখানে তিনটি অতি ক্ষুদ্র কর্ণাস্থি অবস্থিত; ইহাদের আকৃতির জন্য এই অস্থি তিনখানির

নাম দেওয়া হইয়াছে—**হাতুড়ি, নেহাই** (anvil) ও **রেকাব** (stirrup)। হাতুড়ি-অস্থিটি কর্ণ-পটহের ভিতরের গাত্রে সংযুক্ত, এবং রেকাব-অস্থিটি অন্তঃকর্ণের প্রবেশপথে অবস্থিত ঝিল্লীর সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ।

শব্দ-কম্পনগুলির স্বাভাবিক পরিবহনের জন্য মধ্য-কর্ণে বাতাসের চাপ আবহাওয়ার চাপের সমান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মধ্য-কর্ণ ও গলবিলের সহিত সংযোগ সৃষ্টিকারী ইউস্টেকিয়ান টিউবের (Eustachian tube) মারফৎ উভয় প্রকার চাপের সমতা বজায় থাকে। ইউস্টেকিয়ান টিউবের বাহিরের মুখটি সাধারণত বন্ধ থাকে, শুধু কোনকিছু গলাধঃকরণের সময় খুলিয়া যায়। আবহাওয়ার বাতাসের চাপে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিলে (উড়োজাহাজের অকস্মাৎ অবতরণ বা প্যারাসুটের সাহায্যে লাফাইয়া পড়ার সময়) মধ্যকর্ণের বাতাসের চাপে সমতা রক্ষার জন্য কয়েকবার দ্রুত গলাধঃকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা উচিত।

অন্তঃকর্ণ ঃ

অন্তঃকর্ণের গঠন অতীব জটিল।

অন্তঃকর্ণের সমস্ত অংশ শ্রবণ যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়—শুধু ঘুরান-পেঁচান ও তরল পদার্থে পূর্ণ **শ্রুতি-শম্বুক** (cochlea) নামক একটি দীর্ঘ নালী শ্রবণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। বেসিলার ল্যামিনা (Basilar lamina) নামক হাজার হাজার বিভিন্ন আকার ও আকৃতির তন্তু গঠিত একটি পাতলা ঝিল্লী সমগ্র শ্রুতি-শম্বুক নালীটিতে প্রসারিত হইয়া ইহাকে উচ্চ ও নিম্ন অংশে ভাগ করিয়াছে।

অন্তঃকর্ণের অপর অংশে অবস্থিত অটোলিথ্ যন্ত্র এবং অর্ধ-বৃত্তাকার নালী-গুলি দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে—শ্রবণ প্রক্রিয়ার সহিত ইহাদের কোনই সম্পর্ক নাই।

কর্ণের ধারকগুলির উত্তেজনা ঃ

শব্দ কর্ণপটহে কম্পন জাগায়; এই কম্পন কর্ণাস্থিগুলির মাধ্যমে অন্তঃকর্ণের প্রবেশ-পথ-রোধকারী অপর একটি ঝিল্লীতে যাইয়া পৌঁছায়; দ্বিতীয় ঝিল্লীর কম্পন অন্তঃকর্ণস্থিত তরল পদার্থে এবং তথা হইতে বেসিলার ল্যামিনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তুতে চলিয়া যায়।

প্রতিটি শব্দে সমস্ত তন্তুগুলিতে কম্পন জাগেনা—ইহাদের নির্দিষ্ট অংশে কম্পন হয়। অনেকটা পিয়ানোর তারের মত। খোলা পিয়ানোর কাছে কোন এক নির্দিষ্ট গ্রামের শব্দ করিলে ঐ শব্দে বাঁধা পিয়ানোর কম্পন হইয়া ঠিক ঐ গ্রামে বাজিয়া উঠিবে। ইহাকে প্রতিধ্বনি বা অনুনাদ বলে। এই প্রতিধ্বনির ভিত্তিতেই বিভিন্ন শব্দোত্থিত স্বতন্ত্র অনুভূতি জাগ্রত হয়।

তন্তুগুলির কম্পনে বেসিলার ল্যামিনায় অবস্থিত পেঁচাল যন্ত্র গঠনকারী বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ কোষগুলি উত্তেজিত হয়। অনুভূতিপ্রবণ এই সব কোষ হইতে অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্তুগুলি কর্টেক্সের শ্রবণ-কেন্দ্রে তাড়না বহন করিয়া লইয়া যায়।

বেসিলার ল্যামিন্যায় আঘাত লাগিলে সংশ্লিষ্ট-গ্রামবিশিষ্ট শব্দ সম্পর্কে শ্রবণ শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ

১। বোধ-যন্ত্রের ভ্রমাত্মক কয়েকটি উদাহরণ দাও।

২। বোধ-যন্ত্রের ভ্রম সত্ত্বেও আমাদের চেতনায় বহির্বিশ্বের সঠিক প্রতিফলন কিভাবে হয় তাহা ব্যাখ্যা কর। নিজের লেখা উদাহরণ হইতে ভ্রমগুলির সংশোধন কিভাবে হয় লিখ।

অনুশীলনী ঃ

নীচের তালিকার অনুরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দৃষ্টি, শ্রবণ, অটোলিথ, অর্ধ-বৃত্তকার নালীসমূহ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও স্বাদযন্ত্র এবং পেশী ও কণ্ডরা হইতে প্রাপ্ত অনুভূতিগুলি বর্ণনা কর ঃ

যন্ত্রের নাম	প্রাপ্ত অনুভূতি
দৃষ্টি-যন্ত্র—চক্ষু	আলো, রং, দূরত্ব এবং পদার্থের আকার ও আকৃতি

৭২। উচ্চস্তরের স্নায়বিক কার্যলাপ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা সেৎচেনভ ও প্যাভলভ্

আই. এম. সেৎচেনভ

রুশ-শারীর-বৃত্তের ইতিহাসে অন্যতম প্রখ্যাত মুহূর্ত—১৮৬৩ সাল—ঐ সময় তদানীন্তন একটি পত্রিকায় "গুরুমস্তিষ্কের প্রতিবর্তন" নামে সেৎচেনভের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

রুশ বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ইভান সেৎচেনভ্ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগ হইতে স্নাতকোত্তীর্ণ হইবার পর তিনি জার্মান ও ফরাসী শারীর-বৃত্তবিদদের গবেষণা সম্পর্কে পরিচিত হইবার জন্য বিদেশ গমন করেন। কিন্তু সেখানে অবস্থানের প্রথম বৎসরেই তিনি একজন স্বাধীন এবং উচ্চস্তরের বিজ্ঞানী হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন এবং অচিরেই সে-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হন। রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর সেৎচেনভ্ পিটেসবার্গ মেডিকো-সার্জিকাল এ্যাকাদেমীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেৎচেনভ্ তাঁহার লেক্চারের সময় সর্বদাই কিছু না কিছু পরীক্ষা চালাইতেন; সে-সময় এই পদ্ধতির কোন প্রচলন ছিল না। বেলিন্স্কী, হার্জেন এবং চের্নিশেভস্কী প্রভৃতির প্রগতিশীল মতবাদ সেৎচেনভের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তিনি একজন নিষ্ঠাবান বস্তুবাদী হইয়া ওঠেন। সমাজ জীবনে সক্রিয় কর্মী এবং গভীর দেশপ্রেমিক সেৎচেনভ্ রুশ বিজ্ঞানকে বস্তুবাদের ভিত্তিতে আগাইয়া লইয়া যান এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বস্তুবাদী জীবনদর্শন প্রচার করেন।

প্রথম জীবন হইতেই সেৎচেনভ্ শারীর-বৃত্তের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন; এই সময় তিনি মানসিক প্রক্রিয়ার শারীর-বৃত্তিক ভিত্তি সম্পর্কিত অনুশীলনে বিশেষ-ভাবে মনোনিবেশ করেন।

বহু যুগ যুগান্তর পূর্বে মানুষের মনে ধারণা জন্মায় যে অনুভূতি, চিন্তা, কামনা ইত্যাদি "ঐশী-শক্তির" অস্তিত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এগুলি দেহ হইতে বিদায় গ্রহণ করে। দার্শনিক-আদর্শবাদী এবং ধর্মযাজকরা জীবদেহে "আত্মার আবাসস্থলের" সঠিক স্থান নির্দেশের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেন। আত্মা যে কোন বস্তু নয় এবং ইহা যে প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত এ-সম্পর্কে তাঁহাদের নিজেদের মনে কোন সংশয়ই ছিল না।



সেশেনভ

আত্মার অবিনশ্বরতার ধারণা ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংযুক্ত। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া এই ধারণা প্রচলিত ছিল, কারণ শাসক শ্রেণী সব সময়ই ধর্মকে "নিম্ন-শ্রেণী-গুলিকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ রাখার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে" (এঙ্গেল্স্)। আত্মা এবং দেহাতীত জীবনে বিশ্বাস রাখা শাসক শ্রেণীর নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ, এই বিশ্বাসের ফলে দরিদ্রের মন উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতে ভিন্নমুখে পরিচালিত হইত।

এইজন্যই বৈজ্ঞানিক-আদর্শবাদীরা বলিতেন যে আত্মা দেহের অধীন নয়—মনস্তত্ত্বের সহিত শারীর-বৃত্তের কোন সম্পর্ক নাই। মস্তিষ্কের উপর পরীক্ষা চালাইয়া মানসিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করা যায়, একথা তাঁহারা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু বেলিন্স্কী দেখান যে "শারীর-বৃত্তের সমর্থনহীন মনস্তত্ত্ব শারীর সংস্থানের সম্পর্কে জ্ঞানহীন শারীর-বৃত্তের মতই নিরর্থক।"

সেৎচেনভই সর্বপ্রথম মানুষের মানসিক ক্রিয়া-কলাপের শারীর-বৃত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করার সাহসী চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার পূর্বে তিনি এমন এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন যাহা সেৎচেনভের নামকে অমর করিয়াছে। অস্ত্রোপচার দ্বারা তিনি একটি ব্যাঙের গুরুমস্তিষ্ক অপসারণ করেন; ইহার পর অন্তঃমস্তিষ্কে আড়াআড়িভাবে কাটিয়া ব্যাঙের পায়ে এ্যাসিড প্রয়োগজনিত উত্তেজনায় কত দ্রুত প্রতিবর্তন ক্রিয়া সাধিত হয় তাহা নির্ধারণ করেন। দেখা গেল, মস্তিষ্কের কর্তিত অংশে সোডিয়াম ক্লোরাইডের কয়েকটি কেলাস্ (crystal) প্রয়োগ করিলে প্রতিবর্তন ক্রিয়া অবদমিত হয়। "সেৎচেনভের নিরোধ" নামক এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রমাণ হয় যে মস্তিষ্ক প্রতিবর্তন ক্রিয়াকে নিরোধ করিতে পারে।

সেৎচেনভ্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রতিবর্তনের নিরোধ সম্পর্কে তাঁহার

আবিষ্কার মানসিক অবস্থা ও চেতনার সহিত সংশ্লিষ্ট মানব মস্তিষ্কের জটিল ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যায় অশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে।

"গুরুমস্তিষ্কের প্রতিবর্তন" নামক তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধে সেৎচেনভ্ অপূর্ব দক্ষতার সহিত প্রমাণ করেন যে—প্রতিবর্তন ক্রিয়া অবস্থা বিশেষে তীব্রতর অথবা নিরুদ্ধ হইতে পারে, তাহাই মানুষের মানসিক ক্রিয়া-কলাপের সমস্ত লক্ষণের ভিত্তি।

তিমিরিয়াজেভের সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুসারে সেৎচেনভের প্রগতিশীল বস্তুবাদী মত রুশীয় প্রাকৃতবিদ্যাবিদদের মনে নূতন উৎসাহ সঞ্চার করে। সেৎচেনভের অন্যতম শিষ্য রুশ শারীর-বৃত্তবিদ ভেদেন্স্কী "গুরুমস্তিষ্কের প্রতিবর্তন" সম্পর্কে লেখেন "স্বভাবতই বিগত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে এমন কোন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক ছিলনা যিনি এই পুস্তকখানি পড়েন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বইখানি এত জনপ্রিয় ছিল যে সাধারণ জ্ঞানের জন্য এই পুস্তকখানি পড়া একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করা হইত। পাঠকের মনে পুস্তকটি যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিত ইহা খুবই স্বাভাবিক"।

কিন্তু সেৎচেনভের কার্যকলাপের প্রতি জার সরকারের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। "গুরুমস্তিষ্কের প্রতিবর্তন" শীর্ষক পুস্তকটি অতীব বিপজ্জনক বলিয়া মনে করা হইল এবং বাজেয়াপ্ত করারও চেষ্টা হয়। শেষ পর্যন্ত সেৎচেনভ্ নিজেও মেডিকো-সার্জিক্যাল একাদেমী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর ওডেসাতে কয়েক বৎসর কাজ করার পর তিনি পুনরায় পিটার্স্‌বার্গে ফিরিয়া আসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্ত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু জার সরকার এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর উপর নিপীড়ন চালাইতে থাকে; ছাত্র সাধারণ ও রুশিয়ার জনসাধারণকে প্রগতিশীল বস্তুবাদী আদর্শের প্রভাব হইতে দূরে রাখিবার চেস্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত সেৎচেনভকে পুনরায় পিটার্স্‌বার্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করে। তিন বৎসর যাবৎ এই বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানী তাঁহার পরীক্ষা কার্য চালাইবার মত কোন ল্যাবরেটারি পান নাই। তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্মান বৈজ্ঞানিক সেৎচেনভকে দেশত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে জার্মানীতে বসবাস ও কাজ করিতে অনুরোধ জানান, কিন্তু সেৎচেনভ্ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ঠিক সেই সময় সেৎচেনভ্ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করিবার আমন্ত্রণ পান। আবার শুরু হইল বিরাট সৃজনশীল কর্মতৎপরতা। এইবার তিনি কর্মক্ষমতা ও অবসাদ সংক্রান্ত শারীর বৃত্তিক প্রশ্নের অনুশীলন করেন এবং এইভাবে শ্রমিক শ্রেণীর দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির পিছনে শারীর-বৃত্তিক যুক্তির ভিত্তি স্থাপনা করেন।

সেৎচেনভ্ তাঁহার সমস্ত বৈজ্ঞানিক কার্যকালে বস্তুবাদী বিজ্ঞানকে জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রচুর সংখ্যক জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখেন এবং অসংখ্য জনপ্রিয় বক্তৃতা দান করেন। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে ৭৪ বৎসর বয়সে প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত তিনি মস্কোর প্রেসিনেস্কি শ্রমিকদের ক্লাবে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই জার সরকার এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা-দান নিষিদ্ধ করিয়া দেয়।

১৯০৫ সালে সেৎচেনভের মৃত্যু হয়।

প্যাভলভ্ কর্তৃক উচ্চস্তরের স্নায়বিক কার্যকলাপের অনুশীলনঃ

সেৎচেনভের আরব্ধ কাজকে আরও সম্প্রসারিত করেন বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক আই· পি· প্যাভ্‌লভ্। বহু বৎসর যাবৎ অনুসৃত প্যাভলভের সমস্ত কাজের ভিত্তি ছিল উচ্চ স্তরের স্নায়বিক কার্যকলাপের সাহত মস্তিষ্কের প্রতিবর্তন ক্রিয়ার সম্পর্কের তত্ব।

প্যাভ্‌লভের পূর্বে আর কেহই গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সকে উচ্চস্তরের স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের যন্ত্র হিসাবে প্রকৃত কোন অনুশীলন করেন নাই। পেশী সংকোচনে বা পাকস্থলীর রসক্ষরণে কর্টেক্সের সঠিক ভূমিকা অনুশীলন করার কোন পদ্ধতি ইতিপূর্বে জানা ছিল না। বিজ্ঞানীরা তখনও পর্যন্ত জীবজন্তুর ব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট উচ্চস্তরের স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের শারীর বৃত্তিক অনুশীলনকে অসম্ভব মনে করিতেন।

সর্বসাধারণের পরিচিত অতি সাধারণ ঘটনা হইতেই প্যাভলভ্ উচ্চস্তরের স্নায়বিক কার্যকলাপ অনুশীলন করার সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণের সূত্র পান। কয়েক বৎসর যাবৎ কুকুরের লালাগ্রন্থিতে নালী সৃষ্টি করিয়া প্যাভলভ্ লালা ক্ষরণ সম্পর্কে অনুশীলন করেন। লালা ক্ষরণ শুধু মুখের মধ্যে খাদ্য দিয়া মুখগহ্বরের শ্লেষ্মাঝিল্লীর প্রত্যক্ষ উত্তেজনার দ্বারাই সংঘটিত হয় না, পরন্তু, অন্য প্রকার উত্তেজনা অর্থাৎ মুখের নিকট খাদ্য আসার সঙ্কেতেও যে লালা ক্ষরিত হইতে পারে, এই ঘটনা সম্পর্কে তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন। খাদ্যের গন্ধ বা দৃশ্য, কিংবা নিয়মিত খাদ্য আনয়নকারীর পদশব্দেও ঐ সঙ্কেত সৃষ্টি হইতে পারে।

শুধু লালাগ্রন্থির ক্ষেত্রে নয়, এই তত্ত্ব জীবদেহের যে-কোন কার্যকলাপে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ ছড়ি অথবা চাবুক ঘুরাইলে বেদনাদায়ক উত্তেজনার সঙ্কেত হইয়া জন্তুটির প্রতিরোধক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়,—ফলে, কুকুরটি নিজেকে রক্ষা করিতে অথবা পলাইতে চেষ্টা করে।

পরীক্ষা দ্বারা প্যাভলভ্ প্রমাণ করেন যে এই ধরণের সঙ্কেতের প্রভাব গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের ক্রিয়া-কলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট। কর্টেক্স অপসারণ করিলে এই প্রভাব সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। কর্টেক্স অপসারিত কুকুর খাদ্যের গন্ধ বা দৃশ্য অথবা খাদ্য বহনকারীর উপস্থিতিতে কিংবা শত্রুকে দেখিলে কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না। এইরূপ কুকুরের দেহ স্পর্শ করিলে উহা আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দেয়। খাদ্য মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে তবেই ইহার লালা ক্ষরণ হইবে।

সঙ্কেত সৃষ্টিকারী উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণাকেই প্যাভলভ্ উচ্চ স্তরের স্নায়বিক ক্রিয়া-কলাপ অনুশীলনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। যে কোন দেহযন্ত্রের প্রতিক্রিয়াকেই এই অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করা যাইত। প্যাভলভ্ লালা গ্রন্থিটি নির্বাচন করেন। লালা গ্রন্থিতে নালী সৃষ্টি দ্বারা গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যকলাপ ক্ষুণ্ণ হয় নাই; অথচ ইহা দ্বারা অতি সহজে প্রতিক্রিয়ার চরিত্র ও শক্তি অনুধাবন করার সুযোগ পাওয়া যায়, যে কোন সময় ক্ষরিত লালার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

বিভিন্ন সঙ্কেতের ফলে ক্ষরিত লালা হইতে কর্টেক্সের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। প্যাভলভ্ তাঁহার নিজ পদ্ধতি দ্বারা এই অবস্থা নিরূপন করিতে এবং উচ্চ স্তরের স্নায়বিক কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলি নির্ধারণ করিতে সক্ষম হন।

৭৩। সপ্রতিবন্ধ ও অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন

অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনঃ

একটি প্রাপ্ত-বয়স্ক কুকুরের মুখের মধ্যে কিছুটা মাংস প্রবিষ্ট করাইলে পাকস্থলীর জারক রসের প্রতিবর্তনমূলক ক্ষরণ শুরু হইবে। কোনদিন মাংসের স্বাদ পায় নাই এরূপ একটি কুকুর ছানার মুখের মধ্যে মাংসখণ্ড প্রবিষ্ট করাইলেও ঐ একই প্রক্রিয়া হইবে। কুকুরের পায়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রসূত উত্তেজনা দান করিলে কুকুরটি পা টানিয়া লইবে। প্যাভলভ্ এই জন্মগত (স্থায়ী) প্রতিবর্তনের নাম দিয়াছেন অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন কারণ ইহা সর্বদাই ঘটিয়া থাকে এবং ইহার জন্য অন্য কোন অবস্থার প্রয়োজন হয় না।

অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন-চক্র গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের মধ্য দিয়া চলাচল করেনা—মস্তিষ্কের অন্য অংশের মধ্য দিয়া চলিয়া থাকে। কর্টেক্স অপসারণ করিলেও অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন থাকিয়া যায়।

সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনঃ

গুরুমস্তিষ্কের গোলার্ধদ্বয় অক্ষুণ্ণ থাকিলে শুধু খাদ্য দর্শনেই কুকুরের লালা নিঃসৃত হইবে। ইহাও একটি প্রতিবর্তন ক্রিয়া। কিন্তু মুখ মধ্যে খাদ্য প্রবিষ্ট করাইয়া যে প্রতিবর্তন হয়, তাহার সহিত ইহার মৌলিক পার্থক্য আছে।

যে কুকুরছানা কোনদিন মাংসের স্বাদ পায় নাই, মাংস দর্শনে তাহার লালা ক্ষরণ বা লালার প্রতিবর্তন হইবে না। খাদ্য আগে দেখাইয়া তাহার পর খাইতে দিলে তবেই খাদ্য দর্শনে প্রতিবর্তন সৃষ্টি হইবে। অনুরূপভাবে একটি পাত্রে খাদ্য খাইতে দিলে তবেই ঐ পাত্র দর্শনে লালার প্রতিবর্তন ঘটিতে পারে।

এইরূপ প্রতিবর্তন ক্রিয়ার প্রধান চরিত্র হইল এই যে ইহা জন্মগত নয়—ইহা অর্জিত, এবং জন্তুটির সমগ্র জীবদ্দশায় ইহা অর্জিত হইয়া থাকে। প্যাভলভ্ ইহার নাম দিয়াছেন সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন কারণ ইহার উৎপত্তিতে বিশেষ কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থার প্রয়োজন হয়।

সপ্রতিবন্ধ উত্তেজনাপ্রসূত সঙ্কেতঃ

যে-কোন উত্তেজনা হইতে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি হইতে পারে; অপ্রতিবন্ধ উত্তেজনার সঙ্কেতের ক্ষেত্রে উত্তেজনার চরিত্রটি কি ধরণের হইল তাহাতে পশুটির কিছুই আসিয়া যায় না।

যে খাদ্যপাত্রটি খাদ্যের সঙ্কেতে পরিণত হইয়াছে তাহার দর্শনে লালার সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে কোন গাড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ানর ব্যবস্থা থাকিলে কুকুরটি ঐ শব্দের প্রতি অমনোযোগী থাকিতে পারে না—গাড়ির শব্দ খাদ্য-সঙ্কেতে পরিণত হয়; অর্থাৎ একটি সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি হয় এবং শুধু গাড়ির শব্দেই লালা ক্ষরণ হইতে থাকে।

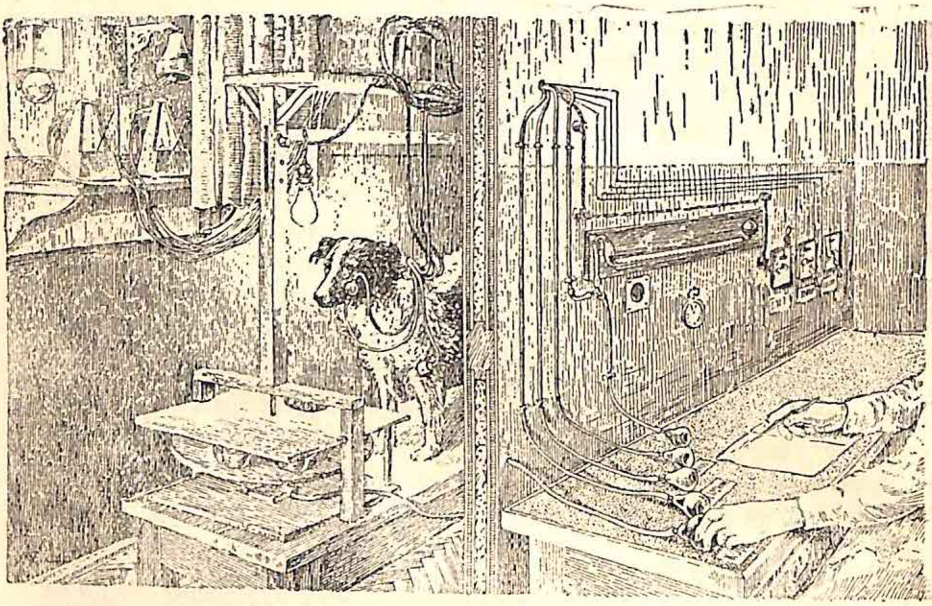
ঐ একই উত্তেজনা অর্থাৎ গাড়ির শব্দ বেদনার সঙ্কেত হিসাবে কাজ করিয়া সপ্রতিবন্ধ প্রতিরোধক প্রতিবর্তন সৃষ্টি করিতে পারে। এইরূপ করিতে হইলে গাড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটি অপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা প্রয়োগ—যেমন, পায়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রয়োগ করিতে হইবে। তরঙ্গ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটি পা টানিয়া লয় ও চিৎকার করিতে থাকে; ইহা একটি অপ্রতিবন্ধ

প্রতিবর্তন। গাড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রয়োগ করিলে কিছুদিন পরে শুধু গাড়ির শব্দেই প্রতিরোধক প্রতিবর্তন সৃষ্টি হইবে।

যে-অবস্থায় পরীক্ষা চালান হয়ঃ

সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের পরীক্ষা চালানর জন্য বিশেষ ধরণের অবস্থার প্রয়োজন। সমস্ত বহিরাগত উত্তেজনার সম্ভাবনা দূর করিতে হইবে, অন্যথায় এইরূপ যে-কোন উত্তেজনা নির্দিষ্ট সঙ্কেতে পরিণত হইতে পারে, অথবা পরীক্ষার স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে।

এই কারণে কুকুরটিকে শব্দনিরোধক দেওয়ালবিশিষ্ট বিশেষ একটি ঘরে রাখিতে হয়। পরীক্ষক ঐ ঘরের বাহিরে বসিয়া এক বিশেষ ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে কুকুরটির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিবেন (১৩৭নং চিত্র)। মাপ-যন্ত্রের



১৩৭নং চিত্র—লালার সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন-ক্রিয়া অনুশীলনের জন্য বিশেষ ঘর। আলো জ্বালানো হইল (সপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা); কুকুরটির সম্মুখে একটি খাদ্যের গামলা বসান হইয়াছে (অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন); মেট্রোনোম, ঘণ্টা, স্পর্শক ইত্যাদি অন্যান্য উত্তেজকগুলিও দেখা যাইতেছে; গবেষকের সম্মুখে একটি বোর্ড এবং লালার ক্ষরণ নির্ধারণের যন্ত্রটি দেখা যাইতেছে।

নিক্তিতে অবস্থিত তরল পদার্থের সঞ্চালন দেখিয়া ক্ষরিত লালার পরিমাণ সঠিক-ভাবে নির্ধারণ করা যায়; এই নিক্তিটি বায়ু চলাচলের সাহায্যে লালাগ্রন্থির নালীতে সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কাঁচের গোলকের সহিত সংযুক্ত। বিভিন্ন রবারের গোলকে চাপ দিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও একটি খাদ্যপাত্র কুকুরটির সম্মুখে রাখা ও সরান যায় এবং ঐ ঘরের মধ্যে ঘণ্টা, বৈদ্যুতিক বাল্ব্, স্পর্শক (স্পর্শানুভূতি সৃষ্টি করিবার যন্ত্র), বেদনা উত্তেজক প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচালিত করা যায়।

সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টিঃ

মনে করা যাক্ একটি ঘণ্টা ধ্বনি দ্বারা লালার সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রথমে ঘণ্টাটি বাজান হইল; ১৫ বা ৩০ সেকেণ্ড যাবৎ ঘণ্টা বাজিতে থাকা কালেই ঘণ্টাপ্রসূত উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে একটি অপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইল—অর্থাৎ রবারের গোলক চাপিয়া কুকুরের সম্মুখে একটি খাদ্যপাত্র রাখা হইল; অতঃপর ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-পাত্রটিও সরাইয়া লওয়া হইল।

খাদ্য ভক্ষণের সময় কুকুরের প্রচুর লালা ক্ষরণ হইবে। এই পরীক্ষা বহুবার চালাইবার পর কুকুরটির সম্মুখে খাদ্য রাখিবার পূর্বেই শুধু ঘণ্টা-ধ্বনিতেই লালা নিঃসৃত হইতে থাকে।

এইভাবে বারবার ভক্ষণের সহিত ঘণ্টাধ্বনিপ্রসূত উত্তেজনার সংযোগে শেষ-পর্যন্ত ঘণ্টাধ্বনিই খাদ্য সঙ্কেতে বা সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনে পরিণত হয়। এখন শুধু ঘণ্টাধ্বনিতেই লালা ক্ষরণ হইবে।

সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝে ইহার সহিত অপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে খাদ্যপাত্র মারফৎ উত্তেজনা যোগ করিতে হয়। এইরূপ না করিলে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন ক্রিয়া দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইবে।

গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সে প্রতিবন্ধক যোগাযোগ (conditioned associations)ঃ

জিহ্বার উপর খাদ্য রাখিলে স্বাদ-ধারকগুলি উত্তেজিত হয়। ইহার ফলে উদ্ভূত তাড়নাগুলি স্বাদ-স্নায়ুর অন্তর্মুখী তন্তু বাহিয়া সুষুম্নাশীর্ষকের লালা কেন্দ্রে পরিচালিত হয় এবং সেখানে একটি উত্তেজিত অঞ্চল সৃষ্টি করে; সুষুম্নাশীর্ষক হইতে এই উত্তেজনা বহির্মুখী স্নায়ুতন্তু বাহিয়া লালা গ্রন্থিতে চলিয়া আসে। অর্থাৎ লালার প্রতিবর্তন-চক্র সুষুম্নাশীর্ষকের মধ্য দিয়া চলাচল করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সস্থিত স্বাদ-কেন্দ্রেও তাড়না পেঁছায় এবং সেখানেও সুষুম্নাশীর্ষকের মত একটি উত্তেজিত অঞ্চল সৃষ্টি হইয়া থাকে (১৩৮-ক নং চিত্র)। অবশ্য লালার প্রতিবর্তন এবং অন্যান্য অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের জন্য গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের অংশ গ্রহণ কোন প্রয়োজনীয় শর্ত নয়।

সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টির জন্য অন্য কোন নূতন উত্তেজনা—যেমন বৈদ্যুতিক বাল্বের আলো ব্যবহার করা যাইতে পারে (১৩৮-খ নং চিত্র)। এই উত্তেজনাও কর্টেক্সে এবং মস্তিষ্কের নিম্নতর অংশে উত্তেজিত এলাকা সৃষ্টি করিবে। আলোকের উত্তেজনায় একটি "উজ্জ্বল" (দৃষ্টি আকর্ষক) প্রতিবর্তন সৃষ্টি হইতে পারে, কুকুরটি বৈদ্যুতিক বাল্বের দিকে মস্তক ঘুরাইয়া কান খাড়া করিয়া সচেতন হইয়া উঠিবে। ইহা একটি অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন—ইহার চক্র কর্টেক্সের মধ্য দিয়া যায় না।

আলোকপ্রসূত এই নূতন উত্তেজনার সহিত খাদ্যপ্রসূত অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন যুক্ত হইলে কর্টেক্সে দুইটি উত্তেজিত এলাকা সৃষ্টি হয়; প্রথমটি উৎপত্তি হয় কর্টেক্সের দৃষ্টিকেন্দ্রে এবং দ্বিতীয়টি ঠিক তাহার পর স্বাদকেন্দ্রে; ফলে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ গড়িয়া ওঠে। এই দুইটি কেন্দ্র একত্রে যত দ্রুত উত্তেজিত হইবে উহাদের মধ্যে সংযোগ এত শক্তিশালী হইবে যে আলোকপ্রসূত প্রথম কেন্দ্রের

উত্তেজনা দ্বিতীয় কেন্দ্রেও ছড়াইয়া পড়ে। ফলে, খাদ্য না দিয়াও শুধু আলোকের উত্তেজনাতেই লালা ক্ষরণ হইতে থাকে।

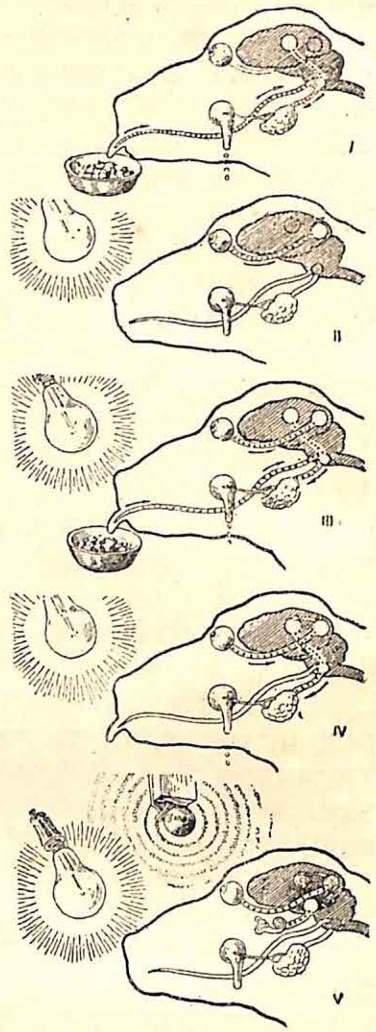
এই ধরণের সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন-চক্র কর্টেক্সের দুইটি অঞ্চল দিয়া চলাচল করে; প্রথমে দৃষ্টি-কেন্দ্রের একটি নির্দিষ্ট অংশে উত্তেজিত এলাকা সৃষ্টি হয় এবং পরে উভয় অংশের সংযোগের ফলে দৃষ্টিকেন্দ্রের উত্তেজনা স্বাদ-কেন্দ্রের অনুরূপ নির্দিষ্ট অংশে প্রবাহিত হয়; সেখান হইতে উত্তেজনা-প্রবাহ সুষুম্না-শীর্ষকের লালাকেন্দ্রের মধ্য দিয়া লালা-গ্রন্থিতে চলিয়া যায় (১৩৮-গ ও ঘ নং চিত্র)।

এইভাবে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টির মাধ্যমে কর্টেক্সের দুইটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সংযোগ গড়িয়া ওঠে এবং তাহার ফলে প্রথম এলাকার উত্তেজনা দ্বিতীয় এলাকাকেও সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত করে। এই ধরণের সংযোগকে প্রতিবর্তক সংযোগ বলা হয়।

সপ্রতিবন্ধ ও অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের তুলনাঃ

অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টিতে বিশেষ কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই। এই প্রতিবর্তন সহজাত, বংশানুক্রমিক এবং এক জাতির সমস্ত জন্তুদের মধ্যেই সম চরিত্রসম্পন্ন। এইজন্য ইহাকে নির্দিষ্ট বলা যাইতে পারে। ইহাদের নির্দিষ্ট ও স্থায়ী চক্র থাকে; এই চক্র মস্তিষ্কের উচ্চতর অংশের পরিবর্তে নিম্নতর অংশের মধ্য দিয়া চলাচল করে।

অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের বিপরীতভাবে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন জীবদেহের জীবদ্দশায় অর্জিত হয়; বিশেষ বিশেষ অবস্থাধীনে এবং কোন একটি অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের সহযোগিতায় বারবার শক্তি-নূতন সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি শালী হইয়া ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট স্নায়ু-কেন্দ্রটির



১৩৮নং চিত্র—অপ্রতিবন্ধ ও সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন

১। লালার অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন; ২। নিষ্ক্রিয় আলোর উত্তেজনা (কর্টেক্সে দৃশ্য কেন্দ্রে উত্তেজিত এলাকা); ৩। সপ্রতিবন্ধ প্রবির্তন সৃষ্টি; নিষ্ক্রিয় উত্তেজনা সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের দ্বারা শক্তিশালী হওয়া (কর্টেক্সে এক সঙ্গে দুইটি উত্তেজিত এলাকা সৃষ্টি হয়); ৪। সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন; ৫। সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের নিরোধ; কর্টেক্সের শ্রবণকেন্দ্রে উত্তেজিত এলাকার সৃষ্টি এবং অন্যান্য এলাকায় নিরোধের আবির্ভাব।

উত্তেজনা-প্রবণতা যথেষ্ট উচ্চ মাত্রার হওয়া প্রয়োজন এবং বাহিরের কোন উত্তেজনা দ্বারা ব্যাঘাত ঘটিতে দেওয়া চলিবে না।

সৃষ্ট সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনকে মাঝে মাঝে শক্তিশালী করিতে পারিলে ইহা বহুকাল পর্যন্ত অটুট থাকে। পুনঃবলীয়ান না করিলে ইহা স্তিমিত হইয়া যায়। সুতরাং সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন অর্জিত এবং অস্থায়ী; জীবটির পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ইহার উৎপত্তি নির্ভর করে। সুতরাং বিভিন্ন ধরণের সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন শুধু যে একই জাতির বিভিন্ন জীবের দেহে সৃষ্টি করা যায় তাহা নয়, একই জীবে বিভিন্ন সময়েও ইহার উৎপত্তি হইতে পারে। নির্দিষ্ট ধরণের প্রতিবর্তনের সহিত ইহার পার্থক্য বোঝার জন্য এইগুলিকে ব্যক্তিগত প্রতিবর্তন বলা যাইতে পারে।

প্রতিটি নূতন সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের জন্য নূতন প্রতিবর্তন-চক্রের প্রয়োজন এবং এইগুলি সর্বদাই মস্তিষ্কের উচ্চতর অংশের মধ্য দিয়া চলাচল করিবে (কুকুরের ক্ষেত্রে গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স)।

সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের তাৎপর্য ঃ

প্রত্যেক জীবই তাহার জীবদ্দশায় বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য উত্তেজনার সম্মুখীন হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি উত্তেজনা বহির্জগতের বিভিন্ন ঘটমান বিষয়ের সঙ্কেতে পরিণত বা প্রতিবর্তিত হইয়া যায়; জীবদেহের নিকট এই সঙ্কেতগুলি কোন কোন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবর্তন ক্রিয়ারও পরিবর্তন সাধিত হয়—কতকগুলি পুরাতন প্রতিবর্তন অদৃশ্য হইয়া নূতন প্রতিবর্তনের আবির্ভাব হয়। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য ও প্রতিরোধপ্রসূত প্রতিবর্তনবিশিষ্ট কোন গৃহপালিত কুকুরের কথাই ধরা যাক। এই কুকুরটি গৃহত্যাগ করিয়া রাস্তার কুকুরে পরিণত হইলে ইহার অনেকগুলি সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন অদৃশ্য হইবে। সেইগুলির পরিবর্তে কুকুরটির নূতন পরিবর্তিত জীবনের অবস্থানুসারে নূতন কতকগুলি প্রতিবর্তন সৃষ্টি হইবে।

জীবনের অবস্থা কখনও চিরস্থায়ী হয় না। স্নায়ুতন্ত্র সবসময়ই বাহিরের পরিবেশের পরিবর্তন অনুসারে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—অপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা দ্বারা নববলে বলীয়ান হইতে না পারিয়া পুরাতন সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন অদৃশ্য হয়, নূতন প্রতিবর্তনের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই ঘটনা—অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার চিরপরিবর্তনশীল জীবন ধারণের অবস্থার সহিত নিজেকে মানাইয়া লওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যই সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের গুরুত্ব এত বেশী।

প্রশ্ন ঃ

১। এই পুস্তকে বর্ণিত উদাহরণ ছাড়া অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের নূতন কয়েকটি উদাহরণ দাও।

২। অনুরূপভাবে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ দাও এবং যে-সকল অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের ভিত্তিতে এইগুলি সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

৭৪। গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়া

সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের নিরোধ (inhibition)ঃ

গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সে এবং স্নায়ুতন্ত্রের অন্যান্য অংশেও উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়ার মধ্যে নিরন্তর পারস্পরিক যোগাযোগ চলিতেছে। কর্টেক্সের কোন এক অংশে প্রচণ্ড উত্তেজিত এলাকার আবির্ভাব হইলে সঙ্গে সঙ্গে এক বিপরীত অবস্থা,—অর্থাৎ কর্টেক্সের অপর অংশে নিরোধক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। একটি সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন ক্রিয়া (বৈদ্যুতিক বাল্বের আলোকপ্রসূত) চলিতে থাকার সময় অকস্মাৎ কোন উচ্চ শব্দ শুনিলে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। শব্দটি কর্টেক্সের শ্রবণকেন্দ্রে এক শক্তিশালী উত্তেজিত এলাকা সৃষ্টি করিবে এবং দৃষ্টি-কেন্দ্রসহ অন্য সমস্ত অংশে নিরোধ সৃষ্টি হইবে; ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় যে বৈদ্যুতিক বাল্বের আলো লালা ক্ষরণ করাইত, এখন আর কোন প্রতিক্রিয়াই ঘটাইবে না (১৩৮-ঙ নং চিত্র)।

বাহিরের উত্তেজনাপ্রসূত এবং বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয় নাই এই ধরণের নিরোধকে প্যাভ্‌লভ্ নাম দিয়াছেন **অপ্রতিবন্ধ নিরোধ** (unconditioned inhibition)।

সপ্রতিবন্ধ নিরোধঃ

অন্যান্য ক্ষেত্রে নিরোধ-প্রক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হয় না—কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় ক্রমশ গড়িয়া ওঠে। এই ধরণের নিরোধকে—যেমন, অপ্রতিবন্ধ উত্তেজনার দ্বারা নববলে বলীয়ান হওয়ার অভাবে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন অদৃশ্য হওয়াকে—প্যাভলভ্ নাম দিয়াছেন সপ্রতিবন্ধ নিরোধ।

মনে করা যাক্, একটি কুকুরের দক্ষিণ উরুতে আঁচড় দিলে উহার লালার সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন হইবে। কুকুরটিকে খাদ্যদান মারফৎ নব-বলে বলীয়ান **না-করিয়া** শুধু কয়েক মিনিট পরপর উহার উরুতে আঁচড় দিলে অর্থাৎ শুধু একটি সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি করিলে প্রথমে প্রতি উত্তেজনায় ক্ষরিত লালার পরিমাণ কমিতে থাকিবে, এবং তাহার পর লালা ক্ষরণ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবে।

মনে হইতে পারে যে অদৃশ্য প্রতিবর্তন বুঝি পরদিনও আর দেখা যাইবে না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরদিন উহা পুনরাবির্ভূত হয় এবং পুনরায় আঁচড়াইলে লালা ক্ষরণ হইতে থাকে। প্রতিবর্তনের পুনরাবির্ভাবের কারণ সম্ভবত এই যে অদৃশ্য হওয়ার সময়—অর্থাৎ অপ্রতিবন্ধ উত্তেজনার দ্বারা সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনকে নববলে বলীয়ান করার অভাবে কর্টেক্সের সংশ্লিষ্ট অংশে উত্তেজনার পরিবর্তে নিরোধ সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং এই নিরোধ প্রতিবর্তনকে দুর্বল অথবা সম্পূর্ণ অদৃশ্য করিয়া দেয়। কর্টেক্সের ঐ বিশেষ অংশের নিরুদ্ধ অবস্থা যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ প্রতিবর্তনের পুনরাবির্ভাব হইবে না।

উত্তেজনার তারতম্য বোধঃ

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে চর্মের বিভিন্ন অংশ হইতে তাড়নাগুলি কর্টেক্সের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয়। কোন কুকুরের দক্ষিণ উরুতে আঁচড়

দিয়া লালার সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি করিলে কর্টেক্সের সংশ্লিষ্ট অংশে উত্তেজনা উদ্ভূত হইবে এবং ঐ উত্তেজনা কর্টেক্সের খাদ্য-কেন্দ্রে পরিবাহিত হইবে। মনে করা যাক, এবারে "স্পর্শক" (চর্ম উত্তেজিত করার একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র) দ্বারা কুকুরের দক্ষিণ উরুর পরিবর্তে বাম থাবা, দেহকান্ড, অথবা দেহের অন্য যে কোন অংশের চর্মে প্রয়োগ করা হইল। এরূপ অবস্থাতেও চর্মের নূতন কোন অংশের উত্তেজনা কোন অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন দ্বারা নব-বলে বলীয়ান করা না হইলেও স্পর্শকের আঁচড় সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি করিবে।

এইরূপ হওয়ার কারণ হইল এই যে উত্তেজনা কর্টেক্সের কোন একটি নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছাইয়া সেইখানেই থাকিয়া যায় না,—পরন্তু সন্নিহিত অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়ে বা বিকীর্ণ হয়। সুতরাং কোন সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি করার সময় দক্ষিণ উরুর চর্মের উত্তেজনায় কর্টেক্সের সংশ্লিষ্ট উত্তেজিত অংশ শুধু খাদ্যকেন্দ্রকেই উত্তেজিত করে না, সঙ্গে সঙ্গে ইহার চতুস্পার্শ্বস্থ অংশেও—যেখানে চর্মের অন্যান্য অংশের সহিত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র আছে, সেখানেও উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়ে।

অবশ্য উত্তেজনার বিস্তার ক্রমশ হ্রাস পায় এবং ইহা সীমাবদ্ধ একটি অংশে কেন্দ্রীভূত হয়। কুকুরটির চর্মের বিভিন্ন অংশে কয়েকবার 'স্পর্শক' প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার পর শুধু দক্ষিণ উরুতে আঁচড় দিবার সময় খাদ্য সরবরাহ করিয়া উত্তেজনা কেন্দ্রীভূত করার প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট তীব্রতর করিয়া তোলা যায়। কিন্তু চর্মের অন্যান্য সংস্থা উত্তেজনা দানের সময় কোন খাদ্য দেওয়া চলিবে না। এই পরীক্ষায় লালার ক্ষরণ কিছুক্ষণ পরে—অর্থাৎ দক্ষিণ উরুতে আঁচড় দিলে তবেই শুরু হইবে। চর্মের অন্যান্য অংশ উত্তেজিত করিলে কর্টেক্সের সংশ্লিষ্ট অংশে সপ্রতিবন্ধ নিরোধ সৃষ্টি হইবে এবং কোন প্রতিবর্তন পাওয়া যাইবে না।

এইভাবে গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সে একই ধরণের উত্তেজনার মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে একটি উত্তেজনা সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি করে এবং অপর কোন উত্তেজনা নিরোধ সৃষ্টি করে। একই প্রকার সঙ্কেতের মধ্যে এই তারতম্য যথেষ্ট উচ্চ মাত্রার উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। একটি শব্দকারী মেট্রোনোমের (সময় গোনার যন্ত্র) সাহায্যে কুকুরের স্নায়ুতন্ত্রে এই তারতম্য অনুধাবন করা সম্ভব। মানুষের ক্ষেত্রে এত সূক্ষ্ম তারতম্য ধরা সহজ নয়।

উত্তেজনার বিশ্লেষণ ও সংযোগ সাধন:

এই তারতম্য—অর্থাৎ উত্তেজনার বিশ্লেষণ, প্রথমে বোধ-যন্ত্রসমূহে শুরু হয়, কারণ, বিভিন্ন উত্তেজনা (আলোক, শব্দ ইত্যাদি) বিভিন্ন ধারকের উপর কাজ করে। তাহা ছাড়াও প্রতিটি বোধযন্ত্রে আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রুতি-স্নায়ুর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত বা সূত্র (nerve endings) শব্দের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম (pitch) দ্বারা উত্তেজিত হয়। সুতরাং শ্রবণযন্ত্রেই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সূক্ষ্ম তারতম্য ধরার শক্তি অর্জিত হইয়া থাকে। অন্যান্য বোধ যন্ত্রেও উত্তেজনার অনুরূপ তারতম্য বা পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া থাকে।

অবশ্য উত্তেজনার তারতম্য করা শুধু বোধযন্ত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বোধযন্ত্রে উদ্ভূত তাড়নাগুলি কর্টেক্সের সংশ্লিষ্ট অংশে পরিবাহিত হইয়া সেখানে উত্তেজিত ও নিরুদ্ধ এলাকা সৃষ্টি করিয়া থাকে; ইহার ফলে উত্তেজনার আরো বেশি তারতম্য সৃষ্টি হয়।

বোধযন্ত্রে উদ্ভূত এবং কর্টেক্সে সমাপ্ত উত্তেজনার বিশ্লেষণ একটি ঐক্যবদ্ধ প্রক্রিয়া। এইজন্যই প্যাভলভ্ ধারক, ধারক হইতে কর্টেক্স্ পর্যন্ত অন্তর্মুখী স্নায়ুপথ এবং কর্টেক্সের সংশ্লিষ্ট অংশকে সম্মিলিতভাবে বিশ্লেষক আখ্যা দিয়াছেন।

বোধযন্ত্রগুলি বিশ্লেষকের বহিস্থ বা প্রান্তীয় মুখ, এবং গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স ইহার আভ্যন্তরিক বা কেন্দ্রীয় মুখ।

কর্টেক্সে শুধু একই প্রকার উত্তেজনার তারতম্য (বিশ্লেষণ) হয় না—সমন্বয় সাধনও (synthesis) হইয়া থাকে। উত্তেজনা ও নিরোধ পরিব্যাপ্ত বা বিকীর্ণ হওয়ার ক্ষমতার উপর সমন্বয় সাধন (synthesis) নির্ভর করে। একটি উদাহরণ বিচার করা যাক। একটি কুকুরের প্রতিরোধক প্রতিবর্তন—যেমন, থাবা উঠান—সৃষ্টি করা হইল। অপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা হিসাবে গ্রহণ করা হইল বৈদ্যুতিক তরঙ্গপ্রসূত বেদনাদায়ক উত্তেজনা, এবং সপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা হইল একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টার ধ্বনি। এখন একটি নিম্নস্বরের বৃহৎ ঘণ্টা বাজাইলেও প্রথমে একই প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইবে—কুকুরটি তাহার থাবা উঠাইবে। এক্ষেত্রে কর্টেক্সে একই প্রকার দুইটি উত্তেজনার সমন্বয় বা সংযোগ সাধিত হয়।

বহির্বিশ্বের এবং জীবদেহের বিভিন্ন ঘটমান বিষয়ের সঙ্কেত সৃষ্টিকারী তাড়নাসমূহের সংযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্কই উত্তেজনার তারতম্য বা বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় সাধন করিয়া থাকে।

উত্তেজনার বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধনের অত্যাবশ্যকীয় তাৎপর্য অত্যন্ত পরিষ্কার। ইহারা জীবকে তাহাদের জীবন ধারণের অবস্থার সহিত মানাইয়া লইবার এবং বিভিন্ন উত্তেজনায় সঠিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার সুযোগ দেয়। শুধু মুক্ত এবং বন্যজন্তুদের ক্ষেত্রে অন্যরূপ ঘটিয়া থাকে; যে কোন শব্দ, প্রতিটি ছায়া, সূক্ষ্মতম গন্ধ, বাতাসের সামান্যতম কম্পনও ইহাদের নিকট খাদ্য অথবা বিপদের সঙ্কেত হিসাবে গণ্য হয়। শুধু সমন্বয় সাধন এবং তাহার সঙ্গে উত্তেজনাগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কোন জন্তু আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারে, শিকার খুঁজিয়া পায় এবং যথা সময়ে সঠিক অবস্থা অনুসারে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে।

উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়ার বিস্তৃতিঃ

সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সম্পর্কে বহু বৎসরের গবেষণা ও অনুশীলন দ্বারা প্যাভলভ্ ও তাঁহার সহকর্মীরা কর্টেক্সে উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়ার সঞ্চালন চরিত্র এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্ধারণ করার সুযোগ পান। দেহের সমস্ত অংশ হইতে অসংখ্য তাড়না নিরন্তর কর্টেক্সের কোষসমূহে প্রবাহিত হইতেছে। এই সমস্ত তাড়নাপ্রসূত উত্তেজিত ও নিরুদ্ধ এলাকাগুলির একটিও নিষ্ক্রিয় থাকে না; ইহারা কর্টেক্সের অন্যান্য অংশেও বিকীর্ণ বা বিস্তৃত হয়। উত্তেজনা ও নিরোধের এই বিকীরণ প্রক্রিয়া স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপের অন্যতম মূল নীতি।

অপর একটি মূল নীতি হইল উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়ার **পারস্পরিক আবেশ** (induction)—অর্থাৎ বিপরীত অবস্থার আবেশ। অর্থাৎ কর্টেক্সের এক অংশে উত্তেজিত এলাকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অপর অংশের নিরুদ্ধ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। নিরুদ্ধ অবস্থা উত্তেজনাকে কর্টেক্সের সর্বাংশে পরিব্যাপ্ত

হইতে না দিয়া ইহার উৎপত্তি স্থলে পুনরায় কেন্দ্রীভূত হইতে বাধ্য করে। এইখানেই উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া যায় এবং তাহার স্থলে বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ নিরোধ সৃষ্টি হইয়া থাকে।

এইভাবে উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়া অহরহ পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে। ফলে, গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সে উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়ার এক অতি জটিল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, অথবা প্যাভ্লভের ভাষায় এক কারুকার্যখচিত গঠন সৃষ্টি হয়। এই কারুকার্য নিরন্তর গতিশীল—উত্তেজিত ও নিরুদ্ধ অঞ্চলগুলি পরস্পরের স্থলাধিকার করিয়া কর্টেক্সের বিভিন্ন অংশে কখনও আবির্ভূত কখনও বা অদৃশ্য হইতেছে।

প্যাভ্লভের সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন তত্ত্বের গুরুত্বঃ

সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সম্পর্কে প্যাভ্লভের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শারীর-বৃত্তের এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে—উচ্চস্তরের স্নায়বিক কার্যকলাপের বস্তুবাদী অনুশীলনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

প্যাভ্লভ্ প্রমাণ করেন যে উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়ার যন্ত্র হিসাবে গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের কার্যকলাপ দেহের অন্যান্য অংশের মত বিশদ ও গভীরভাবেই অনুশীলন করা যায়। প্যাভ্লভের নেতৃত্বে সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা আরও প্রমাণ করেন যে পশু ও মানুষের **উচ্চস্তরের স্নায়বিক** ক্রিয়াকলাপ উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত; স্নায়ুতন্ত্রের অন্যান্য অংশের এই একই বৈশিষ্ট্য। বহু বৎসর যাবৎ এই প্রক্রিয়া অনুশীলনের দ্বারা তাঁহারা জীবজন্তুর ব্যবহার সম্পর্কিত নিয়মগুলি নির্ধারণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণ করেন যে জীবদেহ তাহার কর্টেক্সের সাহায্যেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে। ইহাই সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সম্পর্কে প্যাভ্লভের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিরাট জৈবিক গুরুত্ব।

অস্বাভাবিক শক্তিশালী উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া এবং এক বিশেষ ধরণের সম্মিলিত শক্তিযুক্ত সপ্রতিবন্ধ-উত্তেজনা ও তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত শক্তি-অযুক্ত-সপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা প্রয়োগ দ্বারা প্যাভ্লভ কুকুরের কর্টেক্সে এমন এক ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্টি করেন যাহা মানুষের কোন কোন স্নায়বিক ও মানসিক (মনস্তাত্বিক) ব্যাধির সমতুল্য। ইহার ফলে প্যাভ্লভ্ এই ধরণের ব্যাধিতে কর্টেক্সের শারীর-বৃত্তিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার এবং চিকিৎসা পদ্ধতি স্থির করার সুযোগ পান। উচ্চস্তরের স্নায়বিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে প্যাভ্লভীয় তত্ত্ব বিষয়টিকে সহজ ও পরিস্কারভাবে বুঝিতে সাহায্য করে; নিদ্রা, কৃত্রিম নিদ্রা এবং কয়েক ধরণের মানসিক ব্যাধির কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে; এবং এইভাবে "আত্মার অবিনশ্বরতা", "ঈশ্বরবাদ", "ভবিষ্যৎবাণীপূর্ণ" স্বপ্ন, তথাকথিত "ভূতে পাওয়া" লোক বা "অলৌকিক"-চিকিৎসা ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় ধর্মীয় উপকথা খন্ডন করেন।

প্রশ্নঃ

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের নিরোধ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৭৫। মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়া-কলাপের বৈশিষ্ট্যসমূহ

মানুষ ও পশুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যঃ

মানব জীবনের মূল ভিত্তি শ্রম—উৎপাদন ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রম। শ্রমই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জীবজন্তু হইতে স্বতন্ত্র মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির সৃষ্টি ও উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে। সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমশীল কার্যকলাপের ফলে সুস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। শ্রম ও সুস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হইয়াই বিকশিত হইয়াছে অপূর্ব মানব-মস্তিষ্ক—আবির্ভাব হইয়াছে গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সে নূতন নূতন স্তর, এবং অন্যান্য অংশের কার্যকলাপও পরিবর্তিত হইয়াছে।

এঙ্গেল্স্ বলিয়াছেন, "প্রথমে শ্রম, এবং পরে শ্রমের সহিত সুস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ—এই দুইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উত্তেজনার প্রভাবেই বানরের মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে মানব মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হইল......"। ফলে মানুষ অবশিষ্ট জীব জগতের তুলনায় বিকাশের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইল। মানুষের মানসিক অবস্থা —অর্থাৎ অনুভূতি, চিন্তা, আবেগ, কামনা ইত্যাদি পশুদের তুলনায় অপরিমেয় উন্নত। মানুষের একান্ত বৈশিষ্ট্য—মানসিক অবস্থার এই উচ্চতর পর্যায়ের বিকাশকেই **চেতনা** বলা হয়।

পশুদের মানসিক অবস্থা ও মানুষের চেতনাঃ

কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা বা **উদ্দেশ্যপূর্ণতাই** মানুষের সচেতন কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য। মানুষ প্রথমে নিজের সম্মুখে একটি উদ্দেশ্য স্থাপন করে এবং তাহার পর সেই উদ্দেশ্য সফল করার পন্থা অন্বেষণ করে।

"মাকড়সার কার্যকলাপ বহুলাংশে তাঁতির কাজের সমতুল্য; মৌমাছি তাহার মোমের কোষ রচনায় মানুষের কোন কোন স্থপতিকেও লজ্জা দিবে। কিন্তু প্রথম হইতেই দক্ষতম মৌমাছির সহিত নিকৃষ্টতম স্থপতির পার্থক্য এই যে মানব-স্থপতি মোমের কোষ নির্মাণের পূর্বেই তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে সেই কোষ রচনা করিয়া ফেলিয়াছে। কর্ম-প্রক্রিয়া শেষ করার পর যে ফল হয়, প্রক্রিয়া শুরু হইবার সময়ই সে-সম্পর্কে কর্মীর একটা ধারণা ছিল......" (মার্ক্স)।

মার্ক্সের এই উক্তিতেই মানুষের চেতনা ও পশুর মানসিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্যটি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষ এবং পশু উভয়ের মানসিক প্রক্রিয়াতেই বহির্বিশ্বের ঘটনাবলীর প্রতিফলন হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষ তাহার চেতনায় বিশ্বকে প্রতিফলিত করার সময় দৃষ্ট ঘটনাকে সাধারণ নিয়মভুক্ত করিয়া লয় এবং সেই ঘটনানিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলি নির্ধারণ করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা সে ঐগুলিকে নিজ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার, প্রকৃতিকে স্ববশে আনিবার, এবং শ্রমশীল কর্মপ্রক্রিয়া দ্বারা বিশ্বকে পুনর্গঠিত করার সুযোগ পায়। এঙ্গেল্স্ বলিয়াছেন, "পশুরা বহির্জগতকে শুধু ব্যবহার করে এবং শুধু নিজেদের উপস্থিতির দ্বারা সেই জগতে পরিবর্তন আনয়ন করে; কিন্তু মানুষ জগতকে পরিবর্তিত করার সময় ইহাকে নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধনে বাধ্য করে এবং ইহার উপর আধিপত্য করে।"

উচ্চস্তরের পশুদের প্রাথমিক ও আদিম চিন্তাশক্তি আছে, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু মানুষের চিন্তাশক্তি শুধু দৃশ্যমান ঘটনাকেই সাধারণ নিয়মভুক্ত করে না, পরন্তু প্রত্যক্ষভাবে অ-দৃষ্ট অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ঘটনার গতি পূর্বাহ্নে বুঝিতে পারে। উৎপাদন এবং প্রথমে অতি সরল ও পরে ক্রমবর্ধমান জটিল শ্রমের উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষের সচেতন চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়।

চেতনা একটি সমাজ-সপ্রতিবন্ধ ঘটনাঃ

মানুষের ঐতিহাসিক বিবর্তনে শ্রম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়িয়া ওঠা চেতনা খাদ্য, বস্ত্র ও জীবনধারণের অন্যান্য উপাদান সংগ্রহের পদ্ধতির উপর—অর্থাৎ শ্রমের উপকরণ ও অভিজ্ঞতার উপর এবং শ্রমপ্রক্রিয়ার সময় মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে তাহার উপর নির্ভরশীল ছিল। মানব সমাজের শ্রম-প্রক্রিয়াই রাষ্ট্রের রূপ নির্ধারণ করিয়াছে এবং মানুষের প্রয়োজন, সাংস্কৃতিক জীবন ও ধারণার উপর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। জে· ভি· স্তালিন বলিয়াছেন, "জনসাধারণের চিন্তাধারা তাহাদের জীবনধারণ পদ্ধতিরই অনুরূপ।" ইহার অর্থ, চেতনা সমাজের ইতিহাস সৃষ্ট।

চেতনা ও মস্তিষ্কঃ

চেতনাকে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ হইতে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। মস্তিষ্কের ক্রিয়া ব্যতিরেকে কোন মানসিক প্রক্রিয়াই চলিতে পারেনা। অতীতে মনে করা হইত যে চেতনা গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের নির্দিষ্ট কোন কোন অংশের উপর নির্ভরশীল; কিন্তু বর্তমানে প্রমাণ হইয়াছে যে চেতনা গুরুমস্তিষ্কের সমগ্র কর্টেক্সের সহিত সংশ্লিষ্ট।

কুকুর বা অন্য যে-কোন জন্তুর তুলনায় মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের জটিলতা অপরিমেয়। কিন্তু ক্র্যাস্নোগোরস্কী (Krasnogorsky), ইভানভ-স্মোলেন্স্কী (Smolensky) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিয়াছেন যে মানুষ ও উচ্চস্তরের পশুদের গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের ক্রিয়াকলাপে পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে বহু মিলও আছে। সেইজন্যই সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সম্পর্কে প্যাভ্‌লভের গবেষণা মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংকেত সম্পর্কে প্যাভ্‌লভের গবেষণাঃ

পশুদের মত মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিস্বরূপ সপ্রতিবন্ধ যোগাযোগগুলি কর্টেক্সেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। "জীবজগতে এবং আমাদের মধ্যেও অস্থায়ী স্নায়বিক যোগাযোগই সর্বাপেক্ষা সার্বজনীন শারীর-বৃত্তিক ঘটনা" (প্যাভ্‌লভ্)।

শিশুর জন্মের প্রথম দিন হইতেই সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন দেখা যাইতে পারে। ইহার ঠোঁটটি আলতোভাবে স্পর্শ করিলেই স্তন্যপানানুরূপ বা চোষণের সঞ্চালন হইবে। ইহা একটি অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন। কিন্তু শিশুটিকে বারবার বোতল দিয়া (feeding bottle) দুধ খাওয়াইলে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি হইবে—শুধু বোতল দেখাইলেই ওষ্ঠের চোষণ সঞ্চালন শুরু হইবে। প্যাভ্‌লভের

মতে “আমাদের ও সকল জীবের পক্ষে প্রযোজ্য—ইহাই বাস্তবের প্রথম সঙ্কেত”। অবশ্য মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে ইহার গুরুত্ব গৌণ।

মানুষের গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সে সপ্রতিবন্ধ যোগাযোগ সৃষ্টিতে **বাক্যের** বিশেষ ভূমিকা আছে। প্যাভ্‌লভ্‌ বলিয়াছেন, “প্রথম সঙ্কেতের সঙ্কেত হিসাবে বাক্য,—যাহা আমাদের একান্ত বৈশিষ্ট্য,—বাস্তবের দ্বিতীয় সঙ্কেত সৃষ্টি করিয়াছে।” প্যাভ্‌লভের মতে মানুষের কর্টেক্সে সপ্রতিবন্ধ যোগাযোগগুলি প্রধানত বাক্যোচ্চারণের উত্তেজনা হইতেই সৃষ্টি হয়। স্বতন্ত্র বাক্য বা শব্দগুলি বাক্যোচ্চারণের প্রধান অংশ নয়—প্রধান অংশ হইল নির্দিষ্ট অর্থবোধক বাক্যের সমষ্টি। অর্থাৎ বাক্যের অর্থোপলব্ধির ফলেই যোগাযোগ সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ইভানভ্‌ স্মোলেনস্কী প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্কেত এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে আমরা উহাদের **ঐক্যের** কথা বলিতে পারি। সত্য সত্যই, বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা হইতে যে প্রত্যক্ষ ধারণা সৃষ্টি হয়, সেগুলি শুধু সংশ্লিষ্ট বাক্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত নয়, যে-উপলব্ধি প্রত্যক্ষ ধারণাকে সম্ভব করিয়া তোলে, তাহারও সহিত সম্পর্কযুক্ত।

পৃথক পৃথক শব্দ বা বাক্য নয়,—দ্বিতীয় সঙ্কেত পদ্ধতি, অর্থাৎ সমগ্র বাক্যসমষ্টিই মানুষের চিন্তার ভিত্তি। “মানুষের মনে যে-কোন সময় যে-কোন চিন্তারই উদয় হোক না কেন, ভাষার কাঠামোর ভিত্তিতে, ভাষাগত পদ ও কথন ধারার ভিত্তিতেই সে-চিন্তার উদয় হইয়া থাকে।” (স্তালিন)।

উত্তেজনার বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ঃ

মানুষের বোধযন্ত্রগুলির উৎকর্ষতা পশুদের তুলনায় কম হইলেও উত্তেজনার বিশ্লেষণ ও সমন্বয়সাধন অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ ও প্রগাঢ়।

এঙ্গেল্‌স্‌ বলিয়াছেন, “ঈগলপাখী মানুষ অপেক্ষা ঢের বেশী দূর পর্যন্ত দেখিতে পায়; কিন্তু মানুষের চক্ষু কোন বস্তুতে ঈগল অপেক্ষা অনেক কিছু বেশী দেখিতে পায়”। মানুষের তুলনায় কুকুরের শ্রবণানুভূতি অনেক বেশী তীক্ষ্ণ; কুকুর ⅛ ভাগ স্বরের তারতম্য ধরিতে পারে, অথচ মানুষের কর্ণে তাহা প্রবেশই করেনা। কিন্তু মানুষের ভাষার অর্থ কুকুরের নিকট অবোধ্য কারণ, কুকুরের বাক্‌-উত্তেজনা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা নাই।

উত্তেজনার গভীর বিশ্লেষণ ও সমন্বয়সাধনে মানুষের সহজাত ক্ষমতা তাহার মস্তিষ্কের বিশেষ গঠন ও ক্রিয়াকলাপের সহিত সংযুক্ত; এবং মানুষের চেতনা তাহার গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের উন্নত বিকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট।

৭৬। স্নায়ুতন্ত্রের স্বাস্থ্যবিধি

স্নায়ুতন্ত্র ও অবসাদ বোধঃ

কোন লোকের কাজের ক্ষমতা এবং সজীবতা অথবা অবসাদবোধ স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

মানুষ যখন শারীরিক বা মানসিক শ্রমে মগ্ন থাকে, তাহার গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সে উত্তেজিত এলাকার সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে কর্টেক্সের যে সব অংশ ঐ বিশেষ কাজের সহিত সম্পর্কহীন, সেগুলি নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

কাজে যত বেশী উৎসাহ হইবে, কর্টেক্সের কোন কোন অংশের উত্তেজনা এবং অপর অংশগুলির নিরোধ তত বেশী হইবে। এইজন্যই কোন লোক কাজে গভীরভাবে মগ্ন থাকিলে তাহার চারিপাশে ঘটমান কোন কিছু লক্ষ্য করেনা, সেই ঘরে অন্য কাহারও উপস্থিতি অথবা তাহারা কি বলিতেছে সে সম্পর্কে তাহার চেতনা থাকেনা। এরূপ ক্ষেত্রে লোকটি অনেক ভাল এবং অধিকতর মনোযোগ ও দ্রুততার সহিত কাজ করিয়া থাকে। উৎসাহোদ্দীপক কাজ (শক্তিশালী উত্তেজিত এলাকার সহিত সংশ্লিষ্ট) অবসাদ না করিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত করা যায়।

কাজের ইচ্ছার গুরুত্ব অনেক। কোন লোক তাহার কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলে এবং দ্রুত ও ভালভাবে করিবার চেষ্টা করিলে কর্মক্ষমতা বাড়িয়া যায়। যে লোক কাজে উৎসাহ দেখায় না, তাহাকে খারাপ কর্মী বলার পিছনে কারণ আছে।

প্যাভ্লভ্ তাঁহার গবেষণায় প্রমাণ করিয়াছেন যে ক্ষীণ ও একঘেয়ে উত্তেজনা একদিকে জীবদেহকে কাজে উদাসীন করে, অপরদিকে কর্টেক্সে নিরুদ্ধ অবস্থা প্রসারে সাহায্য করে। নীরস, নিরুৎসাহপূর্ণ যে কাজ তীব্র ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন হয় না, তাহাতেও ঐ একই পরিণাম হইয়া থাকে। ফলে, কর্টেক্সের উত্তেজনা-প্রবণতা হ্রাস পায় এবং অবসাদ আসিয়া যায়; অবশ্য কাজে উৎসাহ জাগিলে এই অবসাদ কমিয়া আসে এবং কখনও কখনও সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়।

অবসাদ ঃ

কাজ, বিশেষত শারীরিক কাজ জীবদেহকে সক্রিয় করিয়া তোলে; পরিপাক-ক্রিয়া তীব্রতর হয়, সমস্ত দেহযন্ত্রের, বিশেষত স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্রমে দেহযন্ত্র ও কলাসমূহের রাসায়নিক উপাদানে পরিবর্তন আসে এবং পরিপাকপ্রসূত বিভিন্ন পদার্থ সঞ্চিত হইতে থাকে। ফলে, স্বতন্ত্র দেহযন্ত্র-গুলির এবং সমগ্র জীবদেহের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। দেহের এই অবস্থাকে অবসাদ বলা হয়। শ্রান্তিবোধের সহিত অবসাদের পার্থক্য আছে। অবশ্য অবসাদের অনিষ্টকর পরিণতি নাই এবং যথেষ্ট বিশ্রাম লওয়ার পর অবসাদপ্রসূত পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়।

শ্রান্তিবোধ, কাজের উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস এবং কাজে নিরুৎসাহ বোধ অবসাদ সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা; এ-সমস্তই ক্রমবর্ধমান নিরোধ প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট। নিরুদ্ধ অবস্থা যে অনুপাতে উত্তেজনাকে ছাড়াইয়া যাইবে, কাজও তত দুষ্কর হইবে।

প্যাভ্লভ্ বলিয়াছেন যে অত্যধিক অবসাদ ও ক্লান্তির বিরুদ্ধে জীবদেহকে রক্ষা করার জন্য কর্টেক্সের স্নায়ুকোষগুলিতে একটি **"প্রহরারত নিরোধের"** সৃষ্টি হয়; অবসাদ শুরু হইবার বহু পূর্ব হইতেই এই "প্রহরারত নৈরাজ্যের বা নিরোধের" আবির্ভাব হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ কাজ করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কর্টেক্সের নৈরাজ্য সংক্রান্ত শ্রান্তিবোধ কাটাইয়া উত্তেজনা-প্রবণতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার জন্য আত্মসচেতনভাবে এবং অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করিতে হইবে।

বিশ্রাম :

অবসাদ যাহাতে অত্যধিক অবসাদে পরিণত হইয়া স্নায়ুতন্ত্র এবং সমগ্র জীবদেহের পক্ষে অনিষ্টকর না হয় তাহার জন্য কাজের অন্তর্বর্তী কালে বিশ্রাম দেওয়া এবং এই এই ভাবে জীবদেহের শক্তি ও কর্মক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন।

কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী কাজ করার পর প্রায়ই কিছুক্ষণের জন্য শুইয়া পড়ার বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকার অদম্য ইচ্ছা জাগে।

গভীর অবসাদে সত্যই পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। বিশ্রাম জীবদেহকে শক্তি অর্জনে সাহায্য করিবে এবং তাহার জন্য সক্রিয় হইতে হইবে।

অনেক ক্ষেত্রে এক কাজ হইতে অন্য ধরণের কাজ গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট বিশ্রাম পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মানসিক শ্রমজনিত আয়াসের পর শারীরিক শ্রম করিলে চমৎকার বিশ্রাম হইয়া থাকে। অপরপক্ষে শারীরিক শ্রমজনিত অবসাদের পর বই পড়া, দাবা খেলা ইত্যাদিতে আনন্দ বোধ হয় এবং এইভাবে বিশ্রামও হয়।

প্রত্যেক লোকেরই অবসর সময়ের একটি অংশ মুক্ত বাতাসে সক্রিয় বিশ্রামে যাপন করা উচিত। প্রমোদ ভ্রমণ, বেড়ান, বরফে স্কেটিং বা স্কী করা এবং অন্যান্য খেলাধূলা জীবদেহকে শক্তিশালী করে; স্নায়ুতন্ত্রের বিশ্রামে এইগুলি অতুলনীয়। বিশেষত, প্রাতঃকালীন ব্যায়াম অতীব গুরুত্বপূর্ণ; প্রাতঃকালীন ব্যায়াম জীবদেহকে শক্তিশালী করে, স্বাস্থ্য ও সজীবতা দান করে, এবং কর্মক্ষমতা বাড়াইয়া সারাদিনের জন্য কর্মঠ রাখে। নিয়মিতভাবে দৈনিক প্রাতঃকালীন ব্যায়াম সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

নিত্য-কর্মধারা (routine) :

দৈনন্দিন রুটিন বা নিত্য-কর্মধারার অর্থ সারাদিনের অবশ্য-করণীয় কাজ-গুলির বিন্যাস। কাজ, বিশ্রাম, নিদ্রা, আহার, ভ্রমণ—এ-সমস্তেরই নির্দিষ্ট সময় থাকা প্রয়োজন। নিত্য-কর্মের নিয়মিত ধারা থাকিলে সময় সম্পর্কিত সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন অনায়াসেই সৃষ্টি হইতে পারে এবং জীবনযাত্রাকে ছন্দোবদ্ধ করিবার অভ্যাস জন্মিতে পারে। নিয়মিত সময়ে আহারের অভ্যাস করিলে নির্ধারিত সময় আসন্ন হইলে পাকস্থলীর রসক্ষরণ শুরু হয়, ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং খাদ্য সহজে পাচিত হইয়া থাকে।

অভ্যাসকৃত সময়ে মানুষ দ্রুত এবং সহজে কাজে মনোনিবেশ করিতে পারে এবং কাজও স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হয়।

নির্দিষ্ট সময়ে নিদ্রা যাওয়া ও শয্যাত্যাগের অভ্যাস করিলে রাত্রে দ্রুত ঘুম আসিয়া যায় এবং প্রাতেও সহজে নিদ্রাভঙ্গ হয়।

কঠোরভাবে নিত্য-কর্মধারা মানিয়া চলিলে কর্টেক্সে অভ্যাস ও জীবনের ছন্দ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সপ্রতিবন্ধ যোগাযোগ গড়িয়া উঠিবে; ইহাতে সমগ্র জীবদেহের ক্রিয়াকলাপে সুবিধা হয়।

নিত্য-কর্মধারা বিন্যাসে প্রথমত পর্যায়ক্রমিক কাজ ও বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন; ইহার ফলে মস্তিষ্ক এবং সমগ্র জীবদেহের কার্যকলাপের সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা সৃষ্টি হইবে এবং অত্যধিক অবসাদের সম্ভাবনাও দূর হইবে। পাচনযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ অনুসারে নির্দিষ্ট বিরতি দিয়া আহার করিলে পাচন

ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চলিয়া থাকে। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ভ্রমণ ও বিধিসম্মত দৈহিক যত্ন লওয়ার যথেষ্ট সময় রাখা উচিত। পরিশেষে নিত্য-কর্মধারার মধ্যে নিয়মিত এবং যথোপযুক্ত নিদ্রার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

নিদ্রা ও তাহার গুরুত্বঃ

পর্যায়ক্রমিক জাগরণ ও নিদ্রার মাধ্যমেই জীবনযাত্রার স্বাভাবিক প্রবাহকে বজায় রাখা সম্ভব। নিদ্রা জীবদেহের শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে। স্থায়ী নিদ্রাহীনতা অনাহার অপেক্ষা স্বল্পতর সময়ে মৃত্যু ঘটাইতে পারে। কুকুরের উপর পরীক্ষা চালাইয়া দেখা গিয়াছে যে দীর্ঘকাল ঘুমাইতে না দিলে স্নায়ুতন্ত্রের, বিশেষ করিয়া কর্টেক্সের যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত এই পরিবর্তন কোষগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

কর্টেক্সের ক্রিয়া-কলাপ অনুশীলন করিয়া প্যাভ্‌লভ্‌ অভিমত দেন যে নিদ্রা এমন একটি নিরোধ যাহা সমগ্র কর্টেক্সে এবং মস্তিষ্কের নিম্নতর অংশসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

দন্তশূল বা পাকস্থলীর বেদনা ইত্যাদির ন্যায় উত্তেজনা দ্বারা কর্টেক্সে যথেষ্ট শক্তিশালী উত্তেজিত এলাকা সৃষ্টি হইলে এই নিরোধ বন্ধ হইয়া নিদ্রা নষ্ট হইবে। অপর-পক্ষে কর্টেক্সে নিরোধ বিস্তার প্রতিরোধকারী উত্তেজনাগুলি দূর করিলে (যেমন, শব্দ, আলো ইত্যাদি) সহজেই নিদ্রা আসিয়া যায়। কাপড় জামা খুলিয়া, কম্বলে দেহাবৃত করিয়া শুইয়া পড়িলে বোধযন্ত্র হইতে তাড়না প্রবাহ স্তিমিত হইয়া আসে, কারণ, তখন পোষাক ও ঠান্ডা হইতে উদ্ভূত উত্তেজনা অপসারিত হয়; তাহা ছাড়া স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত শয়ন এবং পেশীগুলি শিথিল হওয়ার ফলে পেশী, কণ্ডরা ও অস্থিসন্ধি হইতে উদ্ভূত তাড়নাস্রোতও হ্রাস পাইয়া থাকে।

দাঁত মাজা, মুখ-হাত ধোয়া, বিছানা পাতা, কাপড়-জামা খোলা ইত্যাদি যে-সব অভ্যস্ত কাজ আমরা শয়নের পূর্বে করিয়া থাকি, সেগুলি সপ্রতিবন্ধ উত্তেজনায় পরিণত হইয়া কর্টেক্সে নিরোধ বিস্তারে সাহায্য করে। দুর্বল, একঘেয়ে এবং নিরুৎসাহী উত্তেজনাও এই প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে; চলন্ত ট্রেনের চাকার একটানা শব্দে অথবা নীরস বই পড়িতে পড়িতে নিদ্রালু হওয়ার কারণ ইহা হইতেই বোঝা যাইবে। গান গাহিয়া মা যখন শিশুকে ঘুম পাড়ান, তখনো ঐ একই একঘেয়ে তাড়নাস্রোত প্রবাহিত হয় এবং ফলে, আরও দ্রুত নিরোধ বিস্তার হইয়া থাকে।

অত্যধিক আয়াস-সাধ্য কাজ, দুশ্চিন্তা, মানসিক উত্তেজনা, ভয় ইত্যাদি মস্তিষ্কের অতি-অবসাদ হইলে বিপরীত ফল দেখা যায়।

অতি-অবসাদ এবং অত্যধিক উত্তেজনা প্রায়ই নিদ্রাহীনতার কারণ হইয়া থাকে।

নিরোধের বিস্তার সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপ হ্রাস করে, পেশীর কর্ম-তৎপরতা ও পরিপাক ক্রিয়া কমাইয়া দেয়, এবং তাহার ফলে শ্বাস-যন্ত্র ও রক্ত-সংবহন যন্ত্রসমূহের কার্যকলাপে পরিবর্তন আনে—নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হ্রাস পায়।

কর্টেক্সের প্রহরা-কেন্দ্রঃ

প্যাভ্‌লভের ল্যাবরেটারিতে একটি পরীক্ষামূলক গবেষণার সাহায্যে "কর" এই শব্দটির দ্বারা একটি কুকুরের লালা ক্ষরণ সম্পর্কিত সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন

সৃষ্টি করা হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সরবরাহ মারফৎ নব বলে-বলীয়ান না করিয়া অন্যান্য কয়েকটি শব্দপ্রসূত উত্তেজনাও প্রয়োগ করা হয়। দেখা গেল যে এই শব্দগুলি শুধু যে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইল তাহা নয়, অপরপক্ষে ইহারা কর্টেক্সে নিরোধ সৃষ্টি করিল; এবং নিরোধ সৃষ্টিকারী শব্দগুলি বারবার পুনরুচ্চারণের ফলে কুকুরটি ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু সপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা সৃষ্টিকারী "কর" শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটির পুনরায় লালা ক্ষরণ শুরু হইল এবং নিদ্রাভঙ্গ হইল।

নিদ্রাকালে মস্তিষ্কের যে-সব অংশ বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখে প্যাভ্‌লভ্‌ তাহাদের নাম দিয়াছেন কর্টেক্সের প্রহরা-কেন্দ্র। এইগুলি জীবদেহের গুরুত্বপূর্ণ উত্তেজনাসমূহের সহিত সংযুক্ত।

নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের কর্টেক্সেও অনুরূপ প্রহরা-কেন্দ্র থাকে। পীড়িত শিশুর পার্শ্বে উপবিষ্ট মা যখন ঘুমে ঢুলিতে থাকেন সে-অবস্থায় তিনি বজ্রপাতের শব্দ হয়ত নাও শুনিতে পারেন, কিন্তু শিশুর সামান্যতম কাতরানিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে। গোলাবর্ষণ চলিতে থাকাকালে শান্তভাবে নিদ্রারত সৈনিক তাহার সেনাপতির কণ্ঠস্বর শোনামাত্র জাগিয়া ওঠে।

স্বপ্ন ঃ

নিদ্রিত অবস্থায় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সীমাবদ্ধ উত্তেজিত এলাকার আবির্ভাব হইতে পারে; ইহা দ্বারাই নিদ্রিত অবস্থায় অঙ্গ সঞ্চালন, লাফাইয়া ওঠা বা কথা বলার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়।

বিভিন্ন দেহযন্ত্র হইতে কর্টেক্সে আগত তাড়না হইতে উদ্ভূত উত্তেজিত এলাকার সহিত স্বপ্নের সম্পর্ক আছে। দৈহিক অবস্থানের পরিবর্তন, ক্ষুধা অথবা তৃষ্ণা, অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত অন্ত্রনালী বা মূত্রাশয়, শ্বাস-প্রক্রিয়ার বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপের পরিবর্তন ইত্যাদি হইতে উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়া তাড়না প্রবাহিত করিতে পারে। অতিভোজনের পর উদরগহ্বরস্থিত যন্ত্রগুলি মধ্যচ্ছদার উপর চাপ দিয়া ইহাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া শ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপকে দুষ্কর করিয়া তোলে এবং ফলে অপ্রীতিকর স্বপ্নের উদ্ভব হয়। নিদ্রারত অবস্থায় অকস্মাৎ নাসিকার শ্লেষ্মা অপসারিত হইলে নিজেকে বাতাসে উড্ডীয়মান মনে হইতে পারে।

বোধযন্ত্রসমূহ হইতে আগত তাড়না দ্বারাও স্বপ্নের উদ্রেক হইতে পারে। নিদ্রিত মানুষের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে নল হইতে জল পড়ার শব্দে নদী বা ঝরণার স্বপ্ন এবং পায়ের তলায় গরম জলের থলি প্রয়োগে উত্তপ্ত মরুভূমির স্বপ্নের আবির্ভাব হইতে পারে।

অনেক সময় অতীতে দেখা, শোনা, পড়া বা চিন্তা করা ঘটমান বিষয় সম্পর্কিত স্বপ্ন দেখা যায়। বহুকাল পূর্বের সম্পূর্ণ বিস্মৃত ঘটনা অথবা কোন ঘটনা নিজের সম্মুখে ঘটিলেও সে-সময় সেই ঘটনা লক্ষ্য না করা বা চেতনায় না আসা সত্ত্বেও সে-সম্পর্কেও স্বপ্ন দেখা যায়।

ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে বোধযন্ত্রসমূহ হইতে আগত এমনকি অতি নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী সমস্ত তাড়নারই **অবশিষ্টাংশ কর্টেক্সের** কোষসমূহে থাকিয়া যায়।

প্রত্যেক লোকের স্বপ্নের উপাদান ও চরিত্র তাহার কর্টেক্সের কার্যকলাপের

বৈশিষ্ট্যের সহিত, নিজের ধারণা, স্মৃতিশক্তি, স্বার্থ ইত্যাদির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষের চিন্তাধারা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লাফাইয়া চলিয়া যায়; নিদ্রিত অবস্থায় এই প্রক্রিয়া আরও প্রকট হইয়া থাকে। এইজন্যই মানুষ স্বপ্নে সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় অর্থহীন দৃশ্য দেখিতে পায়।

কোন কোন সময় এমনও হয় যে স্বপ্ন বাস্তবের সহিত মিলিয়া গেল। কৃষ্টিহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা ইহাকে "ভবিষ্যৎবক্তা স্বপ্ন" বলিয়া থাকে। এইরূপ আকস্মিকভাবে মিলিয়া যাওয়া স্বপ্নের ভবিষ্যৎবাণী বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না।

নিদ্রা সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধিঃ

জীবদেহ যাহাতে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম পাইয়া সারাদিনের ব্যয়িত শক্তি পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে তাহার জন্য দৈনিক যথেষ্ট পরিমাণে ঘুমান আবশ্যক।

প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দৈনিক ৮ ঘণ্টা ঘুমান উচিত। শিশু ও তরুণদের ক্ষেত্রে বয়সের অনুপাতে স্বাভাবিক হার স্থির করিতে হইবে। বয়স যত কম হইবে তত অধিক নিদ্রার প্রয়োজন। স্কুলগামী ১৪ হইতে ১৬ বৎসরের বালক বালিকাদের দৈনিক কমপক্ষে ৯ ঘণ্টা ঘুমান উচিত।

নিদ্রার নির্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। প্রাতঃকালীন নিদ্রা অপেক্ষা সান্ধ্য নিদ্রা ও রাত্রির নিদ্রা গভীরতর হয় বলিয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়া এবং প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করা উচিত।

নিদ্রারত অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত-সংবহন এবং চর্মের স্বাভাবিক কার্যকলাপ যাহাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শুইবার পূর্বে দিনের ব্যবহৃত সমস্ত পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া রাত্রি-বাস পরিধান করা উচিত। নিদ্রাকালে কটিতে বা মনিবন্ধে কোন বন্ধনী থাকা উচিত নয় কারণ তাহাতে রক্ত সংবহন বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঘুমাইবার সময় দেহ সম্পূর্ণ এলায়িত করিয়া এবং দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া ও হাত দুইটি কম্বলের উপর রাখা উচিত। বাম পার্শ্বে ফিরিয়া শুইলে বক্ষগহ্বরের বাম পার্শ্বে চাপ পড়িয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-কলাপকে দুষ্কর করিয়া তোলে।

নিদ্রাকালে মুক্তবায়ু শ্বাস লওয়া প্রয়োজন। সুতরাং শুইতে যাইবার পূর্বে ঘরটি উত্তমরূপে বায়ুপূর্ণ করা উচিত। রাত্রে জানালা খুলিয়া রাখাই শ্রেয়। কোন কারণেই চাদর বা কম্বল দিয়া মস্তক আবৃত করিয়া ঘুমান উচিত নয়।

নিদ্রাকালে ঘরের বাতাসের তাপ ১৫ হইতে ১৬° ডিগ্রির অধিক হওয়া উচিত নয়। দেহ অত্যধিক ঢাকিবারও প্রয়োজন নাই।

পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সপ্রতিবন্ধ নামক প্রতিবর্তনের চরিত্র কি? অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের সহিত ইহার পার্থক্যই বা কি?
২। সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন কিভাবে সৃষ্টি হয়?
৩। সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন-ক্রিয়া পরীক্ষার জন্য কি কি অবস্থার প্রয়োজন?
৪। জীবের জীবনে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের তাৎপর্য কি?

৫। কোন্ অবস্থায় সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের নিরোধ উৎপত্তি হয়? ইহার তাৎপর্যই বা কি?
৬। গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সে উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়া কিভাবে চলে?
৭। বিশ্লেষক কাহাকে বলে? উত্তেজনার বিশ্লেষণ ও সংযোগসাধন ব্যাখ্যা কর।
৮। মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের বিশেষত্বগুলি বর্ণনা কর।
৯। মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের বিকাশ সম্পর্কিত অনুশীলনে সেৎচেনভ ও প্যাভলভের ভূমিকা কি?
১০। অবসাদ কিভাবে সৃষ্টি হয়?
১১। কর্মক্ষমতা কোন অবস্থায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে?
১২। বিশ্রামের ব্যবস্থা কিভাবে করিতে হইবে?
১৩। নিত্যকর্মধারা পালনের গুরুত্ব কি?
১৪। নিদ্রার গুরুত্ব কি? প্যাভলভ্ নিদ্রা প্রক্রিয়াকে কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন?
১৫। নিদ্রা সম্পর্কিত প্রধান স্বাস্থ্যবিধিগুলি বর্ণনা কর।

১১। বর্ধিষ্ণু জীবদেহের শারীর-বৃত্তিক বিশেষত্ব ঃ

৭৭। প্রজনন

জনন কোষঃ

প্রজনন গ্রন্থিগুলি মিশ্র ধরণের বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহাদের বাহিরে ও ভিতরে উভয়প্রকার ক্ষরণ হইয়া থাকে। প্রজনন গ্রন্থিগুলি বাহিরে যে রস ক্ষরণ করিয়া থাকে তাহাতেই জনন-কোষসমূহের উৎপত্তি ও নিঃসরণ হয়।

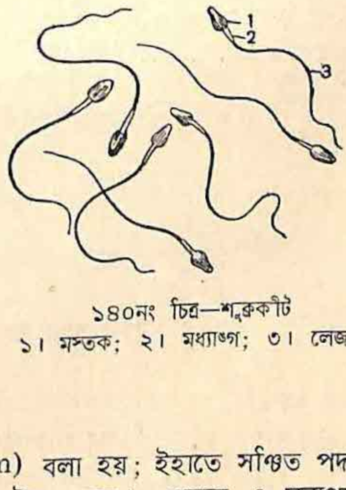
স্ত্রী-প্রজনন যন্ত্র বা **ডিম্বাধারে** (ovary) স্ত্রী-জনন কোষগুলি বা ডিম্বাণু-গুলি (ovum) সৃষ্টি হয়। পুরুষ-প্রজনন-কোষ বা **শুক্রকীটের** (spermatozoa) জন্ম হয় পুং-জনন-কোষ বা **অণ্ডাধারে** (testes)।

ডিম্বাণু বা ডিম্বকোষ (ovum or egg cell) ঃ

অন্যান্য জীবন্ত কোষের মত পরিপুষ্ট ডিম্বাণুতেও জীবোপাদান ও একটি নিউক্লিয়াস আছে (১৩৯নং চিত্র)। ডিম্বাণুর জীবোপাদানকে **ভ্রূণসম্বন্ধীয়**



১৩৯নং চিত্র—ভ্রূণ-ঝিল্লী দ্বারা বেষ্টিত মানব ডিম্বকোষ মধ্যে নিউক্লিয়াস দেখা যাইতেছে। ডীম্বকোষের জীবোপাদানে পুষ্টি-পদার্থের কণিকা দেখা যাইতেছে।

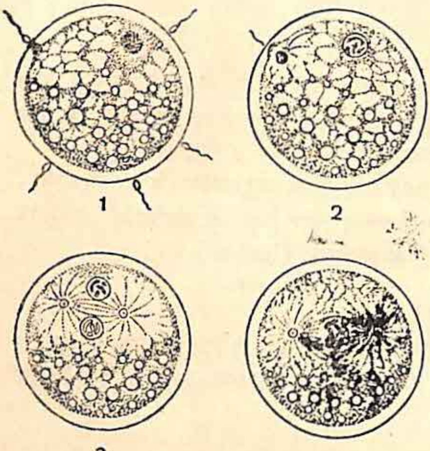


১৪০নং চিত্র—শুক্রকীট
১। মস্তক; ২। মধ্যাঙ্গ; ৩। লেজ।

জীবোপাদান (embryonic protoplasm) বলা হয়; ইহাতে সঞ্চিত পদার্থ হইতেই বর্ধমান ভ্রূণের পুষ্টি সরবরাহ হইয়া থাকে। মানুষ ও স্তন্যপায়ী জীবদের ডিম্বাণুতে যে পরিমাণ পুষ্টিপদার্থ থাকে তাহা ভ্রূণের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের উপযুক্ত; পরবর্তীকালে ইহা মায়ের নিকট হইতে পুষ্টিপদার্থ পাইয়া থাকে। এইজন্যই স্তন্যপায়ী জীবদের ডিম্বাণুগুলি ক্ষুদ্রাকার হয়। মানুষের ডিম্বাণুর ব্যাস মাত্র ০·১ **বা** ০·২ মিলিমিটার।

শুক্রকীট (spermatozoa) ঃ

শুক্রকীটগুলি ডিম্বাণু হইতে অনেক ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র কোষগুলি শুধু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায় (১৪০নং চিত্র)। ইহার পুরু অংশ বা মস্তকে নিউক্লিয়াসটি অবস্থিত, এবং দীর্ঘাংশ বা লেজটি জীবোপাদানে গঠিত। শুক্রকীটগুলি অত্যন্ত সঞ্চরণশীল; লেজ আন্দোলিত করিয়া ইহারা সঞ্চরণ করিয়া থাকে। অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার হইলেও ইহারা বহুদূর অতিক্রম করিতে পারে; আকারের তুলনায় এই দূরত্ব খুবই বেশী—ঘণ্টায় প্রায় ২৫ সেণ্টিমিটার।



১৪১নং চিত্র—নিষিক্ত হওয়ার সময় পুরুষ ও স্ত্রী কোষের মিলন।

প্রজনন প্রক্রিয়া (fertilisation) ঃ

প্রজনন শুরু হইবার মুহূর্ত—অর্থাৎ পুং-জননকোষ বা শুক্রকীট স্ত্রী-জননকোষ বা ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করার পর মুহূর্ত হইতেই ভ্রূণের বিকাশ আরম্ভ হয় (১৪১নং চিত্র)। উভয় জনন-কোষের মিলনের ফলে একটি নূতন কোষের উৎপত্তি হয়; ইহার চরিত্র শুক্রকীট ও ডিম্বাণু উভয় কোষ হইতেই পৃথক। কোষগুলির এই ধরণের মিলনের ফলেই নূতন জীবাণুটির মধ্যে পিতা ও মাতা উভয়ের চরিত্রই পরিবাহিত হইয়া থাকে।

যে যন্ত্রটির মধ্যে প্রজনন প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়, তাহার নাম জরায়ু।

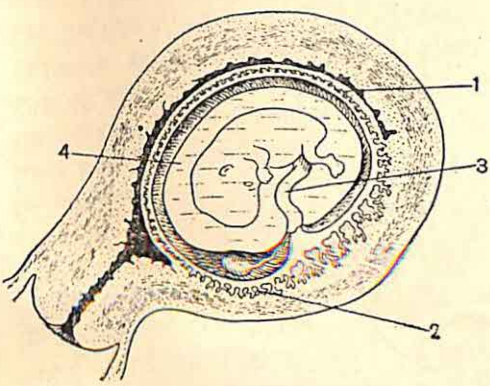
৭৮। জরায়ুর অভ্যন্তরে জীবাণুর বৃদ্ধি

ভ্রূণের বৃদ্ধি ঃ

শুক্রকীটের সহিত মিলন প্রক্রিয়ার পর (fertilised) ডিম্বাণুটি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অচিরেই একাধিক কোষবিশিষ্ট ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়। এই কোষগুলি নিরন্তর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে থাকে। ভ্রূণে তিনটি স্তরের আবির্ভাব হয়—বহিঃস্তর (ectoderm), অন্তঃস্তর (endoderm) এবং মধ্যস্তর (mesoderm) এই স্তবকগুলির ক্রমবিকাশের পথে স্বতন্ত্র দেহযন্ত্রসমূহের উৎপত্তি হইতে থাকে।

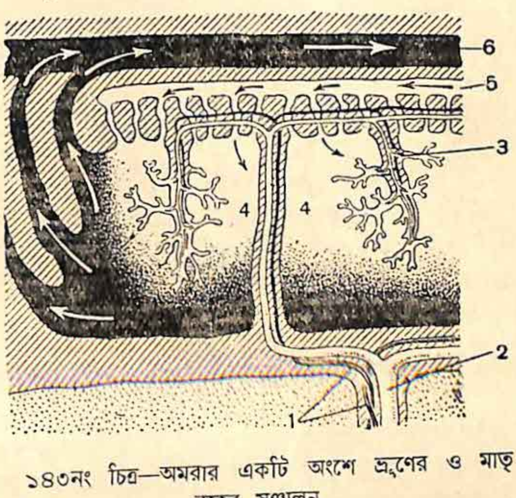
ভ্রূণের পুষ্টি ঃ

বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়েই ভ্রূণের চারিপাশে ঝিল্লীর (membranes) আবির্ভাব শুরু হয়; বহিঃস্থ ঝিল্লীকে বলা হয় **ভিলাস** (villous) **ঝিল্লী**—কারণ ইহাতে মখমলের শোঁয়ার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্গত অংশ থাকে। এই ভিলাস বা শোঁয়াযুক্ত ঝিল্লীর সাহায্যে ভ্রূণ ইতিমধ্যে স্ফীত ও শ্লথ জরায়ুর শ্লেষ্মাযুক্ত আবরণীর সহিত সংযুক্ত থাকে (১৪২নং চিত্র)। শোঁয়াগুলি জরায়ুর শ্লেষ্মাবরণীতে দৃঢ় সন্নিবিষ্ট ও মিলিত হইয়া যায় এবং জন্মের পর **অমরা বা গর্ভের ফুলে** (placenta) পরিণত হয়।



১৪২নং চিত্র—জরায়ুর মধ্যে মানব-ভ্রূণ
১। কোরক-ঝিল্লী; ২। অমরা বা গর্ভের ফুল; ৩। নাভিরজ্জু; ৪। এ্যামনিয়টিক রস।

অমরা দ্বারা মাতৃদেহ ও ভ্রূণের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভ্রূণদেহ এবং অমরা **নাভিরজ্জু** (umbilical cord) দ্বারা সংযুক্ত থাকে। নাভিরজ্জুর মধ্যে রক্ত-প্রণালীসমূহ অবস্থান করে। ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের ফলে রক্ত নাভি-রজ্জুস্থিত রক্তপ্রণালী হইতে অমরায় প্রবেশ করে এবং এইখানেই মাতৃরক্তের ও ভ্রূণ রক্তের পরিপাক হয়। এইভাবে ভ্রূণের রক্ত আদান-প্রদান (পরিপাক) প্রসূত পদার্থগুলি হইতে মুক্ত হয় এবং অক্সিজেন ও পুষ্টি-পদার্থে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ধমনী-রক্ত একটি প্রশস্ত শিরা মারফৎ ভ্রূণে ফিরিয়া আসে।

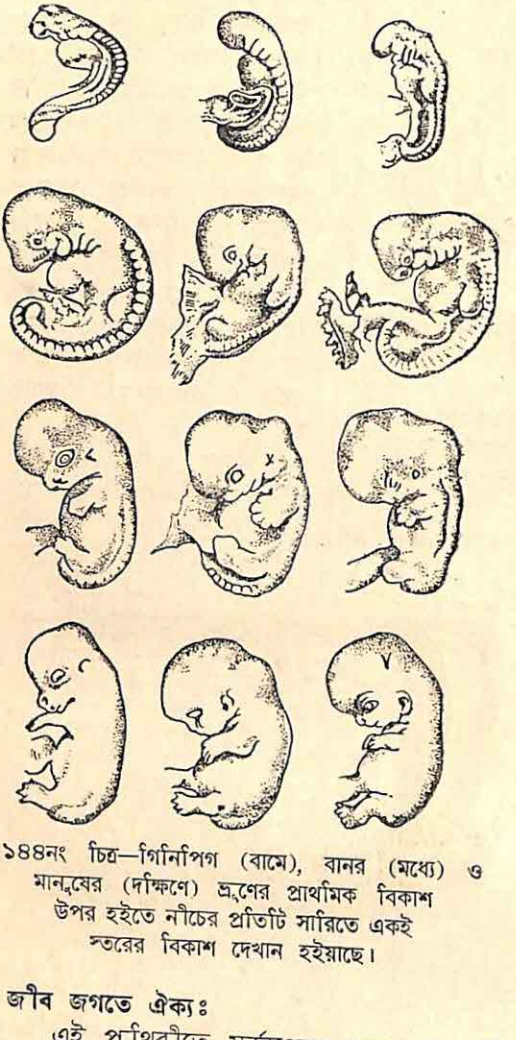


১৪৩নং চিত্র—অমরার একটি অংশে ভ্রূণের ও মাতৃ রক্তের সঞ্চালন
১। নাভিরজ্জুর ধমনী; ২। নাভিরজ্জুর শিরা; ৩। মাতৃরক্তে পূর্ণ এক স্থানে কোরকসমূহ; ৪। ধমনীতে প্রবাহিত মাতৃরক্ত; ৫। ঐ ধমনী; ...৬। ঐ শিরা।

মানুষ ও পশুর ভ্রূণের সাদৃশ্য ঃ

ভ্রূণ আবির্ভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের রূপ পরিগ্রহণ করে না। বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ, বানর, খরগোস, মুরগী বা মাছের ভ্রূণে

যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকে (১৪৪নং চিত্র)। মানব ভ্রূণের বিকাশের তৃতীয় সপ্তাহে দেহকাণ্ডের সম্মুখ প্রান্তের উভয় পার্শ্বে ভাঁজ সৃষ্টি হয়; সমস্ত মেরুদণ্ডী জীবের ভ্রূণেই এই ধরণের ভাঁজ দেখা যায়। এই ভাঁজগুলিই ফুল্কার (gills) সূত্রপাত। মাছের ক্ষেত্রে এইগুলি পরে প্রকৃত ফুল্কায় পরিণত হয় এবং স্থলচর জীবদের দেহে এগুলি পরে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া যায়।



১৪৪নং চিত্র—গিনিপিগ (বামে), বানর (মধ্যে) ও মানুষের (দক্ষিণে) ভ্রূণের প্রাথমিক বিকাশ উপর হইতে নীচের প্রতিটি সারিতে একই স্তরের বিকাশ দেখান হইয়াছে।

জরায়ুর অভ্যন্তরে ভ্রূণ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের বৈশিষ্ট্যহীন এমন আরও কিছু কিছু বিশেষ লক্ষণের আবির্ভাব হয়, যেগুলি বৃদ্ধির শেষ পর্যায়ে অদৃশ্য হইয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ মানব-ভ্রূণের বিকাশের একটি পর্যায়ে একটি কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী লেজের আবির্ভাব হয়। শেষের দিকে অপর এক পর্যায়ে ভ্রূণের মুখ স্বল্পকালের জন্য সূক্ষ্ম লোমে আবৃত থাকে।

ভ্রূণের বৃদ্ধির পঞ্চম সপ্তাহে যে তরুণাস্থি গঠিত কঙ্কালের আবির্ভাব হয়, ভবিষ্যতে ইহা হইতেই অস্থির উদ্ভব হইলেও এই তরুণাস্থি গঠিত কঙ্কালটির আকৃতি মানুষের কঙ্কালের মত নয়।

জীব জগতে ঐক্যঃ

এই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা সহজ যে জীবদেহটি প্রথম সৃষ্টি হয়, ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে করিতে তাহা ক্রমশ অধিক পরিমাণে জটিল ও নূতন নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। বর্তমান দুনিয়ায় যে অসংখ্য ধরণের পরস্পর সাদৃশ্যহীন জীবজন্তু ও গাছপালা দেখা যায়, ইহাদের আবির্ভাবের পূর্বে বহু লক্ষ লক্ষ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু গাছের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা যেমন একই কাণ্ড হইতে উদ্ভূত হয়, ঠিক তেমনি অসংখ্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমস্ত জীবন্ত প্রাণী একই জীবনকাণ্ড হইতে সৃষ্টি হইয়াছে; ইহারা একই জীবন-তরুর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা।

ভ্রূণের বিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান বা ভ্রূণ-বিজ্ঞান (embryology) প্রমাণ করে যে ডিম্ব-কোষ হইতে পরিপুষ্ট বা প্রাপ্তবয়স্কের স্তরে রূপান্তরের পথে সকল জীবদেহই সুদীর্ঘ অতীতের চিহ্ন বহন করে এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদের ক্রমবিকাশের স্বতন্ত্র স্তরগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে।

মানুষ ও অন্যান্য সমস্ত মেরুদণ্ডী জীবের ভ্রূণে ফুল্কার যে চিহ্ন দেখা যায় তাহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে ক্রমবিকাশের বিশেষ এক পর্যায়ে সমস্ত মেরুদণ্ডীদের এক সাধারণ পূর্বপুরুষ জলে বাস করিত এবং মাছের মত ফুল্কা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস লইত।

একথা সত্য যে ভ্রূণের বিকাশের পথে পূর্বপুরুষের সর্বাপেক্ষা মৌলিক নিদর্শনই প্রতিফলিত হয়; কিন্তু তাহা হইলেও এই নিদর্শনগুলি হইতে মানুষের উৎপত্তির ধারা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

ভ্রূণের পরবর্তী বিকাশ:

ভ্রূণের বৃদ্ধির দ্বিতীয় মাসের শেষে ফুল্কার চিহ্নগুলি অদৃশ্য হয় এবং তরুণাস্থি গঠিত কঙ্কালে অস্থিকলার প্রথম দ্বীপগুলি অর্থাৎ কতকগুলি অস্থি-বিন্দুর আবির্ভাব হয়। এই সময় হাত ও পায়ের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবং সমস্ত ভ্রূণ দেহটিতে মানুষের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এইসময় ভ্রূণকে গর্ভস্থ সন্তান বা ফিটাস (foetus) বলা হয়। **গর্ভস্থ শিশু** একটি প্রশস্ত থলির ন্যায় ঝিল্লীর মধ্যে আবৃত থাকে (১৪২নং চিত্র)। এই থলির মধ্যে (amniotic fluid) নামক যে তরল পদার্থ থাকে (১৪২নং চিত্র) তাহারই সাহায্যে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ও সঞ্চালন সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া মা কোন আকস্মিক ঝাঁকানি বা আঘাত পাইলে এই তরল পদার্থ গর্ভস্থ শিশুকে প্রথম ধাক্কা হইতে রক্ষা করে। গর্ভস্থ শিশু খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং জন্মের সময় ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ সেণ্টিমিটার এবং ওজন প্রায় ৩ কিলোগ্রাম হইতে পারে।

জরায়ুর মধ্যে নয় মাসের জীবনে ভ্রূণটি শ্বাস-প্রশ্বাস লয় না, খাদ্যও হজম করে না; মাতাই ভ্রূণের এই কাজগুলি করিয়া দেন। কাজেই গর্ভবতী নারীর রক্তের পরিপাকপ্রসূত অনিষ্টকারী পদার্থ নিঃসরণকারী বৃক্ক দুইটি যদি ভালভাবে কাজ না করে, এবং যদি তিনি যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য না খান অথবা যদি তিনি অত্যধিক অবসাদ সৃষ্টিকারী কঠিন আয়াসসাধ্য কাজ করেন, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্যের উপর আশু অনিষ্টকর প্রভাব পড়িবে। এই-জন্যই গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন লওয়া হয়।

৭৯। *শিশু ও কিশোরদের দেহগঠনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য*

নবজাত শিশু:

জন্মের প্রথম মুহূর্ত হইতেই শিশুর জীবদেহ বহির্জাগতিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে—শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস লয়, আহার করে, ত্যাজ্য পদার্থগুলি

নিঃসৃত করে। মায়ের সহিত সংযোগ ছিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর রক্তে কার্বনিক এ্যাসিড সঞ্চিত হইতে থাকে। জরায়ুর মধ্যে অবস্থান কালে এই কার্বনিক এ্যাসিড গর্ভ-ফুলের মারফৎ নিঃসৃত হইত। সঞ্চিত কার্বনিক এ্যাসিড শ্বাস-কেন্দ্রকে উত্তেজিত করে এবং ফলে, প্রশ্বাস ও শ্বাস সংশ্লিষ্ট পেশীগুলি পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। শিশুর তথাকথিত **"প্রথম ক্রন্দন"** হইতে বোঝা যায় যে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

প্রথম ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে রক্তসংবহনেও পরিবর্তন আসে। জন্মের পূর্বে ফুসফুস দুইটি চুপসান অবস্থায় থাকা কালে ইহাদের মধ্য দিয়া খুব কম পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয়; হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশ হইতে প্রধান রক্তস্রোতটি ফুসফুসে প্রবাহিত না হইয়া গর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ও বাম অলিন্দের মধ্যস্থিত একটি ছিদ্র দিয়া সরাসরি হৃৎপিণ্ডের বাম অর্ধে চলিয়া যায় অথবা মহাধমনী ও পাল্মোনারি ধমনী সংযোগকারী একটি ডাক্ট্ মারফৎ মহাধমনী স্রোতে মিশিয়া যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা স্ফীত ফুসফুস ইহার রক্তপ্রণালীগুলিকে প্রসারিত করে এবং এইভাবে রক্তসংবহন তন্ত্রের ক্ষুদ্র বা ফুসফুস-চক্রের মধ্য দিয়া রক্তের অবাধ সঞ্চালন প্রতিষ্ঠা হয়।

মহাধমনী ও পাল্মোনারি ধমনীর সংযোগকারী অলিন্দদ্বয় ও ডাক্টের মধ্যস্থিত ছিদ্রটি ক্রমশ মিলিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়; এবং শেষ পর্যন্ত রক্ত-সংবহন তন্ত্রের দৈহিকচক্র ও ফুসফুসচক্র—এই উভয় চক্র মারফৎ বিরামহীন রক্ত-প্রবাহ শুরু হইয়া যায়।

বৃদ্ধি ও পরিপাক:

জন্মের সময় শিশুর ওজন থাকে প্রায় ৩ কিলোগ্রাম; প্রথম বর্ষের শেষে এই ওজন প্রায় ১০ কিলোগ্রাম হইয়া থাকে। পরিস্কার বোঝা যায় যে এইরূপ দ্রুত বৃদ্ধির ফলে শিশুর পরিপাকও অতি তীব্র হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে একটি শিশু তাহার দৈহিক ওজনের প্রতি কিলোগ্রাম একজন প্রাপ্তবয়স্ক অপেক্ষা তিন গুণ বেশী শক্তি ব্যয় করিয়া থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া তীব্র হওয়ার ফলে পুষ্টিপদার্থ ও অক্সিজেন সরবরাহের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। ফলে শ্বাস ও রক্ত সংবহনের যন্ত্রগুলিকে অধিকতর কাজ করিতে হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস:

নবজাত শিশু গভীরভাবে শ্বাস লইতে পারেনা; কাজেই ফুসফুসের প্রয়োজনীয় বায়ু-চলাচলের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বাড়িয়া যায়। জন্মের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহে মিনিটে ৬০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস চলিয়া থাকে। পরবর্তী কালে বক্ষগহ্বর যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং বক্ষগহ্বরস্থিত পেশীগুলি যে পরিমাণে শক্তিশালী হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিও সেই অনুপাতে কমিতে থাকে।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া:

প্রাপ্ত-বয়স্কের তুলনায় নবজাত শিশুর হৃৎ-স্পন্দনের গতি প্রায় দ্বিগুণ, কারণ, শিশুদের হৃৎপিণ্ডের পেশী অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং রক্তপ্রণালীগুলির স্থিতিস্থাপকতাও কম।

গতি এবং ছন্দের তারতম্যের দিক হইতে নবজাত শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকের নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য আছে। রক্ত সংবহন ও শ্বাসযন্ত্র-গুলির স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট স্থিতিশীল না হওয়ার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে।

শিশুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের আকার এবং ইহার পেশীর শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কিন্তু অত্যধিক এবং দীর্ঘস্থায়ী কাজের চাপ পড়িলে হৃৎপিণ্ডের পেশী ক্ষীণ হইয়া যায়। এই জন্যই শিশু ও কিশোরদের দৈহিক শ্রমের চাপ বৃদ্ধি পাইয়া হৃৎপিণ্ড যাহাতে বৃহদাকৃতি না হয় এবং ইহার কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পুষ্টি ঃ

বর্ধমান জীবদেহের খাদ্যে দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপ ও বৃদ্ধির উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর পদার্থ থাকা প্রয়োজন। বৃদ্ধি যত তীব্র হইবে খাদ্যে সেই পরিমাণ প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ থাকা আবশ্যক। বিশেষ করিয়া প্রোটিনের চাহিদাই বেশী কারণ ইহাই নূতন কোষ গঠনের প্রধান উপাদান।

বর্ধমান জীবদেহের স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য খাদ্যপ্রাণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকটি খাদ্যপ্রাণ অপ্রতুল হইলে বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। পরিচিত খাদ্যপ্রাণগুলি ছাড়া শিশুর বৃদ্ধির জন্য চর্বিতে দ্রবণীয় ডি জাতীয় খাদ্যপ্রাণের একান্ত প্রয়োজন। কড-লিভার-তৈল, ডিমের কুসুম, মাখন ইত্যাদিতে ডি জাতীয় খাদ্যপ্রাণ থাকে।

কয়েকটি স্নেহ পদার্থে এবং কতকগুলি উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্যে ডি জাতীয় খাদ্যপ্রাণের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি চর্বিতে দ্রবণীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এই পদার্থটি চর্মে সঞ্চিত থাকে এবং সূর্য রশ্মির প্রক্রিয়ায় ইহা আংশিকভাবে ডি-জাতীয় খাদ্যপ্রাণে পরিণত হয়।

চর্মকে সূর্যকিরণে উন্মুক্ত রাখিলে জীবদেহতে ডি জাতীয় খাদ্যপ্রাণের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে শিশুদের সূর্যালোকে বাহির করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্যে এই খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটিলে অথবা হ্রাস পাইলে ধাতব লবণসমূহের পরিপাক নষ্ট হয় এবং অস্থির ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় উপাদান হ্রাস পাইয়া অস্থি নরম হইয়া যায়, দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অন্যান্য গোলযোগ ঘটে। শিশুর বৃদ্ধির প্রথম দিকে (বিশেষত এক বৎসর বয়সের পূর্বে) খাদ্যে ডি জাতীয় খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটিলে রিকেট ব্যাধি হইয়া থাকে।

জন্মের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ শিশু শুধু মাতৃ স্তন্য পান করে; মাতৃ-স্তন-দুগ্ধের উপাদান শিশুর প্রয়োজনের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং ইহাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রোটিন, চর্বি, শর্করা, ধাতব লবণ ও খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়। তাহাছাড়া মাতৃ-স্তন-দুগ্ধে যে প্রতিরোধ-পদার্থ (anti bodies) থাকে সেগুলি বিভিন্ন রোগ-বীজাণুর অনিষ্টকর প্রভাব হইতে শিশুকে রক্ষা করে। এই জন্য মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুদের সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

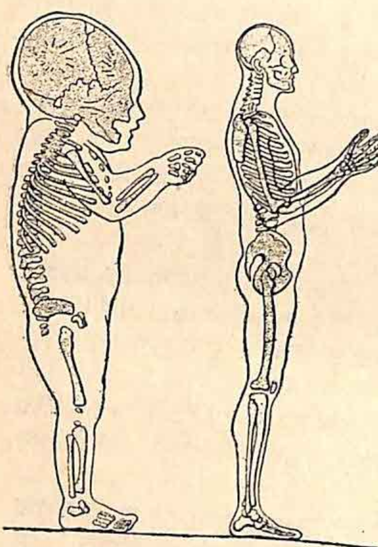
জন্মের পাঁচ-ছয় মাস পরে শুধু মাতৃস্তন দুগ্ধে পর্যাপ্ত পুষ্টি পাওয়া যায় না; এই সময় মা তাঁহার শিশুকে ক্রমে ক্রমে ময়দা জাতীয় শস্যচূর্ণ, পিষ্ট গাজর, লাল জামের জেলি ও অন্যান্য খাদ্য দিতে থাকেন। এক বৎসর বয়সে স্তন্যপান সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

দুই বৎসর বয়সের পূর্বেই শিশুকে বয়স্কদের মতই বিভিন্ন ধরণের খাদ্য দেওয়া হয়; এই সময় সুপ, দই, ছোট ছোট মাংসের টুকরা, পরিজ, খিচুড়ি, তরিতরকারি ফল ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে।

শিশুদের হৃৎপিণ্ডের স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট স্থিতিশীল না হওয়ায় এমনকি কিশোরদিগকেও সুরা, কড়া চা বা কফি জাতীয় পানীয় দেওয়া উচিত নয়।

অস্থি-পেশী-তন্ত্র :

কঙ্কালের অস্থিগুলি খুব ধীরে ধীরে ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে (১৪৫নং চিত্র)।



১৪৫নং চিত্র—নবজাত শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকের কঙ্কাল।

জন্মের সময় দীর্ঘাস্থিগুলির কেন্দ্রস্থলে অস্থিকলার উৎপত্তি হইলেও উহাদের প্রান্তগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ তরুণাস্থিবিশিষ্ট থাকিয়া যায়। শিশুর তিন বৎসর বয়সে প্রগণ্ডাস্থির নিম্নপ্রান্তে অস্থিকলার দ্বীপগুলির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

সমগ্র কঙ্কালটি সম্পূর্ণরূপে অস্থিতে রূপান্তরিত হয় ২৫ বৎসর বয়সে।

শিশুদের অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীগুলি অত্যন্ত ক্ষীণ বৃদ্ধিসম্পন্ন এবং দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কোচনে অক্ষম।

পেশীর শক্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং অঙ্গ সঞ্চালনের সমন্বয়ও ক্রমশ সৃষ্টি হয়। ৬—৭ বৎসর বয়সে শিশু তাহার পেশীগুলিকে অবাধে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দৈহিক ক্রীড়াকৌশল শিখিতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পেশীর দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র শ্রম তখনও পর্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

স্কুলগামী বয়স হইতেই পেশীগুলির **প্রচণ্ড বৃদ্ধি** শুরু হইয়া যায়। ৬ বৎসর বয়সে অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীগুলি দৈহিক ওজনের শতকরা ২২ ভাগ পূর্ণ করে, কিন্তু ১৬ বৎসরের বালক বালিকার অস্থি সংশ্লিষ্ট পেশীগুলি প্রাপ্তবয়স্কদের মতই দৈহিক ওজনের শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ ভাগ গঠন করিয়া থাকে।

১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের বালক বালিকারা বিভিন্ন প্রকার জটিল ও

সূক্ষ্ম সমন্বয়কারী অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে। কিন্তু পেশীগুলি যত পুষ্ট ও শক্তিশালী হউক না কেন এই বয়সে দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র শ্রমসাধ্য কাজ করা উচিত নয়, কারণ, তাহাতে হৃৎপিণ্ডের অনিষ্ট হইতে পারে।

প্রত্যেকটি পেশী ইহার সহিত সংযুক্ত অস্থিকে একটি নির্দিষ্ট দিকে টান দেয় এবং এইভাবে অস্থির বৃদ্ধি ও অস্থি-সূত্রগুলির (bone-slats) অবস্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পেশীর কর্মতৎপরতা ও সঙ্কোচন ক্ষমতা যত বেশী হইবে অস্থির গঠনের উপর প্রভাবও তত বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং পেশীর বৃদ্ধি ও অধিকতর কার্যকলাপ কঙ্কালের বৃদ্ধিকে তীব্রতর করে এবং ইহাকে শক্ত করিয়া তোলে।

স্বভাবতই পেশী ও কঙ্কালের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য শিশু ও কিশোরদের যথেষ্ট অঙ্গ-সঞ্চালন প্রয়োজন। ব্যায়াম, খেলাধূলা, পদভ্রমণ ইত্যাদিতে পেশী-গুলির বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জীবদেহেরও বৃদ্ধি ও শক্তিসঞ্চয় হইয়া থাকে।

মেরুদণ্ডে বক্রতার আবির্ভাবঃ

নবজাত শিশুর মেরুদণ্ডে কোন বক্রতা নাই বলিলেই চলে। গ্রীবার পেশী-গুলির প্রসারণের (কর্মতৎপরতার) ফলে ২—২½ মাসে শিশু মাথা তুলিতে ও ধরিয়া রাখিতে শুরু করে। গ্রীবার পশ্চাদ্দেশীয় পেশীগুলির উপর নিরন্তর টান পড়ার জন্য মাথাটি সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে না এবং ফলে, মেরুদণ্ডের গ্রীবাদেশে একটি বক্রতার সৃষ্টি হয়।



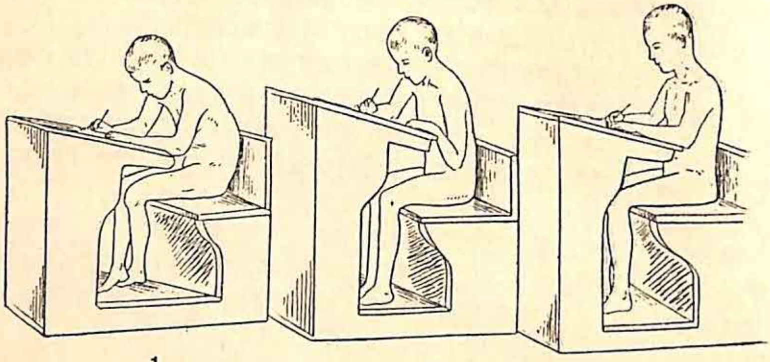
১৪৬নং চিত্র—উপবেশন ও দণ্ডায়মান অবস্থায় মেরুদণ্ডের বক্রতা।

কিছুকাল পরে শিশু যখন বসিতে শেখে, এই সময় দ্বিতীয় বা বক্ষদেশীয় বক্রতার আবির্ভাব হয়; পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ দেহকাণ্ড ঋজু অবস্থায় পৌঁছিলে (অর্থাৎ দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে শিখিলে) কটিদেশীয় বক্রতার সৃষ্টি হয় (১৪৬নং চিত্র)।

অবশ্য পরবর্তীকালে মেরুদণ্ডের বক্রতাগুলি দৈহিক অবস্থান অনুসারে অনায়াসেই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কুব্জ হইয়া বসিলে বক্ষদেশীয় বক্রতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং কটিদেশীয় বক্রতা হ্রাস পায়। দেহকাণ্ডকে একদিকে হেলাইয়া বহন করিলে পার্শ্বদেশীয় বক্রতা সৃষ্টি হইবে। দেহকে ঘন ঘন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ ভুল ভঙ্গিতে রাখিলে মেরুদণ্ডের অস্বাভাবিক বক্রতা সৃষ্টি হইয়া সেই ভঙ্গীটি ক্রমশ স্থায়ী রূপ লইবে এবং একটি অসুস্থ অবস্থার উৎপত্তি হইবে।

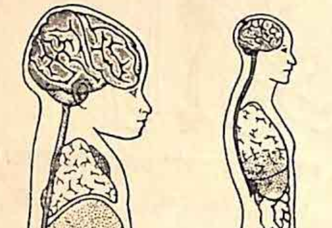
স্কুলগামী বয়সে, বিশেষ করিয়া ১০—১২ বৎসর বয়সে কঙ্কালটি দ্রুত অস্থিকলায় পরিণত হইবার সময় মেরুদণ্ডে কোন বক্রতা সৃষ্টি হইলে তাহা আর সংশোধন করা যায় না এবং ইহার ফলে শরীরের সাধারণ বৃদ্ধিতে, শ্বাসযন্ত্র, এমনকি কর্মক্ষমতার উপরেও ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়।

এইজন্য কাজের সময় দেহের সঠিক ভঙ্গিমা সম্পর্কে সতর্ক থাকা অত্যন্ত



১৪৭নং চিত্র—ডেস্কে উপবেশনের সঠিক ও ভুল ভঙ্গি
১। অত্যন্ত নিচু ডেস্কে বসার ফলে ভুল দেহভঙ্গি;
২। অত্যধিক উঁচু ডেস্কে বসার ফলে ভুল দেহভঙ্গি;
৩। সঠিক উচ্চতাবিশিষ্ট ডেস্কে বসিয়া সঠিক দেহভঙ্গি।

গুরুত্বপূর্ণ। ১৪৭নং চিত্রে ডেস্কে কাজ করিবার সময় দেহের সঠিক ভঙ্গিমা দেখান হইয়াছে। দাঁড়ান বা চলার সময় সঠিক ভঙ্গি বজায় রাখাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।



১৪৮নং চিত্র—নবজাত শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দৈহিক উচ্চতার অনুপাতে মস্তিষ্কের আকৃতি।

স্নায়ুতন্ত্র ঃ

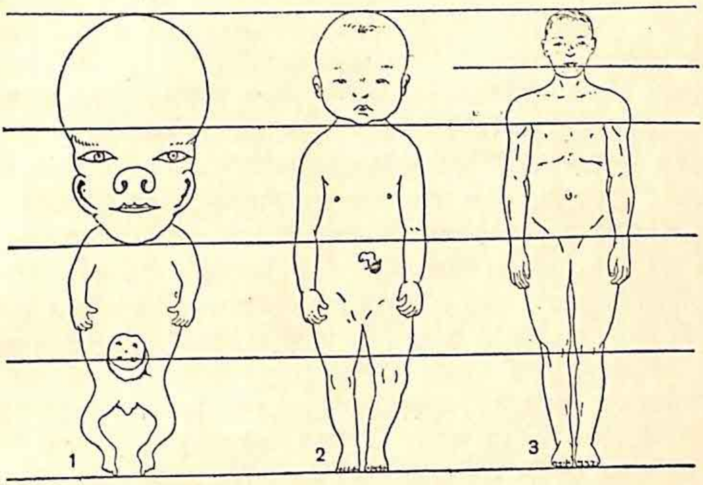
জীবদেহের মধ্যস্থিত সমস্ত প্রক্রিয়াতেই স্নায়ুতন্ত্রের প্রত্যক্ষ অংশ আছে। স্নায়ুতন্ত্রের বৃদ্ধির হার অনুসারেই সমগ্র জীবদেহের এবং তাহার স্বতন্ত্র দেহযন্ত্রের সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং জন্ম মুহূর্তেই স্নায়ুতন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে গঠিত হইয়া যায়, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মস্তিষ্কের ওজন সমগ্র দেহের ওজনের শতকরা ২ ভাগ; কিন্তু নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে ইহা শতকরা ১২ হইতে ১৪ ভাগ (১৪৮নং চিত্র)। স্কুলগামী বয়সে পৌঁছানর সময় শিশুর মস্তিষ্কের ওজন প্রাপ্তবয়স্কের মস্তিষ্কের ওজনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ।

করোটির বৃদ্ধি অনুসারেই মস্তিষ্কের

বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মস্তকের উচ্চতা সমগ্র দেহের উচ্চতার ⅛ ভাগ; নবজাত শিশুদের ক্ষেত্রে ইহা ¼ ভাগ (১৪৯নং চিত্র)।

স্বভাবতই জরায়ুমধ্যে বৃদ্ধির সময়েই নূতন স্নায়ুকোষের গঠন হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্নায়ু-কোষগুলির উৎপত্তির জন্যই জন্মের পর মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি



১৪৯নং চিত্র—বৃদ্ধির সময় দেহের আনুপাতিক পরিবর্তন
১। দুই মাসের ভ্রূণ; ২। নবজাত শিশু; ৩। প্রাপ্তবয়স্ক লোক।

পায়—স্নায়ুকোষের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য নয়। বৃক্ষের ন্যায় উদ্গত অংশগুলি বা ডেনড্রাইটগুলিই বিশেষ দ্রুততার সহিত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

নবজাত শিশুর সপ্রতিবন্ধ যোগাযোগ সৃষ্টি হইলেও গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের কার্যকলাপ খুব দুর্বল থাকে। ক্রমে অঙ্গ সঞ্চালনগুলি শুধু বিভিন্ন ধরণের হয় তাই নয়, মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের বৃদ্ধি অনুসারে এগুলি উদ্দেশ্য-সাধকও হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে কর্টেক্স ক্রমবর্ধমান হারে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহে প্রধানত খাদ্য সংক্রান্ত সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তন সৃষ্টি হইয়া থাকে। অচিরেই প্রতিরোধ সংক্রান্ত সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের উৎপত্তি হয়; অপ্রতিবন্ধ উত্তেজনার শুধু একটি সঙ্কেত অর্থাৎ যেমন, কেহ উহার হাতের উপর আঘাত করিবার ভয় দেখাইলে শিশু কাঁদিয়া ওঠে বা ঝাঁকানি দিয়া হাত সরাইয়া লয়। প্রথম বৎসরের শেষভাগে কর্টেক্সে **বাক্য সংক্রান্ত** উত্তেজনার সপ্রতিবন্ধ যোগাযোগ সৃষ্টি হয়।

গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের বৃদ্ধি (স্নায়ুকোষ ও ইহাদের উদ্গত অংশগুলির) বহু বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে। বৎসরের পর বৎসর কর্টেক্সের বিভিন্ন কোষের মধ্যে যোগাযোগ সংখ্যায় ও জটিলতায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই যোগাযোগ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় শিশুর উচ্চস্তরের স্নায়বিক কার্যকলাপের জটিলতাও সেই অনুপাতে বাড়িতে থাকে। কিন্তু তাহাসত্ত্বেও যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত কর্টেক্সের কোষগুলির সহজেই অবসাদগ্রস্ত ও নষ্ট হইবার প্রবণতা থাকে।

শিশু ও কিশোরদের কর্টেক্সে উত্তেজনা ও নিরোধ অতি সহজেই বিস্তারিত হইয়া থাকে। ইহাই শিশুসুলভ স্বল্প মনোযোগিতার কারণ।

স্নায়ুতন্ত্র, বিশেষত ইহার উচ্চতর অংশ অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্সের বৃদ্ধি যাহাতে স্বাভাবিক গতিতে চলিতে পারে তাহার জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার মূল-নীতিগুলি এবং নিয়মিত নিত্যকর্মধারা পালন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিঃ

মানুষের জীবনের বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্র অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির ক্রিয়াকলাপে তারতম্য ঘটে। উদাহরণস্বরূপ শিশু-জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর বক্ষগহ্বরে উরঃফলকের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত থাইমাস গ্রন্থিটি স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠনের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থিটির আকার যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং ইহার গ্রন্থিকলার স্থলে স্নেহজাতীয় কলার উদ্ভব হয়।

১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়সে যৌন গ্রন্থিগুলি অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ইহাদের নিঃসৃত হরমোন সমগ্র জীবদেহের কার্যকলাপে গভীর পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তন শুধু দ্বিতীয় স্তরের যৌন-চরিত্র সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না; পরন্তু কর্টেক্সসহ সমগ্র জীবদেহের কার্যকলাপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ-স্বরের পরিবর্তন, পুরুষের মুখমণ্ডলে শ্মশ্রুর আবির্ভাব, দৈহিক গঠনের পরিবর্তন ইত্যাদিও হইয়া থাকে। বৃদ্ধির এই অস্থায়ী পর্যায়ে কিশোর কিশোরীরা প্রথম শ্রেণীর ছাত্রসুলভ দুষ্টামির প্রতি আকর্ষণ ও সেই ধরণের কার্যকলাপ কিছু পরিমাণে ত্যাগ করে। তাহারা আরও মনোযোগী ও স্থির চরিত্রসম্পন্ন হইয়া থাকে; অধ্যবসায়ের আবির্ভাব হয়।

৮০। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যরক্ষা

শিশু ও মাতৃমঙ্গলঃ

ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সোবিয়েত রাশিয়ায় যে পরিমাণ যত্ন লওয়া হয়, পৃথিবীর যে-কোন দেশের পক্ষে তাহা অতুলনীয়।

জরায়ুর মধ্যে জীবনের সূত্রপাত হইবার পর মুহূর্ত হইতে সোবিয়েত আইন শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করে। শ্রমজীবী গর্ভবতী মায়েরা প্রসবের পূর্বে এবং পরে ছুটি পাইয়া থাকেন এবং ক্ষতিপূরণও পান। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এবং প্রসবের পরেও নিজের ও শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন লওয়ার জন্য মেয়েরা বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য পাইয়া থাকেন। ইহার জন্য বিশেষ পরামর্শ-কেন্দ্র আছে। কাজের সময় মা তাঁহার শিশুকে সরকারি নার্সারিতে রাখিয়া যাইতে পারেন। তৃতীয় সন্তান জন্মাইবার পর মাকে একটি বিশেষ ভাতা দেওয়া হয়। চতুর্থ (এবং তৎপরবর্তী) সন্তান জন্মাইলে সরকার হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য মাসিক ভাতা দেওয়া হয়।

শিশু ও মাতৃমঙ্গলের জন্য এইসব ব্যবস্থা শিশুমৃত্যুর হার প্রচুর হ্রাস করিয়াছে।

মস্কো শহরে বর্তমান শিশুমৃত্যুর হার মহান অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ববর্তী কালের তুলনায় প্রায় অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে।

স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা ঃ

সোবিয়েত ইউনিয়নে শিশু ও কিশোরদের স্বাস্থ্যরক্ষার স্বাস্থ্যাবাস, স্বাস্থ্যকর ও উন্মুক্ত স্থানে পরিচালিত বিদ্যালয়, তরুণ 'পায়োনীয়ারদের' জন্য স্বাস্থ্য-শিবির, গ্রীষ্মকালীন স্বাস্থ্যকর খেলার মাঠ ইত্যাদি এই সামগ্রিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

সুস্থ শিশুদের জন্য সংগঠিত সমস্ত সরকারি নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ চিকিৎসকদের দ্বারা নিরন্তর তদারক করান হয়। বিদ্যালয়গুলিতে প্রাতঃকালীন আহার সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

শিশু শ্রমিকদের রক্ষা ব্যবস্থা ঃ

সর্বহারা শ্রেণী নিজেদের হাতে ক্ষমতা লইবার পর শিশুশ্রমিকসহ সমস্ত প্রকার শ্রম-শোষণের অবসান ঘটাইয়াছে। তরুণ ছেলে মেয়েরা শিল্প-শিক্ষায়তনের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দ মত বৃত্তি শিক্ষা লাভ করিয়া দক্ষতা অর্জনের পর কারখানায় বা ব্যবসা বাণিজ্যে কাজ করিতে পারে।

শ্রমশিল্পে তরুণদের কাজকর্ম এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যে শ্রম তাহাদের স্বাস্থ্যের অবনতি না ঘটাইয়া দেহকে যথাযথ ও সর্বতোভাবে উন্নত ও শক্ত করিয়া তুলিতে পারে। তরুণদের কোনরকম ক্ষতিকর বা আয়াস-সাধ্য কাজ দেওয়া হয়না।

কারখানায় কাজ করে এরূপ সমস্ত তরুণদের বৎসরে একবার করিয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং তাহার ভিত্তিতে যাহাদের প্রয়োজন, তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

তরুণ শ্রমিকরা বিশেষ ছুটি ভোগ করে এবং এই সময় তাহাদের বিশ্রামাবাস, স্বাস্থ্যাবাস ও স্বাস্থ্য-শিবিরে পাঠান হয়।

পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। পুরুষ ও স্ত্রী যৌন-কোষগুলির নাম কি? তাহাদের গঠন বর্ণনা কর।
২। প্রজনন-প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৩। জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণ ও সন্তানের (foetus) বৃদ্ধি বর্ণনা কর।
৪। মানুষ ও পশুর ভ্রূণের বৃদ্ধিতে কি কি সাদৃশ্য আছে? ইহার দ্বারা কি প্রমাণ হয়?
৫। শিশু ও কিশোরদের দৈহিক বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।
৬। ডি-জাতীয় খাদ্যপ্রাণের গুরুত্ব কি?
৭। বর্ধমান জীবদেহের পুষ্টি সম্পর্কে কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন?
৮। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে শিশু ও কিশোরদের স্বাস্থ্যরক্ষার কি ব্যবস্থা আছে?

পরিশিষ্ট—(ক)

প্রধান প্রধান খাদ্যের উপাদান

নং	খাদ্যের নাম	প্রেটিন	চর্বি	শর্করা	প্রতি ১০০ গ্রামে
		শতকরা			ক্যালরি
১	সূর্যমুখীর তৈল ও অন্যান্য উদ্ভিদ জাতীয় তৈল ...	—	৯৭	—	৮৮০
২	গমের ময়দা	১০	০,৫	৭২	৩৩৫
৩	গমের পাঁউরুটি	৬	০,৪	৫০	২৩০
৪	রাইএর ময়দা	৮	০,৫	৭৫	৩৩৫
৫	রাইএর পাঁউরুটি	৪	০,২	৪৮	২১০
৬	ছাঁটা চাল	৭	০,৫	৭৬	৩৩৬
৭	বাক হুইট (Buck wheat)	৯	১	৭০	৩৩০
৮	মিলেট (Millet)	১৩	০,৮	৬৫	৩২০
৯	ফারিনা Ferina, semolina	৮	—	৭৫	৩৩২
১০	পার্ল বার্লি	৯	২	৬৮	৩২৬
১১	বার্লি	১১	২	৬৫	৩২২
১২	শষ্য (ভুট্টা)	১০	০,৬	৬৬	৩১০
১৩	ওট মিল	১২	৬	৬৫	৩৬০
১৪	ময়দার পিঠে	১১	০,৩	৭০	৩২৭
১৫	মটর (Peas)	১৬	০,৫	৪৫	২৫০
১৬	লেন্‌টিলস	১৮	০,৫	৪৫	২৬০
১৭	মটর (Beans)	২৪	২	৪৮	৩০৫
১৮	সয়াবিন্‌	৩২	১৬	২৯	৩৯০
১৯	আলু	২	—	২০	৮৮
২০	বিট	১	—	১৪	৬০
২১	গাজর	১	০,২	৯	৪২
২২	সোরেল	২	০,৪	৩	২৪
২৩	টাটকা বাঁধাকপি	৩	০,৫	৯	৫২
২৪	সোয়াক্রাউট	১	০,২	৪	২২
২৫	টমাটো	০,৭	—	৩	১৬
২৬	কুমড়া	১	—	৫	২৫
২৭	শুকনো সবজি	১২	১,৫	৪৫	২৪২
২৮	টিনে বন্ধ শব্জি				
	(ক) বেগুন	১,৫	১২	৫	১৩৫
	(খ) স্কোয়াস	১,৫	৬	৮	৯২

নং	খাদ্যের নাম	প্রোটিন	চর্বি	শর্করা	প্রতি ১০০ গ্রামে
		শতকরা			ক্যালরি
	(গ) গোলমরিচ দেওয়া বেগুন	১,৩	৫	৮	৮২
২৯	তাজা ছত্রাক	৩	০,৩	৪	৩০
৩০	শুকনো ছত্রাক	২৫	২	৩০	২৩৮
৩১	আপেল	০,৪	—	১৩	৫৪
৩২	চেরিফল	১	—	১৩	৫৬
৩৩	আঙ্গুর	০,৬	—	১৮	৭৫
৩৪	বিভিন্ন ধরনের জাম	১	—	৮	৩৬
৩৫	কিস্‌মিস	২	০,৩	৬২	২৬০
৩৬	জামের জেলি	০,৪	—	৬০	২৪৫
৩৭	বাদাম	১৫	৬০	৭	৬৩০
৩৮	মিছরি	—	—	১০০	৪০০
৩৯	মধু	০,৩	—	৮০	৩২১
৪০	চকোলেট	৫	২০	৬৫	৪৬০
৪১	কোকো	২২	২০	২০	৩৫০
৪২	গরুর মাংস	১৯	৮	—	১৫০
৪৩	বাছুরের মাংস	১৯	৫	—	১২০
৪৪	শূকরের মাংস (Pork)	১৬	২০	—	২৪৫
৪৫	ভেড়ার মাংস	১৭	১৬	—	২১৫
৪৬	শূকরের মাংস (Ham)	২৪	২০	—	২৭৫
৪৭	সিদ্ধ সসেজ	২০	১৫	৪	২৩০
৪৮	ঐ (Smoked)	১৭	১৪	—	১৯৫
৪৯	ঐ (Frankfurters) ...	১৪	১৩	১	১৮০
৫০	যকৃত	১৮	৩	৩	১১১
৫১	মুরগীর মাংস	১৮	৯	—	১৫৫
৫২	হাঁসের মাংস	১৬	৩০	—	৩৩৫
৫৩	শূকরের চর্বি	—	৯৯	—	৮৯১
৫৪	টিনে ভর্তি মাংস	১৮	১২	১	১৮৫
৫৫	ষ্টারজিয়ান, রোচ, ব্রিম কার্পজাতীয় মাছ ...	১৭	৫	—	১১৫
৫৬	পাইক পার্চ	১৮	০,৩	—	৭৫
৫৭	হেরিং মাছ	১৯	১৩	১	২০০
৫৮	শুকনো কাস্পিয়ান রোচ মাছ	৪৫	১০	—	২৭০
৫৯	কেভিয়ার	৩০	১৪	২	২৫৪
৬০	কড্‌মাছের তেল	—	৯৯	—	৮৯১
৬১	টমাটো ও মাছ (টিনে)	১২	৬	১	১০৬
৬২	ডিম (মুরগী)	১৪	১১	০,৪	১৫৭
৬৩	গরুর দুধ	৩,৫	৩,৫	৫	৬৬
৬৪	টক দই	৪	৩০	৩	৩০০
৬৫	দই	২০	৫	২	১৩৩

নং	খাদ্যের নাম	প্রোটিন	চর্বি	শর্করা	প্রতি ১০০ গ্রামে
		শতকরা			ক্যালরি
৬৬	পনীরের ক্রীম	১৫	৪০	১	৪২৫
৬৭	চর্বিমিশ্রিত ক্রীম	২৩	২৫	৩	৩৩০
৬৮	সামান্য চর্বিযুক্ত পনীর	৩৫	৪	২	১৮৫
৬৯	মাখন	০,৫	৮০	০.৫	৭৩০
৭০	ঘি	—	৯৭	—	৮৮০

পরিশিষ্ট—খ

প্রধান প্রধান খাদ্যে খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ

নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যপ্রাণ এ	বি	সি
১	উদ্ভিজ্জাত তৈল	০	০	০
২	সূক্ষ্ম গমের ময়দা	০	০	০
৩	গমের ময়দা (মোটা)	০	৩	০
৪	পাঁউরুটি	০	১	০
৫	শষ্যজাত ময়দা	০	২	০
৬	রাইএর পাঁউরুটি	০	২	০
৭	মিলেট, পার্ল বার্লি	০	০	০
৮	গম	০	৩	০
৯	ওটমিল	০	২	০
১০	চাল	০	৩	০
১১	ছাঁটা চাল	০	০	০
১২	শষ্য (ভুট্টা)	২	২	০
১৩	সয়াবীন	২	৩	০
১৪	মটর	১	৩	০
১৫	মটর (Pods or peas and beans)	২	২	৪
১৬	সবুজ মটর (Green peas)	৩	২	২
১৭	লেনটিল (Lentils)	০	২	১
১৮	পনর মিনিট সিদ্ধ আলু	০	২	২
১৯	এক ঘণ্টা সিদ্ধ আলু	০	২	১
২০	বীট	০	২	১
২১	গাজর	৪	২	১
২২	সিদ্ধ গাজর	২	১	১
২৩	শালগম (French turnip)	০	১	৩

নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যপ্রাণ		
		এ	বি	সি
২৪	শালগম (Turnip)	১	২	২
২৫	পাকা টম্যাটো	৩	২	৩
২৬	মুলো	০	১	২
২৭	লেটুস্ (গাঢ় সবুজ রং)	৩	২	৩
২৮	লেটুস্ (হাল্কা সবুজ রং)	০	২	২
২৯	সোরেল, স্পিনাক (Sorrel, spinach)	৪	১	৩
৩০	স্ক্যালিয়নস (Scallions)	০	২	২
৩১	পিঁয়াজ	০	২	২
৩২	শশা	০	২	১
৩৩	বাঁধাকপি (কাঁচা)	৩	২	৩
৩৪	রান্না করা বাঁধাকপি	২	২	১
৩৫	সাউয়ার ক্রাউট (Sauerkraut)	০	১	১
৩৬	সিদ্ধ ফুলকপি	১	২	২
৩৭	আপেল	১	১	১
৩৮	ন্যাসপাতি	০	২	১
৩৯	খুবানি (Apricots)	৩	২	১
৪০	কমলা ও পাতি লেবু	২	১	৩
৪১	তরমুজ	০	১	১
৪২	ফুটি	১	১	২
৪৩	আঙ্গুর	০	২	১
৪৪	কিস্‌মিস্	১	২	০
৪৫	চেরিফল	২	১	২
৪৬	জাম	১	১	৩
৪৭	শুকনো কুল	৩	১	০
৪৮	বিভিন্ন ধরণের জাম	২	০	৩
৪৯	শুকনো কাল আঙ্গুর	২	১	৪
৫০	বিভিন্ন ধরণের জাম (Berries of the dried briar, berries of the mountain ash)	৪	?	৪
৫১	বাদাম	১	৩	০
৫২	ছত্রাক	১	২	০
৫৩	তাড়ির গাঁজলা (Barm)	১	৪	০
৫৪	ফার ও পাইনের ফল	৪	?	৪
৫৫	বিভিন্ন ধরণের মাংস	১	২	১
৫৬	টিনের মাংস	০	১	০
৫৭	যকৃৎ, বৃক্ক	৪	৩	২
৫৮	টাটকা মাছ	১	১	?
৫৯	টিনের মাছ ও নুন মাখান মাছ	০	১	১
৬০	ডিম (মুরগী)	৩	২	০
৬১	গরুর দুধ (গরমকালে)	২	১	১

নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যপ্রাণ এ	বি	সি
৬২	অধিক চর্বি মিশান পনীর	২	১	০
৬৩	দই	০	০	০
৬৪	মাখন (গরমকালে যখন গরু মাঠে চরিয়া বেড়ায়)	৩	১	০
৬৫	মাখন (শীতকালে)	২	১	?
৬৬	কড্ মাছের তেল	৪	০	০
৬৭	গরুর মাংসের চর্বি	২	০	০
৬৮	শূকরের মাংসের চর্বি	০	০	০

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

০ অত্যন্ত অল্প পরিমাণ খাদ্যপ্রাণযুক্ত।
১ অল্প পরিমাণ খাদ্যপ্রাণযুক্ত।
২ যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্রাণযুক্ত।
৩ বেশি পরিমাণে খাদ্যপ্রাণযুক্ত।
৪ অত্যন্ত বেশি পরিমাণে খাদ্যপ্রাণযুক্ত।
? খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ অজানা।

পরিশিষ্ট—গ

পারিভাষিক শব্দ (বাংলা-ইংরাজী)

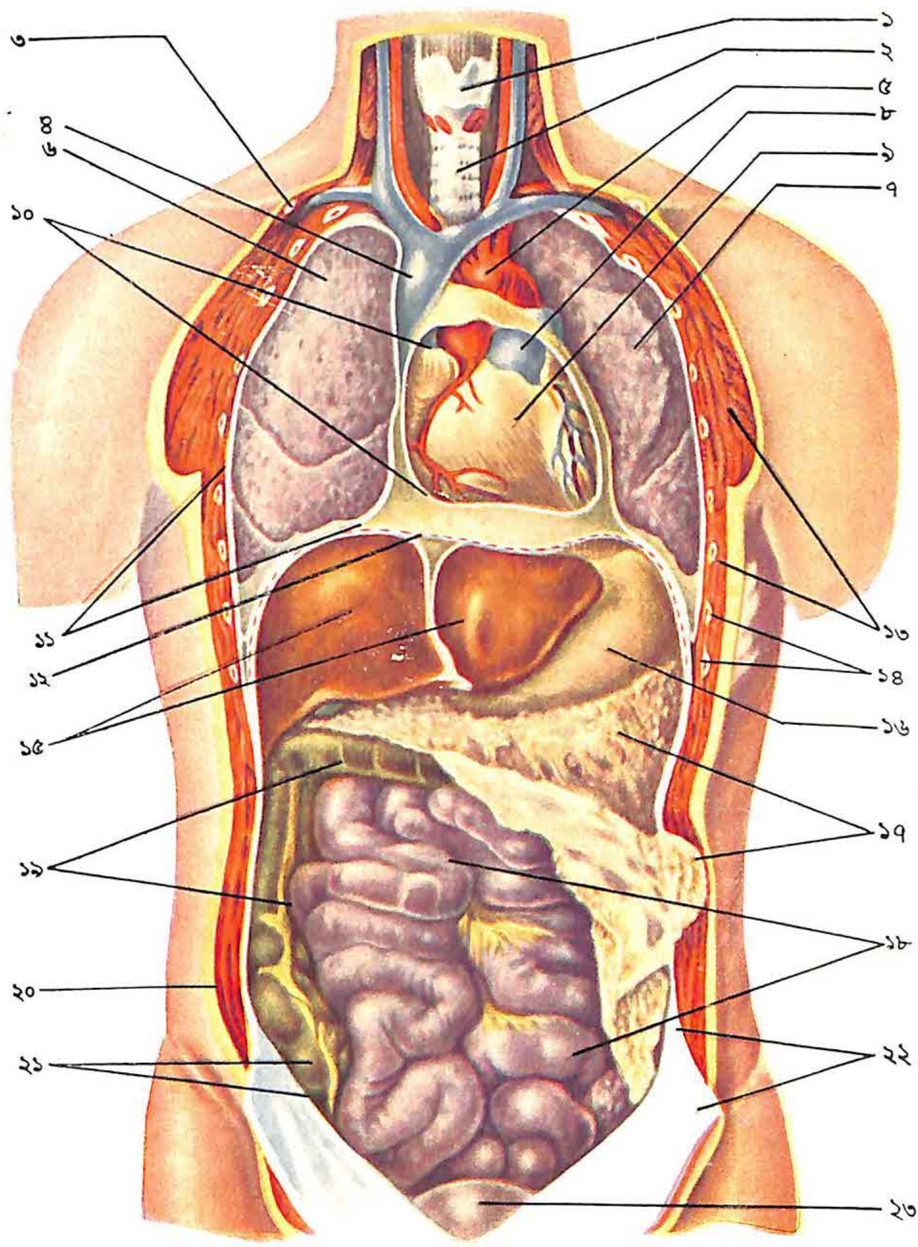
অনুধাবন—Observation
অনাক্রম্যতা—Immunity
অগ্ন্যাশয়—Pancreas
অবশোষিত—Absorbed
অক্সিজেনঘটিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া—Oxidation
অলিন্দ—Auricle
অস্থিবন্ধনী—Ligament
অন্তর্মুখী—Afferent
অপ্রতিবন্ধ—Unconditional
অস্থি-তন্তু—Bone-slats
অস্থি-ধারক—Splint
অনুত্রিকাস্থি—Coccyx
অনুজংঘাস্থি—Fibula
অংশফলক—Scapula
অক্ষকাস্থি—Clavicle
অন্তঃ-প্রকোষ্ঠাস্থি—Ulna
অঙ্গুলিফলক—Phalanx
অনুভূমিক—Horizontal
অবিরাম—Tetanic
অবতল—Concave
অনুঘটক—Catalytic agents
অধোহনু—Submaxillary
অধোরসনা—Sublingual
অম্ল—Acid
অন্ত্রের কোরক—Villus
অন্তঃক্ষরা—Endocrine
অণ্ডাধার—Testis
অতি-বেগনী—Ultra violet
অর্ধনালী বা খাঁজ—Fissure
অন্তঃমস্তিষ্ক—Interbrain
অক্ষিপুট—Eye-lids
অশ্রুক্ষরণকারী—Lachrymal
অক্ষিপট—Retina
অচ্ছোদপটল—Cornea
অন্তঃস্তর—Endoderm
অমরা—Placenta
আবরণিক কলা—Epithelial tissue
আবরণী—Capsule
আলোড়ন—Concussion
আতস কাঁচ—Magnifying glass
আড়াআড়িভাবে—Cross-wise
আবেশ—Induction
ইন্দ্রিয়সংশ্লিষ্ট—Sensory
উর্বস্থি—Femur
উচ্চমহাশিরা—Superior venacava
উপজিহ্বা—Epiglottis
উত্তল—Convex
উৎকুণ—Lice
উষ্ণীষক—Pons (of brain)
উপলব্ধি—Perception
উপযোজন—Accomodation
উচ্চগ্রাম—High pitch
উদ্বায়ী—Volatile
এ্যাক্সন্—Axon of nerve cell
এথময়েড—Ethmoid bone
কণ্ডরা—Tendon
কলা—Tissue
কলাপ্রজনন—Culture of tissue
কোষ—Cell
কোষ প্রাচীর—Cell membrane
ক্লোমশাখা—Bronchus
করোটি—Skull
কশেরুকা—Vertibra
কটিদেশীয়—Lumbar
করতলাস্থি—Carpals
করাঙ্গুলিমূলশলাকা—Metacarpals
কলারস—Tissuefluid
কৈশিক নালী—Capilaries
কপাটিকা—Valve

কিন্বপদার্থ—Ferment or Enzyme
কর্ণপুর—Parotid
কঠিন তালু—Hard palate
কড়া—Callosities
কনীণিকা—Iris
কেলাস—Crystal
কর্টেক্স—Cortex of cerebral hemisphere
খাদ্যপ্রাণ—Vitamin
গুরুমস্তিষ্ক—Cerebrum, cerebral hemisphere
গলনালী—Oesophagus
গ্রীবাদেশীয়—Cervical, neck
গলগ্রন্থি—Thyroid
গলগণ্ড—Goitre
গর্ভস্থ শিশু—*Foetus*
গুল্ফাস্থি—Tarsals
গ্রন্থি—Glands
ঘ্রাণবাহী—Olfactory
ঘনীভূত—Condensed
ঘনফল—Volume
ঘটমানবিষয়—Phenomena
চক্ষুগোলক—Eye ball
চক্রাবর্তন—Cercuit
চক্রপথ—Arc
চেষ্টীয়—Motor
চুপসান—Collapsed state
চারান—Transplanting
ছন্দ—Rythm
জৈবিক ক্রিয়াকলাপ—Vital functions
জীবোপাদান—Protoplasm
জৈব শ্বেতসার—Animal starch
সংঘাস্থি—Tibia
জীবদেহ, জৈবতন্ত্র—Organism
জানুকাপালিক—Patela, knee-cap
ঝিল্লী—Membrane
ডিম্বাধার—Ovary
ডোরাকাটা—Striated
ডিম্বাণু—Ovum
তন্ত্র—System
তরুণাস্থি—Cartilage
তাড়না—Impulse
আলু—Palate
তন্তু—Fibre
তঞ্চিত—Clot
তৈলগ্রন্থি—Sebaceous gland
তারারন্ধ্র—Pupil
ত্রিকাস্থি—Sacrum
থ্যালামাস—Thalamus (part of brain)
দেহযন্ত্র—Organ
দ্বৈপিক—Islets
দূরদৃষ্টিক্ষীণতা—Longsightedness
ধূসর পদার্থ—Grey matter
ধমনী—Artery
ধারক—Receptors
নাভিরজ্জু—Umbilical cord
নেহাই—Anvil
নিরোধ—Inhibition
নালিকা—Tubules
নিঃসরণ—Elimination, excretion
নাড়ী—Pulse
নিলয়—Ventricle
পাচন—Digestion
পরিপাক—Metabolism
পেশী—Muscle
পেশীসূত্র—Fibrils
পাকস্থলী—Stomach
পর্যায়ক্রমিক—Alternative
প্রতিবর্তন—Reflex
পাতলা দ্রব—Weak solution
প্রগণ্ডাস্থি—Humerus
প্রকোষ্ঠ—Fore arm
পদতলাস্থি—Meta tarsal
পদাঙ্গুলিফলক—Phalanges
প্রান্তীয়—Peripheral, of extremities
পৌষ্টিক নালী—Alimentery canal
পারদ দণ্ড—Mercury column
প্রস্থচ্ছেদ—Transverse section
প্রসারণ—Dilatation, extension
প্রদাহ—Inflamation
প্রতিরোধ পদার্থ—Antibody
প্রশ্বাস—Inhalation inspiration
পরজীবী—Parasite
পোষণ—Assimilation
পার্শ্বদেশ—Lateral side
পিত্ত—Bile
পিত্তাশয়—Gall bladder

পিত্তনল—Bile duct
পরিস্রবন—Filtration
পরিবহন—Conduction
পুঁজ—Pus
পুঁজসৃষ্টিকারী—Piogenous
পাখনা—Plumage
পেশীউদ্দীপক—Motor
প্রসারণকারী পেশী—Extensors
পশ্চাদ্দেশীয়—Posterior, hind
প্রতিবর্তন চক্র—Reflex arc
পাটা—Band
প্রসার্যতা—Tension
পেশীর কর্মতৎপরতা—Muscle tone
প্রতিসরণ—Refraction
পেশী বন্ধনী—Ligament
প্রজনন—Fertilisation
ফুসফুস—Lunge
ফুলকা—Gill
বহির্মুখী—Efferent, centrifugal
বক্ষদেশীয়—Thoracic
বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—Radius
বৃক্ক—Kidney
বীজাণু—Microbes
বিষ—Poison, toxin
বিষঘ্ন—Antitoxin
বায়ুকোষ—Alviolus
বহিঃস্তবক—Epidermis
বহিঃক্ষরা—Exocrine
বোধোদ্দীপক—Sensory
বর্ধনশীল—Vegetative, growing
বহিঃস্তর—Ectoderm
ভারসাম্য—Balance
ভারকেন্দ্র—Centre of gravity
ভারোত্তলক যন্ত্র—Lever
ভাঁজ—Flex
ভেদ্য—Permeable
ভ্রূণ—Embryo
মধ্যস্তর—Mesoderm
মূত্রাশয়—Urinary bladder
মূত্রপথ—Urethra
মূত্রনালী—Ureter
মূল স্তবক—Basal layer
মস্তিষ্কের ঝিল্লী—Meninges
মধ্যচ্ছদা—Diaphragm
মহাধমনী—Aorta
মস্তিষ্কাধার—Cranium
যান্ত্রিক—Mechanical
যৌনগ্রন্থি—Sex glands
যৌনগ্রন্থি অপসারণ—Castration
যৌগিক—Compound
রক্ত দান বা প্রবিষ্ট করান—Transfusion
রাসায়নিক—Humoral, chemical
রক্তরস—Plasma
রক্তমস্তু—Serum
রক্ত সংবহন—Circulation
রগাস্থি—Temporal bone
রঞ্জক পদার্থ—Pigment, dye
রক্তাল্পতা—Anaemia
রক্তের প্রকৃতি বিন্যাস—Blood grouping
রক্ত প্রণালীতে রক্ত জমাট বাঁধা—Thrombosis
রক্তপ্রণালী—Blood vessels
রক্তপ্রণালী সম্পর্কিত—Vascular
রেকাব—Plate, horse stirrup
লসিকা—Lymph
ললাটাস্থি—Frontal bone
লঘুকরণ—Refraction of air
লোহিত কণিকা—Red blood cells
লসিকা পিণ্ড—Lymph nodes
হনু—Maxillary bone
হৃদ্ধরা কলা—Pericardium
হৃৎপিণ্ড—Heart
হৃৎ-স্পন্দন—Heart beat
শারীর-বৃত্ত—Physiology
শারীর-সংস্থান—Anatomy
শর্করা—Carbohydrate
শ্বেতসার—Starch
শ্বসন তন্ত্র—Respiratory system
শ্বাস (ত্যাগ)—Expiration
শ্বাস নালী—Trachea
শ্রোণিচক্র—Pelvis
শিরকস্তাস্থি—Parietal bone
শির-নিম্নাস্থি—Occipital bone
শিরা—Vein
শৃঙ্গ—Apex, horn
শ্বেত কণিকা—White blood cells, Lenocoaytes
শ্ব-দন্ত—Canine teeth
শোষক যন্ত্র—Suckers

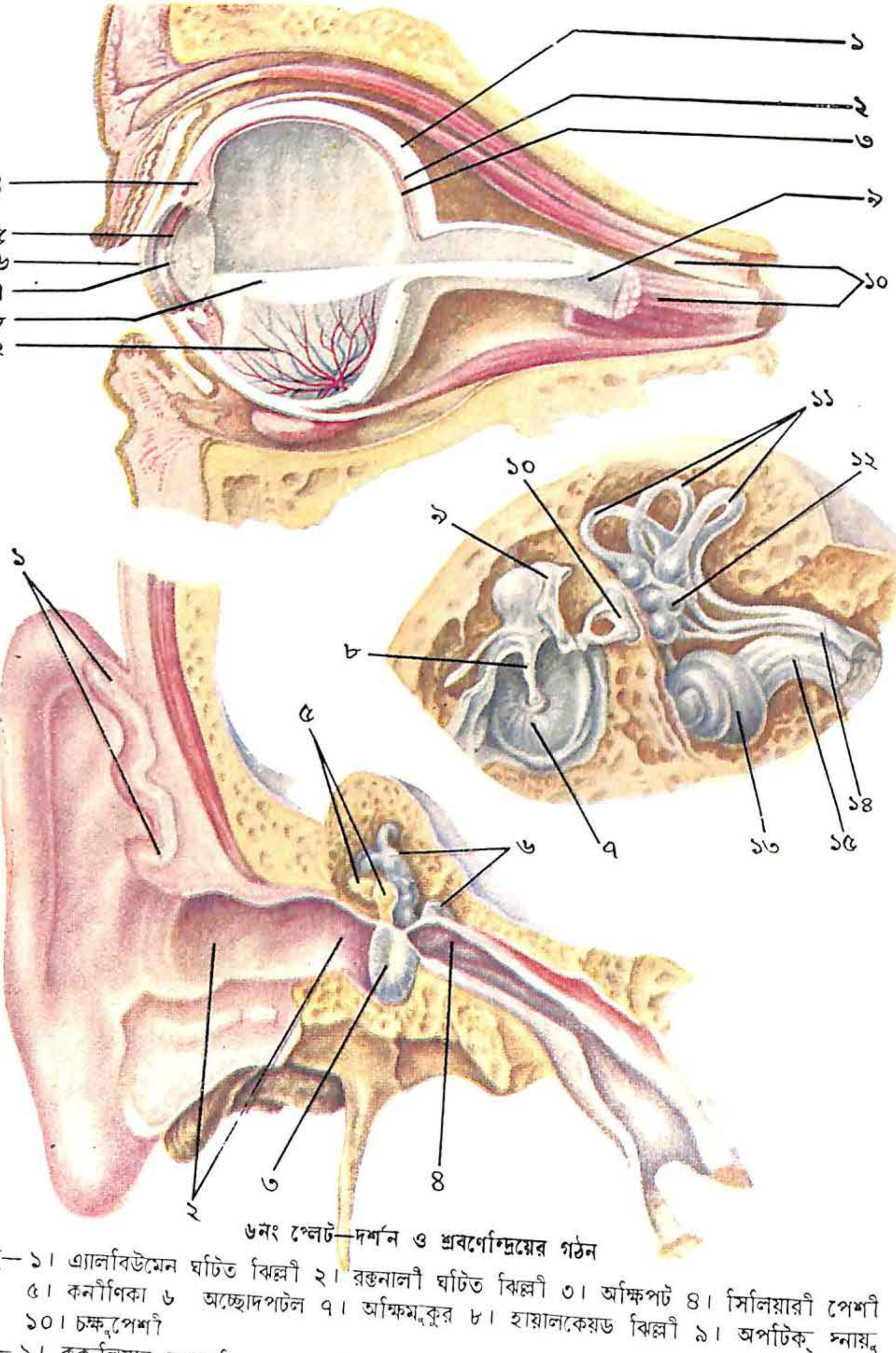
শ্লেষ্মা—Mucus
শ্লেষ্মা-ঝিল্লী—Mucus membrane
শ্লেষ্মা স্ফীতি—Mixoedima
শ্বেত-পদার্থ—White matter
শ্বেত-স্তবক—Setara
শ্রবণ (পথ)—Auditory (path)
শম্বূক—Cocnlea
শুক্রকীট—Spermatozoa
স্নায়ু—Nerve
স্থিতিশীলতা—Stability
স্থিতিস্থাপকতা—Elasticity
স্নেহ বা চর্বি—Fat
স্নায়বিক কলা—Nervous tissue
স্নায়ুতন্তু—Nerve fibres
স্বরযন্ত্র—Larynx
সন্ধিচ্যুতি—Dislocation of bones

সঞ্চালন—Movement
সংপৃক্ত—Saturated
সংবেদনীয়—Sympathetic
সংকুচিত—Constricted
সংকোচন—Contraction
স্তব্ধ—Failure
সুষুম্নাশীর্ষ—Medulla oblongata
স্নেহঘটিত প্রতিক্রিয়া—Fatty degeneration
স্বরতন্ত্রী—Vocal cords
সোঁয়া—Cillia
স্নায়ু-গ্রন্থি—Ganglin
স্বাদ কোরক—Taste bud
সংযোজক কলা—Connective tissue
সমন্বয় সাধন—Synthesis
ক্ষার—Alkali



১নং প্লেট—আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের বিন্যাস

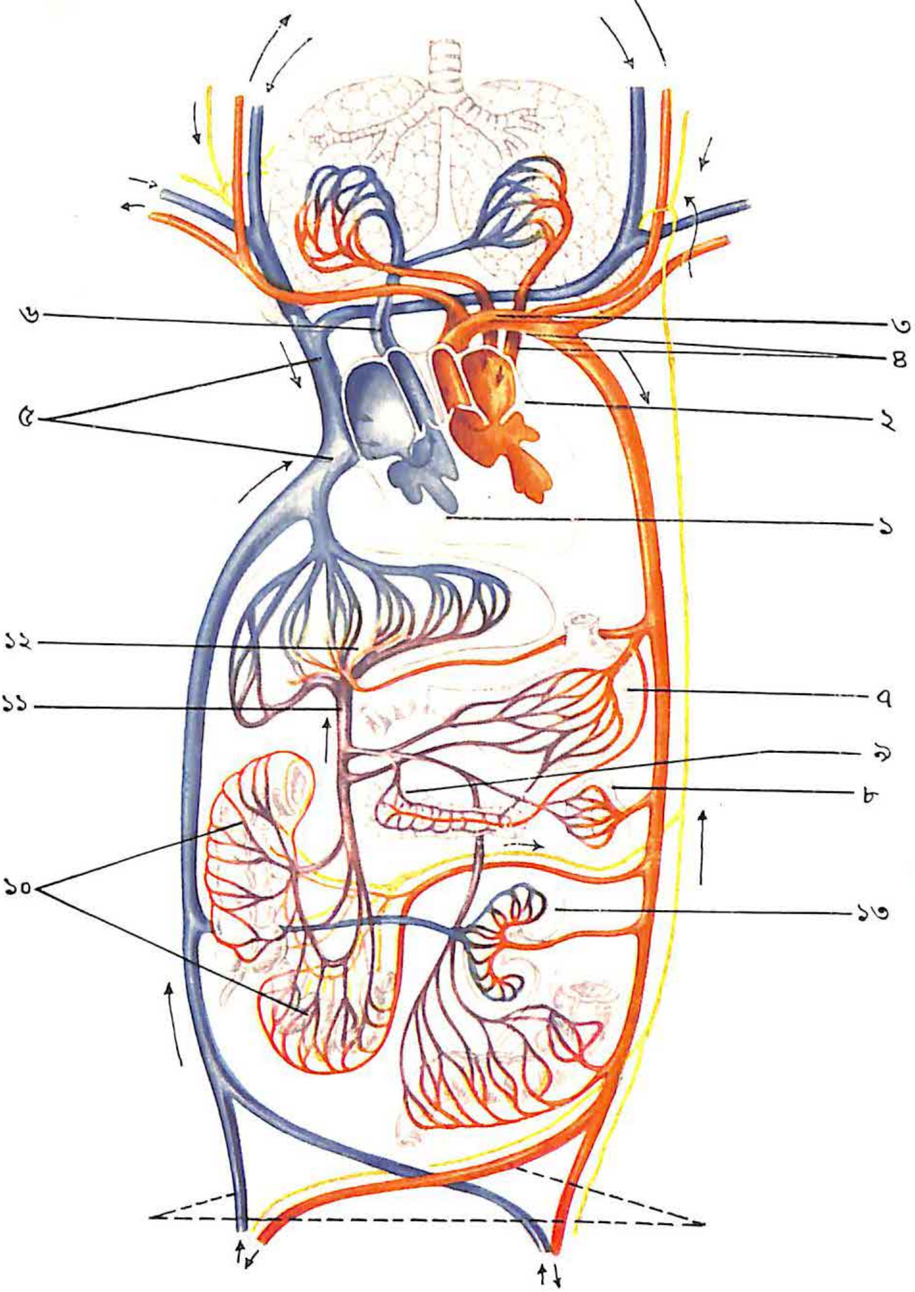
১। স্বরযন্ত্র ২। শ্বাসনালী ৩। অক্ষাস্থি ৪। উচ্চ মহাশিরা ৫। মহাধমনী ৬। দক্ষিণ ফুসফুস ৭। বাম ফুসফুস (হৃৎপিণ্ডকে দেখাইবার জন্য একপাশে টানিয়া লওয়া হইয়াছে) ৮। পালমনারি ধমনী ৯। হৃৎপিণ্ড ১০। পেরিকার্ডিয়াম ১১। প্লুরা ১২। মধ্যচ্ছদা ১৩। পেশী ১৪। পঞ্জরাস্থি ১৫। যকৃত ১৬। পাকস্থলী ১৭। ওমেনটাম ১৮। ক্ষুদ্রান্ত্র ১৯। বৃহদান্ত্র ২০। চর্ম ও চর্মনিম্নস্থ কলা ২১। সিকাম ও ভার্মিফর্ম এ্যাপেনডিক্স ২২। পেরিটোনিয়াম ২৩। মূত্রাশয়



৬নং প্লেট—দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের গঠন

চক্ষু— ১। এ্যালবিউমেন ঘটিত ঝিল্লী ২। রক্তনালী ঘটিত ঝিল্লী ৩। অক্ষিপট ৪। সিলিয়ারী পেশী
৫। কনীণিকা ৬ অচ্ছোদপটল ৭। অক্ষিমুকুর ৮। হায়ালকেয়ড ঝিল্লী ৯। অপটিক্ স্নায়ু
১০। চক্ষুপেশী

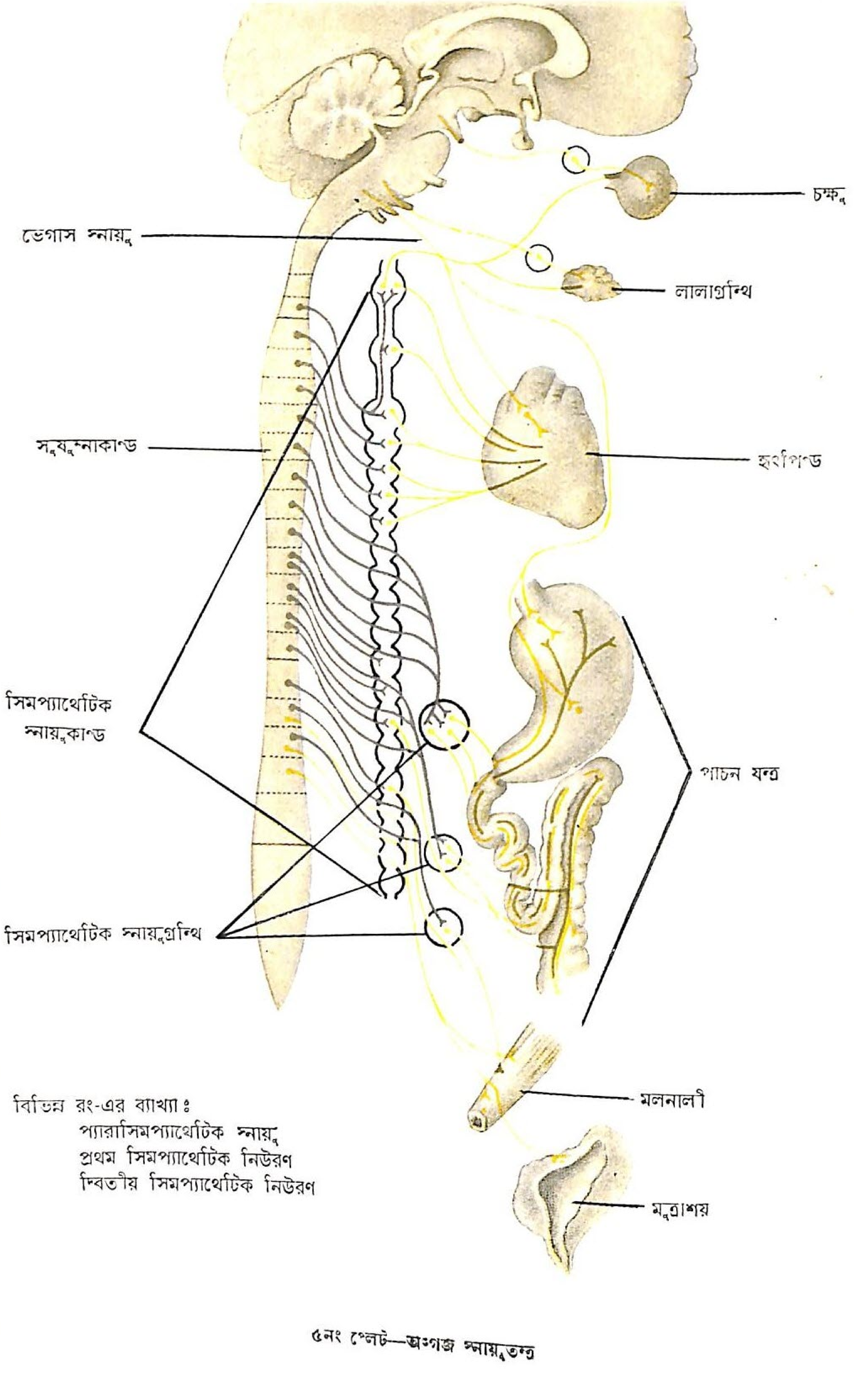
কর্ণ— ১। কক্লিয়ার তরুণাস্থি ২। এক্সটারনাল একাউস্টিক স্নায়ু ৩। কর্ণপটহ (বা টিমপানাস্)
৪। ইউসটেসিয়ান টিউব ৫। মধ্য কর্ণ ৬। অন্তঃকর্ণ ৭। কর্ণপটহের অন্তর্গাত্র ৮। ম্যালিয়াস
৯। নেহাই ১০। রেকাব ১১। অর্ধবৃত্তাকার নালী বা ডাক্ট্ ১২। ভেষ্টিবিউল ১৩। কক্লিয়া
১৪। অর্ধবৃত্তাকার নালী ও ভেষ্টিবিউল হইতে বহির্গামী স্নায়ু ১৫। কক্লিয়া হইতে
বহির্গামী স্নায়ু



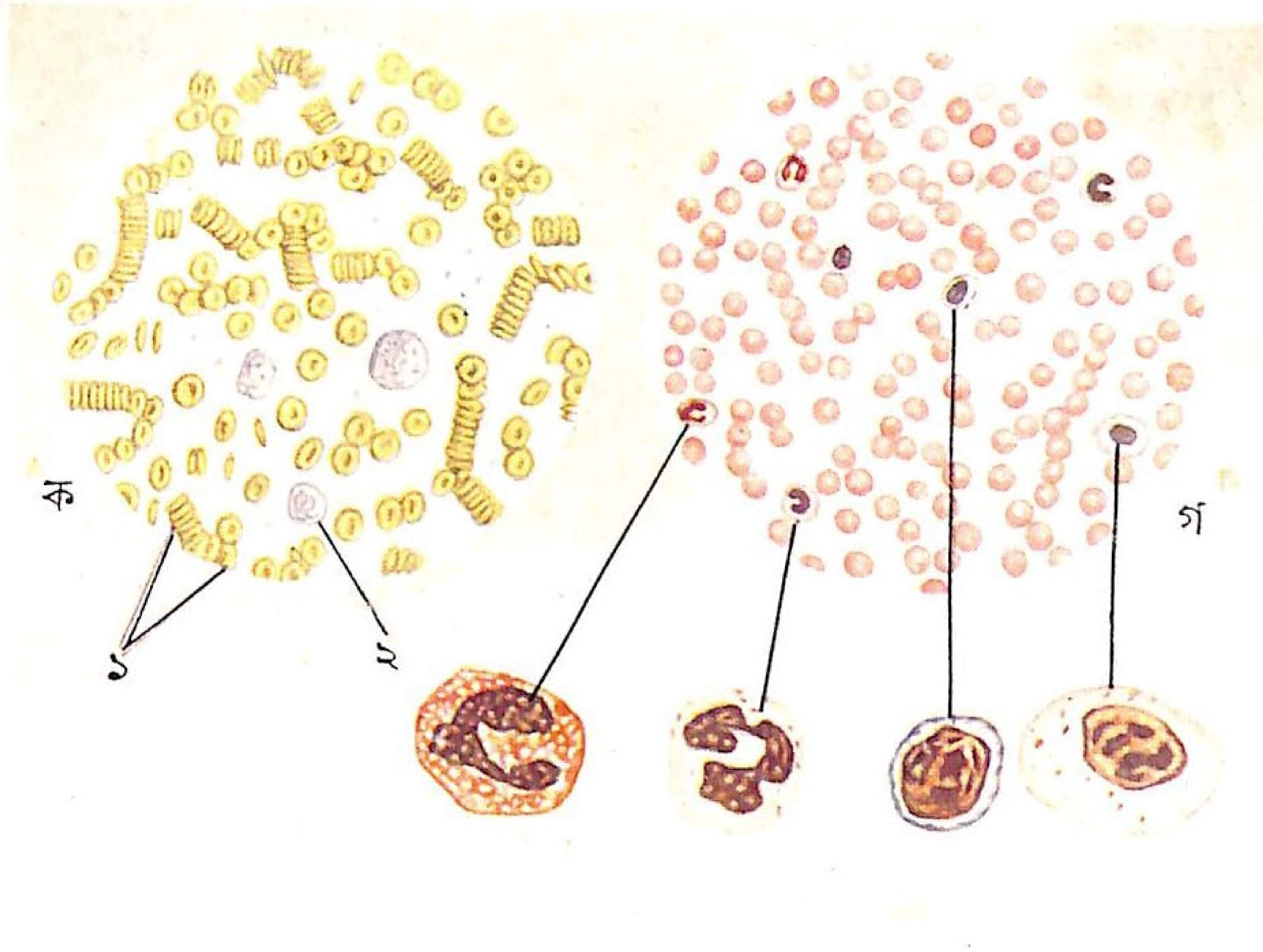
২নং প্লেট—রক্ত ও লসিকা সংবহনের চিত্র

লাল রং—ধমনী বাহিত রক্ত। নীল রং—শিরা। বেগুনি রং—পোর্টাল বা যকৃতের শিরা। পীত রং—লসিকা নালী।

১। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণার্ধ ২। হৃৎপিণ্ডের বাম অর্ধ ৩। মহাধমনী ৪। পালমনারি শিরা ৫। উচ্চ ও নিম্ন মহাশিরা ৬। পালমনারি ধমনী ৭। পাকস্থলী ৮। প্লীহা ৯। অগ্ন্যাশয় ১০। অন্ত্র ১১। পোর্টাল শিরা ১২। যকৃত ১৩। বৃক্ক

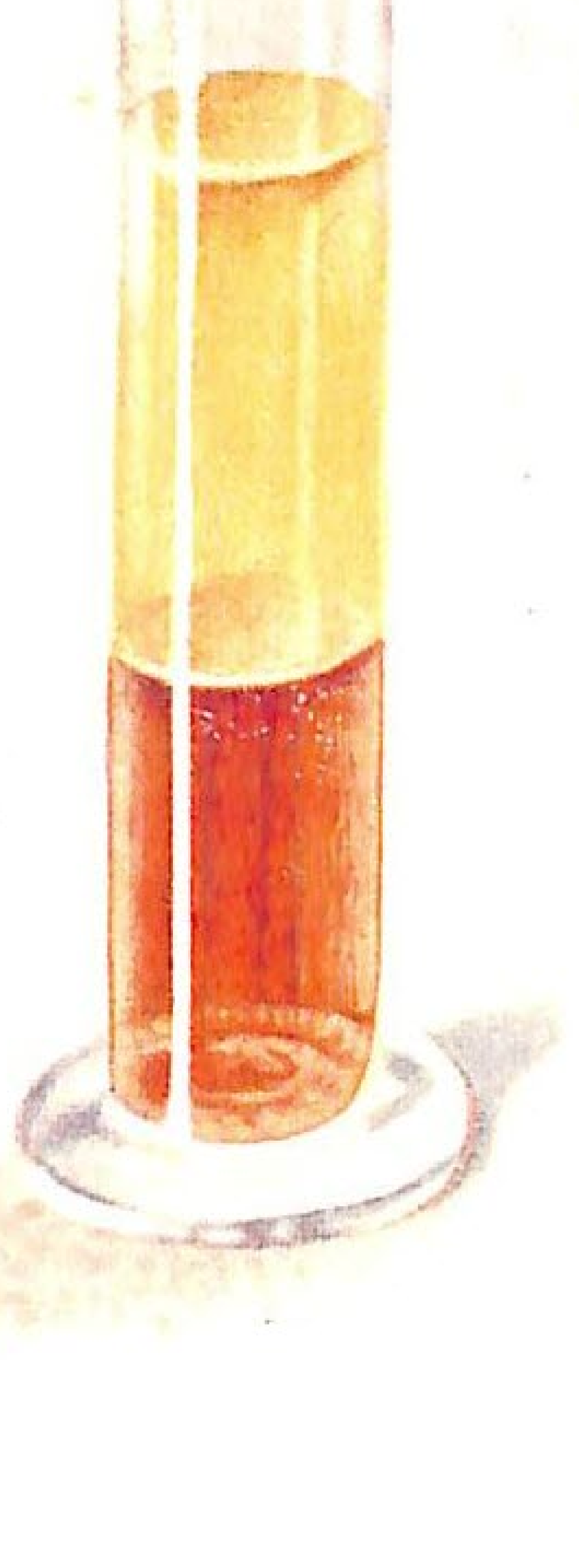


৫নং প্লেট—অংগজ স্নায়ুতন্ত্র



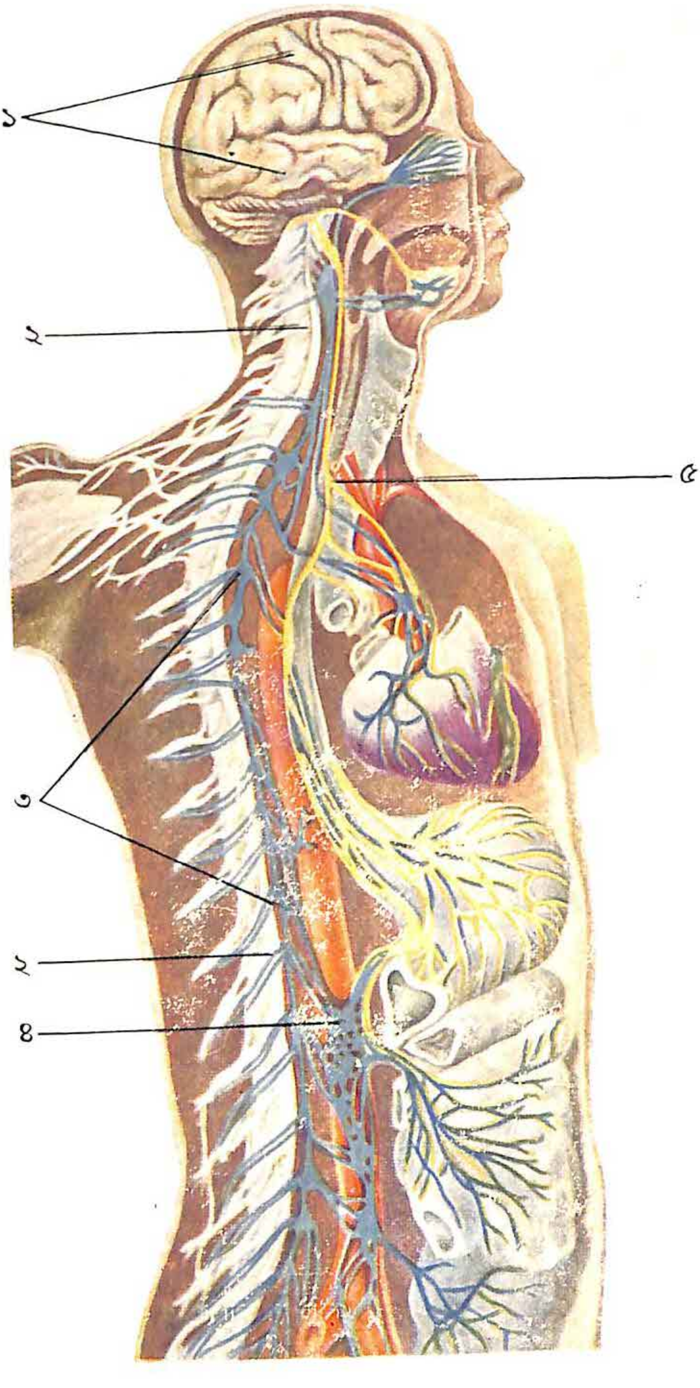


ঘ



৩নং প্লেট—রক্ত

ক। অণুবীক্ষণে দৃষ্ট রক্ত
১। লোহিত কণিকা ২। শ্বেত কণিকা
খ। রং করা রক্ত (বিভিন্ন ধরনের শ্বেত কণিকা)
গ। লোহিত কণিকা—বামে মানুষের; দক্ষিণে ব্যাঙের
ঘ। অ-তঞ্চিত রক্ত—বহুক্ষণ রাখার পর। উপরের (রক্তরস) ও নীচের (লোহিত কণিকা) স্তরের মধ্যস্থলে একটি পাতলা শ্বেত কণিকার স্তর দেখা যাইতেছে।



৪নং প্লেট—মানব দেহের স্নায়ুতন্ত্র

১। মস্তিষ্ক ২। সুষুম্নাকাণ্ড ৩। সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র ৪। মহাধমনীর উপর সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু (সোলার প্লেকসাস্) ৫। ভেগাস (প্যারাসিমপ্যাথেটিক)

সবুজ রং—সিমপ্যাথেটিক। পীত রং—প্যারাসিমপ্যাথেটিক। সাদা—অন্যান্য

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২	৫	কন্তেরা	কণ্ডোরা
৫৮	৯	দেহতন্ত্রগত চক্র	দৈহিক চক্র
৫৯	২১	ফুস্‌ফুস রক্তের	ফুস্‌ফুস চক্রের
৭২	২১	লসিকা হইবার সময়	লসিকাস্রোত প্রবাহিত হইবার সময়
৭৯	৩৬	Falty	Fatty
৮৬	২৪	প্রক্রিয়ামধ্যস্থ	প্রক্রিয়ার ঘটক
৯৬	১০	ইনজেকসন করিবার	ইনজেকসন করিলে
১০৪	১১	শ্লেষ্মা-বীজাণুকে	শ্লেষ্মা বীজাণুকে
১২০	৩৬	জীবদেহের	জীবদেহকে
১৫২	১৯	স্নায়ুতন্ত্রের অভাব	স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাব
১৫৩	১	মানবজীবদেহের	মানবদেহের
১৫৬	৩৩	কেমন	যেমন
১৬৭	২৬	বাতাসে ছাড়িয়া দেয়	বাতাসে তাপ ছাড়িয়া দেয়
১৭১	২৫	পচন শুরু	পচন শুরু হয়
১৭৪	৩৪	ডিয়োডিনের	ডিয়োডিনামের
১৭৫	১১	বলা হয়	বলা হয় অন্তঃক্ষরা
১৮৬	১২-১৩-১৪	(white matter) বলা হয় (grey matter) ও শ্বেতপদার্থ হয়	(grey matter) ও শ্বেত পদার্থ (white matter) বলা হয়।
১৮৮	৩০	কাণ্ড	কাণ্ডের
১৮৮	৩৩	দেহযন্ত্র	দেহযন্ত্রের
১৯১	৩	দিকে	বিপরীত দিকে
১৯১	৪	বিপরীত কেন্দ্রীয়	কেন্দ্রীয়
২২৬	৬	ইউষ্টেকিয়ান	ইউষ্টেসিয়ান
২২৮	ছবির নিচে	সেশেনভ	সেৎচেনভ
২৩৪	৩৮-৩৯	নূতন...থাকে।	৩৮ লাইনটি ৩৯ হইবে ও ৩৯টি ৩৮ হইবে
২৪৩	১০	অবসাদ না করিয়া	বিনা অবসাদে